

আন নাবা

৭৮

নামকরণ

দ্বিতীয় আয়াতের عن النَّبِيِّ الْعَظِيمِ বাক্যাংশের 'আন নাবা' শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এটি কেবল নামই নয়, এই সূরার সমগ্র বিষয়বস্তুর শিরোনামও এটিই। কারণ নাবা মানে হচ্ছে কিয়ামত ও আবেরাতের খবর। আর এই সূরায় এর উপর সমস্ত আলোচনা কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আল মুরসালাতের ভূমিকায় আগেই বলে এসেছি, সূরা আল কিয়ামাহ থেকে আন নাযিজা'ত পর্যন্ত সবক'টি সূরার বিষয়বস্তুর পরম্পরের সাথে একটা মিল আছে এবং এ সবগুলোই মক্কা মুআহ্যমার প্রাথমিক ঘূর্ণে নাযিল হয়েছিল বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

সূরা আল মুরসালাতে যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে এখানেও সেই একই বিষয়ের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও কিয়ামত ও আবেরাত অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ এবং তা মানা ও না মানার পরিণতি সম্পর্কে লোকদের অবহিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ আলাইহি শুয়া সাল্লাম প্রথম দিকে মক্কা মুআহ্যমায় তিনটি বিষয়ের ডিভিতে ইয়েলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন। এক, আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে কাউকে শরীক করা যাবে না। দুই, তাঁকে আল্লাহর নিজের রসূলের পদে নিযুক্ত করেছেন। তিনি, এই দুনিয়া একদিন খৎস হয়ে যাবে। এরপর শুরু হবে আর এক নতুন জগতের। সেখানে আগের ও পরের সব লোকদের আবার জীবিত করা হবে। দুনিয়ায় যে দৈহিক কাঠামো ধারণ করে তারা কাজ করেছিল সেই কাঠামো সহকারে তাদের উঠানে হবে। তারপর তাদের বিশ্বাস ও কাজের হিসেব নেয়া হবে। এই হিসেব নিকেশের ডিভিতে যারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য জানাতে প্রবেশ করবে। যারা কাফের ও ফাসেক প্রমাণিত হবে তারা চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে জাহানামে।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যেকে প্রথমটি আরবদের কাছে যতই অপচলনীয় হোক না কেন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব অবীকার করতো না। তারা আল্লাহকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রব এবং সুষ্ঠা ও রিজিকদাতা বলেও মানতো। অন্য যেসব সত্তাকে তারা ইলাহ

ও মাবুদ গণ্য করতো তাদের সবাইকে আল্লাহরই সৃষ্টি বলেও স্থিকার করতো। তাই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের শুণাবলী ও ক্ষমতায় এবং তাঁর ইলাহ হবার মূল সন্তায় তাদের কোন অংশীদারীত্ব আছে কি নেই এটিই ছিল মূল বিরোধীয় বিষয়।

দ্বিতীয় বিষয়টি মক্কার লোকেরা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। তবে নবুওয়াতের দাবী করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম তাদের মধ্যে চল্পিশ বছরের যে জীবন যাপন করেছিলেন সেখানে তারা কখনো তাঁকে মিথুক, প্রতারক বা ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অবৈধ পদ্ধা অবলম্বনকারী হিসেবে পায়নি। এ বিষয়টি অস্থিকার করার কোন উপায়ই তাদের ছিল না। তারা নিজেরাই তাঁর প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, শান্ত প্রকৃতি, সুস্থমতি ও উন্নত নৈতিক চারিত্রের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই হাজার বাহানাবাজী ও অভিযোগ-দোষারোপ সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম সব ব্যাপারেই সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ছিলেন। কেবলমাত্র নবুওয়াতের দাবীর ব্যাপারে নাউয়বিল্লাহ তিনি ছিলেন মিথুক, এ বিষয়টি অন্যদের বুকানো তো দূরের কথা তাদের নিজেদের পক্ষেও মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল।

এভাবে প্রথম দু'টি বিষয়ের তুলনায় তৃতীয় বিষয়টি মেনে নেয়া ছিল মক্কাবাসীদের জন্য অনেক বেশী কঠিন। এ বিষয়টি তাদের সামনে পেশ করা হলে তারা এর সাথে সবচেয়ে বেশী বিদ্রূপাত্মক ব্যবহার করলো। এ ব্যাপারে তারা সবচেয়ে বেশী বিশ্বয় প্রকাশ করলো। একে তারা সবচেয়ে বেশী অযৌক্তিক ও অসম্ভব মনে করে যেখানে সেখানে একথা ছড়াতে লাগলো যে তা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকল্পনীয়। কিন্তু তাদেরকে ইসলামের পথে নিয়ে আসার জন্য আবেদনের প্রতি বিশ্বাসকে তাদের মনের গভীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া অপরিহার্য ছিল। কারণ আবেদনের প্রতি বিশ্বাসী না হলে এক ও বাতিলের ব্যাপারে চিন্তার ক্ষেত্রে তারা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারতো না, তালো-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে তাদের মূল্যমানে পরিবর্তন সৃচিত হওয়া সম্ভবপর হতো না এবং দুনিয়া পূজার পথ পরিহার করে তাদের পক্ষে ইসলাম প্রদর্শিত পথে এক পা ঢলাও সম্ভব হতো না। এ কারণে মক্কার প্রাথমিক যুগের সূরাগুলোতে আবেদনের পথে একটি বিশ্বাসকে মনের মধ্যে মজবুতভাবে বন্ধমূল করে দেয়ার ওপরই বেশী জোর দেয়া হয়েছে। তবে এ জন্য এমনসব যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে যার ফলে তাওহীদের ধারণা আপনি হ্রদয়গ্রাহী হতে চলেছে। মাঝে মাঝে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম ও কুরআনের সত্যতা প্রমাণের যুক্তিও সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ যুগের সূরাগুলোতে আবেদনের আলোচনা বাবের আসার কারণ ভালোভাবে অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির আলোচ্য বিষয়গুলোর প্রতি নজর দেয়া যাক। কিয়ামতের খবর শুনে মক্কার পথেঘাটে অঙ্গিলিতে সর্বত্র এবং মক্কাবাসীদের প্রত্যেকটি মাহফিলে যেসব আলোচনা, সমালোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি শুরু হয়েছিল এখানে সবার আগে সেদিকে ইঁগিত করা হয়েছে। তারপর অস্থিকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের জন্য যে জমিকে আমি বিছানা বানিয়ে দিয়েছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? জমির মধ্যে আমি এই যে উচু উচু বিশাল বিস্তৃত পর্বত শেণী গেঁড়ে রেখেছি তা কি তোমাদের নজরে পড়ে না? তোমরা কি নিজেদের দিকেও তাকাও না, কিভাবে আমি তোমাদের নারী ও পুরুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি? তোমরা নিজেদের নিদ্রাকে

দেখো না, যার মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তোমাদেরকে কাজের যোগ্য করে রাখার জন্য আমি তোমাদের কয়েক ঘটার পরিণামের পর আবার কয়েক ঘটা বিশ্বাস নিতে বাধ্য করেছি? তোমরা কি রাত ও দিনের আসা-যাওয়া দেখছো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যাকে যথারীতি ধারাবাহিকভাবে জারী রাখা হয়েছে? তোমরা কি নিজেদের মাথার উপর মজবুতভাবে সংঘবন্ধ আকাশ ব্যবহারণ দেখছো না? তোমরা কি এই সূর্য দেখছো না, যার বদৌলতে তোমরা আলো উত্তৃপ লাভ করছো? তোমরা কি বৃষ্টিধারা দেখছো না, যা মেঘমালা থেকে বর্ষিত হচ্ছে এবং যার সাহায্যে ফসল, শাক-সজি সবুজ বাগান ও ঘন বন-জংগল সৃষ্টি হচ্ছে? এসব জিনিস কি তোমাদের একথাই জানাচ্ছে যে, যে মহান অপ্রতিদ্রুতী শক্তিধর এসব সৃষ্টি করেছেন, তিনি কিয়ামত অনুষ্ঠান ও আবেরাত সৃষ্টি করতে অক্ষম? এই সমগ্র কারখানাটিতে যে পরিপূর্ণ কলাকূশলতা ও বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট ফুরণ দেখা যায়, তা প্রত্যক্ষ করার পর কি তোমরা একথাই অনুধাবন করছো যে, সৃষ্টিলোকের এই কারখানার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তু ও প্রতিটি কর্ম একটি উদ্দেশ্যের পেছনে ধাবিত হচ্ছে কিন্তু মূলত এই কারখানাটি নিজেই উদ্দেশ্যবিহীন? এ কারখানায় মানুষকে মুখপাত্রের (Foreman) দায়িত্বে নিযুক্ত করে তাকে এখানে বিরাট ও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে কিন্তু যখন সে নিজের কাজ শেষ করে কারখানা ত্যাগ করে চলে যাবে তখন তাকে এমনিই ছেড়ে দেয়া হবে, ভালোভাবে কাজ করার জন্য তাকে পুরুষ্কৃত করা হবে না ও পেনশন দেয়া হবে না এবং কাজ নষ্ট ও খারাপ করার জন্য জিঞ্জাসাবাদ করা এবং শাস্তি দেয়া হবে না; এর চাইতে অর্থহীন ও বাজে কথা মনে হয় আর কিছুই হতে পারে না। এ যুক্তি পেশ করার পর পূর্ণ শক্তিতে বলা হয়েছে, নিশ্চিতভাবে বিচারের দিন তার নির্ধারিত সময়ে অবশ্যি আসবে। শিশোয় একটি মাত্র ফুক দেবার সাথে সাথেই তোমাদের যেসব বিষয়ের খবর দেয়া হচ্ছে তা সবই সামনে এসে যাবে। তোমরা আজ তা স্থিরীকার করো বা না করো, সে সময় তোমরা যে যেখানে মরে থাকবে সেখান থেকে নিজেদের হিসেব দেবার জন্য দলে দলে বের হয়ে আসবে। তোমাদের অঙ্গীকৃতি সে ঘটনা অনুষ্ঠানের পথ রোধ করতে পারবে না।

এরপর ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, যারা হিসেব-নিকেশের আশা করে না এবং যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের প্রত্যেকটি কথা ও কাজ গুণে গুণে আমার এখানে লিখিত হয়েছে। তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য জাহানাম ওঁৎপেতে বসে আছে। সেখানে তাদের কর্মকাণ্ডের পুরোপুরি বদলা তাদেরকে চুকিয়ে দেয়া হবে। তারা ৩১ থেকে ৩৬ পর্যন্ত আয়াতে এমন সব লোকের সর্বোক্তম প্রতিদানের বর্ণনা দেয়া হয়েছে যারা নিজেদেরকে দায়িত্বশীল ও আল্লাহর কাছে নিজেদের সমস্ত কাজের জবাবদিহি করতে হবে মনে করে সবার আগে দুনিয়ার জীবনে নিজেদের আবেরাতের কাজ করার কথা চিন্তা করেছে। তাদের এই মর্মে নিচয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, তাদের কার্যবলীর কেবল প্রতিদানই দেয়া হবে না, বরং তার চাইতে যথেষ্ট বশী পুরুষ্কারও দেয়া হবে।

সবশেষে আল্লাহর আদালতের চিত্র ও আঁকা হয়েছে। সেখানে কারোর নিজের জিদ নিয়ে গাঁট হয়ে বসে যাওয়া এবং নিজের সাথে সম্পর্কিত লোকদের মাফ করিয়ে নেয়া তো দূরের কথা, অনুমতি-ছাড়া কেউ কথাই বলতে পারবে না। আর অনুমতি হবে এ শর্ত সাপেক্ষে যে, যার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র তার জন্য সুপারিশ

করা যাবে এবং সুপারিশে কোন অসংগত কথাও বলা যাবে না। তাছাড়া একমাত্র তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে যারা দুনিয়ায় সত্যের কালেমার প্রতি সমর্থন দিয়েছে এবং নিছক গুনাহগর আল্লাহর বিধানের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন কোন সত্য অঙ্গীকারকারী কোন প্রকার সুপারিশ সাড়ের হকদার হবে না।

তারপর এক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বক্তব্য শেষ করা হয়েছে, যে দিনের আগমনী সংবাদ দেয়া হচ্ছে সেদিনটি নিচিতভাবেই আসবে। তাকে দূরে মনে করো না। সে কাছেই এসে গেছে। এখন যার ইচ্ছা সেদিনটির কথা মেনে নিয়ে নিজের রবের পথ অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু এ সাবধানবাণী সন্তুষ্ট যে ব্যক্তি তাকে অঙ্গীকার করবে একদিন সমস্ত কর্মকাণ্ড তার সামনে এসে যাবে। তখন সে কেবল অনুত্তুপই করতে পারবে। সে আফসোস করে বলতে থাকবে, হায়। যদি দুনিয়ায় আমার জন্যই তার মনে এ অনুভূতি জাগবে।

আয়াত ৪০

সূরা আন নাবা-মক্কী

কৃত ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

عَمَرٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الَّذِي هُنْ فِيهِ
 مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سِيَعْلَمُونَ ۝ أَلَمْ نَجْعَلِ
 الْأَرْضَ مِهْدًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۝ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۝ وَجَعَلْنَا
 تَوْمَكُمْ سَبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا الْيَلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝

এরা কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছে? সেই বড় যবরট সম্পর্কে কি, যে ব্যাপারে এরা নানান ধরনের কথা বলে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে ফিরছে?^১ কখনো না,^২ শীঘ্ৰই এরা জানতে পারবে। হী কখনো না, শীঘ্ৰই এরা জানতে পারবে।^৩

একথা কি সত্য নয়, আমি যমীনকে বিছানা বানিয়েছি^৪ পাহাড়গুলোকে গেঁড়ে দিয়েছি পেরেকের মতো^৫ তোমাদের (নারী ও পুরুষ) জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি^৬ তোমাদের ঘূমকে করেছি শান্তির বাহন,^৭ রাতকে করেছি আবরণ এবং দিনকে জীবিকা আহরণের সময়^৮

১. বড় যবর বলতে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা বুঝানো হয়েছে। মক্কাবাসীরা অবাক হয়ে কিয়ামত ও আখেরাতের কথা শুনতো। তারপর তাদের প্রত্যেকটি আলাপ-আলোচনায়, বৈঠকে, মজলিসে এ সম্পর্কে নানান ধরনের কথা বলতো ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো। জিজ্ঞাসাবাদ বলতেও এ নানা ধরনের কথাবার্তা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের কথাই বোঝানো হয়েছে। লোকেরা পরস্পরের সাথে দেখা হলে বলতো, আরে ভাই, শুনেছো নাকি? মানুষ নাকি মরে যাবার পরে আবার জীবিত হবে? এমন কথা আগে কখনো শুনেছিলে? যে মানুষটি মরে পচে গেছে, যার শরীরের হাড়গুলো পর্যন্ত মাটিতে মিশে গেছে, তার মধ্যে নাকি আবার নতুন করে প্রাণ সঞ্চার হবে, একথা কি মেনে নেয়া যায়? আগের পরের সব বৎসরের জেগে উঠে এক জায়গায় জমা হবে, একথা কি যুক্তিসংগত? আকাশের বুকে মাথা উচু করে পৃথিবী পৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকা এসব বড় বড় পাহাড় নাকি পেঁজা তুলের মতো বাতাসে উড়তে থাকবে? চাঁদ, সূরজ আর তারাদের আলো কি নিতে যেতে পারে? দুনিয়ার এই জমজমাট ব্যবস্থাটা কি ওলটপালট হয়ে যেতে পারে? এই

মানুষটি তো গতকাল পর্যন্তও বেশ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল, আজ তার কি হয়ে গেলো, আমাদের এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত খবর শুনিয়ে যাচ্ছে? এ জ্ঞানাত ও জাহানাম এতদিন কোথায় ছিল? এর আগে কখনো আমরা তার মুখে একথা শুনিনি কেন? এখন এরা হঠাতে টপকে পড়লো কোথা থেকে? কোথা থেকে এদের অদ্ভুত ধরনের ছবি একে এনে আমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে?

مُمْفِيَهُ مُخْتَلِفُونَ আয়াতাশ্টির একটি অর্থ তো হচ্ছে : “এ ব্যাপারে তারা নানান ধরনের কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্যুপ করে ফিরছে।” এর দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে, দুনিয়ার পরিণাম সম্পর্কে তারা নিজেরাও কোন একটি অভিন্ন আকীদা পোষণ করে না বরং “তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।” তাদের কেউ কেউ খৃষ্টানদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তারা মৃত্যুর পরের জীবন স্বীকার করতো। তবে এই সংগে তারা একথাও মনে করতো যে, এই জীবনটি শারীরিক নয়, অস্ত্রিক পর্যায়ের হবে। কেউ কেউ আবার আখেরাত পুরোপুরি অস্ত্রীকার করতো না, তবে তা ঘটতে পারে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের সন্দেহ ছিল। কুরআন মজীদে এ, ধরনের লোকদের এ উক্তি উত্তৃত করা হয়েছে : **إِنْ نَطَّنُ الْأَظْنَاءِ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ** “আমরা তো মাত্র একটি ধারণাই পোষণ করি, আমাদের কোন নিশ্চিত বিশ্বাস নেই।” [আল জাসিয়াহ, ৩১] আবার এই হী **إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمُعْبُرِينَ** “আমাদের এ দুনিয়ার জীবনটিই সবকিছু এবং মরার পর আমাদের আর কখনো দ্বিতীয়বার উঠানো হবে না।” [আল আন’আম, ২৯] তাদের মধ্যে আবার **كَمَّ** কেউ **سَبَكِّ** জন্য সময়কে দায়ী করতো। তারা বলতোঃ **مَاهِيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَحْيَا وَمَا يُهَلَّكُنَا إِلَّا الدَّمْرُ** “আমাদের এই দুনিয়ার জীবনটিই সব কিছু। এখানেই আমরা মারি, এখানেই জীবন সাড় করি এবং সময়ের চক্র ছাড়া আর কিছুই নেই যা আমাদের ধর্মস করে।” [আল জাসিয়া, ২৪] আবার এমন কিছু লোকও ছিল, যারা সময়কে সবকিছুর জন্য দায়ী না করলেও মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করতো। অর্থাৎ তাদের মতে, মরা মানুষদের আবার জীবিত কূরে তোলার ক্ষমতা আল্লাহর ছিল না। তাদের বক্তব্য ছিল : **مَنْ يُحِسِّنُ الْعَظَامَ وَفِي رَمِيمٍ** “এই হাড়গুলো পঁচেগলে নষ্ট হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে জীবিত করবে কে?” [ইয়াসীন, ৭৮] তাদের এসব বিভিন্ন বক্তব্য একথা প্রমাণ করে যে, এ বিষয়ে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান ছিল না। বরং তারা নিছক আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার বশবর্তী হয়ে অক্রুণে তার ছুঁড়ে যাচ্ছিল। নয়তো এ ব্যাপারে তাদের কাছে যদি কোন সঠিক জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা সবাই একটি বক্তব্যের উপর একমত হতে পারতো (আরো বেশী জ্ঞানের জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আয় যারিয়াতের ৬ টীকা দেখুন)।

২. অর্থাৎ আখেরাত সম্পর্কে যেসব কথা এরা বলে যাচ্ছে এগুলো সবই ভুল। এরা যা কিছু মনে করেছে ও বুঝেছে তা কোনওমেই সঠিক নয়।

৩. অর্থাৎ যে বিষয়ে এরা নিজেরা নানা আজেবাজে কথা বলছে ও ঠাট্টা-বিদ্যুপ করে ফিরছে সেটি যথার্থ সত্য হয়ে এদের সামনে ফুটে উঠার সময় মোটেই দূরে নয়। সে সময় এরা জ্ঞানতে পারবে, রসূল এদেরকে যে খবর দিয়েছিলেন তা ছিল সঠিক এবং আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে এরা যেসব কথা তৈরী করছিল তা ছিল ভিত্তিহীন অসাধ্য।

وَبِنِينَافَوْقَمُرْسِعًا هِلَّا ۝ وَجَعْلَنَا سِرَاجًا وَهَا جَآ ۝ وَأَنْزَلْنَا مِنَ
الْمُعِصْرَتِ مَاءً نَجَاجًا ۝ لِنَخْرُجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَّا ۝ وَجَنِيعَ الْفَاقَافَ ۝
إِنْ يَوْمًا الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝ يَوْمًا يَنْفَعُ فِي الصُورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا ۝
وَتَحْكِيفَ السَّمَاءَ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۝ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝

তোমাদের ওপর সাতটি মজবুত আকাশ স্থাপন করেছি। এবং একটি অতি উজ্জ্বল ও উত্তম বাতি সৃষ্টি করেছি।^১ আর মেঘমালা থেকে বর্ষণ করেছি অবিরাম বৃষ্টিধারা, যাতে তার সাহায্যে উৎপন্ন করতে পারি শস্য, শাক সজি ও নিবিড় বাগান।^২

নিম্নদেহে বিচারের দিনটি নির্ধারিত হয়েই আছে। যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে বের হয়ে আসবে।^৩ আকাশ খুলে দেয়া হবে, ফলে তা কেবল দরজার পর দরজায় পরিণত হবে। আর পর্বতমালাকে চলমান করা হবে, ফলে তা মরীচিকায় পরিণত হবে।^৪

৪. যদীনকে মানুষের জন্য বিছানা অর্থাৎ একটি শাস্তিময় আবাস ভূমিতে পরিণত করার মধ্যে আল্লাহর যে নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান, ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দৃষ্টিতে স্বরূপ নীচের স্থানগুলো দেখুন : তাফহীমুল কুরআন, আন নামুল ৭৩, ৭৪ ও ৮১ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ১০ ও ১১ টীকা, আয় যুখুরফ ৭ টীকা, আল জাসিয়াহ ৭ টীকা এবং কাফ ১৮ টীকা।

৫. পৃথিবীতে পাহাড় সৃষ্টির কারণ এবং এর পেছনে আল্লাহর যে কল্যাণ স্পর্শ রয়েছে তা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাহল ১২ টীকা, আন নম্ল ৭৪ টীকা এবং আল মুরসালাত ১৫ টীকা দেখুন।

৬. মানব জাতিকে নারী ও পুরুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করার মধ্যে সৃষ্টিকর্তার যে মহান কল্যাণ ও উদ্দেশ্য রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল ফুরকান ৬৯ টীকা, আর রুম ২৮ থেকে ৩০ টীকা, ইয়াসীন ৩১ টীকা, আশ সূরা ৭৭ টীকা, আয় যুখুরফ ১২ টীকা এবং আল কিয়ামাহ ২৫ টীকা দেখুন।

৭. মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার যোগ্য করার জন্য মহান আল্লাহ অত্যন্ত কর্মকুশলতা সহকারে তার প্রকৃতিতে ঘূমের এক অভিলাষ বা চাহিদা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। প্রতি কয়েক ঘন্টা পরিশ্রম করার পর এই চাহিদা আবার তাকে কয়েক ঘন্টা ঘূমাতে বাধ্য করে।^৫ এ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআনের সূরা আর রুম ৩৩ টীকা।

৮. অর্থাৎ রাতকে অঙ্ককার করে দিয়েছি। ফলে আগো থেকে নিজেকে বৌচিয়ে তার মধ্যে তোমরা সহজেই ঘুমের প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে দিনকে আলোকোচ্ছল করে দিয়েছি। ফলে তার মধ্যে তোমরা অতি সহজেই নিজেদের রুঞ্জি-রোজগারের জন্য কাজ করতে পারবে। পৃথিবীতে রাত-দিনের নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্ন আবর্তনের মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ রয়েছে। কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র এই একটি কল্যাণের দিকে ইঁধিগত করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ একথা বুঝাতে চান যে, এখানে যা কিছু ঘটছে এগুলো উদ্দেশ্যান্বিতভাবে বা ঘটনাক্রমে ঘটছে না। বরং এর পেছনে একটি মহান কল্যাণকর উদ্দেশ্য কাজ করছে। তোমাদের নিজেদের স্বার্থের সাথে এ উদ্দেশ্যের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তোমাদের অস্তিত্বের খাঠন প্রকৃতি নিজের আরাম ও প্রশান্তির জন্য যে অঙ্ককারের অভিলাষী ছিল তার জন্যে রাতকে এবং তার জীবিকার জন্য যে আলোর অভিলাষী ছিল তার জন্য দিনকে সরবরাহ করা হয়েছে। তোমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদিত এই ব্যবস্থাপনা নিজেই সাক্ষ দিয়ে চলছে যে, কোন জ্ঞানময় সন্তান কর্মকৌশল ছাড়া এটা সম্ভবপর হয়নি। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৬৫ টীকা, ইয়াসীন ৩২ টীকা, আল মু'মিন ৮৫ টীকা এবং আয় যুখুরান্ফ ৪ টীকা)।

৯. মজবুত বলা হয়েছে এ অর্থে যে, আকাশের সীমান্ত অত্যন্ত দৃঢ়ত্বে সংবদ্ধ, তার মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও কখনো হয় না। এ সীমানা পেরিয়ে উর্ধজগতের অসংখ্য গহ-নক্ষত্রের মধ্য থেকে কোন একটিও কখনো অন্যের সাথে সংঘর্ষ বাধায় না এবং কোনটি কক্ষচূড় হয়ে পৃথিবীর বুকে আছড়েও পড়ে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল বাকারাহ ৩৪ টীকা, আর রাঁ'দ ২ টীকা, আল হিজর ৮ ও ১২ টীকা, আল মু'মিনুন ১৫ টীকা, লুকমান ১৩ টীকা, ইয়াসীন ৩৭ টীকা, আস্ সাফফাত ৫ ও ৬ টীকা, আল মু'মিন ১০ টীকা এবং কাফ ৭ ও ৮ টীকা)।

১০. এখানে সূর্যের কথা বলা হয়েছে। মূলে حِمَّةٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে অতি উন্নত আবার অতি উজ্জ্বলও। তাই আয়াতের অনুবাদে আমি দু'টো অর্থই ব্যবহার করেছি। এ ছোট বাক্যটির মধ্যে মহান আল্লাহর শক্তি ও কর্মকুশলতার যে বিরাট নির্দশনটির দিকে ইঁধিগত করা হয়েছে সে নির্দশনটির অর্থাৎ সূর্যের ব্যাস পৃথিবী থেকে ১০৯ শুণ বেশী এবং তার আয়তন পৃথিবীর তলনায় ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার শুণ বড়। তার তাপমাত্রা ১ কোটি ৪০ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করা সম্ভেদ তার আলোর শক্তি এত বেশী যে, মানুষ খালি চোখে তার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে রাখার চেষ্টা করলে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার উভাপে এত বেশী যে, পৃথিবীর কোথাও তার উভাপের ফলে তাপমাত্রা ১৪০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত পৌছে যায়। মহান আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞান ও সৃষ্টিকুশলতার মাধ্যমে পৃথিবীকে সূর্য থেকে এক ভারসাম্যপূর্ণ দূরত্বে স্থাপন করেছেন। পৃথিবী তার বর্তমান অবস্থানের চাইতে সূর্যের বেশী কাছাকাছি নয় বলে অস্বাভাবিক গরম নয়। আবার বেশী দূরে নয় বলে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডাও নয়। এ কারণে এখানে মানুষ, পশু-পাখি ও উদ্ভিদের জীবন ধারণ সম্ভবগর হয়েছে। সূর্য থেকে শক্তির অপরিমিয়ে ভাণ্ডার উৎসারিত হয়ে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এ শক্তিই পৃথিবীর বুকে আমাদের জীবন ধারণের উৎস। তারি সাহায্যে আমাদের ক্ষেত্রে ফসল পাকছে। এবং পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী তার আহার লাভ করছে। তারি উভাপে সাগরের

পানি বাস্প হয়ে আকাশে উঠে যায়, তারপর বাতাসের সাহায্যে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে বারি বৰ্ষণ করে। এ সূর্যের বুকে মহান সর্বশক্তিমান আগ্নাহ এমন বিশাল অগ্নিকুণ্ড ছাপিয়ে রেখেছেন যা কোটি কোটি বছর থেকে সমগ্র সৌরজগতে আলো, উত্তাপ ও বিভিন্ন প্রকার রশ্মি অব্যাহতভাবে ছড়িয়ে চলছে।

১১. পৃথিবীতে বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভিদের তরতাজা হয়ে ওঠার মধ্যে প্রতিনিয়ত আগ্নাহ অসীম ক্ষমতা ও সৃষ্টিকুশলতার যে বিশ্বায়কর আত্মপ্রকাশ ঘটে চলছে সে সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের নিশ্চেষ্ণ স্থানসমূহে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে : সূরা আন নাহল ৩০ টীকা, আল মু'মিনুন ১৭ টীকা, আশ্ শু'আরা ৫ টীকা, আর রুম ৬৫ টীকা, ফাতের ১৯ টীকা, ইয়াসীন ২৯ টীকা, আল মু'মিন ২০ টীকা, আয যুখ্রফ ১০-১১ টীকা এবং আল উয়াকিয়াহ ২৮ থেকে ৩০ টীকা।

এ আয়াতগুলোতে একের পর এক বহু প্রাকৃতিক নির্দশন ও যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে কিয়ামত ও আবেরাত অব্যাক্তকারীদেরকে একথা জানানো হয়েছে যে, যদি তোমরা চোখ মেলে একবার পৃথিবীর চারদিকে তাকাও, পাহাড়-পর্বত, তোমাদের নিজেদের জন্য, নিদী, জাগরণ এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের এই ব্যবস্থাপনাটি গভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করো; বিশ্ব-জাহানে প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক ব্যবস্থা, আকাশ রাজ্যে প্রদীপ্ত সূর্য, মেঘপুঁজি থেকে বর্ষিত বৃষ্টিধারা এবং তার সাহায্যে উৎপন্ন তরুলতা ও বৃক্ষরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করো, তাহলে এসবের মধ্যে তোমরা দু'টি জিনিস সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এক, একটি জ্বরনদন্ত শক্তির সহায়তা ছাড়া এসব কিছু অতিভুলীল হতে পারে না এবং এ ধরনের নিয়ম-শৃঙ্খলার আওতাধীনে জারীও থাকতে পারে না। দুই, এসব জিনিসের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি বিরাট হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ কর্মকুশলতা সক্রিয় রয়েছে এবং উল্লেশ্যবিহীনভাবে কোন একটি কাজও হচ্ছে না। যে মহাশক্তি এসব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করতে পারে, এদেরকে ধৰংস করে দেবার এবং ধৰংস করার পর আবার নতুন করে অন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করার তার ক্ষমতা নেই, এ ধরনের কথা এখন কেবলমাত্র একজন মূর্খই বলতে পারে। আর একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে যে, যে জ্ঞানময় সন্তা এই বিশ্ব-জাহানের কোন একটি কাজও বিনা উদ্দেশ্যে করেননি, তিনি নিজের এ জগতে মানুষকে জেনে বুঝে ভালো ও মন্দের পার্থক্য, আনুগত্য ও অবাধ্যতার স্বাধীনতা এবং নিজের অসংখ্য সৃষ্টিকে কাজে লাগাবার ও ইচ্ছা মতো ব্যবহার করার ক্ষমতা বিনা উদ্দেশ্যেই দান করেছেন। একথাও কেবলমাত্র একজন নির্বোধই বলতে পারে। মানুষ তার সৃষ্টি এ জিনিসগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করুক বা খারাপভাবে উভয় অবস্থার পরিণাম সমান হবে, একজন ভালো কাজ করতে করতে মারা যাবে, সে মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, আর একজন খারাপ কাজ করতে করতে মারা যাবে সেও মাটিতে মিশে খতম হয়ে যাবে, যে ভালো কাজ করবে সে তার ভালো কাজের কোন প্রতিদান পাবে না এবং যে খারাপ কাজ করবে সে ও তার খারাপ কাজের জন্য জিজ্ঞাসিত হবে না এবং কোন প্রতিফল পাবে না, এ ধরনের কথা একজন জ্ঞানহীন মানুষই বিশ্বাস করতে পারে। মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত ও আবেরাত সম্পর্কিত এসব যুক্তিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তাফহীমুল কুরআনের নিশ্চেষ্ণ স্থানগুলো দেখুন : আর রাঁ'আদ ৭ টীকা, আল হজ্জ ৯ টীকা, আর রুম ৬ টীকা, সাবা ১০ ও ১২ টীকা এবং আসু সাফ্ফাত ৮ ও ৯ টীকা।

إِنْ جَهَنَّمْ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلْطَّاغِيْنَ مَا بَأَ ۝ فِيهَا أَحْقَابًا ۝
 لَا يَنْ وَقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا هِمْ مَا وَغَسَاقًا ۝ جَزَاءٌ وَفَاقَا ۝
 إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَكُلُّ بُوَايَتِنَا كِنْ أَبَا ۝ وَكُلُّ شَرِي ۝
 أَحْصَيْنَهُ كِتَبًا ۝ فَنَّ وَقَوْافِلَ نَزِيلَ كُرْلَلَا عَنْ أَبَا ۝

আসলে জাহানাম একটি ফৌদ।^{১৪} বিদ্রোহীদের আবাস। সেখানে তারা যুগের পর যুগ পড়ে থাকবে।^{১৫} সেখানে তারা গরম পানি ও ক্ষতরণ ছাড়া কোন রকম ঠাণ্ডা এবং পানযোগ্য কোন জিনিসের স্বাদই পাবে না।^{১৬} (তাদের কার্যকলাপের) পূর্ণ প্রতিফল। তারা কোন হিসেব-নিকেশের আশা করতো না। আমার আয়তগুলোকে তারা একেবারেই মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল।^{১৭} অথচ প্রত্যেকটি জিনিস আমি গুণে গুণে লিখে রেখেছিলাম।^{১৮} এখন মজা বুঝ, আমি তোমাদের জন্য আয়াব ছাড়া কোন জিনিসে আর কিছুই বাঢ়াবো না।

১২. এখানে শিংগার শেষ ফুঁকের কথা বলা হয়েছে। এর আওয়াজ বুলবুল হবার সাথে সাথেই সমস্ত মরা মানুষ অকস্মাত জেগে উঠবে। “তোমরা বলতে শুধুমাত্র যাদেরকে তখন সর্বোধন করা হয়েছিল তাদের কথা বলা হয়নি বরং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যতগুলো লোক দুনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছে ও করবে তাদের সবার কথা বলা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইবরাহীম ৫৭ টীকা, আল হাজ্জ ১ টীকা, ইয়াসীন ৪৬ ও ৪৭ টীকা এবং আয় যুমার ৭৯ টীকা)।

১৩. এখানে মনে রাখতে হবে, কুরআনের অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও একই সাথে কিয়ামতের বিভিন্ন পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, প্রথম আয়াতটিতে শেষ দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। আর পরবর্তী দু’টি আয়াতে দ্বিতীয় দফায় শিংগায় ফুঁক দেবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে তাফহীমুল কুরআনের সূরা আল হাজ্জার ১০ টীকায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। “জাকাশ খুলে দেয়া হবে” এর মানে হচ্ছে উর্ধ্বাংশতে কোন বাধা ও বন্ধন থাকবে না। সব দিক থেকে সব রকমের আসমানী বালা ও মুসিবতের এমন বন্যা নেমে আসতে থাকবে যেন মনে হবে তাদের আসার জন্য সমস্ত দরজা খুলে গেছে এবং তাদের বাধা দেবার জন্য কোন একটি দরজাও বন্ধ নেই। আর পাহাড়ের চলার ও মরীচিকায় পরিণত হবার মানে হচ্ছে, দেখতে দেখতে মুহূর্তের মধ্যে পর্বতমালা স্থানচ্যুত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। তারপর তেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়বে যে, যেখানে একটু আগে বিশাল পর্বত ছিল সেখানে দেখা যাবে বিশাল বালুর সমৃদ্ধ। এ অবস্থাকে সূরা তাহায় নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : “এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেদিন এ পাহাড়

কোথায় চলে যাবে? এদের বলে দাও, আমার রব তাদেরকে ধূলোয় পরিণত করে বাতাসে উড়িয়ে দেবেন এবং যমীনকে এমন একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন যে, তার মধ্যে কোথাও একটুও অসমতল ও উচ্চনীচু জায়গা এবং সমান্যতম তাঁজও দেখতে পাবে না।” (১০৫-১০৭ আয়াত এবং ৮৩ টীকা)।

১৪. শিকার ধরার উপযোগী করে যে জায়গাটিকে গোপনে তৈরী করা হয় এবং নিজের অঙ্গাত্মারে শিকার যেখানে চলে এসে তার মধ্যে আটকে যায়, তাকেই বলে ফাঁদ। জাহানামের ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা অবলম্বন করে তারা জাহানামের ভয়ে ভীত না হয়ে দুনিয়ায় এ মনে করে লাফালাফি দাপাদাপি করে ফিরছে যে, আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত তাদের জন্য একটি ঢালাও বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখনে তাদের পাকড়াও হবার কোন আশংকা নেই। কিন্তু জাহানাম তাদের জন্য এমন একটি গোপন ফাঁদ যেখানে তারা আকস্মিকভাবে আটকা পড়ে যায় এবং সেখান থেকে বের হবার আর কোন উপায় থাকে না।

১৫. মূলে আহকাব (أَحْقَاب) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, একের পর এক আগমনকারী দীর্ঘ সময়। এমন একটি ধারাবাহিক যুগ যে, একটি যুগ শেষ হবার পর আর একটি যুগ শুরু হয়ে যায়। এ থেকে লোকেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে যে, জানাতের জীবন হবে চিরন্তন কিন্তু জাহানাম চিরন্তন হবে না। কারণ এ যুগ যতই দীর্ঘ হোক না কেন, এখানে যখন যুগ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তখন এ থেকে একথাই বুঝা যাচ্ছে যে, এ সময় অশেষ ও অচুরন্ত হবে না। বরং একদিন না একদিন তা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু দু’টি কারণে এই যুক্তি ভুল। এক, আরবীতে ‘হাকাব’ শব্দের আভিধানিক অর্থের মধ্যেই এ ভাবধারা রয়েছে যে, একটি হাকবের পিছনে আর একটি হাকব রয়েছে। কাজেই আহকাব অপরিহার্যভাবে এমন যুগের জন্য বলা হবে যা একের পর এক আসতেই থাকবে এবং এমন কোন যুগ হবে না যার পর আর কোন যুগ আসবে না। দুই, কোন বিষয় সম্পর্কে কুরআন মজীদের কোন আয়াত থেকে এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা নীতিগতভাবে ঠিক নয়, যা সেই একই বিষয় সম্পর্কিত কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। কুরআনের ৩৪ জায়গায় জাহানামবাসীদের জন্য ‘খুলুদ’ (চিরন্তন) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তিন জায়গায় কেবল ‘খুলুদ’ বলেই শেষ করা হয়নি বরং তার সাথে ‘আবাদান’ ‘আবাদান’ (চিরকাল) শব্দও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এক জায়গায় পরিকার বলা হয়েছে, ‘তারা চাইবে জাহানাম থেকে বের হয়ে যেতে। কিন্তু তারা কখনো সেখান থেকে বের হতে পারবে না এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আয়াব।’ (আল মায়েদাহ ৩৭ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে : “যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন তারা এ অবস্থায় চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।” জানাতবাসীদের সম্পর্কেও এ একই কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : “যতদিন পৃথিবী ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত আছে ততদিন জানাতে তারা চিরকাল থাকবে, তবে তোমার রব যদি অন্য কিছু চান।” (হুদ ১০৭-১০৮ আয়াত) এই সুস্পষ্ট বজ্রবের পর ‘আহকাব’ শব্দের ভিত্তিতে একথা বলার অবকাশ আর কতটুকু থাকে যে, আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণকারীরা জাহানামে চিরকাল অবস্থান করবে না বরং কখনো না কখনো তাদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে?

إِنَّلِلْمُتَقِينَ مَفَازٌ ۚ حَدَّ أَئِقَّ وَأَعْنَابًا ۗ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۗ وَكَاسَاً ۖ
دِهَاقًا ۗ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا ۗ وَلَا كِنْبًا ۗ

২ রক্তু'

অবশ্যি মুন্তাকীদের^১ জন্য সাফল্যের একটি স্থান রয়েছে। বাগ-বাগিচা, আঙ্গুর, নবযৌবনা সমবয়সী তরুণীবন্দ^২ এবং উচ্ছিপিত পানপাত্র। সেখানে তারা শুনবে না কোন বাজে ও মিথ্যা কথা।^৩

১৬. মূলে গাস্মাক (غَسَّاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হয় : পুঁজি, রক্ত, পুঁজি মেশানো রক্ত এবং চোখ ও গায়ের চামড়া থেকে বিভিন্ন ধরনের কঠোর দৈহিক নির্যাতনের ফলে যেসব রস বের হয়। এছাড়াও এ শব্দটি ভীষণ দুর্গন্ধ ও পাঁচে গিয়ে উৎকট দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এমন জিনিসের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১৭. এ হচ্ছে তাদের জাহানামের ভয়াবহ আয়াব ভোগ করার কারণ। প্রথমত, দুনিয়ায় তারা এ মনে করে জীবন যাপন করতে থাকে যে, আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজেদের আসনের হিসেব পেশ করার সময় কখনো আসবে না। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ নিজের নবীদের মাধ্যমে তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব আয়াত পাঠিয়েছিলেন সেগুলো মনে নিতে তারা সম্পূর্ণরূপে অঙ্গীকার করে এবং সেগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।

১৮. অর্থাৎ তাদের সমস্ত কথা ও কাজ, তাদের সব রকমের উঠাবসা-চলাফেরা এমনকি তাদের চিন্তা, মনোভাব, সংকল্প ও উদ্দেশ্যাবলীর পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড আমি তৈরি করে রাখছিলাম। সেই রেকর্ড থেকে কোন কিছুই বাদ যেতে পারেনি। অর্থ সেই নির্বোধদের এ সবের কোন খবর ছিল না। তারা নিজেদের জায়গায় বসে মনে করছিল, তারা কোন মগের মূল্যকে বাস করছে, নিজেদের ইচ্ছে মতো তারা এখানে যাচ্ছেতাই করে যাবে এবং তাদের এসব খেচ্ছারের জন্যে কারোর কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

১৯. এখানে মুন্তাকী শব্দটি এমন সব লোকের মোকাবিলায় ব্যবহার করা হয়েছে যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের দুনিয়ার কার্যক্রমের হিসেব দেবার কোন ধারণা পোষণ করতো না। এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাই নিশ্চিতভাবেই এ আয়াতে এমন সব লোকের কথা বলা হয়েছে যারা আল্লাহর আয়াতকে সত্য বলে মনে নিয়েছিল এবং একথা মনে করে দুনিয়ায় জীবন যাপন করেছিল যে, কিয়ামতের দিন তাদের দুনিয়ায় সমস্ত কাজের হিসেব দিতে হবে।

২০. এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা পরম্পর সমবয়স্কা হবে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, তাদেরকে যেসব পুরুষের স্তুর হিসেবে দেয়া হবে তারা সে সব স্বামীদের সমবয়স্কা হবে। ইতিপূর্বে সূরা সাদ-এর ৫২ আয়াতে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৩৭ আয়াতেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

جزاءٍ مِنْ رِبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُولُ الْرُّوحُ وَالْمَلِئَةُ صَفَا
لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَامَ أَذْنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَّابًا ۝ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ
فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَابَا ۝ إِنَّا آنَّ رَنْكَرْ عَنْ أَبَا قَرِيبَا ۝ يَوْمَ
يُنَظَّرُ الْمَرءُ مَا قُدِّمَتْ يَدَهُ وَيَقُولُ الْكِفَرُ يُلْيِتْنِي كُنْتُ تَرْبَا ۝

প্রতিদান ও যথেষ্ট পুরস্কার^{২২} তোমাদের রবের পক্ষ থেকে, সেই পরম করণাময় আগ্নাহর পক্ষ থেকে যিনি পৃথিবী ও আকাশসমূহের এবং তাদের মধ্যবর্তী প্রত্যেকটি জিনিসের মালিক, যার সামনে কারো কথা বলার শক্তি থাকবে না।^{২৩}

যেদিন ঝাই^{২৪} ও ফেরৈশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। পরম করণাময় যাকে অনুমতি দেবেন এবং যে ঠিক কথা বলবে, সে ছাড়া আর কেউ কথা বলবে না।^{২৫} সেদিনটি নিশ্চিতভাবেই আসবে। এখন যার ইচ্ছা নিজের রবের দিকে ফেরার পথ ধরুক।

যে আয়াবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম।^{২৬} যেদিন মানুষ সেসব কিছুই দেখবে যা তার দু'টি হাত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কাফের বলে উঠবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।^{২৭}

২১. জানাতে মানুষ কোন বাজে, নোংরা, মিথ্যা ও অর্থহীন কথা শুনবে না। মানুষের কান এ থেকে সংক্ষিপ্ত থাকবে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টিকে জানাতের বিরাট নিয়ামত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। জানাতে কোন কটুকথা ও আজেবাজে গপসপ হবে না। কেউ কারোর সাথে মিথ্যা কথা বলবে না এবং কারোর কথাকে মিথ্যাও বলবে না। দুনিয়ায় মালিগালাজ, মিথ্যা দোষারোপ, অভিযোগ, কৃত্স্না প্রচার ও অন্যের ওপর মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দেবার যে ব্যাপক প্রচেষ্টা মানুষের সমাজে চলছে তার ছিটে ফোটাও সেখানে থাকবে না। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮ টাকা এবং আল উয়াকিয়াহ ১৩ ও ১৪ টাকা।)

২২. প্রতিদান শব্দের পরে আবার যথেষ্ট পুরস্কার দেবার কথা বলার অর্থ এ দাঁড়ায় যে, তারা নিজেদের সৎকাজের বিনিময়ে যে প্রতিদান লাভের অধিকারী হবে কেবলমাত্র ততটুকুই তাদেরকে দেয়া হবে না বরং তার ওপর অতিরিক্ত পুরস্কার এবং অনেক বেশী পুরস্কার দেয়া হবে। বিপরীত পক্ষে জাহানামবাসীদের জন্য কেবলমাত্র এতটুকুই বলা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের কাজের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। অর্থাৎ তাদের যে পরিমাণ

অপরাধ তার চেয়ে বেশী শাস্তি দেয়া হবে না এবং কমও দেয়া হবে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন সূরা ইউনুস ২৬-২৭ আয়াত, আন নামল ৮৯-৯০ আয়াত, আল কাসাস ৮৪ আয়াত, সাবা ৩৩ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

২৩. অর্থাৎ হাশেরের ময়দানে আল্লাহর দরবারের শান-শওকত, প্রভাব ও প্রতিপন্থি এমন পর্যায়ের হবে যার ফলে পৃথিবী বা আকাশের আধিবাসী কারোর আল্লাহর সামনে কথা বলার অথবা তাঁর আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করার সাহস হবে না।

২৪. অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এখানে জিরুল আলাইহিস সালামের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর দরবারে তিনি উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবার কারণে এখানে অন্যান্য ফেরেশতাদের থেকে আলাদাভাবে তাঁর কথা বলা হয়েছে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা আল মা'আরিজ ও টীকা)

২৫. এখানে কথা বলা মানে শাফায়াত করা বলা হয়েছে, কেবলমাত্র দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সেদিন এ শাফায়াত সভব হবে। এক, যে ব্যক্তিকে যে গুনাহগারের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে শাফায়াত করার অনুমতি দেয়া হবে একমাত্র সে-ই তার জন্য শাফায়াত করতে পারবে। দুই, শাফায়াতকারীকে সঠিক ও যথার্থ সত্য কথা বলতে হবে। অন্যান্য সুপারিশ করতে পারবে না। দুনিয়ায় কমপক্ষে সত্যের কালেমার সমর্থক অর্থাৎ নিছক গুনাহগার ছিল, কাফের ছিল না, এমন ব্যক্তিকে পক্ষে সুপারিশ করতে হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ ২৮১ টীকা, ইউনুস ৫ টীকা, হৃদ ১০৬ টীকা, মারয়াম ৫২ টীকা, ত্বা-হা ৮৫-৮৬ টীকা, আল আফিয়া ২৭ টীকা, সাবা ৪০-৪১ টীকা, আল মু'মিন ৩২ টীকা, আয যুখরুফ ৬৮ টীকা, আন নাজম ২১ টীকা এবং আল মুদ্দাসির ৩৬ টীকা।)

২৬. আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি এখানে একথা চিন্তা করতে পারে যে যাদেরকে সংশোধন করে একথা বলা হয়েছিল তারা চৌদ্দ'শ বছর আগে দুনিয়া থেকে চলে গেছে এবং এখনো বলা যেতে পারে না, কিয়ামত আগামী কত শত, হাজার বা লক্ষ বছর পরে আসবে, তাহলে একথাটি কোনু অর্থে বলা হয়েছে যে, যে আয়াবটি কাছে এসে গেছে সে সম্পর্কে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিলাম? তাছাড়া সূরার সূচনায় কেমন করে একথা বলা হলো যে, শীঘ্ৰই তারা জানতে পারবে? এর জবাব এই যে, মানুষ যতক্ষণ এ দুনিয়ার স্থান ও কালের সীমানায় রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে অবস্থান করে কেবল ততক্ষণই তার মধ্যে সময়ের অনুভূতি থাকে। মরণের পরে যখন শুধুমাত্র রহস্য বাকি থেকে যাবে তখন আর সময়ের চেতনা ও অনুভূতি থাকবে না। আর কিয়ামতের দিন মানুষ যখন পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে তখন তার মনে হবে যেনি ঘুমের মধ্যে কেউ তাকে জাগিয়ে দিনবাহে। হাজার হাজার বছর পরে তাকে আবার জীবিত করা হয়েছে, এ অনুভূতির লেশমাত্রও তখন তার মধ্যে থাকবে না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আন নামল ২৬ টীকা, বনি ইসরাইল ৫৬ টীকা, ত্বা-হা ৮০ টীকা এবং ইয়াসীন ৪৮ টীকা।)

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ায় জন্মই না হতো অথবা মরে গিয়ে মাটিতে মিশে যেতাম এবং আবার জীবিত হয়ে ওঠার সুযোগ না হতো।

আন নাযি'আত

৭৯

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ **وَالنَّزْعُت** থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

হয়রত আবদুর্রাহ ইবনে আবাস রাদিয়াল্লাহু আনহ বলেন, “আমা ইয়াতাসা-আলুনা”র পরে এ সূরাটি নামিল হয়। এটি যে প্রথম দিকের সূরা তা এর বিষয়বস্তু থেকেও প্রকাশ হচ্ছে।

বিষয়বস্তু ও আলোচ্য বিষয়

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের প্রয়াণ এবং এ সংগে আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার পরিণাম সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ।

বক্তব্যের সূচনায় মৃত্যুকালে প্রাণ হরণকারী, আল্লাহর বিধানসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নকারী এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সারা বিশ্ব-জাহানের ব্যবস্থা পরিচালনাকারী ফেরেশতাদের ক্ষম খেয়ে নিচ্ছিতভাবে আর একটি নতুন জীবনের সূচনা হবে। কারণ যে ফেরেশতাদের সাহায্যে আজ মানুষের প্রাণবায়ু নির্গত করা হচ্ছে তাদেরই সাহায্যে আবার মানুষের দেহে প্রাণ সঞ্চার করা যেতে পারে। যে ফেরেশতারা আজ ঘুর্হতকাল বিলম্ব না করে সংগে সংগেই আল্লাহর হৃকুম তামিল করে যাচ্ছে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনা করছে, আগামীকাল সেই ফেরেশতারাই সেই একই আল্লাহর হৃকুমে এ বিশ্ব ব্যবস্থা ওলটপালট করে দিতে এবং আর একটি নতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

এরপর লোকদের জানানো হয়েছে, এই যে কাজটিকে তোমরা একেবারেই অসম্ভব মনে করো, আল্লাহর জন্য এটি আদতে এমন কোন কঠিন কাজই নয়, যার জন্য বিরাট ধরনের কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে। একবার ঝাঁকুনি দিলেই দুনিয়ার এ সমস্ত ব্যবস্থা ওলটপালট হয়ে যাবে। তারপর আর একবার ঝাঁকুনি দিলে তোমরা অক্ষয় নিজেদেরকে আর একটি নতুন জগতের বুকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে। তখন যারা এ পরবর্তী জগতের কথা অধীকার করতো তারা তয়ে কাঁপতে থাকবে। যেসব বিষয় তারা অসম্ভব মনে করতো তখন সেগুলো দেখতে থাকবে অবাক বিশ্বে।

তারপর সংক্ষেপে হয়েরত মুসা (আ) ও ফেরাউনের কথা বর্ণনা করে গোবদের সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার, তাঁর হিদায়াত ও পথনির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করার এবং প্রতারণার আধ্যায় নিয়ে তাঁকে পরাজিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার পরিণাম ফেরাউন দেখে নিয়েছে। ফেরাউনের পরিণাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তোমরা যদি নিজেদের কর্মনীতি পরিবর্তন না করো তাহলে তোমাদের পরিণামও অন্য রকম হবে না।

এরপর ২৭ থেকে ৩৩ আয়াত পর্যন্ত মৃত্যুর পরের জীবনের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই অঙ্গীকারকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি বেশী কঠিন কাজ অথবা প্রথমবার মহাশূন্যের অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র সহ এ বিশাল বিস্তীর্ণ বিশ্ব-জগত সৃষ্টি করা কঠিন কাজ? যে আল্লাহর জন্য এ কাজটি কঠিন ছিল না তাঁর জন্য তোমাদের দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন? মাত্র একটি বাক্যে আখেরাতের সম্ভাবনার সপক্ষে এ অকাট্য যুক্তি পেশ করার পর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবন ধারণের জন্য যেসব উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। পৃথিবীতে জীবন ধারণের এ উপকরণের প্রতিটি কস্তুর এই যর্মে সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, অত্যন্ত বৃদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও কর্মকুশলতা সহকারে তাকে কোন না কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এ ইঁধণিত করার পর মানুষের নিজের চিন্তা-ভাবনা করে মতামত গঠনের জন্য এ প্রশংস্তি তার বৃদ্ধিবৃত্তির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব-জাহানের এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থায় মানুষের মতো একটি বৃদ্ধিমান জীবকে স্বাধীন ক্ষমতা, ইঁধতিয়ার ও দায়িত্ব অর্পণ করে তার কাজের হিসেব নেয়া, অথবা সে পৃথিবীর বুকে সব রকমের কাজ করার পর মরে নিয়ে মাটির সাথে মিশে যাবে এবং চিরকলের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তারপর তাকে যে ক্ষমতা-ইঁধতিয়ারগুলো দেয়া হয়েছিল সেগুলো সে কিভাবে ব্যবহার করেছে এবং যে দায়িত্বসমূহ তার ওপর অর্পণ করা হয়েছিল সেগুলো কিভাবে পালন করেছে, তার হিসেব কখনো নেয়া হবে না— এর মধ্যে কোনটি বেশী যুক্তিসংগত বলে মনে হয়? এ প্রশ্নে এখানে কোন আগোচনা করার পরিবর্তে ৩৪ থেকে ৪১ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, হাশরের দিন মানুষের স্থায়ী ও চিরন্তন ভবিষ্যতের ফায়সালা করা হবে। দুনিয়ায় নির্ধারিত সীমান্য লংঘন করে কে আল্লাহর বিকল্পে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করেছে, পার্থিব জাত, স্বার্থ ও স্বাদ আবাদনকে উদ্দেশ্যে পরিণত করেছে এবং কে নিজের রবের সামনে হিসেব-নিকেশের জন্য দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীতি অনুভব করেছে ও নফসের অবৈধ আকাংখা-বাসনা পূর্ণ করতে অঙ্গীকার করেছে, সেদিন এরি ভিত্তিতে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। একথার মধ্যেই ওপরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর রয়ে গেছে। দিদ ও ইঠকারিতামুক্ত হয়ে দ্বিমানদারীর সাথে এ সম্পর্কে চিন্তা করলে যে কোন ব্যক্তিই এ জবাব হাসিন করতে পারে। কারণ মানুষকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য যেসব ইঁধতিয়ার ও দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে কাজ শেষে তার কাজের হিসেব নেয়া এবং তাকে শাস্তি বা প্রস্তুত দেয়াই হচ্ছে এ ইঁধতিয়ার ও দায়িত্বের স্বাতান্ত্রিক নৈতিক ও যুক্তিসংগত দাবী।

সবশেষে মক্কার কাফেরদের যে একটি প্রশ্ন ছিল 'কিয়ামত কবে আসবে,-তার জবাব দেয়া হয়েছে। এ প্রশ্নটি তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেছে বারবার

করতো। জ্বাবে বলা হয়েছে, কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। রসূলের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র কেয়ামত যে অবশ্যই হবে এ সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়। এখন যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নিতে পারে আবার যার ইচ্ছা কিয়ামতের ভয়ে ভীত না হয়ে নাগামহীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। তারপর যখন সময়টি এসে যাবে তখন এ দুনিয়ার জীবনের জন্য যারা প্রাণ দিতো এবং একেই সবকিছু মনে করতো, তারা অনুভব করতে থাকবে, এ দুনিয়ার বুকে তারা মাত্র সামান্য সময় অবস্থান করেছিল। তখন তারা জানতে পারবে, এ মাত্র কয়েক দিনের জীবনের বিনিময়ে তারা চিরকালের জন্য নিজেদের ভবিষ্যত কিভাবে বরবাদ করে দিয়েছে।

জায়াত ৪৬

সূরা আন নাহি'আত-মক্কী

কর্ক ২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالنَّزَعُ مِنْ غَرَقًا ① وَالنِّسْطَرِ نَشَطاً ② وَالسَّبِحِ سَبِحَا ③
 فَالسِّقْتِ سَبِقاً ④ فَالْمَدِ بِرْتِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ ⑥ تَتَبعُهَا
 الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِنَ وَاجِفَةُ ⑧ أَبْصَارٌ هَاخَائِشَةُ ⑨

সেই ফেরেশতাদের কসম যারা ডুব দিয়ে টানে এবং খুব আন্তে আন্তে বের করে নিয়ে যায়। আর (সেই ফেরেশতাদেরও যারা বিশ্বলোকে) দ্রুত গতিতে সৌতরে চলে, বারবার (হকুম পালনের ব্যাপারে) সবেগে এগিয়ে যায়, এরপর (আল্লাহর হকুম অনুযায়ী) সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনা করে।^১ যেদিন ভূমিকক্ষের ধাক্কা ঝাঁকুনি দেবে এবং তারপর আসবে আর একটি ধাক্কা।^২ কতক হৃদয় সেদিন ডয়ে কাঁপতে থাকবে।^৩ দৃষ্টি হবে তাদের ভীতি বিহ্বল।

১. এখানে যে বিষয়টির জন্য পাঁচটি গুণাবলীমস্পন্দন সন্তোষমূহের কসম খাওয়া হয়েছে তার কোন বিশ্লেষিত আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু প্রবর্তী আলোচনায় যেসব বিষয় উদ্ধাপিত হয়েছে তা থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামত অবশ্য হবে এবং সমস্ত মৃত মানুষদের নিশ্চিতভাবেই আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো হবে, একথার উপরই এখানে কসম খাওয়া হয়েছে। এ পাঁচটি গুণাবলী কোন্ কোন্ সন্তোষ সাথে জড়িত, একথাও এখানে পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কিন্তু বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেটিন এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা), মাসরুক, সাঈদ ইবনে যুবাইর, আবু সালেহ, আবুদ্দ দৃহা ও সুন্দী বলেন : ডুব দিয়ে টানা এবং আন্তে আন্তে বের করে আনা এমন সব ফেরেশতার কাজ যারা মৃত্যুকালে মানুষের শরীরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তার প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে তার প্রাণ বায়ু টেনে বের করে আনে। দ্রুতগতিতে সৌতরে চলার সাথে হয়রত আলী (রা), হয়রত ইবনে মাসউদ (রা), মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও আবু সালেহ ফেরেশতাদেরকেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। এ ফেরেশতারা আল্লাহর হকুম তামিল করার জন্য এমন দ্রুত গতিশীল রয়েছে যেন মনে হচ্ছে তারা মহাশূন্যে সৌতার কাটছে। “সবেগে এগিয়ে যাওয়ার” ব্যাপারেও এই একই অর্থ গ্রহণ করেছেন হয়রত আলী (রা) মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, মাসরুক ও

يَقُولُونَ إِنَّا مَرْدُونَ فِي الْحَافِرَةِ ۝ إِذَا كُنَّا عَظَمَانِ خَرَّةً ۝ قَالُوا
تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۝ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ إِذَا هُمْ
بِالسَّاهِرَةِ ۝

এরা বলে, “সত্ত্বিই কি আমাদের আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে? পচা-গলা হাজিতে পরিণত হয়ে যাওয়ার পরও?” বলতে থাকে “তাহলে তো এ ফিরে আসা হবে বড়ই লোকসানের!”^{১৪} অর্থ এটা শুধুমাত্র একটা বড় রকমের ধর্মক এবং হঠাৎ তারা হায়ির হবে একটি খোলা ময়দানে! ^{১৫}

হাসান বসরী প্রমুখগণ। আর সবেগে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর হকুমের ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই তাদের প্রত্যেকেই তা তামিল করার জন্যে দৌড়ে যায়। “সকল বিষয়ের কাজ পরিচালনাকারী বলতেও ফেরেশতাদের কথাই বুঝানো হয়েছে। হযরত আলী (রা), মুজাহিদ, আতা, আবু সালেহ, হাসান বসরী, কাতাদাহ থেকে একথাই উভ্রূত হয়েছে। অন্য কথায় বলা যায়, এরা বিশ্ব ব্যবস্থাপনার এমন সব কর্মচারী যাদের হাতে আল্লাহর হকুমে দুনিয়ার সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে। কোন সহীহ হাদীসে এ আয়াতগুলোর এ অর্থ বর্ণিত না হলেও প্রথম সারির কয়েকজন সাহাবা এবং তাঁদেরই ছাত্রমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত কতিপয় তাবেঈ যখন এগুলোর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন তখন তাঁদের এই জান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অর্জিত হয়ে থাকবে মনে করাটাই স্বাভাবিক।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়া ও মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে ফেরেশতাদের ক্ষম যাওয়ার কারণ কি? তারা নিজেরাই তো সে জিনিসের মতো অদৃশ্য ও অনন্তরুত, যা অনুষ্ঠিত হবার ব্যাপারে তাদেরকে সাক্ষী ও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে? এর কারণ অবশ্য আল্লাহ ভালো জানেন। তবে আয়ার মতে এর কারণ হচ্ছে, আরববাসীরা ফেরেশতাদের অন্তিম অঙ্গীকার করতো না। তারা স্বীকার করতো মৃত্যুকালে ফেরেশতারাই মানুষের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়। তারা একথাও বিশ্বাস করতো যে, ফেরেশতারা অতি দ্রুতগতিশীল হয়, এক মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলে যায় এবং হকুম করার সাথে সাথেই যে কোন কাজ মুহূর্তকাল দেরি না করেই করে ফেলে। তারা একথাও মানতো, ফেরেশতারা আল্লাহর হকুমের অনুগত এবং আল্লাহর হকুমেই বিশ্ব-জাহানের সমগ্র ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করে। ফেরেশতারা স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ‘ইচ্ছা ও কর্মপ্রেরণার অধিকারী নয়। মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণে তারা অবশ্য ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলতো। তারা তাদেরকে নিজেদের মাঝে পরিণত করেছিল। কিন্তু আসল ক্ষমতা-ইখতিয়ার যে ফেরেশতাদের হাতে একথা তারা মনে করতো না। তাই এখানে কিয়ামত হওয়া এবং মৃত্যুর পরের জীবন প্রমাণ করার উদ্দেশ্যেই ফেরেশতাদের উপরোক্তবিত গুণাবলীর কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে

هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ نَادَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمَقْدِسِ طُوئِيٌّ
 اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَىٰ ۝ فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى آنَ تَرْزِكِيٌّ
 وَأَهْلِ يَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشِيٌّ ۝ فَارْهَ الْآيَةَ الْكَبِيرَىٰ ۝ فَكَلَّ بَ
 وَعْصِيٌّ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۝ فَحَسِرَ فَنَادَىٰ ۝ فَقَالَ آنَارَبِّكَ
 الْأَعْلَىٰ ۝ فَأَخْلَنَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأُخْرَةِ وَالْأَوْلَىٰ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً
 لِمَنْ يَخْشِيٌّ ۝

তোমার^৬ কাছে কি মূসার ঘটনার খবর পৌছেছে? যখন তার রব তাকে পবিত্র ‘তুওয়া’ উপত্যকায়^৭ ডেকে বলেছিলেন, “ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তাকে বলো, তোমার কি পবিত্রতা অবশেষ করার আগ্রহ আছে এবং তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাইলে তোমার মধ্যে (তাঁর) ভয় জাগবে^৮” তারপর মূসা ফেরাউনের কাছে গিয়ে তাকে বড় নিদর্শন^৯ দেখালো। কিন্তু সে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করলো ও অমান্য করলো, তারপর চালবাজী করার মতলবে পিছন ফিরলো।^{১০} এবং লোকদের জমায়েত করে তাদেরকে সংযোধন করে বললো : “আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব^{১১}” অবশেষে আগ্রাহ তাকে আখ্যেরাত ও দুনিয়ার আয়াবে পাকড়াও করলেন। আসলে এর মধ্যে রয়েছে মন্তবড় শিক্ষা, যে ভয় করে তার জন্যে।^{১২}

যে, আগ্রাহ হকুমে ফেরেশতারা তোমাদের প্রাণ বের করে নিয়ে যায়, তাঁরই হকুমে তারা আবার তোমাদের প্রাণ দানও করতে পারে। যে আগ্রাহ হকুমে তারা বিশ-জাহানের ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করছে তাঁরই হকুমে, যখনই তিনি এ হকুম করবেন তখনই তারা এ বিশ-জাহানকে ধ্বংস করে দিতে এবং আর একটি নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করতেও পারে। তাঁর হকুম তামিল করার ব্যাপারে তাদের পক্ষ থেকে সামান্যতম শৈথিল্য বা মূহূর্তকাল দেরীও হতে পারে না।

২. প্রথম ধাক্কা বলতে এমন ধাক্কা বুঝানো হয়েছে, যা পৃথিবী ও তার মধ্যকার সমস্ত জিনিস ধ্বংস করে দেবে। আর দ্বিতীয় ধাক্কা বলতে যে ধাক্কায় সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে যাবানের মধ্য থেকে বের হয়ে আসবে তাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা যুমারে এ অবস্থাটি নিমোনিতাবে বর্ণিত হয়েছে : “আর শিংগায় ফুক দেয়া হবে। তখন পৃথিবী ও

আকাশসমৃহে যা কিছু আছে সব মরে পড়ে যাবে, তবে কেবলমাত্র তারাই জীবিত থাকবে যাদের আল্লাহ (জীবিত রাখতে) চাইবেন। তারপর দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়া হবে। তখন তারা সবাই আবার হঠাৎ উঠে দেখতে থাকবে।” (৬৮ আয়াত)

৩. “কতক হৃদয়” বলা হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র কাফের, নাফরমান ও মুনাফিকরাই কিয়ামতের দিন ভীত ও আতঙ্কিত হবে। সৎ মু'মিন বাদ্দাদের ওপর এ ভীতি প্রভাব বিস্তার করবে না। সূরা আরিয়ায় তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “সেই চরম ভীতি ও আতঙ্কের দিনে তারা একটুও পেরেশান হবে না এবং ফেরেশতারা এগিয়ে এসে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। তারা বলতে থাকবে, তোমাদের সাথে এ দিনটিরই ওয়াদা করা হয়েছিল।” (১০৩ আয়াত)

৪. অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হল, হী সেখানে এমনটিই হবে, তারা বিদ্যুপ করে পরম্পর বলাবলি করতে লাগলো : সত্যিই যদি আমাদের আবার জীবিত হয়ে ফিরে আসতে হয় তাহলে তো আমরা মারা পড়বো। এরপর আমাদের আর রক্ষে নেই।

৫. অর্থাৎ তারা এটাকে একটা অসম্ভব কাজ মনে করে একে বিদ্যুপ করছে। অথচ আল্লাহর জন্য এটা কোন কঠিন কাজ নয়। এ কাজটি করতে তাঁকে কোন বড় রকমের প্রযুক্তি নিতে হবে না। এর জন্য শুধুমাত্র একটি ধর্মক বা ঝাকুনিই যথেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের শরীরের ধূস্মাবশেষ মাটি বা ছাই যে কোন আকারেই থাক না কেন সব দিক থেকে উঠে এসে এক জায়গায় জমা হবে এবং অকশ্মাত তোমরা নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে জীবিত আকারে দেখতে পাবে। এ ফিরে আসাকে যতই ক্ষতিকর মনে করে তোমরা তা থেকে পালিয়ে থাকার চেষ্টা করো না কেন, এ ঘটনা অব্যশই ঘটবে। তোমাদের অঙ্গীকার, পলায়ন প্রচেষ্টা বা ঠাণ্ডা-বিদ্যুপে এটা থেমে যাবে না।

৬. মক্কার কাফেরদের কিয়ামত ও আব্দেরাতকে না মানা এবং তা নিয়ে ঠাণ্ডা-বিদ্যুপ করা আসলে কোন দার্শনিক তত্ত্বের অঙ্গীকৃতি ছিল না। বরং এভাবে তারা আল্লাহর রসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে তারা যে কৌশল অবলম্বন করতো তা কোন সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ছিল না। বরং তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর রসূলকে আঘাত হানা ও ক্ষতিগ্রস্ত করা। তাই আব্দেরাতের জীবনের ব্যাপারে আরো বেশী যুক্তিপ্রমাণ পেশ করার আগে তাদেরকে হয়রত মুসা (আ) ও ফেরাউনের ঘটনা শুনানো হচ্ছে। এভাবে তারা রসূলের সাথে সংঘাতে লিঙ্গ হওয়া এবং রসূল প্রেরণকারী আল্লাহর মোকাবিলায় যাথা উচু করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যেতে পারবে।

৭. পবিত্র তুওয়া উপত্যকার অর্থ বর্ণনা করে সাধারণভাবে যুফাস্সিরগণ বলেছেন : “সেই পবিত্র উপত্যকাটি যার নাম ছিল তুওয়া” কিন্তু এ ছাড়া এর আরো দু'টি অর্থও হয়। এক, “যে উপত্যকাটিকে দু'বার পবিত্র করা হয়েছে।” কারণ মহান আল্লাহ হয়রত মুসা (আ)-কে সেখানে সর্বোধন করে প্রথম বার তাকে পবিত্র করেন। আর হয়রত মুসা বনী ইসরাইলকে মিসর থেকে বের করে এনে এ উপত্যকায় অবস্থান করলে আল্লাহ তাকে দ্বিতীয়বার পবিত্রতার মর্যাদায় ভূষিত করেন। দুই, “রাতে পবিত্র উপত্যকায় সর্বোধন

করেন।” আরবী প্রবাদে বলা হয় : جاء بعد طوى : অর্থাৎ উমুক ব্যক্তি রাতের কিছু অংশ অতিক্রম করার পর এসেছিল।

৮. এখানে কয়েকটি কথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে :

এক : হ্যুমান মূসাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার সময় তাঁর ও আল্লাহর মধ্যে যেসব কথা হয়েছিল কুরআন মজীদের যথার্থ স্থানে তা কোথাও সংক্ষেপে আবার কোথাও বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে বলার সুযোগ ছিল। তাই এখানে কেবল সেগুলোর সারাংশই বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা জ্ঞা-হার ৯ থেকে ৪৮, শু'আরার ১০ থেকে ১৭, নামনের ৭ থেকে ১২ এবং কাসাসের ২৯ থেকে ৩৫ আয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুই : এখানে ফেরাউনের যে বিদ্রোহের কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে, বন্দেগীর সীমানা অতিক্রম করে মষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ের মোকাবিলায় বিদ্রোহ করা। মষ্টার মোকাবিলায় বিদ্রোহ করার বিষয়টির আলোচনা সামনের দিকে এসে যাচ্ছে। সেখানে বলা হয়েছে : ফেরাউন তার প্রজাদের সমবেত করে ঘোষণা করে, “আমি তোমাদের সবচেয়ে বড় রব।” আর সৃষ্টির মোকাবিলায় তার বিদ্রোহ ও সীমালংঘন ছিল এই যে, সে নিজের শাসনাধীন এলাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করে রেখেছিল। দুর্বল শ্রেণীগুলোর ওপর সে চালাতো কঠোর জুলুম-নির্যাতন এবং নিজের সমগ্র জাতিকে বোকা বানিয়ে তাদেরকে নিজের দাসে পরিণত করে রেখেছিল। একথা সূরা কাসাসের ১৪ আয়াতে এবং সূরা যুবরঞ্জফের ৫৪ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَقُلْ لَهُمْ قُلْ لَهُمْ يَتَذَكَّرُ : **তিনি :** ইয়রত মূসাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল : **আবু খাশী** “তুমি ও তোমার তাই হারুন, তোমরা দু'জনে তার সাথে মোলায়েম সুরে কথা বলবে, হয়তো সে নসীহত গ্রহণ করতে ও আল্লাহকে ভয় করতে পারে।” (সূরা ত্বা-হা ৪৪ আয়াত) এ মোলায়েম সুরে কথা বলার একটা নমুনা এ আয়াতগুলোতে পেশ করা হয়েছে। এ থেকে একজন পথচারী ব্যক্তিকে পথ দেখাবার জন্য তার কাছে কিভাবে বিচক্ষণতার সাথে সত্যের দাওয়াত পেশ করতে হবে তার কলাকৌশল জানা যায়। এর দ্বিতীয় নমুনাটি পেশ করা হয়েছে সূরা ত্বা-হা’র ১৯ থেকে ৫২, আশু শু’আরার ২৩ থেকে ২৮ এবং আল কাসামের ৩৭ আয়াতে। কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ যেসব আয়াতে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের কৌশল শিখিয়েছেন এ আয়াতগুলো তারই অস্তরভুক্ত।

চারঃ হ্যৱত মুসাকে শুধুমাত্র বনী ইসরাইলদের মুক্ত করার জন্য ফেরাউনের কাছে পাঠানো হয়নি, যেমন কোন কোন লোক মনে করে থাকেন। বরং তাঁকে নবুওয়াত দান করে ফেরাউনের কাছে পাঠাবার পথের উদ্দেশ্যই ছিল ফেরাউন ও তাঁর কওমকে সত্য সঠিক পথ দেখানো। এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, যদি সে সত্য সঠিক পথ গ্রহণ না করে তাহলে তিনি বনী ইসরাইলকে যারা আসলে ছিল একটি মুসলিম কওম) তাঁর দাসত্বমুক্ত করে মিসর থেকে বের করে আনবেন। 'এ আয়াতগুলো থেকেও একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ এগুলোতে বনী ইসরাইলের রেহাইয়ের কোন উল্লেখই নেই। বরং হ্যৱত মুসাকে

১০। ফেরাউনের সামনে কেবলমাত্র সত্ত্বের দাওয়াত প্রচার করার হকুম দেয়া হয়েছে। যেসব আয়াতে হ্যরত মূসা ইসলামের বাণী প্রচার করেছেন এবং বনী ইসরাইলদের রেহাই-এর দাবীও করেছেন সেসব আয়াত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আল 'আরাফের ১০৪ থেকে ১০৫, ত্বা-হা'র ৪৭' থেকে ৫২, আশ শূ'আরার ১৬ থেকে ১৭ এবং ২৩ থেকে ২৮ আয়াত। (আরও বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুসের ৭৪ টাকা দেখুন)

পাঁচ : এখানে পবিত্রতা (আত্মিক শুদ্ধতা) অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস, চরিত্র ও কর্ম সবক্ষেত্রে পবিত্রতা অবলম্বন করা। অন্য কথায় ইসলাম গ্রহণ করা। ইবনে যায়েদ বলেন, কুরআনে যেখানেই [তামাকী' (আত্মিক) শুদ্ধতা] শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই এর অর্থ হয় ইসলাম গ্রহণ করা। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াত তিনটি পেশ করেন : **وَذلِكَ جِزْنُو مَنْ تَرَكَى** "আর এটি হচ্ছে তাদের প্রতিদ্বন্দ্ব যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে।" অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। **وَمَا يَدْرِي لَعْلَهُ يَرْكَى** "আর তোমরা জান, হ্যতো তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে পারে।" অর্থাৎ মুসলমান হয়ে যেতে পারে। **وَمَا عَلِيَّ أَلْأَيْلَكَ أَلْأَيْلَكَ** "আর কী যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন করতে না পারে তাহলে তোমার কি দায়িত্ব আছে?" অর্থাৎ যদি তারা মুসলমান না হয়। (ইবনে জারীর)

ছয় : আর "তোমার রবের দিকে আমি তোমাকে পথ দেখাবো, তাহলে তোমার মধ্যে (তার) ত্য জাগবে" - একথার অর্থ হচ্ছে, যখন তুমি নিজের রবকে চিনে নেবে এবং তুমি জানতে পারবে যে, তুমি তার বাল্লাহ, স্বাধীন ও স্বয়ংস্মৃণ ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি নও তখন অনিবার্যভাবে তোমার দিলে তাঁর ত্য সৃষ্টি হবে। আর আল্লাহর ত্য এমন একটি জিনিস যার উপর দুনিয়ার মানুষের সঠিক ও নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ নিভর করে। আল্লাহর জ্ঞান এবং তাঁর ত্য ছাড়া কোন প্রকার পবিত্রতা ও শুল্ক আত্মার কথা কম্বনাই করা যেতে পারে না।

৯. বড় নিদর্শন বলতে এখানে লাঠির অজগর হয়ে যাওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্যি একটি নিষ্প্রাণ লাঠির মানুষের চোখের সামনে একটি জলজ্যান্ত অজগর সাপে পরিণত হওয়া, যাদুকরেরা এর যোকাবিলায় লাঠি ও দড়ি দিয়ে যেসব কৃত্রিম অজগর বানিয়ে দেখিয়েছিল সেগুলোকে ট্পাট্প গিলে ফেলা এবং হ্যরত মূসা (আ) যখন একে ধরে উঠিয়ে নিলেন তখন আবার এর লাঠি হয়ে যাওয়া, এর চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে? এসব একথারই সৃষ্টি আলামত যে, আল্লাহ রাবুল আলামীনেরই পক্ষ থেকে হ্যরত মূসা (আ) প্রেরিত হয়েছিলেন।

১০. কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : ফেরাউন সারা মিসর থেকে শ্রেষ্ঠ পারদর্শী যাদুকরদের ডেকে আনে এবং একটি বিশাল সাধারণ সমাবেশে তাদেরকে লাঠি ও দড়ি দিয়ে অজগর সাপ বানাতে বলে, যাতে করে লোক বিশ্বাস করে যে মূসা আলাইহিস সালাম কোন নবী নন বরং একজন যাদুকর এবং লাঠিকে অজগরে পরিণত করার যে তেলেসমাতি তিনি দেখিয়েছেন অন্যান্য যাদুকররাও তা দেখাতে পারে। কিন্তু তার এ প্রতারণাপূর্ণ কৌশল ব্যর্থ হলো এবং যাদুকররা পরাজিত

أَنْتَمْ أَشْخَلَقَ إِلَّا السَّمَاءَ بِنَهَا ۝ رَفِعْ سَمَكَهَا فَسُونَهَا ۝
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ صَحَمَهَا ۝ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْمَهَا ۝
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَمَهَا ۝ وَأَجْبَالَ آرْسَهَا ۝ مَتَاعًا لَكُمْ
وَلَا نَعَامِكُمْ ۝

২ রূক্ষ

তোমাদের^{১৩} সৃষ্টি করা বেশী কঠিন কাজ, না আকাশের^{১৪} আল্লাহই তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার ছাদ অনেক উচু করেছেন। তারপর তার ভারসাম্য কায়েম করেছেন। তার রাতকে চেকে দিয়েছেন এবং তার দিনকে প্রকাশ করেছেন।^{১৫} এরপর তিনি ময়ীনকে বিছিয়েছেন।^{১৬} তার মধ্য থেকে তার পানি ও উদ্ভিদ বের করেছেন।^{১৭} এবং তার মধ্যে পাহাড় গেড়ে দিয়েছেন, জীবন যাপনের সামগ্রী হিসেবে তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুদের জন্য।^{১৮}

হয়ে নিজেরাই স্থীকার করে নিল যে, হ্যরত মুসা আলাইহিস সালাম যা কিছু দেখিয়েছেন তা যাদু নয় বরং মু'জিয়া।

১১. ফেরাউনের এ দাবীটি কুরআনের কয়েকটি স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার সে হ্যরত মুসা (আ)-কে বলে, “যদি তুমি আমাকে ছাড়া আর কাউকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়ে থাকো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো।” (আশ শ'আরার ২৯ আয়াত) আর একবার সে তার দরবারের লোকদের সর্বোধন করে বলে, “হে জাতির প্রধানরা আমি জানি না আমি ছাড়া তোমাদের আর কোন খোদাও আছে।” (আল কাসাস ৩৮ আয়াত) ফেরাউনের এসব বক্তব্যের এ অর্থ ছিল না এবং এ অর্থ হতেও পারে না যে, সে-ই এই বিশ্ব-জাহানের স্মষ্টি এবং এ পৃথিবীটাও সে সৃষ্টি করেছে। এ সবের এ অর্থও ছিল না যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব অবীকার করে এবং নিজেকেই বিশ্ব-জাহানের রব বলে দাবী করে। আবার এ অর্থও ছিল না যে, সে ধর্মীয় অর্থে একমাত্র নিজেকেই লোকদের মাবুদ ও উপাস্য গণ্য করে। তার ধর্মের ব্যাপারে কুরআন মজীদই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সে নিজেই অন্য উপাস্যদের পূজা করতো। তাই দেখা যায় তার সভাসদরা একবার তাকে সর্বোধন করে বলে, “আপনি কি মুসাকে ও তার কওমকে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করার এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে ত্যাগ করার স্বাধীনতা দিতে থাকবেন? (আল আ'রাফ ১২৭ আয়াত) কুরআনে ফেরাউনের এ বক্তব্যও উদ্ভৃত হয়েছে যে, মুসা যদি আল্লাহর প্রেরিত হতো তাহলে তার কাছে সোনার কৌকন অবতীর্ণ করা হয়নি কেন? অথবা তার সাথে ফেরেশতাদেরকে চাপরাশি-আরদালি হিসেবে পাঠানো হয়নি কেন? (আয় মুখরফ ৫৩ আয়াত) কাজেই এ থেকে বুঝা যায় যে, আসলে সে ধর্মীয় অর্থে নয়

১১. বরং রাজনৈতিক অর্থে নিজেকে ইলাহ, উপাস্য ও প্রধান রব হিসেবে পেশ করতো। অর্থাৎ এর অর্থ ছিল, আমি হচ্ছি প্রধান কর্তৃত্বের মালিক। আমি ছাড়া আর কেউ আমার রাজ্যে হকুম চালাবার অধিকার রাখে না। আর আমার উপর আর কোন উচ্চতর ক্ষমতাধরও নেই, যার ফরমান এখানে জারী হতে পারে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ ৮৫ টাকা, ত্বা-হা ২১ টাকা, আশু শু'আরা ২৪ ও ২৬ টাকা, আল কাসাস ৫২ ও ৫৩ টাকা এবং আয যুখুরলফ ৪৯ টাকা)

১২. অর্থাৎ আল্লাহর রসূলকে মিথ্যা বলার ও তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পরিণামকে ভয় করো। ফেরাউন এই পরিণামের মুখ্যমুখি হয়েছিল।

১৩. কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব এবং তা যে সৃষ্টি জগতের পরিবেশ পরিস্থিতির যুক্তিসংগত দাবী একথার যৌক্তিকতা এখানে পেশ করা হয়েছে।

১৪. এখানে সৃষ্টি করা যানে দ্বিতীয়বার মানুষ সৃষ্টি করা। আর আকাশ যানে সমগ্র উর্ধজগত, যেখানে রয়েছে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, অগণিত সৌরজগত, বীহারিকা ও ছায়াপথ। একথা বলার অর্থ হচ্ছে : তোমরা মৃত্যুর পর আবার জীবিত করাকে বড়ই অসম্ভব কাজ মনে করছো। বারবার বলছো, আমাদের হাড়গুলো পর্যন্ত যখন পচে গলে যাবে, সে অবস্থায় আমাদের শরীরের বিক্ষিপ্ত অংশগুলো আবার এক জায়গায় জমা করা হবে এবং তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা হবে, এটা কেমন করে সম্ভব? তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, এই বিশাল বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টি বেশী কঠিন কাজ, না তোমাদের একবার সৃষ্টি করার পর দ্বিতীয়বার সেই একই আকৃতিতে সৃষ্টি করা কঠিন? যে আল্লাহর জন্য প্রথমটি কঠিন ছিল না তার জন্য দ্বিতীয়টি অসম্ভব হবে কেন? মৃত্যুর পরের জীবন সম্পর্কে এই যুক্তিটিই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরা ইয়সিমে বলা হয়েছে : “আর যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, তিনি কি এই ধরনের জিনিসগুলোকে (পুনর্বার) সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন না? কেন নয়? তিনি তো মহাপরাক্রমশালী স্তু। সৃষ্টি করার কাজ তিনি খুব ভালো করেই জানেন।” (৮১ আয়াত) সূরা মু'মিনে বলা হয়েছে : “অবশ্যি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টির চাইতে অনেক বেশী বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।” (৫৭ আয়াত)

১৫. রাত ও দিনকে আকাশের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। কারণ আকাশের সূর্য অস্ত যাওয়ার ফলে রাত হয় এবং সূর্য উঠার ফলে হয় দিন। রাতের জন্য ঢেকে দেয়া শব্দটি এই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে যে, সূর্য অস্ত যাওয়ার পর রাতে অন্ধকার পৃথিবীর ওপর এমনভাবে ছেয়ে যায় যেন উপর থেকে তার উপর পরদা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়।

১৬. “এরপর তিনি যমীনকে বিছিয়েছেন”-এর অর্থ এ নয় যে, আকাশ সৃষ্টি করার পরই আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; এটা ঠিক এমনই একটা বর্ণনা পদ্ধতি যেমন আমরা বলে থাকি, “তারপর একথাটা চিন্তা করতে হবে।” এর মানে এ নয় যে, প্রথমে ওই কথাটা বলা হয়েছে তারপর একথাটা বলা হচ্ছে। এভাবে আগের কথার সাথে একথাটার ঘটনামূলক ধারাবাহিক সম্পর্কের বিষয় বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং দু'টো কথা একসাথে বলা হলেও এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হয় একটা কথার পরে দ্বিতীয় কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা। এই বর্ণনা পদ্ধতির অসংখ্য নজীর কুরআন মজীদেই পাওয়া

যাবে। যেমন সূরা কলমে বলা হয়েছে : عَلَىٰ بَعْدِ ذَلِكَ زَنِيمٌ سَجَّلَمْ এবং তারপর
বজ্জাত” এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে সে জালেম হয়েছে তারপর হয়েছে বজ্জাত। বরং এর
অর্থ হচ্ছে, সে জালেম এবং তার ওপর অতিরিক্ত হচ্ছে সে বজ্জাতও। এভাবে সূরা বালাদে
বলা হয়েছে : تُمْ كَانَ مِنَ الظِّنْنِ أَمْنَوْا : “দাসকে মুক্ত করে
দেয়া তারপর মু’মিনদের অন্তরভুক্ত হওয়া।” এর অর্থও এ নয় যে, প্রথমে
সে (দাস মুক্ত করে) সৎকাজ করবে তারপর ঈমান আনবে। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এসব
সৎকাজ করার প্রবণতার সাথে সাথে তার মধ্যে মু’মিন হবার শৃণ্টিও থাকতে হবে।
এখানে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, কুরআনে কোথাও পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি
আগে এবং আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২৯
আয়াতে। আবার কোথাও আকাশ সৃষ্টির ব্যাপারটি আগে এবং পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপারটি পরে
উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এই আয়াতগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটি আসলে কোন
বিপরীতধর্মী বক্তব্য নয়। কুরআনের এসব জায়গায় কোথাও কাকে আগে ও কাকে পরে
সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা বলা মূল বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। বরং যেখানে পরিবেশ ও
পরিস্থিতির দাবী অনুযায়ী আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার প্রয়োজন দেখা
দিয়েছে, সেখানে আকাশসমূহের আলোচনা প্রথমে করা হয়েছে এবং পৃথিবীর আলোচনা
করা হয়েছে পরে। আবার যেখানে ভাষণের ধারা অনুযায়ী পৃথিবীতে মানুষ যেসব নিয়ামত
লাভ করছে সেগুলোর কথা তাদেরকে শরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।
সেখানে পৃথিবীর আলোচনা করা হয়েছে আকাশের আগে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য
তাফহীমুল কুরআন, হা-মীম আসু সাজাহ ১৩ থেকে ১৪ টীকা দেখুন)

১৭. উল্লিদ বলতে শুধু প্রাণীদের খাদ্য উল্লিদের কথা বলা হয়নি বরং মানুষ ও পশু
উভয়ের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত যাবতীয় উল্লিদের কথা বলা হয়েছে। রা’আ (رَأَى) ও
রাত’আ (رَأَتْ) শব্দ দু’টি যদিও সাধারণভাবে আরবী ভাষায় পশুদের চারণভূমির জন্য
ব্যবহার করা হয়, তবুও কখনো কখনো মানুষের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন
সূরা ইউসুফে হ্যরত ইউসুফের (আ) ভাইয়েরা তাদের মহামান্য পিতাকে বলেন :
أَرَسْلَنَهُ مَعْنَا غَدَّا يُرْتَعُ وَيُلْعَبُ “আস্লানে আগামীকাল ইউসুফকে আমাদের সাথে
পাঠিয়ে দিন। কিছু চরে বেড়াবে এবং খেলাধূলাও করবে” (১৬ আয়াত) এখানে শিশু
কিশোরের জন্য চরে বেড়ানো শব্দটি বনের মধ্যে চলাফেরা ও ঘোরাঘুরি করে গাছ থেকে
ফল পাড়া ও খাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৮. এই আয়াতগুলোতে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য দুই ধরনের যুক্তি
পেশ করা হয়েছে। এক, যে আল্লাহ অসাধারণ বিশ্বকর ভারসাম্য সহকারে বিশাল বিস্তৃত
বিশেষজ্ঞত এবং জীবন যাপনের নানাবিধি উপকরণ সহকারে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,
তাঁর অসীম ক্ষমতা বলে কিয়ামত ও মৃত্যুর পরের জীবনের অনুষ্ঠান মোটেই কঠিন ও
অসম্ভব ব্যাপার নয়। দুই, এই মহাবিশ্বে ও এ পৃথিবীতে আল্লাহর পূর্ণ জ্ঞানবস্তার যেসব
নির্দশন সুস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে, তা একথাই প্রমাণ করে যে, এখানে কোন কাজই
উদ্দেশ্যান্বীনভাবে হচ্ছে না। মহাশূন্যে অসংখ্য গ্রহ, তারকা, নীহারিকা ও ছায়াপথের মধ্যে
যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তা একথাই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এসব কিছু অক্ষয়ৎ
হয়ে যায়নি। বরং এর পেছনে একটি অত্যন্ত সুচিত্তিত পরিকল্পনা কাজ করে যাচ্ছে। একটি

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامِةُ الْكَبْرِيٌّ^١ يَوْمَ يَتَلَقَّ كُلُّ إِنْسَانٍ مَا سَعَىٰ^٢
 وَبِرَزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يُرِيٌّ^٣ فَأَمَّا مَنْ طَغَى٤ وَأَثْرَ الْحَيَاةَ
 الَّذِي نَيَّا٥ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْهَوْي٦ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ
 رَبِّهِ وَنَهَىَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوْي٧ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْهَوْي٨^٩

তারপর যখন মহাবিপর্যয় ঘটবে।^{১০} যেদিন মানুষ নিজে যা কিছু করেছে তা সব অৱৰণ করবে^{১১} এবং প্রত্যেক দর্শনকারীর সামনে জাহানাম খুলে ধরা হবে, তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছিল এবং দুনিয়ার জীবনকে বেশী ভালো মনে করে বেছে নিয়েছিল, জাহানামই হবে তার ঠিকানা। আর যে ব্যক্তি নিজের রবের সামনে এসে দাঁড়াবার ব্যাপারে ভীত ছিল এবং নফসকে খারাপ কামনা থেকে বিরত রেখেছিল তার ঠিকানা হবে জান্মাত।^{১২}

নিয়মের অধীনে এই রাত ও দিনের আসা যাওয়া একথাই প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য পূর্ণ বিজ্ঞতা সহকারে এই নিয়ম-শৃঙ্খলা কার্যেম করা হয়েছে। এ পৃথিবীতেই এমন এলাকা আছে যেখানে চরিশ ঘটার মধ্যে দিন রাত্রির আবর্তন হয়। আবার এমন এলাকাও আছে যেখানে রাত হয় অতি দীর্ঘ এবং দিনও হয় অতি দীর্ঘ। পৃথিবীর জনবসতির অনেক বড় অংশ প্রথম এলাকায় অবস্থিত। আবার যেখানে রাত ও দিন যত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে যেতে থাকে সেখানে জীবন যাপনও হয় তত বেশী কঠিন ও কঠকর। ফলে জনবসতিও সেখানে তত বেশী কম হয়ে যেতে থাকে। এমন কি যে এলাকায় ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত হয় সে এলাকা জনবসতির মোটেই উপযোগী নয়। এ পৃথিবীতেই এ দু'টি নম্বুনা দেখিয়ে দিয়ে মহান আগ্রাহ এ সত্যটি প্রমাণ করেছেন যে, রাত ও দিনের যথা নিয়মে যাওয়া আসার ব্যবস্থা কোন ঘটনাক্রিম ব্যাপার নয় বরং পৃথিবীকে মানুষের উপযোগী করার জন্য বিপুল জ্ঞান ও কলা কুশলতা সহকারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ অনুযায়ীই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পৃথিবীকে তিনি এমনভাবে বিহিয়ে দিয়েছেন যার ফলে তা মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তার মধ্যে এমন পানি সৃষ্টি করেছেন, যা মানুষ ও পশু পান করতে এবং যার সাহায্যে উদ্ভিদ জীবনী শক্তি শাত করতে পারে তার মধ্যে পাহাড় গড়ে দিয়েছেন এবং এমন সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন যা মানুষ ও সব ধরনের প্রাণীর জীবন ধারণের মাধ্যমে পরিণত হতে পারে। এসব কিছুই একথা প্রমাণ করে যে, এগুলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোন ঘটনা নয় বা কোন বাজিকর ডুগডুগি বাজিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এসব করে বসেনি। বরং এর প্রত্যেকটি কাজই বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে সম্পন্ন করেছেন একজন সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞান সম্পন্ন সত্তা। এখন কিয়ামত ও পরকালের জীবন অনুষ্ঠিত হওয়া বা না হওয়া কোনটা যুক্তিসংগত ও বুদ্ধি-বিবেচনাসম্মত, সুস্থবুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি ব্যক্তিই একথা চিন্তা করতে পারে।

يَسْئُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَمَهَا ۝ فَيَمْرَأْتَ مِنْ ذِكْرِهِمَا ۝
 إِلَى رِبِّكَ مُنْتَهِهِمَا ۝ إِنَّمَا أَنْتَ مِنْ رَّمَنْ يَخْشَهَا ۝ كَانُوكَمْ
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمَرْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيشَةً أَوْ صَحَّهَا ۝

এরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, সেই সময়টি (কিয়ামত) কখন আসবে? ২২ সেই সময়টি বলার সাথে তোমার সম্পর্ক কি? এর জ্ঞান তো আল্লাহ পর্যন্তই শেষ। তাঁর তয়ে ভীত এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করাই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব। ২৩ যেদিন এরা তা দেখে নেবে সেদিন এরা অনুভব করবে যেন (এরা দুনিয়ায় অথবা মৃত অবস্থায়) একদিন বিকালে বা সকালে অবস্থান করেছে মাত্র। ২৪

এই সমস্ত জিনিস দেখার পরও যে ব্যক্তি বলে আবেরাত অনুষ্ঠিত হবে না সে যেন বলতে চায়, এখানে অন্য সবকিছুই হিকমত তথা জ্ঞান-বৃদ্ধি-বিচক্ষণতা ও বিশেষ উদ্দেশ্য সহকারে হচ্ছে, তবে শুধুমাত্র পৃথিবীতে মানুষকে যে বৃদ্ধি, সচেতনতা ও ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য ও বৃদ্ধি-বিচক্ষণতা নেই। কারণ এই পৃথিবীতে মানুষকে বিপুল ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে সব রকমের ভালো যদ্দ কাজ করার স্বাধীনতা ও সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে কিন্তু কখনো তার কাজের কোন হিসেব নেয়া হবে না,—এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্যানুভাব ও অযৌক্তিক কথা আর কিছুই হতে পারে না।

১৯. এই মহাবিপর্যয় হচ্ছে কিয়ামত। এ জন্য এখানে **الْتَّامَةُ الْكُبْرَى** (আত্মাতামাতুল কুবরা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। “তামাহ” বলতে এমন ধরনের মহাবিপদ বুঝায় যা সবকিছুর ওপর ছেয়ে যায়। এরপর আবার তার সাথে “কুবরা” (মহা) শব্দ ব্যবহার করে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে সেই বিপদ ও বিপর্যয়ের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা বুঝাবার জন্য শুধুমাত্র “তামাহ” শব্দ যথেষ্ট নয়।

২০. অর্থাৎ যেদিন মানুষ দেখে নেবে যে, দুনিয়ায় যে হিসেব-নিকেশের খবর তাকে দেয়া হয়েছিল সেদিনটি এসে গেছে। সে সময় আমলনামা হাতে দেবার আগে দুনিয়ায় সে যা কিছু করেছিল এক এক করে সবকিছু তার মনে পড়ে যাবে। কোন কোন লোক দুনিয়াতেও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে যে হঠাৎ তারা কোন ভয়াবহ বিপদের মুখ্যমুখ্য হয়। মৃত্যুকে তাদের একেবারে অতি নিকটে দেখতে পায়। এ অবস্থায় নিজেদের সারা জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের চিত্র তাদের মানস পটে ঘূর্ণতের মধ্যে ভেসে ওঠে।

২১. আবেরাতে আসল ফায়সালার ভিত্তি কি, সে কথা এখানে কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে বলে দেয়া হয়েছে। দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে একটি দৃষ্টিত্বী হচ্ছে, মানুষ দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে এবং হির করে নিয়েছে যে, যেতাবেই হোক না কেন দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল ও দুনিয়ার স্বাদ আস্বাদন করাই তার লক।

এ সম্পর্কে হিতীয় দৃষ্টিভঙ্গীটি হচ্ছে দুনিয়াবী জীবন যাপন করার সময় মানুষকে খেয়াল রাখতে হবে যে, একদিন তাকে নিজের রবের সামনে হাজির হতে হবে এবং প্রবৃত্তির অভিলাশ পূরণ করতে সে এ জন্য বিরত থাকবে যে, যদি এখানে সে নিজের প্রবৃত্তির দাবী মেনে নিয়ে কোন অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভ করে অথবা কোন অবৈধ ভোগবিলাসে নিষ্ঠ হয়, তাহলে নিজের রবের কাছে এর কি জবাব দেবে? মানুষ দুনিয়ার জীবনে দু'টি দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্য থেকে কোনৃটি গ্রহণ করবে এরি ওপর আবেরাতের ফায়সালা নির্ভর করবে। যদি প্রথমটি গ্রহণ করে তাহলে তার স্থায়ী ঠিকানা হবে জাহানাম। আর যদি দ্বিতীয়টি গ্রহণ করে, তাহলে তার স্থায়ী ও চিরস্তন আবাস হবে জান্নাত।

২২. মকার কাফেরো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বারবার এ প্রশ্ন করতো। তাদের এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল কিয়ামত কবে হবে, তার সময় ও তারিখ জানা নয় বরং এ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্যুপ করা। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন, সূরা মূলক ৩৫ টীকা দেখুন)

২৩. এর ব্যাখ্যাও সূরা মূলকের ৩৬ টীকায় আলোচিত হয়েছে। তবে এখানে তার ভয়ে ভীত প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক করে দেয়াই শুধুমাত্র তোমার দায়িত্ব—একথা বলার অর্থ এ নয় যে, যারা ভীত নয় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া তোমার দায়িত্ব নয়। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সতর্ক করে দেবার ফায়দা তারাই লাভ করতে পারবে যারা সেদিনটির আসার ভয়ে ভীত থাকবে।

২৪. এ বিষয়বস্তুটি এর আগেও কুরআনের আরো কয়েকটি জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোর ব্যাখ্যা আমি সেখানে করে এসেছি। এ জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ৫৩ টীকা, বনী ইসরাইল ৫৬ টীকা, ঢা-হা ৮০ টীকা, আল মু'মিনুন ১০১ টীকা, আর রুম ৮১-৮২ টীকা ও ইয়াসীন ৪৮ টীকা দেখুন। এ ছাড়াও সূরা আহকাফের ৩৫ আয়াতেও এ বিষয়বস্তুটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে আমি এর ব্যাখ্যা করিনি। কারণ এর আগেও কয়েক জায়গায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আবাসা

৮০

নামকরণ

এই সূরার প্রথম শব্দ **بَسْ** কে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

মুফাস্সির ও মুহাদিসগণ একযোগে এ সূরা নাযিলের নিষ্কর্প কারণ বর্ণনা করেছেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে মঙ্গা মুয়ায়্যমার কয়েক জন বড় বড় সরদার বসেছিলেন। তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে উদ্যোগী করার জন্য তিনি তাদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছিলেন। এমন সময় ইবনে উষ্মে মাকতূম (রা) নামক একজন অঙ্ক তাঁর খেদমতে হাজির হলেন এবং তাঁর কাছে ইসলাম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলেন। তার এই প্রশ্নে সরদারদের সাথে আলাপে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। তিনি তার কথায় কান দিলেন না। এই ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সূরাটি নাযিল হয়। এ ঐতিহাসিক ঘটনার কারণে এ সূরা নাযিলের সময়-কাল সহজেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে, হ্যরত ইবনে উষ্মে মাকতূম (রা) একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী ও হাফেজ ইবনে কাসীর বলেন : **أَسْلَمَ بِمَكْيَةَ قَدِيمًا** (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে মকায় ইসলাম গ্রহণ করেন) এবং **مُوْمِنٌ أَسْلَمَ قَدِيمًا** (তিনি একেবারেই প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত)। অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের একেবারেই শুরুতে তিনি মকায় ইসলাম গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, যেসব হাদীসে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে তার কোন কোনটি থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটির আগেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবার কোন কোন হাদীস থেকে প্রকাশ হয়, এ সময় তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সত্যের সন্ধানেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। হ্যরত আয়েশার (রা) বর্ণনা মতে, তিনি এসে বলেছিলেন : **بِإِرْشَادِ رَسُولِ اللَّهِ أَرْسَلْنَا** “হে আল্লাহর রসূল! আমাকে সত্য-সরল পথ দেখিয়ে দিন।” (তিরিয়ি, হাকেম ইবনে হিব্রান, ইবনে জারীর, আবু নাইলা) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা) বর্ণনা করেছেন : তিনি এসেই কুরআনের একটি আয়াতের অর্থ জিজ্ঞেস করতে থাকেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : **بِإِرْسَالِ اللَّهِ عَلَمْنِي مَا عَلِمَ اللَّهُ** “হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন আমাকে সেই জ্ঞান শেখান।” (ইবনে জারীর,

ইবনে আবী হাতেয়) এসব বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর নবী এবং কুরআনকে আল্লাহর ক্রিতাব বলে মনে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইবনে' যায়েদ তৃতীয় আয়াতে উল্লেখিত হলে যিন্কি (হয়তো সে পরিশুল্ক হবে) এর অর্থ করেছেন **لَعْلَهُ يَسْلِمُ** (হয়তো সে ইসলাম গ্রহণ করবে)। (ইবনে জারীর) আবার আল্লাহ নিজেই বলেছেন : "ভূমি কী জানো, হয়তো সে সংশোধিত হয়ে যাবে অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হবে এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হবে" এ ছাড়া আল্লাহ এও বলেছেন : "যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং ভীত হয় তার কথায় তুমি কান দিচ্ছো না।" একথা থেকে ইংগিত পাওয়া যায়, তখন তার মধ্যে সত্য অনুসন্ধানের গভীরতর প্রেরণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই দেহায়াতের উৎস মনে করে, তাঁর খেদমতে হায়ির হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই নিজের চাহিদা প্রণ হবে বলে মনে করছিলেন। তাঁর অবস্থা একথা প্রকাশ করছিল যে, তাঁকে সত্য সরল পথের সন্ধান দেয়া হলে তিনি সে পথে চলবেন।

তৃতীয়ত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে সে সময় যারা উপস্থিত ছিল বিভিন্ন রেওয়ায়াতে তাদের নাম উল্লেখিত হয়েছে। তারা ছিল উত্তরা, শাইবা, আবু জেহেল, উমাইয়া ইবনে খালাফ, উবাই ইবনে খালফ প্রমুখ ইসলামের ঘোর শক্রুরা। এ থেকে জানা যায়, এ ঘটনাটি তখনই ঘটেছিল যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এই লোকগুলোর মেলামেশা বঙ্গ হয়েনি। তাদের সাথে বিরোধ ও সংঘাত তখনো এমন পর্যাপ্ত পৌছেনি যে, তাঁর কাছে তাদের আসা যাওয়া এবং তাঁর সাথে তাদের মেলামেশা বঙ্গ হয়ে গিয়ে থাকবে। এসব বিষয় প্রমাণ করে, এ সূরাটি একেবারেই প্রথম দিকে নাথিলকৃত সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আপাতদৃষ্টিতে ভাষণের সূচনায় যে বর্ণনা পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা দেখে মনে হয়, অঙ্গের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও তার কথায় কান না দিয়ে বড় বড় সরদারদের প্রতি মনোযোগ দেবার কারণে এই সূরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিরক্কার ও তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু পুরো সূরাটির সমস্ত বিষয়বস্তুকে একসাথে সামনে রেখে চিন্তা করলে দেখা যাবে, আসলে এখানে ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে কুরাইশদের কাফের সরদারদের বিরুদ্ধে। কারণ এই সরদাররা তাদের অহকার, ইঠধর্মিতা ও সত্য বিমুক্তার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যের দাওয়াতকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছিল। এই সত্ত্বেও এখানে নবীকে তাঁর সত্য দীনের দাওয়াত দেবার স্থিক পদ্ধতি শোখাবার সাথে সাথে নবুওয়াত লাভের প্রথম অবস্থায় নিজের কাজ সম্পর্ক করার ব্যাপারে তিনি যে পদ্ধতিগত ভূল করে যাচ্ছিলেন তা তাঁকে বুঝানো হয়েছে। একজন অঙ্গের প্রতি তাঁর অমনোযোগিতা ও তার কথায় কান না দিয়ে কুরাইশ সরদারদের প্রতি মনোযোগী হওয়ার কারণ এ ছিল না যে, তিনি বড়লোকদের বেশী সম্মানিত মনে করতেন এবং একজন অঙ্গকে তুল্জ জান করতেন, নাউয়ুবিল্লাহ তাঁর চারিত্বে এই ধরনের কোন বক্রতা ছিল না যার ফলে আল্লাহ তাঁকে

পাকড়াও করতে পারেন। বরং আসল ব্যাপার এই ছিল, একজন সত্য দীনের দাওয়াত দানকারী যখন তাঁর দাওয়াতের কাজ শুরু করেন তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টি চলে যায় জাতির প্রভাবশালী লোকদের দিকে। তিনি চান, এই প্রভাবশালী লোকেরা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করুক। এভাবে তাঁর কাজ সহজ হয়ে যাবে। আর অন্যদিকে দুর্বল, অক্ষম ও সমাজে প্রভাব-প্রতিপন্থিহীন লোকদের মধ্যে তাঁর দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লেও তাতে সমাজ ব্যবহ্যায় কোন বড় রকমের পার্থক্য দেখা দেয় না। প্রথম দিকে রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রায় এই একই ধরনের কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতি গ্রহণের পেছনে একাত্তরাবে কাজ করেছিল তাঁর আন্তরিকতা ও সত্য দীনের দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেবার প্রেরণা। বড়লোকদের প্রতি সম্মানবোধ এবং গরীব, দুর্বল ও প্রভাবহীন লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করার ধারণা এর পেছনে মোটেই সক্রিয় ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে বৃঝালেন, এটা ইসলামী দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং এই দাওয়াতের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বের অধিকারী, যে সত্যের সঙ্গানে ফিরছে, সে যতই দুর্বল, প্রভাবহীন ও অক্ষম হোক না কেন আবার এর দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই গুরুত্বহীন, যে নিজেই সত্যবিমূখ, সে সমাজে যত বড় মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন। তাই ইসলামের দাওয়াত আপনি জোরশোরে সবাইকে দিয়ে যান কিন্তু যাদের মধ্যে সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার আগ্রহ পাওয়া যায় তারাই হবে আপনার আগ্রহের আসল কেন্দ্রবিন্দু। আর যেসব আত্মগ্রী লোক নিজেদের অহংকারে মন্ত হয়ে মনে করে, আপনি ছাড়া তাদের চলবে কিন্তু তারা ছাড়া আপনার চলবে না, তাদের সামনে আপনার এই দাওয়াত পেশ করা এই দাওয়াতের উল্লত মর্যাদার সাথে মোটেই খাপ খায় না।

সূরার প্রথম থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুই আলোচিত হয়েছে। তারপর ১৭ আয়াত থেকে রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারী কাফেরদের প্রতি ক্ষেত্র প্রকাশ করা হয়েছে। তারা নিজেদের স্মষ্টি ও রিযিকদাতা আল্লাহর মোকাবিলায় যে দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল প্রথমে সে জন্য তাদের নিদা ও তিরঙ্কার করা হয়েছে। সংবশ্বরে তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের এই কর্মনীতির অত্যন্ত ডয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।

আয়াত ৪২

সূরা আবাসা-মক্কী

৪২

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

عَبْسٌ وَتَوْلٌ ۝ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ۝ وَمَا يَنْرِيكَ لَعْلَهُ يَرْكِي ۝
 أَوْيَنْ كَرْفَتْنَفَعَهُ الْنِّكْرِي ۝ أَمَا مِنْ أَسْتَغْنَىٰ فَانْتَ لَهُ تَصْدِي ۝
 وَمَا عَلَيْكَ الْأَيْزِكِي ۝ وَأَمَّا مِنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۝ وَهُوَ يَخْشِي ۝
 عَنْهُ تَلْهِي ۝ كَلَإِنْهَا تَلَكْرَة ۝ فَمِنْ شَاءَ ذَكْرَهُ ۝ فِي صَحْفٍ
 مَكْرَمَةٌ ۝ مَرْفُوعَةٌ مَطْهَرَةٌ ۝ بَأْيِلِي سَفَرَةٌ ۝ كَرَآمِي بَرَرَةٌ ۝

ক্রম্বৃকাল ও মুখ ফিরিয়ে নিল, কারণ সেই অঙ্গটি তার কাছে এসেছে।^১ তুমি কী জানো, হয়তো সে শুধরে যেতো অথবা উপদেশের প্রতি মনোযোগী হতো এবং উপদেশ দেয়া তার জন্য উপকারী হতো? যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও, অর্থ সে যদি শুধরে না যায় তাহলে তোমার ওপর এর কি দায়িত্ব আছে? আর যে নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে ভীত হচ্ছে, তার দিক থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো।^২ কথখনো নয়,^৩ এটি তো একটি উপদেশ,^৪ যার ইচ্ছা এটি গ্রহণ করবে। এটি এমন সব বইতে লিখিত আছে, যা সম্মানিত, উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন ও পবিত্র।^৫ এটি মর্যাদাবান ও পৃত চরিত্র লেখকদের^৬ হাতে থাকে।^৭

১. এই প্রথম বাক্যটির প্রকাশভঙ্গী বড়ই চমকপ্রদ। পরবর্তী বাক্যগুলোতে সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোধন করা হয়েছে। এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, ক্রম্বৃকাবার ও মুখ ফিরিয়ে নেবার কাজটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই করেছিলেন। কিন্তু বাক্যটির সূচনা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে মনে হয়েছে, তিনি নন অন্য কেউ এ কাজটি করেছে। এই প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে এই অনুভূতি সৃষ্টি করা হয়েছে যে, এটা আপনার করার মতো কাজ ছিল না। আপনার উন্নত চরিত্রের সাথে

পরিচিত কোন ব্যক্তি এ কাজটি দেখলে তাবতো, আগনি নন বরং অন্য কেউ এ কাজটি করছে।

এখানে যে অঙ্গের কথা বলা হয়েছে, ইতিপূর্বে ভূমিকায় আমরা এ সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছি, তিনি হচ্ছেন বিখ্যাত সাহারী হয়রত ইবনে উষ্মে মাকতূম (রা)। হাফেয় ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল ইসতিখাব' এবং হাফেয় ইবনে হাজার 'আল ইসাবাহ' গ্রন্থে তাঁকে উষ্মুল মু'মিনীন হয়রত খাদীজার (রা) ফুফাত ভাই বলে বর্ণনা করেছেন। তারা শিখেছেন, তাঁর মা উষ্মে মাকতূম ছিলেন হয়রত খাদীজার (রা) পিতা খুওয়াইলিদের সহেদর বোন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাঁর এই আতীয়তার সম্পর্ক জানার পর তিনি যে তাঁকে গরীব বা কম মর্যাদা সম্পর্ক মনে করে তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বড়লোকদের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন এ ধরনের সন্দেহ পোষণ করার কোন অবকাশ থাকে না। কারণ তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন শ্যালক। বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে সমাজের সাধারণ শ্রেণীভুক্ত নন বরং অভিজ্ঞাত বংশীয় ছিলেন। তাঁর প্রতি তিনি যে আচরণ করেছিলেন তা 'অঙ্গ' শব্দটি থেকেই সুস্পষ্ট। রসূলের (সা) অনাগ্রহ ও বিরূপ আচরণের কারণ হিসেবে আল্লাহ নিজেই এ শব্দটি উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ রসূলে কর্মীর (সা) ধারণা ছিল, আমি বর্তমানে যেসব লোকের পেছনে লেগে আছি এবং যাদেরকে সঠিক পথে আনার চেষ্টা করছি তাদের একজনও যদি হেদায়াত লাভ করে তাহলে তার মাধ্যমে ইসলামের শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইবনে উষ্মে মাকতূম হচ্ছেন একজন অঙ্গ। দৃষ্টিশক্তি না থাকার কারণে এই সরদারদের মধ্য থেকে একজনের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য যতটা লাভজনক হবে ইবনে মাকতূমের ইসলাম গ্রহণ ততটা লাভজনক হতে পারে না। তাই তিনি মনে করেছিলেন, সরদারদের সাথে আলোচনার মাঝখানে বাধা না দিয়ে অন্য সময় তিনি যা কিছু জানতে চান জেনে নিতে পারবেন।

২. দীন প্রচারের ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মূল বিষয়টির প্রতিই অবহেলা প্রদর্শন করেছিলেন। আর এই বিষয়টি বুঝাবার জন্যই মহান আল্লাহ প্রথমে ইবনে উষ্মে মাকতূমের সাথে আচরণের ব্যাপারে তাঁকে পাকড়াও করেন। তারপর সত্যের আহবায়কের দৃষ্টিতে কোন জিনিসটি সত্যিকারভাবে গুরুত্ব লাভ করবে এবং কোন জিনিসটি গুরুত্ব লাভ করবে না তা তাঁকে জানান। একদিকে এক ব্যক্তির বাস্তিক অবস্থা পরিকারভাবে একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, সে সত্যের সন্ধানে ফিরছে, বাতিলের অনুগামী হয়ে আল্লাহর গ্যবের মুখে পড়ে যাওয়ার ভয়ে সে ভীত সন্তুষ্ট। তাই সত্য-সঠিক পথ সম্পর্কে জানার জন্য সে নিজে পায়ে হেঁটে চলে এসেছে। অন্যদিকে আর এক ব্যক্তির আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, সত্য সন্ধানের কোন আগ্রহই তার মনে নেই। বরং সে নিজেকে কারম্ব সত্য পথ জানিয়ে দেবার মুখাপেক্ষীই মনে করে না। এই দু ধরনের লোকের মধ্যে কে ঈমান আনলে দীনের বেশী উপকার হতে পারে এবং কার ঈমান আনা দীনের প্রচার এই প্রসারের বেশী সহায়ক নয়, এটা দেখার বিষয় নয়। বরং এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, কে হেদায়াত গ্রহণ করে নিজেকে সুধরে নিতে প্রস্তুত এবং কে হেদায়াতের এই মূল্যবান সম্পদটির আদতে কোন কদরই করে না। প্রথম ধরনের লোক অঙ্গ, কানা ঝোঁড়া, অংগহীন সহায় সহল শক্তি সামর্থ্যীন হলে এবং বাহ্যত দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বড় রকমের অবদান রাখার যোগ্যতা

সম্পর্ক না হলেও হকের আহবায়কের কাছে তিনিই হবেন মূল্যবান ব্যক্তি। তার দিকেই তাঁকে নজর দিতে হবে। কারণ এই দাওয়াতের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহর বান্দাদের জীবন ও কার্যক্রম সংশোধন করা। আর এই ব্যক্তির অবস্থা একথা প্রকাশ করছে যে, তাকে উপদেশ দেয়া হলে সে সংশোধিত হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদের ব্যাপারে বলা যায়, তারা সমাজে যতই প্রভাবশালী হোক না কেন, সত্ত্বের আহবায়কের তাদের পেছনে লেগে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতিই প্রকাশ্যে একথা জানাচ্ছে যে, তারা সংশোধিত হতে চায় না। কাজেই তাদের সংশোধন করার প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা নিষ্ক সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা সংশোধিত হতে না চাইলে তাদেরই ক্ষতি, সত্ত্বের আহবায়কের ওপর এর কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

৩. অর্থাৎ এমনটি কথনো করো না। যেসব লোক আল্লাহকে ভুলে আছে এবং যারা নিজেদের দুনিয়াবী সহায়-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অহংকারে মন্ত হয়ে আছে, তাদেরকে অথবা গুরুত্ব দিয়ো না। ইসলামের শিক্ষা এমন কোন জিনিস নয় যে, যে ব্যক্তি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে তার সামনে নতজানু হয়ে তা পেশ করতে হবে। আবার এই ধরনের অহংকারী লোককে ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য এমন ধরনের কোন প্রচেষ্টা চালানোও তোমার মর্যাদা বিরোধী, যার ফলে সে এ ভুল ধারণা করে বসে যে, তার সাথে তোমার কোন স্বার্থ জড়িত আছে এবং সে মেনে নিলে তোমার দাওয়াত সম্প্রসারিত হবার পথ প্রশ্ন্ত হবে। অন্যথায় তুমি ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে সত্ত্বের যতটা মুখাপেক্ষী নয় সত্ত্বও তার ততটা মুখাপেক্ষী নয়।

৪. অর্থাৎ কুরআন।

৫. অর্থাৎ সব ধরনের মিথ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর মধ্যে নির্ভেজাল সত্ত্বের শিক্ষা পেশ করা হয়েছে। কোন ধরনের বাতিল, অসৎ ও অন্যায় চিন্তা ও মতবাদের কোন স্থানই সেখানে নেই। দুনিয়ার অন্যান্য ধর্মগুলো যেসব ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধে ভরে তোলা হয়েছে, তার সামান্য গন্কটুকুও এখানে নেই। মানুষের চিন্তা-ভাবনা কর্মনা বা শয়তানী ওয়াসেওয়াসা ও দুরতিসংক্রিতি সবকিছু থেকে তাকে পাক-পবিত্র রাখা হয়েছে।

৬. এখানে একদল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ অনুসারে কুরআনের বিভিন্ন অংশ লেখা, সেগুলোর হেফাজত করা এবং সেগুলো হবহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁদের প্রশংস্য এখানে দু'টি শব্দ উচ্চারিত হয়েছে। একটি হচ্ছে মর্যাদাবান এবং অন্যটি পৃত চরিত্র। প্রথম শব্দটির মাধ্যমে একথা প্রকাশ করা হয়েছে যে, তাঁরা এত বেশী উন্নত মর্যাদার অধিকারী যার ফলে যে আমানত তাঁদের হাতে সোপার্দ করা হয়েছে তা থেকে সামান্য পরিমাণ খেয়ানত করাও তাঁদের মতো উন্নত মর্যাদার অধিকারী সন্তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আর দ্বিতীয় শব্দটি ব্যবহার করে একথা জানানো হয়েছে যে, এই কিতাবের বিভিন্ন অংশ লেখার, সেগুলো সংরক্ষণ করার এবং সেগুলো রস্লের কাছে পৌছাবার যে দায়িত্ব তাঁদের ওপর অপিত হয়েছে পূর্ণ বিশ্বস্ততা সহকারে তাঁরা সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

৭. যে ধারাবাহিক বর্ণনায় এই আয়াতগুলো উদ্ভৃত হয়েছে সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায়, এখানে নিষ্ক কুরআন মজীদের শেষে বর্ণনা করার জন্য তাঁর

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ^{٤٧} مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ^{٤٨} مِنْ نُطْفَةٍ^{٤٩}
 فَقَدْ رَأَهُ^{٥٠} ثُمَّ أَمَاتَهُ^{٥١} فَأَقْبَرَهُ^{٥٢} ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ^{٥٣}
 كَلَّا لَهَا يَقْضِي مَا أَمْرَهُ^{٥٤} فَلَمْ يَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ^{٥٥} أَنَا صَبَبْنَا
 الْهَاءَ صَبَابًا^{٥٦} ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَابًا^{٥٧} فَانْبَتَنَا فِيهَا حَبَابًا^{٥٨} وَعَنْبَابًا
 وَقُضَابًا^{٥٩} وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا^{٦٠} وَحْلَ أَئِقَ غُلْبًا^{٦١} وَفَاكِهَةَ وَأَبَا^{٦٢}
 مَتَاعَ الْكَمْرِ وَلَا نَعَامِكْرِ^{٦٣}

লান্ড^১ মানুষের প্রতি,^২ সে কত বড় সত্য অঙ্গীকারকারী।^৩ কোনু জিনিস থেকে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন? এক বিন্দু শুক্র থেকে।^৪ আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পরে তার তকদীর নিদিষ্ট করেছেন,^৫ তারপর তার জন্য জীবনের পথ সহজ করেছেন।^৬ তারপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরে পৌছিয়ে দিয়েছেন।^৭ তারপর যখন তিনি চাইবেন তাকে আবার উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন।^৮ কখনো নয়, আল্লাহ তাকে যে কর্তব্য পালন করার হৃকুম দিয়েছিলেন তা সে পালন করেন।^৯ মানুষ তার খাদ্যের দিকে একবার নজর দিক।^{১০} আমি প্রচুর পানি চেলেছি।^{১১} তারপর যমীনকে অভূতভাবে বিদীর্ঘ করেছি।^{১২} এরপর তার মধ্যে উৎপন্ন করেছি শশ্য, আঙুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, ঘন বাগান, নানা জাতের ফল ও ঘাস তোমাদের ও তোমাদের গৃহপালিত পশুর জীবন ধারণের সামগ্রী হিসেবে।^{১৩}

এই প্রশংসা করা হয়নি। বরং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেসব অহংকারী লোক ঘৃণাভরে এর দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, তাদেরকে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেয়া যে, এই মহান কিতাবটি তোমাদের সামনে পেশ করা হবে এবং তোমরা একে গ্রহণ করে তাকে ধন্য করবে, এই ধরনের কোন কার্যক্রম এর জন্য কোন প্রয়োজন নেই এবং এটি এর অনেক উর্ধে। এ কিতাব তোমাদের মুখাপেক্ষী নয় বরং তোমরাই এর মুখাপেক্ষী। নিজেদের ভালো চাইলে তোমাদের মন-মগজ্জে যে শয়তান বাসা বেঁধে আছে তাকে সেখান থেকে বের করে দাও এবং সোজা এই দাওয়াতের সামনে যথা নত করে দাও। নয়তো তোমরা এর প্রতি যে পরিমাণ অমুখাপেক্ষিতা দেখাচ্ছো এটি তার চাইতে অনেক বেশী তোমাদের অমুখাপেক্ষী। তোমরা একে ঘৃণ্ণ ও তুচ্ছ জ্ঞান করলে এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সামান্যতম পার্থক্যও দেখা দেবে না। তবে এর ফলে তোমাদের গর্ব ও অহংকারের গগণচূর্ণী ইমারত ভেঙে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়া হবে।

৮. এখান থেকে আল্লাহর সত্য দীনের প্রতি মুখাপেক্ষিতা অঙ্গীকার করে আসছিল এমন ধরনের কাফেররা ক্রোধের লক্ষ্যলে পরিণৃত হয়েছে। এর আগে সূরার শুরু থেকে ১৬ আয়াত পর্যন্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংৰোধন করা হয়েছে। সেখানে পর্দাতরালে কাফেরদের প্রতি ক্রোধ বর্ণণ করা হয়েছে। সেখানে বর্ণনাভৃঙ্গী ছিল নিম্নরূপ : হে নবী! একজন সত্য সন্ধানীকে বাদ দিয়ে আপনি এ কাদের পেছনে নিজের শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করছেন? সত্ত্বের দাওয়াতের দৃষ্টিতে এদের তো কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই। আপনার মতো একজন মহান মর্যাদা সম্পর্ক নবীর পক্ষে কুরআনের মতো উল্লত মর্যাদা সম্পর্ক কিতাব এদের সামনে পেশ করার কোন প্রয়োজন নেই।

৯. কুরআন মজীদের এই ধরনের বিভিন্ন স্থানে মানুষ শব্দটি মানব জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়নি। বরং সেখানে মানুষ বলতে এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে যাদের অপছন্দীয় শুণাবনীর নিম্না করাই মূল লক্ষ হয়ে থাকে। কোথাও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ঐসব অপছন্দনীয় শুণাবলী পাওয়া যাওয়ার কারণে “মানুষ” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার কোথাও এর ব্যবহারের কারণ এই দেখা দিয়েছে যে, বিশেষ কিছু লোককে নির্দিষ্ট করে যদি তাদের নিম্না বা তিরস্কার করা হয় তাহলে তার ফলে তাদের মধ্যে জিদ ও হঠধর্মিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। তাই এ ক্ষেত্রে উপদেশ দেবার জন্য সাধারণভাবে কথা বলার পদ্ধতিই বেশী প্রভাবশালী প্রমাণিত হয়।

১০. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ “কোন জিনিসটি তাকে সত্য অঙ্গীকার করতে উদ্বৃদ্ধ করেছে? অন্য কথায় বলা যায়, কিসের জোরে সে কুফরী করে? কুফরী অর্থ এখানে সত্য অঙ্গীকার হয়, নিজের উপকারীর উপকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করাও হয়, আবার নিজের স্মষ্টা, মালিক, প্রভু ও রিয়িকদাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর মতো আচরণ করাও হয়।

১১. অর্থাৎ প্রথমে তো তার নিজের ঘোলিক সন্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করা দরকার। কোনু জিনিস থেকে সে অতিকৃত লাভ করেছে? কোথায় সে লালিত হয়েছে? কোনু পথে সে দুনিয়ায় এসেছে? কোন ধরনের অসহায় অবস্থার মধ্যে দুনিয়ায় তার জীবনের সূচনা হয়েছে? নিজের এই প্রকৃত অবস্থা ভুলে গিয়ে সে কেমন করে “আমার সমতুল্য কেউ নেই” বলে ভুল ধারণা পোষণ করতে পারে? নিজের স্মষ্টার প্রতি বিদ্রূপ ও তুচ্ছ তাছিল্য করার প্রবণতা সে কোথায় থেকে পেলো? (এই একই কথা সূরা ইয়াসীনের ৭৭-৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে)।

১২. অর্থাৎ সে মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় তার তক্কদীর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সে কোনু লিংগের হবে? তার গায়ের রং কি হবে? সে কতটুকু উচু হবে? তার দেহ কতটুকু কি পরিমাণ মোটা ও পরিপুষ্ট হবে? তার অংগ-প্রত্যঙ্গগুলো কতটুকু নিখৃত ও অসম্পূর্ণ হবে? তার চেহারা সুরাত ও কঠুন্বর কেমন হবে? তার শারীরিক বল কতটুকু হবে? তার বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা কতটুকু হবে? কোনু দেশে, পরিবারে এবং কোনু অবস্থায় ও পরিবেশে সে জন্মগ্রহণ করবে, লালিত পালিত হবে এবং শেষ পর্যন্ত কি হয়ে গড়ে উঠবে? তার ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশ ও পরিবারের প্রভাব, পরিবেশের প্রভাব এবং তার নিজের ব্যক্তিসম্ভাৱ ও অহমের প্রভাব কি পর্যায়ে ও কতটুকু থাকবে? দুনিয়ার জীবনে সে কী ভূমিকা পালন করবে? পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে? এই

১০ " তকদীর থেকে এক চূল পরিমাণ সরে আসার ক্ষমতাও তার নেই। এর মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও সে করতে পারবে না। এত সব সংশ্লেষণে তার একি দৃঃসাহস, যে মষ্টার তৈরি করা তকদীরের সামনে সে এতই অসহায়, তার মোকালোয় সে কুফরী করে ফিরছে।

১৩. অর্থাৎ দুনিয়ায় তার জীবন যাপনের সমস্ত উপকরণ সরবরাহ করেছেন। নয়তো মষ্টা যদি তার এই শক্তিগুলো ব্যবহার করার মতো এসব উপায় উপকরণ পৃথিবীতে সরবরাহ না করতেন তাহলে তার দেহ ও যান্তিকের সমস্ত শক্তি ব্যর্থ প্রমাণিত হতো। এ ছাড়াও মষ্টা তাকে এ সুযোগও দিয়েছেন যে, সে নিজের জন্য ভালো বা মন্দ, কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা আনুগত্য বা অবাধ্যতার মধ্যে যে কোন পথ চায় গ্রহণ করতে পারে। তিনি উভয় পথই তার সামনে খুলে রেখে দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি পথই তার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। এখন এর মধ্য থেকে যে পথে ইচ্ছা সে চলতে পারে।

১৪. অর্থাৎ কেবল তার সৃষ্টি ও তকদীরের ব্যাপারেই নয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তার মষ্টার কাছে সে একেবারেই অসহায়। নিজের ইচ্ছায় সে সৃষ্টি হতে পারে না। নিজের ইচ্ছায় মরতেও পারে না। নিজের মৃত্যুকে এক মৃত্যুর্তকালের জন্য পিছিয়ে দেবার ক্ষমতাও তার নেই। যে সময় যেখানে যে অবস্থায়ই তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই সময় সেই জ্ঞানগায় সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। আর মৃত্যুর পর তার জন্য যে ধরনের কবর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে ঠিক সেই ধরনের কবরেই সে স্থান লাভ করে। তার এই কবর মৃত্যুকা গর্ভে, সীমাহীন সাগরের গভীরতায়, অগ্নিকুণ্ডের বৃক্কে বা কোন হিন্দু পণ্ডের পাকস্থলীতে যে কোন জ্ঞানগায় হতে পারে। মানুষের তো কোনু কথাই নেই, সারা দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি মিলে চেষ্টা করলেও কোন ব্যক্তির ব্যাপারে মষ্টার এই সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে না।

১৫. অর্থাৎ মৃত্যুর পর মষ্টা আবার যখন তাকে জীবিত করে উঠাতে চাইবেন তখন তার পক্ষে উঠাতে অধীকার করার ক্ষমতাও থাকবে না। প্রথমে সৃষ্টি করার সময় তাকে জিজেস করে সৃষ্টি করা হয়নি। সে সৃষ্টি হতে চায় কিনা, এ ব্যাপারে তার মতামত নেয়া হয়নি। সে সৃষ্টি হতে অধীকার করলেও তাকে সৃষ্টি করা হতো। এভাবে এই দ্বিতীয়বার সৃষ্টিও তার মর্জির ওপর নির্ভরশীল নয়। মরার পর সে আবার উঠাতে চাইলে উঠবে, আবার উঠাতে অধীকার করলে উঠবে না, এ ধরনের কোন ব্যাপারই এখানে নেই। এ ব্যাপারেও মষ্টার মর্জির সামনে সে পুরোপুরি অসহায়। যখনই তিনি চাইবেন তাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দেবেন। তাকে উঠাতে হবে, সে হাজার বার না চাইলেও।

১৬. হকুম বলতে এখানে এমন হকুমও বুঝানো হয়েছে, যা স্বাভাবিক পথনির্দেশনার আকারে মহান আল্লাহ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন। এমন হকুমও বুঝানো হয়েছে, যেদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব এবং পৃথিবী থেকে নিয়ে আকাশ পর্যন্ত বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি অগু পরমাগু এবং আল্লাহর অপরিসীম শক্তি সমন্বিত প্রতিটি বস্তুই ইংগিত করছে। আবার এমন হকুমও বুঝানো হয়েছে, যা প্রতি যুগে আল্লাহ নিজের নবী ও কিতাবের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন এবং প্রতি যুগের সংস্কৃতদের মাধ্যমে যাকে চতুরদিকে পরিব্যাপ্ত করেছেন। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দাহার ৫ টাকা) এ প্রসংগে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছে তা হচ্ছে : ওপরের আয়তগুলোতে যেসব মৌলিক সত্যের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতে মানুষের উচিত ছিল তার মষ্টার

০ ॥ আনুগত্য করা। কিন্তু সে উল্টো তাঁর নাফরমানির পথ অবলম্বন করেছে এবং আল্লাহর বান্দাহ হবার দাবী পূরণ করেনি।

১৭. অর্থাৎ যে খাদ্যকে সে মামুলি জিনিস মনে করে সে সম্পর্কে তাঁর একবার চিন্তা করা দরকার। কিভাবে এই খাদ্য উৎপন্ন হয়। আল্লাহ যদি এর উপকরণগুলো সরবরাহ না করতেন তাহলে কি জমি থেকে এই খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা মানুষের ছিল?

১৮. এর অর্থ বৃষ্টি। সূর্য তাপে সমুদ্র পৃষ্ঠের বিপুল বারি রাশিকে বাস্পের আকারে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়। তা থেকে সৃষ্টি হয় ঘন মেঘ। বায়ু প্রবাহ সেগুলো নিয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। তারপর মহাশূন্যের শীতলতায় সেই বাষ্পগুলো আবার পানিতে পরিণত হয়ে দুনিয়ার প্রত্যেক এলাকায় একটি বিশেষ পরিমাণ অনুযায়ী বর্ষিত হয়। এরপর এই পানি সরাসরি পৃথিবী পৃষ্ঠে বর্ষিত হয়, ভূগর্ভে কৃয়া ও ঝর্ণার আকার ধারণ করে, নদীনালায় স্রোতের আকারেও প্রবাহিত হয়। আবার পাহাড়ে জমাট বীধা বরফের আকার ধারণ করে গলে যেতেও থাকে। এভাবে বর্ষাকাল ছাড়াও অন্যান্য মওসুমে নদীর বুকে প্রবাহিত হতে থাকে। এসব ব্যবস্থা কি মানুষ নিজেই করেছে? তাঁর স্মষ্টা তাঁর জীবিকার জন্য যদি এসবের ব্যবস্থা না করতেন তাহলে মানুষ কি পৃথিবীর বুকে জীবন ধারণ করতে পারতো?

১৯. যমীনকে বিদীর্ণ করার মানে হচ্ছে, মাটি এমনভাবে ফাটিয়ে ফেলা যার ফলে মানুষ তাঁর মধ্যে যে বীজ, আটি বা চারা রোপণ বা বপন করে অথবা যা বাতাস ও পাথির মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে তাঁর মধ্যে পৌছে যায় তা অংকুর গঁজাতে পারে। মানুষ বড় জোর মাটি খনন করতে বা তাঁর মধ্যে লাঙ্গল চালাতে পারে এবং আল্লাহ যে বীজ সৃষ্টি করেছেন তাকে মাটিতে রোপণ করতে পারে। এর বেশী সে কিছুই করতে পারে না। এ ছাড়া সমস্ত কাজ আল্লাহ করেন। তিনি অসংখ্য জাতের উদ্ভিদের বীজ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই এসব বীজের মধ্যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছেন, যার ফলে মাটির বুকে এদের অংকুর বের হয় এবং প্রতিটি বীজ থেকে তাঁর প্রজাতির পৃথক উদ্ভিদ জন্ম নেয়। আবার তিনি মাটির মধ্যে এমন যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার ফলে তা পানির সাথে মিশে ঐ বীজগুলোর প্রত্যেকটির খোসা আলগা করে তাঁর মুখ খুলে দেয় এবং সেখান থেকে বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদের জন্য তাঁর উপযোগী খাদ্য সরবরাহ করে। তাঁর উদ্গম ও বিকাশ লাভে সাহায্য করে। আল্লাহ যদি এই বীজগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি না করতেন এবং মাটির এই উপরি শরকে এই যোগ্যতা সম্পর্ক না করতেন তাহলে মানুষ কি এখানে কোন খাদ্য লাভ করতে পারতো?

২০. অর্থাৎ কেবল তোমাদের জন্যই নয়, তোমাদের যেসব পশ্চ থেকে তোমরা গোপ্ত, চর্বি, দুধ, মাখন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্ৰী লাভ করে থাকো এবং যারা তোমাদের আরো অসংখ্য অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ করে থাকে, তাদের জন্যও। এসব কিছুই কি এ জন্য করা হয়েছে যে, তোমরা এসব দুব্য সামগ্ৰী ব্যবহার করে লাভবান হবে এবং যে আল্লাহর রিয়িক লাভ করে তোমরা বেঁচে আছো তাঁর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করবে?

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحِةُ ۝ يَوْمَ يَفِرُّ الرُّءُوسُ مِنْ أَخْيَهُ ۝ وَأَمْهَ وَأَبِيهِ ۝
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۝ لِكُلِّ أُمَّرَىٰ مِنْهُمْ يُومَئِنْ شَانِ يَغْنِيهِ ۝ وَجْهُ
يُومَئِنْ مَسْفِرَةٌ ۝ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبِشَرَةٌ ۝ وَجْهُ يُومَئِنْ عَلَيْهَا غَبْرَةٌ ۝
تَرْهِقُهَا قَرْرَةٌ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرُ فِي الْفَجْرَةِ ۝

অবশেষে যখন সেই কান ফাটানো 'আওয়াজ আসবে^১ সেদিন মানুষ পালাতে থাকবে—নিজের ভাই, মা, বাপ, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের থেকে।^২ তাদের প্রত্যেকে সেদিন এমন কঠিন সময়ের মুখোমুখি হবে যে, নিজের ছাড়া আর কারোর কথা তার মনে থাকবে না।^৩ সেদিন কতক চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, হাসিমুখ ও দুশীতে ডগবগ করবে। আবার কতক চেহারা হবে সেদিন ধূলিমালিন, কালিমাখা। তারাই হবে কাফের ও পাপী।

২১. এখানে কিয়ামতের শেষ শিংগাম্বনির কথা বলা হয়েছে। এই বিকট আওয়াজ বুলন্দ হবার সাথে সাথেই মরা মানুষেরা বেঁচে উঠবে।

২২. প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে সূরা মা'আরিজের ১০ থেকে ১৪ পর্যন্ত আয়াতে। পালাবার মানে এও হতে পারে যে, সেদিন মানুষ নিজের ঐসব শ্রিয়তম আত্মীয় স্বজনকে বিপদ সাগরে হাবড়ব খেতে দেখে তাদের সাহায্যার্থে দৌড়ে যাবার পরিবর্তে উন্টো তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যেতে থাকবে, যাতে তারা সাহায্যের জন্য তাকে ডাকতে না থাকে। আবার এর এ মানেও হতে পারে যে, দুনিয়ায় আগ্রাহ ভয় না করে এবং আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে যেতাবে তারা পরম্পরের জন্য গোনাহ করতে ও পরম্পরকে গোমরাহ করতে থেকেছে, তার কুফল সামনে স্বৃতিতে প্রকাশিত দেখে তাদের প্রত্যেকে যাতে অন্যের গোমরাহী ও খোনাহের দায়িত্ব কেউ তার ঘাড়ে না চাপিয়ে দেয় এই ভয়ে অন্যের থেকে পালাতে থাকবে। ভাই ভাইকে, স্তান মা-বাপকে, স্বামী স্ত্রীকে এবং মা-বাপ স্তানকে এই মর্মে ভয় করতে থাকবে যে, নিচয়ই এবার আমার বিরুদ্ধে মামলায় এরা সাক্ষী দেবে।

২৩. হাদীস গ্রন্থগুলোতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ও সনদ পরম্পরায় বর্ণিত বিভিন্ন হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ একেবারেই উলংগ হয়ে উঠবে।” একথা শুনে তাঁর পবিত্র স্তৰীদের মধ্য থেকে কোন একজন (কোন কোন বর্ণনা মতে হ্যরত আয়েশা, কোন বর্ণনা মতে হ্যরত সওদা আবার কোন বর্ণনা অনুযায়ী অন্য একজন মহিলা) ঘাবড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আগ্রাহ রসূল। আমাদের লজ্জাহান কি সেদিন সবার সামনে খোলা থাকবে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াতটি তেলাওয়াত করে রলেন, সেদিন অন্যের দিকে তাকাবার মতো হঁশ ও চেতনা কারো থাকবে না। (নাসাই, তিরমিয়ী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, বাইহাকী ও হাকেম)।

আত তাকভীর

৮১

নামকরণ

সূরার প্রথম বাক্যের **কুর্ত** শব্দটি থেকে নামকরণ করা হয়েছে। তাকভীর (কুরো) হচ্ছে মূল শব্দ। তা থেকে অতীত কালের কর্তৃবাচ্য অর্থে কুরোত (কুরো) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, গুটিয়ে ফেলা হয়েছে। এই নামকরণের অর্থ হচ্ছে, এটি সেই সূরা যার মধ্যে গুটিয়ে ফেলার কথা বলা হয়েছে।

নামিসের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাতঃগী থেকে পরিকারভাবে জানা যায়, এটি মক্কা মু'আয্যমার প্রথম যুগের নামিস ইওয়া সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে দু'টি : আখেরাত ও রিসালাত।

প্রথম ছ'টি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উদ্বেগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে : যখন সূর্য আলোহীন হয়ে পড়বে। তারকারা স্থানচ্যুত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে। পাহাড়গুলো পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎপাটিত হয়ে শূন্যে উড়তে থাকবে। মানুষ তাদের সবচেয়ে গ্রিয় জিনিসের কথা ভুলে যাবে। বনের পশুরা আতঙ্কিত ও দিশেহারা হয়ে সব এক জায়গায় জড়ে হয়ে যাবে। সমুদ্র ঝীত হবে ও জলে উঠবে। পরবর্তী সাতটি আয়াতে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের উদ্বেগ করে বলা হয়েছে : যখন জগতগুলোকে আবার নতুন করে শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হবে। আমলনামা খুলে দেয়া হবে। অপরাধের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আকাশের সমষ্টি পরদু সরে যাবে। এবং জালাত-জাহারাম ইত্যাদি সব জিনিসই চোরের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। আখেরাতের এই ধরনের একটি পুরোপুরি ছবি ঔকার পর একথা বলে মানুষকে চিন্তা করার জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় ধর্ত্যেক ব্যক্তি কি পাথেয় সংগ্রহ করে এনেছে তা সে নিজেই জানতে পারবে।

এরপর রিসালাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মক্কাবাসীদেরকে বলা হয়েছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের সামনে যা কিছু পেশ করছেন সেগুলো কোন পাগলের প্রলাপ নয়। কোন শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও বিদ্রাস্তিও নয়। বরং সেগুলো আল্লাহর প্রেরিত একজন উর্রত মর্যাদা সম্পর্ক বৃহৎ ও বিশ্বস্ত বাণীবাহকের বিবৃতি, যাকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উন্নুক আকাশের দিগন্তে দিনের উজ্জ্বল আলোয় নিজের চোখে দেখেছেন। এই শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমরা কোন দিকে চলে যাচ্ছো?

আয়াত ২৯

সূরা আত তাকভীর-মঙ্গী

কৃক্ষ. ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মাত্ম মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ ① وَإِذَا النَّجْوَمُ انْكَلَرَتْ ② وَإِذَا الْجَبَالُ
 سُيَرَتْ ③ وَإِذَا الْعِشَارُ عَطَلَتْ ④ وَإِذَا الْوَحْشُ حَسِرَتْ ⑤
 وَإِذَا الْبَحَارُ سَجَرَتْ ⑥ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوَجَتْ ⑦ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
 سُئِلَتْ ⑧ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ⑨ وَإِذَا الصُّبَحُ نُشِرَتْ ⑩ وَإِذَا
 السَّمَاءُ كُشِطَتْ ⑪ وَإِذَا الْجَهَنَّمُ سُعِرَتْ ⑫ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَزْلَفَتْ ⑬
 عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا حَضِرَتْ ⑭

যখন সূর্য গুটিয়ে নেয়া হবে।^১ যখন তারকারা চারদিকে বিস্কিঞ্চ হয়ে যাবে।^২ যখন পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে।^৩ যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলোকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দয়া হবে।^৪ যখন বন্য পশুদের চারদিক থেকে এনে একত্র করা হবে।^৫ যখন সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে।^৬ যখন প্রাণসমূহকে^৭ (দেহের সাথে) জুড়ে দেয়া হবে।^৮ যখন জীবিত পুঁতি ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোনু অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে।^৯ যখন আমলনামাসমূহ খুলে ধরা হবে। যখন আকাশের পরদা সরিয়ে ফেলা হবে।^{১০} যখন জাহানামের আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং জান্মাতকে নিকটে আনা হবে।^{১১} সে সময় প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে সে কি নিয়ে এসেছে।

১. সূর্যকে আলোহীন করে দেবার জন্য এটা একটা অতুলনীয় উপমা। আরবী ভাষায় তাকভীর মানে হচ্ছে গুটিয়ে নেয়া। মাথায় পাগড়ী বাঁধার জন্য “তাকভীরম্ব আমামাহ” বলা হয়ে থাকে। কারণ আমামা তথা পাগড়ী লব্বা কাপড়ের হয়ে থাকে এবং মাথার চারদিকে তা জড়িয়ে নিতে হয়। এই সাদৃশ্য ও সম্পর্কের কারণে সূর্য থেকে যে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র সৌরজগতে ছড়িয়ে পড়ে তাকে পাগড়ীর সাথে তুলনা করা

হয়েছে। বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন এই বিছিয়ে থাকা পাগড়ীটি সূর্যের গায়ে জড়িয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ তার আলোক বিছুরণ বন্ধ হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে বৌধনের কারণে তারা নিজেদের কক্ষপথে ও নিজেদের জায়গায় বৌধা আছে তা খুলে যাবে এবং সমস্ত গ্রহ-তারকা বিশ্ব-জাহানের চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এ ছাড়াও ‘ইন্কিদার’ শব্দটির মধ্যে ‘কুরাত’ এর অর্থও রয়েছে। অর্থাৎ তারা শুধু ছড়িয়েই পড়বে না বরং এই সবগে আলোহীন হয়ে অন্ধকার হয়েও যাবে।

৩. অন্য কথায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণেই পাহাড়ের ওজন ও তারত্ব আছে এবং তা এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। কাজেই এই শক্তি বিলুপ্ত হবার সাথে সাথেই সমস্ত পাহাড় পর্বত সমূলে উৎপাটিত ও ওজনহীন হয়ে এমনভাবে পৃথিবীর বুকে চলতে থাকবে যেমন মেঘ শূন্যে ভেসে বেড়ায়।

৪. আরবদেরকে কিয়ামতের ডয়াবহ অবস্থা বুঝাবার জন্য এটি ছিল একটি চমৎকার বর্ণনা পদ্ধতি। আধুনিক কালের বাস ও ট্রাক চলাচলের আগে আরবদের কাছে গর্ভবতী উটনীর চাইতে বেশী মূল্যবান আর কোন সম্পদই ছিল না, যার প্রসবের সময় অতি নিকটে। এ সময় তার হেফাজত ও দেখাশুনার জন্য সবচেয়ে বেশী যত্ন নেয়া হতো। উটনীটি যাতে হারিয়ে না যায়, কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে না যায় অথবা কোনভাবে তা নষ্ট না হয়ে যায় এ জন্য খুব বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। এই ধরনের উটনীদের থেকে লোকদের গাফেল হয়ে যাওয়ার মানে এই দাঁড়ায় যে, তখন নিচয়ই এমন কোন কঠিন বিপদ লোকদের ওপর এসে পড়বে যার ফলে তাদের নিজেদের এই সবচেয়ে প্রিয় সম্পদ সংরক্ষণের কথা তাদের খেয়ালই থাকবে না।

৫. দুনিয়ায় কোন সাধারণ বিপদ দেখা দিলে সব ধরনের পশুদের পালিয়ে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখা যায়। সে সময় সাপ দংশন করে না এবং বায়ও আক্রমণ করে না।

৬. এখানে **স্জুর্ট** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে তাসজীর (تسجیر) এবং তা থেকে অতীতকালে কর্মবাচ্যে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণত চুল্লীতে আগুন জ্বালাবার জন্য ‘তাসজীর’ শব্দ ব্যবহার করা হয়। কিয়ামতের দিন সমুদ্রে আগুন লেগে যাবে, একথাটা আপাত দৃষ্টে বিশ্বয়কর মনে হয়। কিন্তু পানির মূল তত্ত্ব ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা থাকলে এর মধ্যে কোন কিছুই বিশ্বয়কর মনে হবে না। আল্লাহ তাঁর অসীম ক্ষমতা ও অলৌকিক কার্যক্রমের সাহায্যে অঙ্গীজন ও হাইড্রোজেনের মতো এমন দু'টি গ্যাসকে একসাথে মিশ্রিত করে রেখেছেন যাদের একটি আগুন জ্বালায় এবং অন্যটি নিজে জ্বলে। এই দু'টি গ্যাসের সংমিশ্রণে পানির মতো এমন একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন যা আগুন নিভিয়ে দেয়। আল্লাহর অসীম ক্ষমতার একটি ইঁগিতই পানির এই মিশ্রণ পরিবর্তন করে দেবার জন্য যথেষ্ট। তখন তারা পরম্পর থেকে আলাদা হয়ে তাদের মূল প্রকৃতি অনুযায়ী আগুন জ্বালাবার ও জ্বলার কাজে ব্যাপ্ত হবে।

৭. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা শুরু হয়েছে।

৮. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে মানুষ দুনিয়ায় যেমন দেহ ও আত্মার সাথে অবস্থান করছিল আবার ঠিক সেই অবস্থায়ই তাকে নতুন করে জীবিত করা হবে।

৯. এই আয়াতের বর্ণনাভঙ্গীতে মারাত্তুক ধরনের ক্ষেত্রে প্রকাশ দেখা যায়। এর চেয়ে বেশী ক্ষেত্রের কর্মনাও করা যেতে পারে না। যে বাপ মা তাদের মেয়েকে জীবিত পুত্রে ফেলেছে আল্লাহর কাছে তারা এত বেশী ঘৃণিত হবে যে, তাদেরকে সংরোধন করে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে হত্যা করেছিলে কোন অপরাধে? বরং তাদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে ছেট নিরপরাধ মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধে মেরে ফেলা হয়েছিল? জবাবে সে নিজের কাহিনী শুনাতে থাকবে। জালেম বাপ মা তার প্রতি কি অত্যাচার করেছে এবং কিভাবে তাকে জীবিত পুত্রে ফেলেছে সে কথা সে সবিশ্রান্তে বর্ণনা করতে থাকবে। এ ছাড়াও এই ছেটে আয়াতটিতে দু'টি বড় বড় বিষয়বস্তু সংযোজিত করা হয়েছে। এ জন্য কোন শব্দের আশ্রয় গ্রহণ ছাড়াই শুধুমাত্র বর্ণনাভঙ্গী থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক, এর মধ্যে আরববাসীদের মনে এই অনুভূতি জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, জাহেলীয়ত তাদেরকে নৈতিক অবনতির এমন নিষ্পত্তি পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়েছে যার ফলে তারা নিজেদের স্তনাকে নিজ হাতে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করার কাজ করছে। এরপরও তারা নিজেদের এই জাহেলী কর্মকাণ্ডকে সঠিক মনে করে তার ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই বিকৃত সমাজ জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য যে সংস্কার মূলক কর্মসূচী এনেছেন তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। দুই, এর মধ্যে আখেরাতের অপরিহার্যতার ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট যুক্তি পেশ করা হয়েছে। যে মেয়েকে জীবিত অবস্থায় মাটির মধ্যে প্রোথিত করা হয়েছে তার প্রতি এ অন্যায়ের বিচার কোথাও হওয়া দরকার এবং যেসব জালেম এই জুলুমের কাজটি করেছে এমন একটি সময় আসা দরকার, যখন তাদের এই নিষ্ঠুরতার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যে মেয়েটিকে মাটির মধ্যে পুত্রে ফেলা হয়েছে তার ফরিয়াদ শুনার মতো তখন তো দুনিয়ায় কেউ ছিল না। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থায় এ কাজটিকে সম্পূর্ণ বৈধ করে রাখা হয়েছিল, বাপ-মা এ জন্য একটুও লজ্জিত হতো না। পরিবারেও কেউ তাদের নিম্না ও তিরক্কার করতো না। সমগ্র সমাজ পরিবেশে একজনও এ জনী তাদেরকে পাকড়াও করতো না। তাহলে আল্লাহর প্রভৃতি-কর্তৃত্বের অধীনে এই বিরাট জুলুম ও অন্যায়ের কি কোন বিচার হবে না?

প্রাচীনকালে আরবে মেয়েদের জীবিত করব দেবার এ নিষ্ঠুর পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এর বিভিন্ন কারণ ছিল। এক, অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এই দুরবস্থার দরুন লোকেরা চাইতো খাদ্যের গ্রহণকারীর সংখ্যা কম হোক এবং তাদের লালন পালনের বোঝা যেন বহন করতে না হয়। প্রবর্তীকালে অর্থ-উপর্যুক্ত সহায়তা করবে এই আশায় ছেলেদের লালন পালন করা হতো। কিন্তু মেয়েদের ছেটবেলায় লালন পালন করে বড় হয়ে গেলে বিয়ে দিয়ে অন্যের ঘরে পাঠিয়ে দিতে হবে, এ কারণে মেরে ফেলে দেয়া হতো। দুই, দেশের আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সাধারণ নিরাপত্তাহীনতার কারণে এটা মনে করে পুত্রসন্তানের প্রতিপালন করা হতো যে, যার যত বেশী ছেলে হবে তার তত বেশী সাহায্যকারী হবে। অন্যদিকে গোত্রীয় সংঘর্ষ ও যুদ্ধের সময় মেয়েদের সংরক্ষণ করতে হতো এবং তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কোন কাজেই লাগতো না। তিনি, আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে সাধারণ দুরবস্থার কারণে শক্রগোত্রে পরম্পরারের ওপর অতিরিক্তে হামলা করার সময় প্রতিপক্ষ শিবিরের যতগুলো মেয়েকে হামলাকারীরা লুটে নিয়ে যেতো, তাদেরকে বাঁদী বানিয়ে

রাখতো অথবা কোথাও বিক্রি করে দিতো। এসব কারণে আরবে কোথাও সন্তান প্রসবকালেই ঘায়ের সামনেই একটি গর্ত খনন করে রাখা হতো। মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে তখনই তাকে গর্তে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দেয়া হতো। আবার কোথাও যদি মা এতে রাজী না হতো বা তার পরিবারের কেউ এতে বাধা সাধতো তাহলে অনিছাসত্ত্বেও বাপ কিছুদিন তাকে লালন পালন করতো। তারপর একদিন মরুভূমি, পাহাড় বা জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে কোথাও তাকে জীবিত করব দিয়ে দিতো। এই ধরনের রেওয়াজ আরবের বিভিন্ন এলাকায় প্রচলিত ছিল। এ ক্ষেত্রে শিশু কন্যাদের সাথে কেমন নির্দয় ব্যবহার করা হতো তার একটি কাহিনী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক সাহাবী একবার তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। সুনানে দারামির প্রথম অধ্যায়ে এ দাহীসচি উচ্ছৃত হয়েছে। এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার জাহেলী যুগের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন : আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। পথে একটি কৃষ্ণ পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কৃষ্ণের মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল, হায় আব্রা! হায় আব্রা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবলে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বললেন : ওহে, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোকার্ত করে দিয়েছো। তিনি বললেন : থাক, তোমরা একে বাধা দিয়ো না। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন : তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশী কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাঢ়ি ভিজে গেলো। এরপর তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আব্রাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।

একথা মনে করা ভুল হবে যে, আরববাসীরা এই চরম অমানবিক কাজটির কর্দর্যতার কোন অনুভূতিই রাখতো না। কোন সমাজ যত বেশী বিকৃতই হোক না কেন তা কখনো এই ধরনের জুনুম ও অমানবিক কাজকে একেবারেই অন্যায় মনে করবে না, এমনটি কখনই হতে পারে না। তাই কুরআন মজিদে এই কাজটির কর্দর্যতা ও দৃশ্যীয় হওয়া সম্পর্কে কোন লব্ধ চওড়া ভাষণ দেয়া হয়নি। বরং কতিপয় লোমহর্ষক শব্দের মাধ্যমে কেবল এতটুকু বলেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, এমন এক সময় আসবে যখন জীবিত পুরুতে ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন দোষে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? আরবের ইতিহাস থেকেও জানা যায়, জাহেলী যুগে অনেক লোকের এই রীতিটির কর্দর্যতার অনুভূতি ছিল। তাবারানীর বর্ণনা মতে কবি ফারায়দাকের দাদা 'সা'সা' ইবনে নাজীয়াহ আলযুজাশেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করে, হে আব্রাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগে কিছু ভালো কাজও করেছি। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, আমি তিনশ ষাটটি মেয়েকে জীবিত করব দেয়া থেকে রক্ষা করেছি। তাদের প্রত্যেকের প্রাণ বাঁচাবার বদলে দু'টি করে উট বিনিয় মূল্য হিসেবে দিয়েছি। আমি কি এর প্রতিদান পাবো? জবাবে তিনি বলেন : তোমার জন্য পূরক্ষার রয়েছে এবং সে পূরক্ষার হচ্ছে, আব্রাহ তোমাকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন।

আসলে এটি ইসলামের একটি বিরাট অবদান। ইসলাম কেবলমাত্র আরবের এই নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রথাটি নির্মূল করেনি বরং এই সংগে মেয়ের জন্য যে একটি দুর্ঘটনা এবং অনিচ্ছা সম্বৰ্ধে একে গ্রহণ করে নিতে হয়—এই ধরনের চিন্তা ও ধারণারও চিরতরে অবসান ঘটিয়েছে। বিপরীত পক্ষে ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে, মেয়েদের লালন পালন করা, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দীক্ষা দেয়া এবং ঘর সংসারের কাজে পারদর্শী করে গড়ে তোলা অনেক বড় নেকীর কাজ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে মেয়েদের সম্পর্কে মানুষের সাধারণ ধারণা যেভাবে পরিবর্তন করে দেন হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে তা আন্দজ করা যাবে। দৃষ্টিতে স্বরূপ আমি নীচে কয়েকটি হাদীস উন্নত করছি :

مَنِ ابْتُلَىٰ مِنْ هُذِهِ الْبَنَاتِ بِشَنِّيٍّ فَأَخْسِنْ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِرِّاً مِنَ
النَّارِ -

“এই মেয়েদের জন্মের মাধ্যমে যে ব্যক্তিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়, তারপর সে তাদের সাথে সহ্যবহার করে তারা তার জন্য জাহানামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে পরিণত হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّىٰ تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَا وَهَكَذَا وَضَمَّ
أَصَابِعَهُ -

“যে ব্যক্তি দু’টি মেয়ের লালনপালন করে, এভাবে তারা বালেগ হয়ে যায়, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে ঠিক এভাবে আসবে। একথা বলে তিনি নিজের আঙুলগুলো একসাথে করে দেখান।” (মুসলিম)

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخْوَاتِ فَأَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ
حَتَّىٰ يُغْنِيَهُنَّ اللَّهُ أَوْجَبَ اللَّهُ أَلَّهُجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ
أَوْ أَثْنَتَيْنِ ؟ قَالَ أَوِ اثْنَتَيْنِ حَتَّىٰ لَوْقَالُوا أَوْ وَاحِدَةٍ ؟ لَقَالَ وَاحِدَةٍ -

“যে ব্যক্তি তিনি কল্যা বা বোনের লালনপালন করে, তাদেরকে ভালো আদব কায়দা শেখায় এবং তাদের সাথে শ্রেহপূর্ণ ব্যবহার করে, এমনকি শেষ পর্যন্ত তারা তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী না থাকে, তার জন্য আল্লাহ জামাত ওয়াজিব করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন : হে আল্লাহর রসূল ! আর যদি দু’জন হয়। জবাব দেন, দু’জনকে এভাবে লালনপালন করলেও তাই হবে। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আবুস রো (রা) বলেন, যদি লোকেরা সে সময় একজনের লালনপালন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো তাহলে তিনি একজনের সম্পর্কেও এই একই জবাব দিতেন।” (শারহস সুরাহ)

مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِذْهَا وَلَمْ يَهِنَّهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا
أَدْخِلْهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ -

“যার কল্যা-সন্তান আছে, সে তাকে জীবিত করব দেয়নি, তাকে দীনহীন ও লাঞ্ছিত করেও রাখেনি এবং পুত্রকে তার ওপর বেশী গুরুত্বও দেয়নি, আল্লাহ তাকে জামাতে স্থান দেবেন।” (আবু দাউদ)

مَنْ كَانَ لَهُ ثُلَثَ بَنَاتٍ وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَّتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ -

“যার তিনটি কন্যা আছে, সেজন্য সে যদি সবর করে এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তাদেরকে তালো কাপড় পরায়, তাহলে তারা তার জন্য জাহানামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ে পরিণত হবে।” (বুখারীর আদাবুল মুফরাদ ও ইবনে মাজাহ)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُدْرِكُهُ أُبْنَتَانِ فَيُحِسِّنُ صَاحْبَتَهُمَا إِلَّا دُخَلَنَاهُ الْجَنَّةَ

“যে মুসলমানের দু’টি মেয়ে থাকবে, সে যদি তাদেরকে তালোভাবে রাখে, তাহলে তারা তাকে জামাতে প্রবেশ করাবে।” (ইমাম বুখারীর আদাবুল মুফরাদ)

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِسُرَاقَةَ بْنِ جَعْشَمَ إِلَّا أَدْلُكَ عَلَى أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ أَوْ مِنْ أَعْظَمِ الصَّدَقَةِ قَالَ بْلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُبْنَتُكَ الْمَرْدُودَةُ إِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ -

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাকাহ ইবনে জাশুমকে বলেন, আমি কি তোমাকে বলবো সবচেয়ে বড় সাদকাহ (অথবা বলেন, বড় সাদকাণ্ডোর অন্যতম) কি? সুরাকাহ বলেন, অবশ্যই বলুন হে আলাহর রসূল। তিনি বলেন, তোমার সেই মেয়েটি যে (তালাক পেয়ে অথবা বিধবা হয়ে) তোমার দিকে ফিরে আসে এবং তুমি ছাড়া তার আর কোন উপার্জনকারী থাকে না।” (ইবনে মাজাহ ও বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)

এই শিক্ষার ফলে মেয়েদের ব্যাপারে কেবল আরবদেরই নয় দুনিয়ার অন্যান্য যেসব জাতি ইসলামের ছায়াতলে আধ্যয় নিয়েছে তাদের সবার দৃষ্টিভঙ্গীই বদলে গেছে।

১০. অর্থাৎ এখন যা কিছু দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে তা সব সুস্পষ্ট হয়ে তেসে উঠবে। এখন তো আকাশ কেবল শূন্যই দেখা যায় এবং তার মধ্যে দেখা যায় মেঘ, ধূলিকনা, চন্দ, সূর্য ও গ্রহ-তারকা। কিন্তু সেদিন আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত তার নিজস্ব ও আসল রূপে আবরণ মুক্ত হয়ে সবার সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে।

১১. অর্থাৎ হাশরের যয়দানে যখন লোকদের মামলার শুনানী চলতে থাকবে, তখন জাহানামের উদ্দীপ্ত আগুনও সবাই দেখতে পাবে। জামাতও তার সমস্ত নিয়ামত সহকারে সবার সামনে হায়ির থাকবে। এভাবে একদিকে অসংখ্যকেরা জানতে পারবে তারা কোন ধরনের জিনিস থেকে বঞ্চিত হয়ে কোন দিকে যাচ্ছে এবং সংগৃহীতের জানতে পারবে তারা কোন জিনিসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোন ধরনের নিয়ামত লাভ করতে যাচ্ছে।

فَلَا أَقِسْمَرْ بِالْخَنْسِ^{١٦} الْجَوَارِ الْكَنِسِ^{١٧} وَالْيَلِ إِذَا عَسَسَ^{١٨}
 وَالصَّبَرِ^{١٩} إِذَا تَنَفَّسَ^{٢٠} إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ^{٢١} ذِي قَوَّةٍ عِنْدِ ذِي الْعَرْشِ
 مَكِينٍ^{٢٢} مَطَاعٍ شَرِّ أَمِينٍ^{٢٣} وَمَا صَاحِبُكَمْ بِمَجْنُونٍ^{٢٤} وَلَقَدْ رَأَهُ بِالْأَفْقَى
 الْمَبِينٍ^{٢٥} وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ^{٢٦} وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنٍ^{٢٧}
 رَجِيمٍ^{٢٨} فَإِنَّ تَلَّهُبُونَ^{٢٩} إِنَّهُ لَا ذِكْرٌ لِلْعَلَمِينَ^{٣٠} لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ
 أَنْ يَسْتَقِيمَ^{٣١} وَمَا تَشَاءُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ^{٣٢}

কাজেই, না,^{১২} আমি কসম খাচ্ছি পেছনে ফিরে আসা ও অন্তর্শ্য হয়ে যাওয়া তারকারাজির এবং রাত্রির, যখন তা বিদায় নিয়েছে এবং প্রভাতের, যখন তা শাস ফেলেছে,^{১৩} এটি প্রকৃতপক্ষে একজন সশান্তিত বাণীবাহকের বাণী,^{১৪} যিনি বড়ই শক্তিধর,^{১৫} আরশের মালিকের কাছে উন্নত মর্যাদার অধিকারী, সেখানে তার হকুম মেনে চলা হয়,^{১৬} তিনি আস্তাভাজন।^{১৭} আর (হে মকাবাসীরা!) তোমাদের সাথী^{১৮} পাগল নয়। সেই বাণীবাহককে দেখেছে উজ্জ্বল দিগন্তে^{১৯} আর সে গায়েবের (এই জ্ঞান লোকদের কাছে পৌছানোর) ব্যাপারে কৃপণ নয়।^{২০} এটা কোন অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নয়।^{২১} কাজেই তোমরা কোথায় চলে যাচ্ছো? এটা তো সারা জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটা উপদেশ। তোমাদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, যে সত্য সরল পথে চলতে চায়।^{২২} আর তোমাদের চাইলেই কিছু হয় না, যতক্ষণ না আল্লাহ রয়ে আলামীন তা চান।^{২৩}

১২. অর্থাৎ তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয় যে, কুরআনে যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো কোন পাগলের প্রলাপ বা শয়তানের ওয়াস্তুওয়াসাহ ও কৃমত্রণ।

১৩. এই বিষয়ের ওপর এই কসম খাওয়া হয়েছে তা সামনের আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে। এই ধরনের কসমের অর্থ হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্ককারে কোন স্বপ্ন দেখেননি। বরং যখন তারকারা অঙ্গমিত হয়েছিল, রাত বিদায় নিয়েছিল এবং প্রভাতের উদয় হয়েছিল তখন উন্তুক্ত আকাশে তিনি আল্লাহর ফেরেশতাকে দেখেছিলেন। কাজেই তিনি যা কিছু বর্ণনা করছেন তা সবই তাঁর নিজের চেয়ে দেখা। সুস্পষ্ট দিনের আলোয় পূর্ণচেতনা সহকারে তিনি এসব দেখেছেন।

১৪. এখানে সশান্তিত বাণীবাহক (রসূল করীম) বলতে অহী আনার কাজে লিঙ্গ ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে। সামনের আয়াতে একথাটি আরো সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আর কুরআনকে “বাণীবাহকের বাণী” বলার অর্থ এই নয় যে, এটি ঐ সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিজের কথা। বরং “বাণীবাহকের বাণী” শব্দ দু’টিই একথা প্রকাশ করছে যে, এটি সেই সত্ত্বার বাণী যিনি তাকে বাণীবাহক করে পাঠিয়েছেন। সূরা “আল হাক্ক”র ৪০ আয়াতে এভাবে কুরআনকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী বলা হয়েছে। সেখানেও এর অর্থ এই নয় যে, এটি নবীর (সা) নিজের রচনা। বরং একে “রসূলে করীমের” বাণী বলে একথা সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহর রসূল হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি পেশ করছেন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ হিসেবে নয়। উভয় স্থানে বাণীকে ফেরেশতা ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বাণী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাণীবহনকারী ফেরেশতার মুখ থেকে এবং লোকদের সামনে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন সূরা আল হাক্ক র ২২ টীকা দেখুন)

১৫. সূরা আন নাজমের ৪-৫ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

اَنْ هُوَ اَلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ - عَلِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ -

“এ তো একটি শুহী, যা তার উপর নায়িল করা হয়। প্রবল শক্তির অধিকারী তাকে তা শিখিয়েছেন।” জিবীল আলাইহিস সালামের সেই প্রবল ও মহাপ্রাক্রমশালী শক্তি কি? এটি আসলে “মৃতাশাবিহাত”-এর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ ছাড়া এ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য কারোর জানা নেই। তবে এ থেকে এতটুকু কথা অবশ্য জানা যায় যে, নিজের অসাধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে তিনি ফেরেশতাদের মধ্যেও বৈশিষ্ট্রের অধিকারী। মুসলিম শরীফে কিতাবুল ইমানে হ্যরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উক্তি উন্মুক্ত করেছেন : আমি দু’বার জিবীলকে তার আসল আকৃতিতে দেখেছি। তৌর বিশাল সত্ত্বা আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী সমগ্র মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত ছিল। বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী ও মুসনাদে আহমদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ছ’টি ডানা সমন্বিত অবস্থায় দেখেছেন। এ থেকে তাঁর অসাধারণ শক্তির বিষয়টি কিছুটা আন্দাজ করা যেতে পারে।

১৬. অর্থাৎ তিনি ফেরেশতাদের কর্মকর্তা। সমস্ত ফেরেশতা তাঁর হকুমে কাজ করে।

১৭. অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে তিনি কোন কথা আল্লাহর অহীর সাথে মিশিয়ে দেবেন না। বরং তিনি এমন পর্যায়ের আমানতদার যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু বলা হয় সেগুলো তিনি হবহ পৌছিয়ে দেন।

১৮. সাথী বলতে এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁকে মক্কাবাসীদের সাথী অভিহিত করে আসলে তাঁকে এ বিষয়ের অনুভূতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি তাদের জন্য কোন আগতুক বা অপরিচিত লোক নন। বরং তিনি তাদেরই জাতি ও গোত্রভুক্ত। তাদের মধ্যেই সারা জীবন তিনি অবস্থান করেছেন। তাদের শহরের প্রতিটি আবালবৃক্ষবনিতা তাঁকে চেনে। তিনি কোন ধরনের জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও সচেতন

ব্যক্তি তা তারা ভালোভাবেই জানে। এই ধরনের এক ব্যক্তিকে জেনেবুঁবে পাগল বলতে গিয়ে তাদের অবশ্য কিছুটা লজ্জা অনুভব করা উচিত। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন নাজমের ২ ও ৩ টীকা দেখুন)

১৯. সূরা আন নাজমের ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত টীকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পর্যবেক্ষণকে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাজম ৭-৮ টীকা)

২০. অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছ থেকে কোন কথা গোপন রাখেন না। গায়ের থেকে তাঁর কাছে আল্লাহর সত্তা ও গুণবলী, ফেরেশতা, মৃত্যুর পরের জীবন, কিয়ামত, আবেদন বা জাহানায় সম্পর্কে যা কিছু সত্ত্ব ও নির্ভুল তথ্য আসে তা সবই তিনি একটুও কমবেশী না করে তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

২১. অর্থাৎ কোন শয়তান এসে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে এসব কথা বলে যায়, তোমাদের এ ধারণা ভুল। শয়তান কেন মানুষকে শিরক, মৃতিগৃজা, কুফরী ও আল্লাহহন্দেহিতা থেকে সরিয়ে আল্লাহপরান্তি ও তাওহীদের শিক্ষা দেবে? কেন সে মানুষের মনে লাগামহীন উটের মতো স্থাধীন জীবন যাপন করার পরিবর্তে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন ও তাঁর সামনে জবাবদিহি করার অনুভূতি জগাবে? জাহেলী রীতিনীতি, জুলুম, দুর্নীতি ও দৃষ্টিতে পথে চলতে বাধা দিয়ে কেন সে মানুষকে পবিত্র ও নিষ্কলৃষ্ট জীবন যাপন এবং ন্যায়, ইনসাফ, তাকওয়া ও উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণবলী অর্জন করতে উদ্ব�ৃদ্ধ করবে? এই ধরনের কাজ করা শয়তানের পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আশ' শু'আরা ২১০-২১২ আয়াত ও ১৩০-১৩২ টীকা এবং ২২১-২২৩ আয়াত ও ১৪০-১৪১ টীকা)

২২. অন্য কথায় বলা যায়, এ বাণীটি তো সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য উপদেশ একথা ঠিক কিন্তু এর থেকে ফায়দা একমাত্র সেই ব্যক্তি হাসিল করতে পারে যে নিজে সত্ত্ব-সরল পথে চলতে চায়। এ থেকে উপকৃত হবার জন্য মানুষের সত্ত্ব-সন্ধানী ও সত্ত্ব প্রিয় হওয়া প্রথম শর্ত।

২৩. এ বিষয়বস্তুটি ইতিপূর্বে সূরা মুদ্দাস্সিরের ৫৬ আয়াতে এবং সূরা দাহারের ৩০ আয়াতে আলোচিত হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য তাফহীমুল কুরআন, আল মুদ্দাস্সির ৪১ টীকা দেখুন।

আল ইনফিতার

৮২

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শব্দ অন্তর্ভুক্ত থেকেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে রয়েছে ইনফিতার অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত ফেটে যাওয়া। এ নামকরণের কারণ হচ্ছে এই যে, এ সূরায় আকাশের ফেটে যাওয়ার কথা আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার ও সূরা আত্ম তাকভীরের বিষয়ক্ষেত্র মধ্যে গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে বুঝা যায়, এই সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত। মুসলাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনুল মন্যার, তাবারানী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়ায় হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রা) একটি বর্ণনা উভ্রূত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنَ فَلَيَقُرَأْ إِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ، وَإِذَا السَّمَاءُ اشْفَقَتْ -

“যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনটি নিজের চোখে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে নেয়।”

এখানে প্রথমে কিয়ামতের দিনের ছবি ভূলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়ায় যাকিছু করেছে কিয়ামতের দিন তা সবই তার সামনে উপস্থিত হবে। তারপর মানুষের মনে অনুভূতি জাগানো হয়েছে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে অস্তিত্ব দান করলেন এবং যার অনুগ্রহে তুমি আজ সমস্ত সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে ভালো শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সহকারে বিচরণ করছো, তিনি কেবল অনুগ্রহকারী ইনসাফকার নন, তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কে এই প্রতারণার জাল বিস্তার করলো? তাঁর অনুগ্রহের অর্থ এ নয় যে, তুমি তাঁর ন্যায়নির্ণিত ব্যবহার ও বিচারের ভয় করবে না। তারপর মানুষকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে, তুমি কোন ভুল ধারণা নিয়ে বসে থেকো না। তোমার গুরো আমলনামা তৈরী করা হচ্ছে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সেখকরা সবসময় তোমার সমস্ত কথাবার্তা, উঠাফেরা ও যাবতীয় কাজকর্ম লিখে চলছেন। সবশেষে পূর্ণ দৃঢ়তা সহকারে বলা হয়েছে, অবশিষ্যই একদিন কিয়ামত হবে। সেদিন নেক্কার লোকেরা জাগাতে সুখের জীবন লাভ করবে এবং পাপীরা জাগাতে আঘাত ভোগ করবে। সেদিন কেউ কারোর কোন কাজে লাগবে না। বিচার ও ফায়সালাকারী সেদিন হবেন একমাত্র আল্লাহ।

আয়াত ১৯

সূরা আল ইনফিতার-মৌলী

কৃতি ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রম কর্মপামর মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ① وَإِذَا الْكَوَافِكُ انتَهَرَتْ ② وَإِذَا الْبِحَارُ
 فَجَرَتْ ③ وَإِذَا الْقَبُورُ بَعْثَرَتْ ④ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدْ مَتَ
 وَأَخْرَتْ ⑤

যখন আকাশ ফেটে যাবে, যখন তারকারা চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে, যখন সমুদ্র ফাটিয়ে ফেলা হবে^১ এবং যখন কবরগুলো খুলে ফেলা হবে^২, তখন প্রত্যেক ব্যক্তি তার সামনের ও পেছনের সবকিছু জেনে যাবে।^৩

১. সূরা তাকভীরে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়া হবে এবং এখানে বলা হয়েছে, সমুদ্রগুলোকে ফাটিয়ে ফেলা হবে। এই উভয় আয়াতকে মিলিয়ে দেখলে এবং কুরআনের দৃষ্টিতে কিয়ামতের দিন এমন একটি ভয়াবহ ভূমিকাপ্র হবে যা কোন একটি বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং একই সময় সারা দুনিয়াকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে দেবে, এ বিষয়টিকেও সামনে রাখলে সমুদ্রগুলোর ফেটে চৌচির হয়ে যাওয়ার ও তার মধ্যে আগুন লেগে যাবার প্রকৃত অবস্থাটি আমরা অনুধাবন করতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, প্রথমে এই যহুদীকালীন ফলে সমুদ্রের তলদেশ ফেটে যাবে এবং সমুদ্রের পানি ভূগর্ভের অভ্যন্তরভাগে নেমে যেতে থাকবে যেখানে সর্বক্ষণ প্রচণ্ড গরম লাভা টগবগ করে ফুটছে। এই গরম লাভার সাথে সংযুক্ত হবার পর পানি তার প্রাথমিক অবস্থায় অর্ধাং প্রাথমিক দু'টি মৌলিক উপাদান অঙ্গিজেন ও হাইড্রোজেনে পরিণত হবে। এর মধ্যে অঙ্গিজেন আগুন জ্বালানোর সাহায্য করে এবং হাইড্রোজেন নিজে খুলে ওঠে। এভাবে প্রাথমিক মৌলিক উপাদানে পরিণত হওয়া ও আগুন লেগে যাওয়ার একটি ধারাবাহিক প্রতিক্রিয়া (Chain reaction) চলতে থাকবে। এভাবে দুনিয়ার সবগুলো সাগরে আগুন লেগে যাবে। এটা আমদের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা তত্ত্বিক অনুমান। তবে এর সঠিক জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।

২. প্রথম তিনটি আয়াতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই আয়াতে দ্বিতীয় পর্বের কথা বলা হয়েছে। কবর খুলে ফেলার মানে হচ্ছে; মানুষকে আবার নতুন করে জীবিত করে উঠানো।

يَا يَهُآ إِلَّا نَسَانٌ مَاغْرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ فَسُوْلَكَ
فَعَنْ لَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَبَّكَ ۝ كَلَّا بَلْ تَكُنُ بُونٌ بِاللِّيْنِ ۝
وَإِنَّ عَلَيْكَ حَفْظِينَ ۝ كِرَاماً كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

ହେ ମନୁଷ ! କୋଣ୍ଡ ଜିନିଷ ତୋମାକେ ତୋମାର ମହାନ ରବେର ବ୍ୟାପାରେ ଧୌକାଯ ଫେଲେ ରେଖେହେ, ଯିନି ତୋମାକେ ସୃଷ୍ଟି କରେହେନ, ତୋମାକେ ସୁଠାମ ଓ ସୁସାମଙ୍ଗସ୍ୟ କରେ ଗଡ଼େହେନ ଏବଂ ଯେ ଆକୃତିତେ ଚେଯେହେନ ତୋମାକେ ଗଠନ କରେହେନ,^୪ କଥିଥିନୋ ନା,^୫ ବରଂ (ଆସଲ କଥା ହଛେ ଏହି ଯେ), ତୋମରା ଶାନ୍ତି ଓ ପୁରୁଷାରକେ ମିଥ୍ୟା ମନେ କରଛୋ।^୬ ଅଥଚ ତୋମାଦେର ଓପର ପରିଦର୍ଶକ ନିଯୁକ୍ତ ରଯେହେ, ଏମନ ସମ୍ମାନିତ ଲେଖକବୁନ୍ଦ, ଯାରା ତୋମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାଜ ଜାନେ।^୭

৩. আসল শব্দ হচ্ছে মার্কডম্যান্ট এবং অন্যর মার্কডম্যান্ট অর্থ হতে পারে এবং
সবগুলো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। যেমন (১) যে ভালো ও মন্দ কাজ করে মানুষ আগে
পাঠিয়ে দিয়েছে তাকে এবং যেগুলো করতে সে বিরত থেকেছে তাকে মার্কডম্যান্ট
বলা যায়। এ দিক দিয়ে এ শব্দগুলো ইংরেজি Commission বা Omission-এর মতো
একই অর্থবোধক। (২) যা কিছু প্রথমে করেছে তা মার্কডম্যান্ট এবং যা কিছু পরে করেছে
তা মার্কডম্যান্ট-এর অন্তরভুক্ত। অর্থাৎ সম্পাদনের ধারাবাহিকতা ও তারিখ অনুসারে মানুষের
প্রক্লেক্টি কাজের হিসেব সংলিত আমলনামা তার সামনে এসে যাবে। (৩) যেসব ভালো
বা মন্দ কাজ মানুষ তার জীবনে করেছে সেগুলো মার্কডম্যান্ট-এর অন্তরভুক্ত। এ মানুষের
সমাজে এসব কাজের যে প্রভাব ও ফলাফল সে নিজের পেছনে রেখে এসেছে সেগুলো মার্কডম্যান্ট
-এর অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ প্রথমে তো তোমার উচিত ছিল সেই পরম করণাময় ও অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ লাভ করে তাঁর শোকরণজারী করা এবং তাঁর সমস্ত হকুম মেনে ঢলা। তাঁর নাফরমানী করতে গিয়ে তোমার দক্ষিণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নিজের যাবতীয় যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে তুমি নিজের কৃতিত্ব মনে করার ধোকায় পড়ে গেছো। তোমাকে যিনি অস্তিত্বান্ব করেছেন তাঁর অনুগ্রহের দ্বীপুত্তি দেবার চিন্তা তোমার মনে একবারও উদয় হয় না। হিতীয়ত, দুনিয়ায় তুমি যা ইচ্ছে করে ফেলতে পারো, এটা তোমার ঝুঁঝের অনুগ্রহ। তবে কখনো এমন হ্যানি যে, যখনই তুমি কোনো ভুল করেছে, অমনি তিনি তোমাকে পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে বিকল করে দিয়েছেন। অথবা তোমার চোখ অঙ্গ করে দিয়েছেন বা তোমাকে বজ্জ্বলাতে হত্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর এ অনুগ্রহ ও কোমলতাকে তুমি দুর্বলতা ভেবে বসেছো। এবং তোমার আল্লাহর উল্লুহিয়াতে ইনসাফের নামগঙ্কও নেই মনে করে নিজেকে প্রতারিত করেছো।

৫. অর্থাৎ এই ধরনের ধৌকা খেয়ে যাওয়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। তোমার অস্তিত্ব নিজেই ঘোষণা করছে যে, তুমি নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে যাওনি। তোমার বাপ-মাও তোমাকে সৃষ্টি করেনি। তোমার মধ্যে যেসব উপাদান আছে সেগুলো নিজে নিজে একত্র হয়ে যাওয়ার ফলেও ঘটনাক্রমে তুমি মানুষ হিসেবে তৈরি হয়ে যাওনি। বরং এক মহাজ্ঞানী ও মহাশক্তিধর আল্লাহ তোমাকে এই পূর্ণাঙ্গ মানবিক আকৃতি দান করেছেন। তোমার সামনে সব রকমের প্রাণী রয়েছে, তাদের মোকাবিলায় তোমার সবচেয়ে সুন্দর শারীরিক কাঠামো এবং শ্রেষ্ঠ ও উরত শক্তি একেবারেই সুস্পষ্ট। বুদ্ধির দাবী তো এই ছিল, এসব কিছু দেখে কৃতজ্ঞতায় তোমার মাথা নত হয়ে যাবে এবং সেই মহান রবের মোকাবিলায় তুমি কখনো নাফরমানী করার দুঃসাহস করবে না। তুমি এও জানো যে, তোমার রব কেবলমাত্র রহীম ও করীম করণশূন্য ও অনুগ্রহশীলই নন, তিনি জাহার ও কাহুহার—মহাপরাক্রমশালী এবং কঠোর শাস্তি দ্বানকারীও। তীর পক্ষ থেকে যখন কোন তুমিকম্প, তুফান বা বন্যা আসে তখন তার প্রতিরোধের জন্য তোমরা যতই ব্যবস্থা অবলম্বন করো না কেন সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যায়। তুমি একথাও জানো, তোমার রব মূর্খ অঙ্গ নন বরং তিনি মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ। জ্ঞান ও বিজ্ঞতার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে এই যে, যাকে বুদ্ধি-জ্ঞান দান করা হবে তাকে তার কাজের জন্য দায়ীও করতে হবে। যাকে ক্ষমতা-ইখতিয়ার দেয়া হবে সেই ক্ষমতা-ইখতিয়ার সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেবও তার কাছ থেকে নিতে হবে। যাকে নিজ দায়িত্বে সৎ ও অসৎকাজ করার ক্ষমতা দেয়া হবে তাকে তার সৎকাজের জন্য পূরুষার ও অসৎকাজের জন্য শাস্তিশুণ্ডি দিতে হবে। এসব সত্য তোমার কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। তাই তোমার মহান রবের পক্ষ থেকে তুমি যে ধৌকায় পড়ে গেছো তার পেছনে কোন যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে, একথা তুমি বলতে পারবে না। তুমি নিজে যখন কারোর কর্মকর্তা হবার দায়িত্ব পালন করে থাকো তখন তোমার অধীন ব্যক্তি যদি তোমার ভদ্রতা ও কোমল ব্যবহারকে দুর্বলতা মনে করে তোমার মাথায় চড়ে বসে, তাহলে তখন তুমি তাকে নীচ প্রকৃতির বলে মনে করে থাকো। কাজেই তোমার প্রকৃতি একথা সাক্ষ দেবার জন্য যথেষ্ট যে, প্রভুর দয়া, করুণা ও মহানুভবতার কারণে তার চাকর ও কর্মচারীর কখনো তার মোকাবিলায় দুঃসাহসী হয়ে যাওয়া উচিত নয়। তার এ ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয় যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে যাবে এবং এ জন্য কেউ তাকে পাকড়াও করতে ও শাস্তি দিতে পারবে না।

৬. অর্থাৎ যে জিনিসটি তোমাকে ধৌকায় ফেলে দিয়েছে তার পেছনে আসলে কোন শক্তিশালী যুক্তি নেই। বরং দুনিয়ার এই কর্মজগতের পরে আর কোন কর্মফল জগত নেই, নিছক তোমার এ নির্বোধ ধারণাই এর পেছনে কাজ করেছে। এ বিভ্রান্ত ও ভিস্তুহীন ধারণাই তোমাকে আল্লাহ থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এরি ফলে তুমি আল্লাহর ন্যায় বিচারের ভয়ে ভীত হও না এবং এটিই তোমার নৈতিক আচরণকে দায়িত্বহীন বানিয়ে দিয়েছে।

৭. অর্থাৎ তোমরা চাইলে কর্মফল দিবসকে অস্থীকার করতে পারো, তাকে মিথ্যা বলতে পারো, তার প্রতি বিদ্যুপ্বাণ নিষ্কেপ করতে পারো কিন্তু এতে প্রকৃত সত্য বদলে যাবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমাদের রব এই দুনিয়ায় তোমাদেরকে

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝ وَإِنَّ الْفَجَارَ لَفِي جَحِيرٍ ۝ يَصْلُونَهَا يَوْمًا
 الَّذِينَ ۝ وَمَا هُرُونَهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا يَوْمًا الَّذِينَ ۝
 مَتَّمَ مَا أَدْرِكَ مَا يَوْمًا الَّذِينَ ۝ يَوْمًا لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا
 ۝ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝

নিসন্দেহে নেক লোকেরা পরমানন্দে থাকবে আর পাপীরা অবশ্যি যাবে জাহানামে। কর্মফলের দিন তারা তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং সেখান থেকে কোনক্রমেই সরে পড়তে পারবে না। আর তোমরা কি জানো, এই কর্মফল দিনটি কি? হাঁ, তোমরা কি জানো, এই কর্মফল দিনটি কি? এটি সেই দিন যখন কারোর জন্য কোন কিছু করার সাধ্য কারোর থাকবে না। ৮ ফায়সালা সেদিন একমাত্র আল্লাহর ইখতিয়ারে থাকবে।

লাগামহীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং তিনি তোমাদের প্রত্যেকের উপর অত্যন্ত সত্ত্বান্বিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করে রেখেছেন। তারা নিরপেক্ষভাবে তোমাদের সমস্ত ভালো ও মন্দ কাজ রেকর্ড করে যাচ্ছে। তোমাদের কোন কাজ তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকছে না। তোমরা অঙ্ককারে, একান্ত নির্জনে, জন্মানবহীন গভীর জগতে অথবা এমন কোন অবস্থায় কোন কাজ করে থাকলে যে সম্পর্কে তোমরা পূর্ণ নিশ্চিত থাকছো যে, তা সকল সৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছে, তারপরও তা তাদের কাছ থেকে গোপন থাকছে না। এই তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতাদের জন্য আল্লাহ “কিরামান কাতেবীন” শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ লেখকবৃন্দ যারা করীম (অত্যন্ত সমানিত ও মর্যাদাবান)। তাদের কারোর সাথে ব্যক্তিগত তালোবাসা বা শক্রতা নেই। ফলে একজনের প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অন্যজনের জ্যথা বিরোধিতা করে সত্য বিবোধী ঘটনা রেকর্ড করার কোন অবকাশই সেখানে নেই। তারা খেয়ালতকারীও নয়। ডিউটি ফৌকি দিয়ে নিজেদের তরফ থেকে খাতায় উল্টো সিধে লিখে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘৃষ্যবোরও নয়। নগদ কিছু নিয়ে কারো পক্ষে বা কারো বিপক্ষে মিথ্যা রিপোর্ট দেবার কোন প্রশ্নই তাদের ব্যাপারে দেখা দেয় না। এসব যাবতীয় নৈতিক দুর্বলতা থেকে তারা মুক্ত। তারা এসবের অনেক উর্ধ্বে। কাজেই সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের মানুষের নিশ্চিত থাকা উচিত যে, তাদের প্রত্যেকের সৎকাজ হবহ রেকর্ড হবে এবং কারোর ঘাড়ে এমন কোন অসৎকাজ চাপিয়ে দেয়া হবে না, যা সে করেনি। তারপর এই ফেরেশতাদের দ্বিতীয় যে গুণটি বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে : “তোমরা যা কিছু করো তা তারা জানে।” অর্থাৎ তাদের অবস্থা দুনিয়ার সি, আই, ডি ও তথ্য সরবরাহ এজেন্সিগুলোর মতো নয়। সব রকমের প্রচেষ্টা ও সাধ্য-সাধনার পরও অনেক কথা তাদের কাছ থেকে গোপন-থেকে যায়। কিন্তু এ

ফেরেশতারা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ সম্পর্কে পূরোপূরি অবগত। সব জায়গায় সব
অবস্থায় সকল ব্যক্তির সাথে তারা এমনভাবে লেগে আছে যে, তারা জানতেই পারছে না
যে, কেউ তাদের কাজ পরিদর্শন করছে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ নিয়তে কি কাজ করেছে তাও
তারা জানতে পারে। তাই তাদের তৈরি করা রেকর্ড একটি পূর্ণাংশ রেকর্ড। এই রেকর্ডের
বাইরে কোন কথা নেই। এ সম্পর্কেই সূরা কাহাফের ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে :
কিয়ামতের দিন অপরাধীরা অবাক হয়ে দেখবে তাদের শামনে যে আমলনামা পেশ করা
হচ্ছে তার মধ্যে তাদের ছোট বড় কোন একটি কাজও অলিখিত থেকে যায়নি। যা কিছু
তারা করেছিল সব হবহ ঠিক তেমনিভাবেই তাদের শামনে আনা হয়েছে।

৮. অর্থাৎ কাউকে সেখানে তার কর্মফল ভোগ করার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করার
ক্ষমতা কারোর ধাকবে না। কেউ সেখানে এমন প্রভাবশালী বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন হবে
না যে, আল্লাহর আদালতে তাঁর রায়ের বিরুদ্ধে বেঁকে বসে একথা বলতে পারে, উমুক
ব্যক্তি আমার আত্মীয়, প্রিয় বা আমার সাথে সম্পর্কিত, কাজেই দুনিয়ায় সে যত খারাপ
কাজ করে থাকুক না কেন তাকে তো মাফ করতেই হবে।

আল মুতাফ্ফিফীন

৮৩

নামকরণ

প্রথম আয়াত وَيَلِ الْمُطْفِفِينَ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এই সূরার বর্ণনাতঁগী ও বিষয়বস্তু থেকে পরিষ্কার জানা যায়, এটি মঙ্গা মু'আয়মায় প্রথম দিকে নাযিল হয়। সে সময় আখেরাত বিশ্বাসকে মঙ্গাবাসীদের মনে পাকা-পোক্তভাবে বসিয়ে দেবার জন্য একের পর এক সূরা নাযিল হচ্ছিল। সূরাটি ঠিক তখনই নাযিল হয় যখন মঙ্গার লোকেরা পথে-ঘাটে-বাজারে-মজলিসে-মহফিলে মুসলমানদেরকে টিটকারী দিচ্ছিল এবং তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করছিল। তবে জুনুম, নিপীড়ন ও মারপিট করার যুগ তখনো শুরু হয়নি। কোন কোন মুফাসুসির এই সূরাকে মদীনায় অবর্তীণ বলেছেন। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা)-এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটিই মূলত এ ভূল ধারণার পেছনে কাজ করছে। তিনি বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন তখন এখানকার লোকদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কৃম দেবার ঝোঁক ভীষণভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। তখন আল্লাহ নাযিল করেন সূরাটি। এরপর থেকে লোকেরা ভালোভাবে ওজন ও পরিমাপ করতে থাকে। (নাসাই, ইবনে মাজাহ, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জায়ির, বাইহাকী ফী শ'আবিল ইমান) কিন্তু যেমন ইতিপূর্বে সূরা দাহারের ভূমিকায় আমি বলে এসেছি, সাহাবা ও তাবেঙ্গণ সাধারণত কোন একটি আয়াত যে ব্যাপারটির সাথে খাপ খেতো সে সম্পর্কে বলতেন, এ আয়াতটি এ ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কাজেই ইবনে আব্রাস (রা)-এর রেওয়ায়াত থেকে যা কিছু প্রমাণ হয় তা কেবল এটুকু যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পরে যখন মদীনার লোকদের মধ্যে এ বদঅ্যাসার্টির ব্যাপক প্রসার দেখেন তখন আল্লাহর হকুমে তাদের এ সূরাটি শুনান এবং এর ফলে তারা সংশোধিত হয়ে যায়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তুও আখেরাত।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে সাধারণ বেঙ্গমানীটির ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল প্রথম ছ'টি আয়াতে সে জন্য তাদের পাকড়াও করা হয়েছে। তারা অন্যের থেকে নেবার সময় ওজন ও মাপ পুরো করে নিতো। কিন্তু যখন অন্যদেরকে দেবার সময় আসতো তখন ওজন ও মাপে

প্রত্যেককে কিছু না কিছু কম দিতো। সমাজের আরো অসংখ্য অসংকাজের মধ্যে এটি এমন একটি অসংকাজ ছিল যার অসৎ হবার ব্যাপারটি কেউ অস্বীকার করতে পারতো না। এ ধরনের একটি অসংকাজকে এখনে দৃষ্টিতে স্বরূপ পেশ করে বলা হয়েছে। এটি আবেরাত থেকে গাফেল হয়ে থাকার অপরিহার্য ফল। যতদিন লোকদের মনে এ অনুভূতি জাগবে না যে, একদিন তাদের আল্লাহর সামনে পেশ হতে হবে এবং সেখানে এক এক পাইয়ের হিসেব দিতে হবে ততদিন তাদের নিজেদের কাজ-কারবার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে পূর্ণ সতত অবলম্বন সম্ভবই নয়। সতত ও বিশৃঙ্খলাকে “উত্তম নীতি” মনে করে কোন ব্যক্তি কিছু ছোট ছোট বিষয়ে সততার নীতি অবলম্বন করলেও করতে পারে কিন্তু যেখানে বেইমানী একটি “লাভজনক নীতি” প্রয়াণিত হয় সেখানে সে কখনই সততার পথে চলতে পারে না। মানুষের মধ্যে একমাত্র আল্লাহর তয়ে ও আবেরাতের প্রতি বিশ্বাসের ফলেই সত্যিকার ও স্থায়ী সত্যতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। কারণ এ অবস্থায় সততা একটি “নীতি” নয়, একটি “দায়িত্ব” গণ্য হয় এবং দুনিয়ায় সততার নীতি লাভজনক হোক বা অলাভজনক তার ওপর মানুষের সততার পথ অবলম্বন করা বা না করা নির্ভর করে না।

এভাবে নৈতিকতার সাথে আবেরাতে বিশ্বাসের সম্পর্ককে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর পদ্ধতিতে বর্ণনা করার পর ৭ থেকে ১৭ পর্যন্ত আয়তে বলা হয়েছে, দুর্ভাগ্যকারীদের কাজের বিবরণী প্রথমেই অপরাধজীবীদের রেজিস্টার (Black List) লেখা হচ্ছে এবং আবেরাতে তাদের মারাত্মক ধর্মসের সম্মুখীন হতে হবে। তারপর ১৮ থেকে ২৮ পর্যন্ত আয়তে সৎলোকদের উত্তম পরিণামের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, তাদের আমলনামা উচ্চ মর্যাদা সম্পর্ক লোকদের রেজিস্টারে সন্তুষ্টিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত করা হচ্ছে। আল্লাহর নৈকট্যলাভকারী ফেরেশতারা এ কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

সবশেষে ইমানদারদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এবং এই সঙ্গে কাফেরদেরকে এই মর্মে সতর্কও করে দেয়া হয়েছে যে, আজ যারা দুমানদারদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার কাজে ব্যাপ্ত আছে কিয়ামতের দিন তারা অপরাধীর পর্যায়ে থাকবে এবং নিজেদের এ কাজের অত্যন্ত খারাপ পরিণাম দেখবে। আর সেদিন এ ইমানদাররা এ অপরাধীদের খারাপ ও তয়াবহ পরিণাম দেখে নিজেদের চোখ শীতল করবে।

আয়াত ৩৬

সূরা আল মুতাফিফীন-মঙ্গী

কৃত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রম কর্মশাময মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَيَلِ الْمُطْغَفِينَ ۝ أَلَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِونَ ۝ وَإِذَا
كَالَّوْهُمْ أَوْ زَوْهُمْ يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعَثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ ۝

ধৰ্মস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়।^১ তাদের অবস্থা এই যে, লোকদের থেকে নেবার সময় পুরোমাত্রায নেয় এবং তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়।^২ এরা কি চিন্তা করে না, একটি মহাদিবসে^৩ এদেরকে উঠিয়ে আনা হবে? যেদিন সমস্ত মানুষ রবুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে।

১. মূলে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে থেকে। আরবী ভাষার তাফীফ (ত্বক) ছোট, তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসকে বলা হয়ে থাকে। পারিভাষিক অর্থে তাফীফ মানে হচ্ছে মাপে ও ওজনে চুরি করা। কারণ এ কাজ করার সময় এক ব্যক্তি মাপ ও ওজনের মাধ্যমে কোন বড় পরিমাণ জিনিস চুরি করে না। বরং হাত সাফাইয়ের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতার অংশ থেকে সামান্য সামান্য করে বাচিয়ে নেয়। ফলে বিক্রেতা কি জিনিস কর্তৃক চুরি করেছে ক্রেতা তা টেরও পায় না।

২. কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে ওজনে ও মাপে কম করার কঠোর নিদা এবং সঠিকভাবে ওজন ও পরিমাণ করার জন্য কড়া তাগিদ করা হয়েছে। সূরা আন'আমে বলা হয়েছে : "ইনসাফ সহকারে পুরো ওজন ও পরিমাপ করো। আমি কাউকে তার সামর্থের চাইতে বেশীর জন্য দায়িত্বশীল করি না।" (১৫২ আয়াত) সূরা বনী ইসরাইলে বলা হয়েছে : "মাপার সময় পুরো মাপবে এবং সঠিক পাত্রা দিয়ে ওজন করবে।" (৩৫ আয়াত) সূরা রহমানে তাকীদ করা হয়েছে : "ওজনে বাড়াবাড়ি করো না, ঠিক ঠিকভাবে ইনসাফের সাথে ওজন করো এবং পাত্রায় কম করে দিয়ো না।" (৮-৯ আয়াত) শো'আইবের সম্প্রদায়ের উপর এ অপরাধের কারণে আবাব নাযিল হয় যে, তাদের মধ্যে ওজনে ও মাপে কম দেবার গ্রেগ সাধারণতাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং হয়রত শো'আইব (আ)-এর বারবার বসীহত করা সত্ত্বেও এ সম্প্রদায়টি এ অপরাধমূলক কাজটি থেকে বিরত থাকেনি।

كَلَا إِنَّ كِتَبَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ① وَمَا أَدْرِنَكَ مَا سِجِّينٍ ② كِتَبَ
 مَرْقُومًا ③ وَلِلْيَوْمِئِنِ لِلْمَكَنِ بَيْنَ ④ الَّذِينَ يَكْنِيْنَ بَوْنَ يَبْوَأُ الدِّينَ ⑤
 وَمَا يَكْنِيْنَ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَلٍ أَثْيَمٌ ⑥ إِذَا تُنْتَلَى عَلَيْهِ أَيْتَنَا قَالَ
 أَسَا طِيرُ الْأَوْلَيْنِ ⑦ كَلَا بَلْ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ⑧
 كَلَا إِنَّهُمْ عَنْ رِبِّهِمْ بِوْمَئِنِ لِمَحْجُوبُونَ ⑨ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا
 الْجَحِيرَ ⑩ ثُمَّ يُقَالُ هُنَّا الَّذِينَ كُنْتُمْ بِهِ تَكْلِيْبُونَ ⑪

কথখনো নয়,^৪ নিচিতভাবেই পাপীদের আমলনামা কয়েদখানার দফতরে রয়েছে।^৫ আর তুমি কি জানো সেই কয়েদখানার দফতরটা কি? একটি লিখিত কিতাব। সেদিন মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য ধর্ষণ সুনিশ্চিত, যারা কর্মফল দেবার দিনটিকে মিথ্যা বলেছে। আর সীমালংঘনকারী পাপী ছাড়া কেউ একে মিথ্যা বলে না। তাকে যখন আমার আয়ত শুনানো হয়^৬ সে বলে, এ তো আগের কালের গল। কথখনো নয়, বরং এদের মনে এদের খারাপ কাজের জং ধরেছে।^৭ কথখনো নয়, নিচিতভাবেই সেদিন তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত রাখা হবে।^৮ তারপর তারা গিয়ে পড়বে জাহানামের মধ্যে। এরপর তাদেরকে বলা হবে, এটি সেই জিনিস যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

৩. কিয়ামতের দিনটিকে মহাদিবস হিসেবে উপস্থাপিত করে বলা হয়েছে।^৯ সেদিন আল্লাহর আদালতে সকল জিন ও মানুষের কাজের হিসেব নেয়া হবে একই সংগে এবং আয়াব ও সওয়াব দানের ব্যাপারে শুরুত্বপূর্ণ ফায়সালা করা হবে।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় এ ধরনের অপরাধ করার পর তারা এমনি স্বাধীনভাবে ঘূরে বেড়াবে এবং কথখনো এদের আল্লাহর সামনে ঝুঁঝু করাবিদিহি করার জন্য হায়ির হতে হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারে ভুল।

৫. আসলে সিজ্জীন (سِجِّين) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি এসেছে সিজন (سِجْن) থেকে।। সিজন মানে জেলখানা বা কয়েদখানা। সামনের দিকে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে এমন ধরনের রেজিষ্টার খাতা যাতে শাস্তিলাভ যোগ্য লোকদের আমলনামা লেখা হচ্ছে।

كَلَّا إِنَّ كِتَبَ الْأَبْرَارَ لَفِي عَلِيهِنَّ وَمَا أَدْرِيكَ مَا عَلِيهِنَّ^{১)} كِتَب
 مَرْقُومٌ^{২)} يَشْهَدُ الْمَقْرُوبُونَ^{৩)} إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ^{৪)} عَلَى
 الْأَرَائِكَ يَنْظَرُونَ^{৫)} تَعْرِفُ فِي وِجْهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ^{৬)} يَسْتَقْوِنَ
 مِنْ رِحْيقِ مُخْتَوِّيٍّ^{৭)} خِتْمَهُ مِسْكٌ^{৮)} وَفِي ذَلِكَ فَلَيَتَّفَاصِ الْمَتَنَا^{৯)}
 فِسْوَنَ^{১০)} وَمِزاجَهُ مِنْ تَسْنِيمٍ^{১১)} عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْمَقْرُوبُونَ

কথ্যনো নয়,^{১)} অবশ্যি নেক লোকদের আমলনামা উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরে রয়েছে। আর তোমরা কি জানো, এ উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের দফতরটি কি? এটি একটি লিখিত কিতাব। নেকট্য লাভকারী ফেরেগতারা এর দেখাশুনা করে। নিসন্দেহে নেক লোকেরা থাকবে বড়ই আনন্দে। উচু আসনে বসে দেখতে থাকবে। তাদের চেহারায় তোমরা সঙ্ঘলতার দীপ্তি অনুভব করবে। তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধতম শরাব পান করানো হবে। তার ওপর মিষ্টক-এর মোহর থাকবে।^{১০)} যারা অন্যদের ওপর প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে চায় তারা যেন এই জিনিসটি হাসিল করার জন্য প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার চেষ্টা করে। সে শরাবে তাসনীমের^{১১)} মিশ্রণ থাকবে। এটি একটি ঝরণা, নেকট্যলাভকারীরা এর পানির সাথে শরাব পান করবে।

৬. অর্থাৎ যেসব আয়তে বিচার দিনের খবর দেয়া হয়েছে সেই সব আয়ত।

৭. অর্থাৎ শাস্তি ও পুরক্ষারকে গৱ বা উপকথা গণ্য করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। কিন্তু যে কারণে তারা একে গৱ বলছে তা হচ্ছে এই যে, এরা যেসব গোনাহ করতে থেকেছে এদের দিলে পুরোপুরি তার মরীচা ধরেছে। ফলে পুরোপুরি যুক্তিসংগত কথাও এদের কাছে গৱ বলে মন হচ্ছে। এই জং ও মরীচার ব্যাখ্যায় রসন্তুরাহ সাঙ্গাঙ্গাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : বান্দা যখন কোন গোনাহ করে, তার দিলে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। সে তওবা করলে দাগটি উঠে যায়। কিন্তু যদি সে গোনাহ করে যেতেই থাকে তাহলে সমগ্র দিলের ওপর তা ছেয়ে যায়। মুসলিমে আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ, ইবনে জারীর, হাকিম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে হিয়ান ইত্যাদি।

৮. অর্থাৎ একমাত্র নেক লোকেরাই আঙ্গাহর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে এবং পাপীরা তার থেকে বাস্তিত হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল কিয়ামাহ ১৭ টাকা)।

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الظَّالِمِينَ أَمْنَوْا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مُرِوَا^١
 بِهِمْ يَتَغَامِزُونَ وَإِذَا نَقْلَبُوا إِلَيْهِمْ أَنْقَلَبُوا فَكِيمِينَ وَإِذَا^٢
 رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُؤُلَاءِ لَضَالُونَ وَمَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ
 حِفْظِيْنَ فَالْيَوْمَ أَمْنَوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى^٣
 الْأَرْأَئِكِ هُلْ تُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

অপরাধীরা দুনিয়াতে দ্বিমানদারদের বিদ্রূপ করতো। তাদের কাছ দিয়ে যাবার সময় চোখ টিপে তাদের দিকে ইশারা করতো। নিজেদের ঘরের দিকে ফেরার সময় আনন্দে উৎকুল্প হয়ে ফিরতো।^১ আর তাদেরকে দেখলে বলতো, এরা হচ্ছে পথবর্ষ।^২ অর্থ তাদেরকে এদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।^৩ আজ দ্বিমানদাররা কাফেরদের ওপর হাসছে। সুসজ্জিত আসনে বসে তাদের অবস্থা দেখছে। কাফেররা তাদের কৃতকর্মের “সওয়াব” পেয়ে গেলো তো।^৪

৯. অর্থাৎ মানুষের ভালো ও মন্দ কাজের কোন পুরস্কার ও শাস্তি দেয়া হবে না, তাদের এ ধারণা একেবারেই ভুল।

১০. মূলে “খিতামুহ মিস্ক” (خِتَمَةٌ مِسْكٌ) বলা হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, যেসব পাত্রে এই শরাব রাখা হবে তার ওপর মাটি বা মোমের পরিবর্তে মিশ্কের মোহর লাগানো থাকবে। এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের মানে হয় : এটি হবে উন্নত পর্যায়ের পরিচ্ছন্ন শরাব। ঝরণায় প্রবাহিত শরাবের থেকে এটি বেশী উন্নত গুণাবলী সম্পর্ক হবে। জারাতের খাদেমরা মিশ্কের মোহর লাগানো পাত্রে করে এনে এগুলো জারাতবাসীদের পান করাবে। এর হিতীয় মানে হতে পারে : এই শরাব যখন পানকারীদের গলা থেকে নামবে তখন শেষের দিকে তারা মিশ্কের খুবু পাবে। এই অবস্থাটি দুনিয়ার শরাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এখনে শরাবের বোতল খেলার সাথে সাথেই একটি বোটকা গুৰু নাকে লাগে। পান করার সময়ও এর দুর্গতি অনুভূত হতে থাকে এবং গলা দিয়ে নামবার সময় মস্তিষ্কের অভ্যন্তরেও পচা গুৰু পোছে যায়। এর ফলে শরাবীর চেহারায় বিবাদের একটা ভাব জেগে উঠে।

১১. তাসনীম মানে উন্নত ও উচু। কোন ঝরণাকে তাসনীম বলার মানে হচ্ছে এই যে, তা উচু থেকে প্রবাহিত হয়ে নীচের দিকে আসে।

১২. অর্থাৎ একথা ভাবতে ভাবতে ঘরের দিকে ফিরতো : আজ তো বড়ই মজা। উমুক মুসলমানকে বিদ্রূপ করে, তাকে চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ব করে

বড়ই যজা পাওয়া গেছে এবং সাধারণ মানুষের সামনে তাকে চরমতাবে অপদষ্ট করা গেছে।

১৩. অর্থাৎ এরা বুদ্ধিষ্ঠ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদেরকে জারাত ও জাহানামের চক্রে ফেলে দিয়েছেন। ফলে এরা নিজেরা নিজেদেরকে দুনিয়ার নাত, স্বার্থ ও ভোগ-বিলাসিতা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে এবং সব রকমের আশংকা ও বিগদ আপনের মুখোযুক্তি হয়েছে। যা কিছু এদের সামনে উপস্থিত আছে তা কেবল এ অনিচ্ছিত আশায় ত্যাগ করছে যে, এদের সাথে মৃত্যুর পরে কি এক জারাত দেবার ওয়াদা করা হয়েছে, আর পরবর্তী জগতে নাকি কোন জাহানাম হবে, এদেরকে তার আয়াবের তয় দেখানো হয়েছে এবং তার ফলেই এরা আজ এ দুনিয়ায় সবকিছু কষ্ট বরদাশৃত করে যাচ্ছে।

১৪. এই ছোট বাক্যটিতে বিদ্যুপকারীদের জন্য বড়ই শিক্ষাপ্রদ ইঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে অর্থাৎ ধরে নেয়া যাক মুসলমানরা যা কিছুর প্রতি ঈমান এনেছে সবকিছুই ভুল। কিন্তু তাতে তারা তোমাদের তো কোন ক্ষতি করছে না। যে জিনিসকে তারা সত্য মনে করেছে সেই অনুযায়ী তারা নিজেরাই একটি নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গি ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। এখন বলো, আল্লাহ কি তোমাকে কোন সেনানায়ক বনিয়ে পাঠিয়েছেন? যে তোমাকে আক্রমণ করছে না তুমি তাকে আক্রমণ করছো কেন? যে তোমাকে কষ্ট দিচ্ছে না তুমি তাকে অথবা কষ্ট দিচ্ছো কেন? আল্লাহ কি তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন?

১৫. এই বাক্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিদ্যুপ লুকিয়ে আছে যেহেতু কাফেররা সওয়াবের কাজ মনে করে মুসলমানদেরকে বিরুদ্ধ করতো ও কষ্ট দিতো। তাই বলা হয়েছে, আর্থেরাতে মু'মিনরা জারাতে আরামে বসে বসে জাহানামে কাফেরদের আগনৈ জ্বলতে দেখবে। তাদের এ অবস্থা দেখে মু'মিনরা মনে মনে বলতে থাকবে, ওদের কাজের কেমন চমৎকার সওয়াব ওয়া পেয়ে গেলো।

আল ইনশিকাক

৮৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের **انشققتْ** শব্দটি থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে। এর মূলে
রয়েছে **انشقق** শব্দ। ইনশিকাক মানে ফেটে যাওয়া। অর্থাৎ এ নামকরণের মাধ্যমে
একথা বলতে চাওয়া হয়েছে যে, এটি এমন একটি সূরা যাতে আকাশের ফেটে যাওয়ার
উদ্দেশ্য আছে।

নামিলের সময়-কাল

এটিও মু'আয্যমার প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অস্তরভুক্ত। এ সূরার মধ্যে
যেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে তার আভ্যন্তরীণ বক্তব্য ও প্রমাণগত্ব থেকে একথা
জানা যায় যে, যখন এ সূরাটি নাখিল হয় তখন জ্বল্ম-নিপীড়নের ধারাবাহিকতা শুরু
হয়নি। তবে কুরআনের দাওয়াতকে তখন যক্ষায় প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছিল। একদিন
কিয়ামত হবে এবং সমস্ত মানুষকে আল্লাহর সামনে হায়ির হতে হবে একথা মেনে নিতে
লোকেরা অঙ্গীকার করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। প্রথম পাঁচটি আয়াতে কেবল
কিয়ামতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি। বরং এ সংগে কিয়ামত যে সভ্যাই অনুষ্ঠিত হবে
তার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। তার অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে : সেদিন আকাশ ফেটে
যাবে পৃথিবীকে ছড়িয়ে দিয়ে একটি সমতল ময়দানে পরিণত করা হবে। পৃথিবীর পেটে যা
কিছু আছে (অর্থাৎ মৃত মানুষের শরীরের অংশসমূহ এবং তাদের কার্যাবলীর বিভিন্ন সাক্ষ
প্রমাণ) সব বের করে বাইরে ফেলে দেয়া হবে। এমনকি তার মধ্যে আর কিছুই থাকবে
না। এর সপক্ষে যুক্তি পেশ করে বলা হয়েছে, আকাশ ও পৃথিবীর জন্য এটিই হবে
তাদের রবের হকুম। আর যেহেতু এ দু'টি আল্লাহর সৃষ্টি, কাজেই তারা আল্লাহর হকুম
অমান্য করতে পারবে না। তাদের জন্য তাদের রবের হকুম তামিল করাটাই সত্য।

এরপর ৬ থেকে ১৯ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষ সচেতন বা অচেতন যে
কোনভাবেই হোক না কেন সেই মনযিলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যেখানে তার নিজেকে
তার রবের সামনে পেশ করতে হবে। তখন সমস্ত মানুষ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক,
যাদের আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। তাদেরকে কোন প্রকার কঠিন হিসেব-নিকেশের
সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই সহজে মাফ করে দেয়া হবে। দুই, যাদের আমলনামা পিঠের দিকে

দেয়া হবে। তারা চাইবে, কোনভাবে যদি তাদের মৃত্যু হতো। কিন্তু মৃত্যুর বদলে তাদেরকে জাহানামে ঠিলে দেয়া হবে। তারা দুনিয়ায় এই বিভাসিতে ড্রবে ছিল যে, তাদেরকে কখনো আল্লাহর সামনে হাফির হতে হবে না। এ কারণে তারা এ পরিণতির সম্মুখীন হবে। অথচ তাদের রব তাদের সমস্ত কার্যক্রম দেখছিলেন। এসব কার্যক্রমের ব্যাপারে জবাবদিহি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার তাদের কোন কারণ ছিল না। দুনিয়ার কর্মজীবন থেকে আখেরাতের শাস্তি ও পুরস্কারের জীবন পর্যন্ত তাদের পর্যায়ক্রমে পৌছে যাওয়ার ব্যাপারটি ঠিক তেমনই নিশ্চিত যেমন সূর্য ডুবে যাওয়ার পর পশ্চিম আকাশে লাল আভা দেখা দেয়া, দিনের পরে রাতের আসা, সে সময় মানুষ ও সকল প্রাণীর নিজ নিজ ডেরায় ফিরে আসা এবং একাদশীর একফালি চাঁদের ধীরে ধীরে চতুরদশীর পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত।

সবশেষে কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির খবর শুনানো হয়েছে। কারণ তারা কুরআনের বাণী শুনে আল্লাহর সামনে নত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। এ সংগে যারা ঈমান এনে নেক আমল করে তাদেরকে অগণিত পুরস্কার ও উত্তম প্রতিদানের সুখবর শুনানো হয়েছে।

আয়াত ২৫

সূরা আল ইনশিকাক-মঙ্গী

কৃক্ষ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتْ ۝ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ
 مَلَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحْقَتْ ۝
 يَا يَاهَا إِلَّا نَسَانٌ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَلْ حَافِلٌ قِيَهِ ۝

যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং নিজের রবের হকুম পালন করবে।^১ আর (নিজের রবের হকুম মেনে চলা,) এটিই তার জন্য সত্য। আর পৃথিবীকে যখন ছড়িয়ে দেয়া হবে।^২ যা কিছু তার মধ্যে আছে তা বাইরে নিষ্কেপ করে সে খালি হয়ে যাবে।^৩ এবং নিজের রবের হকুম পালন করবে। আর (নিজের রবের হকুম মেনে চলা), এটিই তার জন্য সত্য।^৪ হে মানুষ! তুমি কঠোর পরিশ্রম করতে করতে তোমার রবের দিকে এগিয়ে যাচ্ছো, পরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

১. মূলে أَذْنَتْ لِرَبِّهَا শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এর শান্তিক মানে হয়, “সে নিজের রবের হকুম শুনবে।” কিন্তু আরবী প্রবাদ অনুযায়ী أَذْنَتْ এর মানে শুধুমাত্র হকুম শুনা হয় না বরং এর মানে হয়, সে হকুম শুনে একজন অনুগতের ন্যায় নির্দেশ পালন করেছে এবং একটুও অবাধ্যতা প্রকাশ করেনি।

২. পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেবার মানে হচ্ছে, সাগর, নদী ও সমস্ত জলাশয় ভরে দেয়া হবে। পাহাড়গুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হবে। পৃথিবীর সমস্ত উচু নীচু জায়গা সমান করে সমগ্র পৃথিবীটাকে একটি সমতল প্রান্তরে পরিণত করা হবে। সূরা ত্বা-হা’য় এই অবস্থাটিকে নিমোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : মহান আল্লাহ “তাকে একটা সমতল প্রান্তরে পরিণত করে দেবেন। সেখানে তোমরা কোন উচু জায়গা ও তৌজ দেখতে পাবে না।” (১০৬-১০৭ আয়াত) হাকেম মুস্তাফাকে নির্ভরযোগ্য সনদ সহকারে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর বরাত দিয়ে একটি হাদীস উন্নৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে একটি দস্তরখানের মতো খুলে বিছিয়ে দেয়া হবে। তারপর মানুষের জন্য সেখানে কেবলমাত্র পা রাখার জায়গাই থাকবে।” একথাটি তালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য এ বিষয়টিও সামনে রাখতে হবে যে, সেদিন সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের জন্য

فَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا
 يُسِيرًا ۝ وَيَنْقِلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ وَرَاءَ
 ظَهْرٍ ۝ فَسَوْفَ يَلْعَبُوا ثُبُورًا ۝ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۝ إِنَّهُ كَانَ
 فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحْوِرَ ۝ بَلِّي ۝ إِنْ رَبَهُ
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝

তারপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হয়েছে, তার কাছ থেকে হাল্কা হিসেব নেয়া হবে^৬ এবং সে হাসিমুখে নিজের লোকজনের কাছে ফিরে যাবে।^৭ আর যার আমলনামা তার পিছন দিক থেকে দেয়া হবে,^৮ সে মৃত্যুকে ডাকবে এবং জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়বে। সে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে ঢুবে ছিল।^৯ সে মনে করেছিল, তাকে কখনো ফিরতে হবে না। না ফিরে সে পারতো কেমন করে? তার রব তার কার্যকলাপ দেখছিলেন।^{১০}

হয়েছে ও হবে সবাইকে একই সংগে জীবিত করে আল্লাহর আদানতে পেশ করা হবে। এ বিরাট জনগোষ্ঠীকে এক জায়গায় দৌড় করাবার জন্য সমস্ত সাগর, নদী, জলাশয়, পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, মালভূমি, তথা উচু-নীচু সব জায়গা তেজেছে ভরাট করে সারা দুনিয়াটাকে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত করা হবে।

৩. এর অর্থ হচ্ছে, যত মৃত মানুষ তার মধ্যে রয়েছে সবাইকে ঠেলে বাইরে বের করে দেবে। আর এভাবে তাদের কৃতকর্মের যেসব প্রমাণগত্ব তার মধ্যে রয়ে গেছে সেগুলোও পূরোপূরি বেরিয়ে আসবে। কোন একটি জিনিসও তার মধ্যে লুকিয়ে বা গোপন থাকবে না।

৪. যখন এসব ঘটনাবলী ঘটবে তখন কি হবে, একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। কারণ এ পরবর্তী বক্তব্যগুলো নিজে নিজেই তা প্রকাশ করে দিচ্ছে। এ বক্তব্যগুলোতে বলা হচ্ছে : হে মানুষ! ভূমি তোমার রবের দিকে এগিয়ে চলছো। শীঘ্র তাঁর সামনে হাফির হয়ে যাবে। তখন তোমার আমলনামা তোমার হাতে দেয়া হবে। আর তোমার আমলনামা অনুযায়ী তোমাকে পুরস্কার দেয়া হবে।

৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় ভূমি যা কিছু কষ্ট-সাধনা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছ, সে সম্পর্কে ভূমি মনে করতে পারো যে তা কেবল দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ এবং দুনিয়াবী স্বার্থ লাভ করাই তার উদ্দেশ্য। কিন্তু আসলে ভূমি সচেতন বা অচেতনভাবে নিজের রবের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে এবং অবশ্যে তোমাকে তাঁর কাছেই পৌছতে হবে।

৬. অর্থাৎ তার হিসেব নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করা হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, উমুক উমুক কাজ তুমি কেন করেছিলে? ঐসব কাজ করার ব্যাপারে তোমার কাছে কি কি ওজর আছে? নেকীর সাথে সাথে গোনাহও তার আমলনামায় অবশ্যি লেখা থাকবে। কিন্তু গোনাহের তুলনায় নেকীর পরিমাণ বেশী হবার কারণে তার অপরাধগুলো উপেক্ষা করা হবে এবং সেগুলো মাফ করে দেয়া হবে। কুরআন মজিদে অসংক্রমণীয় লোকদের কৃষ্ণ হিসেব-নিকেশের জন্য “সু-উল হিসেব” (খারাপভাবে হিসেব নেয়া) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (আর রা'আদ ১৮ আয়াত) সংলোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “এরা এমন লোক যাদের সংকোচণগুলো আমি গ্রহণ করে নেবো এবং অসংকোচণগুলো মাফ করে দেবো।” (আল আহকাফ ১৬ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যে ব্যাখ্যা করেছেন তাকে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসাই, আবু দাউদ, হাকেম, ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হমাইদ ও ইবনে মারদুইয়া বিভিন্ন শব্দাবলীর সাহায্যে হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। এক বর্ণনা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যার থেকেই হিসেব নেয়া হয়েছে, সে মারা পড়েছে।”

হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন, হে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ কি একথা বলেননি, “যার আমলনামা তার ডান হাতে দেয়া হবে তার থেকে হাঙ্গা হিসেব নেয়া হবে?” রসূলুল্লাহ (সা) জবাব দেন : “সেটি তো হলো কেবল আমলের উপস্থাপনা। কিন্তু যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সে মারা পড়েছে।” আর একটি রেওয়ায়াতে হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি একবার নামাযে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিম্নোক্ত দোয়া পড়তে শুনি : “হে আল্লাহ! আমার থেকে হাঙ্গা হিসেব নাও” তিনি সালাম ফেরার পর আমি তাঁকে এর অর্থ জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন : “হাঙ্গা হিসেব মানে বান্দার আমলনামা দেখা হবে এবং উপেক্ষা করা হবে। হে আয়েশা! সেদিন যার কাছ থেকে হিসেব নেয়া হয়েছে সে মারা পড়েছে।”

৭. নিজের লোকজন বলতে পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন ও সাধী-সহযোগীদের কথা বুঝানো হয়েছে। তাদেরকেও একইভাবে মাফ করে দেয়া হয়ে থাকবে।

৮. সূরা আল হাকায় বলা হয়েছে, যার আমলনামা তার বাম হাতে দেয়া হবে। আর এখানে বলা হয়েছে, তার পেছন দিক থেকে দেয়া হবে। সম্ভবত এটা এভাবে হবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ডান হাতে আমলনামা পাবার ব্যাপারে প্রথম থেকে নিরাশ হয়ে থাকবে। কারণ নিজের কার্যক্রম তার তালোভাবেই জানা থাকবে। ফলে সে নিচিতভাবে মনে করবে যে, তাকে বাম হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তবে সমস্ত মানুষের সামনে আমলনামা বাম হাতে নিতে সে লজ্জা অনুভব করবে। তাই সে নিজের হাত পেছনের দিকে রাখবে। কিন্তু এই চালাকি করে সে নিজের কৃতকর্মের ফল নিজের হাতে তুলে নেবার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। সে হাত সামনের দিকে রাখুক বা পেছনের দিকে অবশ্যি তার আমলনামা তার হাতে ধরিয়ে দেয়া হবে।

৯. অর্থাৎ তার অবস্থা ছিল আল্লাহর স্বান্দাদের থেকে আলাদা। আল্লাহর এই সংবাদের সম্পর্কে সূরা ত্বা-হা'র ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে : তারা নিজেদের পরিবারের লোকদের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ভীত লোকদের জীবন যাপন করতো। অর্থাৎ সবসময় তারা

فَلَا أُقْسِرُ بِالشَّفَقِ^{١٥} وَاللَّيلُ وَمَا وَسَقَ^{١٦} وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
 لَتَرْكَبِنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ^{١٧} فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ^{١٨} وَإِذَا قُرِئَ
 عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ^{١٩} بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَلِّبُونَ^{٢٠}
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَوْعُونَ^{٢١} فَبِشِّرْهُمْ بَعْدَ أَبْلَيْهِمْ^{٢٢} إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَهْمُونٍ^{٢٣}

কাজেই না, আমি কসম খাচ্ছি, আকাশের লাল আভার ও রাতের এবং তাতে
 যা কিছুর সমাবেশ ঘটে তার, আর চাঁদের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে। তোমাদের
 অবশ্যি স্তরে স্তরে এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থার দিকে এগিয়ে যেতে
 হবে।^{১১} তাহলে এদের কি হয়েছে, এরা ঈমান আনে না এবং এদের সামনে
 কুরআন পড়া হলে এরা সিজদা করে না^{১২} বরং এ অধীকারকারীরা উলটো মিথ্যা
 আরোপ করে। অথচ এরা নিজেদের আমলনামায় যা কিছু জমা করছে আল্লাহর তা
 খুব ভালো করেই জানেন।^{১৩} কাজেই এদের যত্নান্দায়ক আয়াবের সুসংবাদ দাও।
 তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত
 পুরস্কার।

তয় করতো নিজেদের স্তুতি ও পরিবারের লোকদের প্রতি তালবাসায় উদ্বৃক্ষ হয়ে তাদের
 দুনিয়াবী শার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে নিজেদের পরকাল বরবাদ না করে ফেলে। বিপরীত
 পক্ষে সেই ব্যক্তির অবস্থা ছিল এই যে, সে নিজের ঘরে আরামে সুখের জীবন যাপন
 করছিল। স্তুতি-স্তুতি ও পরিবারের লোকজনদের বিলাসী জীবন যাপনের জন্য যথই
 হারাম পদ্ধতি অবলম্বন এবং অন্যের অধিকার হরণ করার প্রয়োজন হোক না কেন তা
 তারা করে চলছিল। এই বিলাসী জীবন-যাপন করতে গিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত
 সীমারেখাণ্ডলোকে সে চোখ বন্ধ করে ধূঃস করে চলছিল।

১০. অর্থাৎ সে যেসব কাজ কারবার করে যাচ্ছিল আল্লাহ সেগুলো উপেক্ষা করতেন
 এবং নিজের সামনে ডেকে তাকে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করতেন না এমনটি ছিল আল্লাহর
 ইনসাফ ও হিকমতের পরিপন্থী।

১১. অর্থাৎ তোমরা একই অবস্থার ওপর অপরিবর্তিত থাকবে না। বরং যৌবন থেকে
 বার্ধক্য, বার্ধক্য থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে বর্যথ (মৃত্যু ও কিয়ামতের মাঝখানের জীবন),
 বর্যথ থেকে পুনরজ্জীবন, পুনরজ্জীবন থেকে হাশরের ময়দান তারপর হিসেব-নিকেশ
 এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অসংখ্য মন্যিল তোমাদের অবশ্যি অতিক্রম করতে হবে। এ

বিষয়ে তিনটি জিনিসের ক্ষমতা থাওয়া হয়েছে। সূর্য অস্ত যাবার পর পঞ্চম আকাশের লালিমার, দিনের পর রাত্রির আধার ও তার মধ্যে দিনের বেলা যেসব মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী পৃথিবীর চারদিকে বিচরণ করে তাদের একত্র হওয়ার এবং ঠাঁদের সরুকাত্তের মতো অবস্থা থেকে পর্যায়ক্রমে বৃক্ষ প্রাণ হয়ে পূর্ণচন্দ্রে পরিণত হওয়ার। অন্য কথায় বলা যায়, এ জিনিসগুলো প্রকাশে সাক্ষ প্রদান করছে যে, মানুষ যে বিশ্ব-জাহানে বসবাস করে সেখানে কোন স্থিতিশীলতা নেই। সেখানে সর্বত্র একটি নিরন্তর পরিবর্তন ও ধারাবাহিক অবস্থান্তর প্রক্রিয়া কার্যকর রয়েছে। কাজেই শেষ নিশ্চাসটা বের হয়ে যাবার সাথে সাথে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, মুশারিকদের এ ধারণা ঠিক নয়।

১২. অর্থাৎ এদের মনে আল্লাহর ভয় জাগে না। এরা তাঁর সামনে মাথা নত করে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কার্যক্রম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়ার সময় সিজদা করেছেন। ইমাম মালেক, মুসলিম ও নাসাই হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহ সম্পর্কে এ রেওয়ায়াত উন্নত করেছেন যে, তিনি নামাযে এ সূরাটি পড়ে এ জায়গায় সিজদা করেন এবং বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ জায়গায় সিজদা করেছেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসাই আবু রাফের একটি বর্ণনা উন্নত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, হযরত আবু হুরাইরা (রা) এশার নামাযে এ সূরাটি পড়েন এবং সিজদা করেন। আমি এর কারণে জিজেস করলে তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে নামায পড়ি এবং তিনি এখানে সিজদা করেন তাই আমি আমৃত্যু এখানে সিজদা করে যেতে থাকবো। মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ এবং আরো অনেকে অন্য একটি রেওয়ায়াত উন্নত করেছেন। তাতে হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে এই সূরায় এবং 'ইক্রা বিস্মি রবিকাল্লাজী খালাক' সূরায় সিজদা করেছি।

১৩. এর আর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, এরা নিজেদের মনে কুফরী, হিংসা, সত্ত্বের সাথে শক্তা এবং অন্যান্য খারাপ ইচ্ছা ও দুষ্ট সংকলনের যে নোত্বা আবর্জনা ভরে রেখেছে আল্লাহ তা খুব ভালো করেই জানেন।

আল বুরজ

৮৫

নামকরণ

প্রথম আয়তে **الْبَرْجُ** শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

এর বিষয়বস্তু থেকেই একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, এ সূরাটি মক্কা মুয়ায়্যমায় এমন এক সময় নায়িল হয় যখন মুশারিকদের জুলুম নিপীড়ন তুংগে উঠেছিল এবং তারা কঠিনতম শাস্তি দিয়ে মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিচ্ছৃত করার চেষ্টা করছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে, ঈমানদারদের ওপর কাফেররা যে জুলুম করছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা এবং ঈমানদারদেরকে এই মর্মে সান্ত্বনা দেয়া যে, যদি তারা এসব জুলুম-নিপীড়নের মোকাবিলায় অবিচল থাকে তাহলে তারা এর জন্য সর্বোত্তম পুরুষার পাবে এবং আল্লাহ নিজেই জালেমদের থেকে বদলা মেবেন।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম আসহাবুল উব্দুদ্দের (গর্ত ওয়ালাদের) কাহিনী শুনানো হয়েছে। তারা ঈমানদারদেরকে আগুনে ভরা গর্তে ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। এ কাহিনীর মাধ্যমে মু'মিন ও কাফেরদেরকে কয়েকটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, গর্তওয়ালারা যেমন আল্লাহর অভিশাপ ও তাঁর শাস্তির অধিকারী হয়েছে তেমনি মক্কার মুশারিক সরদাররাও তার অধিকারী হচ্ছিল। দুই, ঈমানদাররা যেমন তখন ঈমান ত্যাগ করার পরিবর্তে আগুনে ভরা গর্তে নিষিক্ষণ হয়ে জীবন দেয়াকে বেছে নিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে এখনও ঈমানদারদের ঈমানের পথ থেকে সামান্যতমও বিচ্ছৃত না হয়ে সব রকমের কঠিনতম শাস্তি ভোগ করা উচিত। তিনি, যে আল্লাহকে মেনে নেবার কারণে কাফেররা বিরোধী হয়ে গেছে এবং ঈমানদাররা তাদের মেনে নেবার ওপর অবিচল রয়েছে, তিনি সবার ওপর ক্ষমতাশালী ও বিজয়ী, তিনি পৃথিবী ও আকাশের কর্তৃত্বের অধিকারী, নিজের সক্ষায় তিনি নিজেই প্রশংসার অধিকারী এবং তিনি উভয় দলের অবস্থা দেখছেন। কাজেই নিচিতভাবেই কাফেররা তাদের কুফরীর কারণে কেবল জাহানামের শাস্তি ভোগ করবে না বরং এই সংগে নিজেদের জুলুম-নিপীড়নের শাস্তিও তারা ভোগ করবে আগুনে দাহীভূত হয়ে। অনুরূপভাবে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করেছে তারা নিচিতভাবে জালাতে যাবে এবং এটিই বৃহত্তম সাফল্য। তারপর কাফেরদেরকে এ মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত শক্ত ও কঠোরভাবে পাকড়াও করে থাকেন। যদি তোমরা

নিজেদের বিরাট দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করে থাকো তাহলে তোমাদের চাইতে বড় দলীয় শক্তির অধিকারী ছিল ফেরাউন ও সামুদ্র। তাদের সেনাবাহিনীর পরিণাম থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আব্বাহর অসীম শক্তি তোমাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে। এই ঘেরাও কেটে বের হবার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আর যে কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্থ করার জন্য তোমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটি শব্দ অপরিবর্তনীয়। এই কুরআনের প্রতিটি শব্দ নওহে মাহফুয়ের গায়ে এমনভাবে খোদিত আছে যে হাজার চেষ্টা করেও কেউ তা বদলাতে পারবে না।

আয়াত ২২

সূরা আল বুরজ-মৰী

কুরআন

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
পরম কর্মাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعِدِ ۝ وَشَاهِلٍ وَمَشْهُودٍ ۝
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْلَادِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقْدِ ۝ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا
قَعُودٌ ۝ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ۝ بِالْمُؤْمِنِينَ شَهُودٌ ۝ وَمَا نَقْمَوْا
مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيمِ ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

কসম মজবুত দুর্গ বিশিষ্ট আকাশের। এবং সেই দিনের যার ওয়াদা করা হয়েছে আর যে দেখে তার এবং সেই জিনিসের যা দেখা যায়।^১ মারা পড়েছে গর্তওয়ালারা যে গর্তে দাউ দাউ করে ছলা ছলানীর আগুন ছিল, যখন তারা সেই গর্তের কিনারে বসেছিল এবং ইমানদারদের সাথে তারা সবকিছু করছিল তা দেখছিল।^২ ওই ইমানদারদের সাথে তাদের শক্তির এ ছাড়া আর কোন কারণ ছিল না যে, তারা সেই আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছিল যিনি মহাপ্রাক্রমশালী এবং নিজের সন্তায় নিজেই প্রশংসিত, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী। আর সে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন।^৩

১. মূলে تَبَعَّدَتِ الْبُرُوجُ বলা হয়েছে। অর্থাৎ বুর্জ বিশিষ্ট আকাশ। প্রাচীন জ্যোতিবিদ্যা অনুযায়ী মুফাস্সিরগণের কেউ কেউ এ থেকে আকাশের বারটি বুর্জ অর্থ করেছেন। অন্যদিকে ইবনে আবাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদাহ, হাসান বসরী, যাহহাক ও সুন্দীর মতে এর অর্থ হচ্ছে, আকাশের বিশাল গ্রহ ও তারকাসমূহ।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

৩. যে দেখে এবং যা দেখা যায়—এ ব্যাপারে মুফাস্সিরগণের বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমার মতে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে যে কথাটি সম্পর্ক রাখে সেটি হচ্ছে, যে দেখে বলতে এখানে কিয়ামতের দিন উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এবং যা দেখা

যায় বলতে কিয়ামতকেই বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের ত্যাবহ ও লোমহর্ষক ঘটনাবলী সেদিন যারা দেখে তারা প্রত্যেকেই দেখবে। এটি মুজাহিদ, ইকরামা, যাহহাক, ইবনে নুজাইহ এবং অন্যান্য কতিপয় মুফাস্সিরের বক্তব্য।

৪. যারা বড় বড় গর্তের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরকে তার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল এবং তাদের জ্বলে পুড়ে মরার বীভৎস দৃশ্য নিজেদের চোখে দেখেছিল তাদেরকে এখানে গর্তওয়ালা বলা হয়েছে। মারা পড়েছে অর্থ তাদের ওপর আল্লাহর লানত পড়েছে এবং তারা আল্লাহর আয়াবের অধিকারী হয়েছে। এ বিষয়টির জন্য তিনিটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। প্রথম বুর্জ বিশিষ্ট আকাশের দ্বিতীয় কিয়ামতের দিনের, যার ওয়াদা করা হয়েছে। তৃতীয় কিয়ামতের ত্যাবহ ও লোমহর্ষক দৃশ্যাবলীর এবং সেই সমস্ত সূচির যারা এ দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করবে। প্রথম জিনিসটি সাক্ষ দিছে, যে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন মহাশক্তিধর সত্ত্বা বিশ্ব-জাহানের বিশাল তারকা ও শহরাঞ্জির ওপর কর্তৃত্ব করছেন তাঁর পাকড়াও থেকে এ তুচ্ছ নগণ্য মানুষ কেমন করে বীচতে পারে? দ্বিতীয় জিনিসটির কসম এ জন্য খাওয়া হয়েছে যে, দুনিয়ায় তারা ইচ্ছামতো জুলুম করেছে কিন্তু এমন একটি দিন অবশ্যি আসবে যেদিনটি সম্পর্কে সমস্ত মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সেদিন প্রত্যক্ষ মজলুমের বদলা দেয়া হবে এবং প্রত্যেক জালেমকে পাকড়াও করা হবে। তৃতীয় জিনিসটির কসম খাওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, এ জালেমরা ফেতাবে ওই ঈমানদারদের জ্বলে পুড়ে মরার দৃশ্য দেখেছে ঠিক তেমনি কিয়ামতের দিন এদের শান্তি দেয়ার দৃশ্য সমগ্র সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করবে।

গর্তে আগুন জ্বালিয়ে ঈমানদারদেরক তার মধ্যে নিক্ষেপ করার একাধিক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, এ ধরনের জুলুম ও নিপীড়নমূলক ঘটনা দুনিয়ায় কয়েকবার ঘটেছে।

ইয়রত সুহাইব রুমী (রা) এ ধরনের একটি ঘটনা রাসূলগ্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হচ্ছে : এক বাদশাহ কাছে একজন যাদুকর ছিল। বৃক্ষ বয়সে সে বাদশাহকে বললো, একটি ছেলেকে আমার কাছে নিযুক্ত করো, সে আমার কাছ থেকে এ যাদু শিখে নেবে। বাদশাহ যাদু শেখার জন্য যাদুকরের কাছে একটি ছেলেকে নিযুক্ত করলো। কিন্তু সেই ছেলেটি যাদুকরের কাছে আসা যাওয়ার পথে একজন রাহবেরে (যিনি সম্ভবত ইস্মা আলাইহিস সালামের দীনের অনুসারী একজন সাধক ছিলেন) সাক্ষাত করতে লাগলো। তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে সে ঈমান আনলো। এমন কি তাঁর শিক্ষার শুরু সে অলৌকিক শক্তির অধিকারীও হয়ে গেলো। সে অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে এবং কুর্ষরোগ নিরাময় করতে লাগলো। ছেলেটি তাওহীদের প্রতি ঈমান এনেছে, একথা জানতে পেরে বাদশাহ প্রথমে রাহবেকে হত্যা করলো তারপর ছেলেটিকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু কোন অন্ত দিয়েই এবং কোনভাবেই তাকে হত্যা করতে পারলো না।—শেষে ছেলেটি বললো, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও তাহলে প্রকাশ জনসমাবেশে “বিস্মি রবিল গুলাম” (অর্থাৎ এই ছেলেটির রবের নামে) বাক্য উচ্চারণ করে আমাকে তীর মারো, তাতেই আমি মারা যাবো। বাদশাহ তাই করলো। ফলে ছেলেটি মারা গেলো। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করে লোকেরা চীৎকার করে উঠলো, আমরা এই ছেলেটির রবের প্রতি ঈমান আনলাম। বাদশাহ সভাসদরা তাকে বললো, এখন তো

তাই হয়ে গেলো যা থেকে আপনি বাঁচতে চাছিলেন। লোকেরা আপনার ধর্ম ত্যাগ করে এ ছেলেটির ধর্মগ্রহণ করেছে। এ অবস্থা দেখে বাদশাহ অত্যন্ত দ্রুদ্ধ হলো। সে রাস্তার পাশে গর্ত খনন করালো। তাতে আগুন জ্বালালো। যারা ইমান ত্যাগ করতে রাজী হলো না তাদের সবাইকে তার মধ্যে নিষ্কেপ করলো। (মুসনাদে আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিয়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, ইবনে আবী শাইবা, তাবারানী, আব্দ ইবনে হমাইদ)

তৃতীয় ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হয়রত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহ। তিনি বলেন, ইরানের এক বাদশাহ শরাব পান করে নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করে এবং উভয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। কথাটি প্রকাশ হয়ে গেলে বাদশাহ জনসমক্ষে ঘোষণা করে দেয় যে, আল্লাহ বোনের সাথে বিয়ে হালাল করে দিয়েছেন। লোকেরা তার একথা মানতে প্রস্তুত হয় না। ফলে সে নানান ধরনের শাস্তি দিয়ে লোকদের একথা মানতে বাধ্য করতে থাকে। এমনকি সে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে যে ব্যক্তি তার একথা মানতে প্রস্তুত হয়নি তাকে তার মধ্যে নিষ্কেপ করতে থাকে। হয়রত আলী (রা) বলেন, সে সময় থেকেই অগ্নি উপাসকদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়কে বিয়ে করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়। (ইবনে জারীর)

তৃতীয় ঘটনাটি হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) সভ্বত ইসরাইলী বর্ণনা থেকে উদ্ভৃত করেছেন। তিনি বলেন : বেবিলনের অধিবাসীরা বনী ইসরাইলকে হয়রত মূসা আলাইহিস সালামের দীন থেকে বিচ্ছৃত করতে বাধ্য করেছিল। এমন কি যারা তাদের কথা মানতে অবীকার করতো তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে ভরা গর্তে নিষ্কেপ করতো। (ইবনে জারীর, আব্দ ইবনে হমাইদ)

নাজরানের ঘটনাটিই সবচেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ইবনে হিগাম, তাবারী, ইবনে খালদুন, মু'জামুল বুলদান গ্রন্থ প্রণেতা ইত্যাদি মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এর সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে : হিয়ারের (ইয়ামন) বাদশাহ তুরান আস্যাদ আবু কারিবা একবার ইয়াস্রিবে যায়। সেখানে ইহুদিদের ঘারা প্রভাবিত হয়ে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে এবং বনি কুরাইয়ার দু'জন ইহুদি আলেমকে সংগে করে ইয়ামনে নিয়ে যায়। সেখানে সে ব্যাপকভাবে ইহুদি ধর্মের প্রচার চালায়। তারপর তার ছেলে যু-নুওয়াস তার উভরাধিকারী হয়। সে দক্ষিণ আরবে ইসায়ীদের কেন্দ্রস্থল নাজরান আক্রমণ করে। সেখান থেকে ইসায়ী ধর্মকে উৎখাত করা এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে জোরপূর্বক ইহুদি ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তার লক্ষ। (ইবনে হিশাম বলেন, নাজরানবাসীরা হয়রত ঈসার আসল দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল)। নাজরান পৌছে সে লোকদেরকে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানায়। লোকেরা অবীকার করে। এতে ক্ষিণ হয়ে সে বিপুল সংখ্যক লোককে দাউ দাউ করে জুলা আগুনের কুয়ায় নিষ্কেপ করে জ্বালিয়ে দেয় এবং অনেককে হত্যা করে। এভাবে মোট বিশ হাজার লোক নিহত হয়। নাজরানবাসীদের মধ্য থেকে দাউস যু-সা'লাবান নামক এক ব্যক্তি কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করে পালিয়ে যায়। এক বর্ণনা মতে, সে রোমের কায়সারের দরবারে চলে যায় এবং অন্য একটি বর্ণনা মতে সে চলে যায় হাবশার (ইথিওপিয়া) বাদশাহ নাজাসীর দরবারে। সেখানে সে এই জুলুমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। প্রথম বর্ণনা অনুযায়ী রোমের কায়সার হাবশার বাদশাহকে লেখেন এবং

ঝিতীয় বর্ণনা অনুযায়ী নাজ্জাশী কায়সারের কাছে নৌবাহিনীর জাহাজ সরবরাহের আবেদন জানান। যাহোক সবশেষে হাবশার স্তর হাজার সৈন্য আরইঃগত নামক একজন সেনাপতির পরিচালনাধীনে ইয়ামন আক্রমণ করে। যু-নুওয়াস নিহত হয়। ইহনি রাষ্ট্রে পতন ঘটে। ইয়ামন হাবশার ঈসায়ী রাষ্ট্রের অন্তরভুক্ত হয়।

অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদি থেকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের এ বর্ণনার কেবল সত্যতাই প্রমাণিত হয় না বরং এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত তথ্যাদিও জানা যায়। সর্বপ্রথম ৩৪০ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামন হাবশার ঈসায়ীদের দখলে আসে। ৩৭৮ খ্রিষ্ট সেখানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ সময় ঈসায়ী মিশনারীরা ইয়ামনে প্রবেশ করতে শুরু করে। এরি নিকটবর্তী সময়ে ফেমিউন (Faymeyun) নামক একজন সংস্থার তাগী সাধক পুরুষ, কাশুফ ও কারামতের অধিকারী ঈসায়ী পর্যটক নাজরানে আসেন। তিনি স্থানীয় লোকদেরকে মৃতি পূজার গলদ বুঝাতে থাকেন। তার প্রচার গুণে নাজরানবাসীরা ঈসায়ী ধর্মে দীক্ষিত হয়। সে সময় তিনজন সরদার তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। তাদের একজনকে বলা হতো সাইয়েদ। তিনি উপজাতীয় সরদারদের মতো একজন বড় সরদার ছিলেন। বিদেশ সঞ্চার বিষয়াবলী, সক্রিয়ত্ব এবং সেনাবাহিনী পরিচালনা তার দায়িত্বের অন্তরভুক্ত ছিল। ঝিতীয় জনকে বলা হতো আকেব। তিনি অত্যন্তরীণ বিষয়াবলী দেখাশুনা করতেন। ত্বরীয় জনকে বলা হতো উস্কুফ (বিশপ)। তিনি ছিলেন ধর্মীয় নেতা। দক্ষিণ আরবে নাজরান ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। এটি ছিল একটি বৃহত্তম বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। এখানে তসর, চামড়া ও অন্তর্নির্মাণ শিল্প উন্নতি লাভ করেছিল। প্রসিদ্ধ ইয়ামনী বর্মণ এখানেই নির্মিত হতো। এ কারণে নিছক ধর্মীয় কারণেই নয় বরং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেও যু-নুওয়াস এ গুরুত্বপূর্ণ হানটি আক্রমণ করে। নাজরানের সাইয়েদ হারেশাকে, সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ যাকে Arethas বলেছেন, হত্যা করে। তার স্তুরী রক্ষার সামনে তার দুই কন্যাকে হত্যা করে এবং তাদের রক্ত পান করতে তাকে বাধ্য করে। তারপর তাকেও হত্যা করে। উস্কুফ বিশপ পলের (Paul) শুকনো হাড় কবর থেকে বের করে এনে জ্বালিয়ে দেয়। আগুন তরা গর্তসমূহে নারী, পুরুষ, শিশু, যুবা, বৃক্ষ, পাদুরী, রাহেব সবাইকে নিক্ষেপ করে। সামগ্রিকভাবে ত্রিশ থেকে চাত্তিশ হাজার লোক নিহত হয়েছিল বলা হয়। ৫২৩ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। অবশেষে ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দে হাবশীরা ইয়ামন আক্রমণ করে যু-নুওয়াস ও তার হিমাইয়ারী রাজত্বের পতন ঘটায়। প্রত্যতিক গবেষকগণ ইয়ামন হিস্নে গুরাবের যে শিলালিপি উদ্ধার করেছেন তা থেকেও এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঈসায়ী লেখকদের বিভিন্ন লেখায় গর্তওয়ালাদের এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে মূল ঘটনার সময় এবং এ ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তাদের বিবরণ সহকারে লিখিত বেশ কিছু গ্রন্থ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে তিনটি গ্রন্থের রচয়িতারা এই ঘটনার সমসাময়িক। তাদের একজন হচ্ছেন : প্রকোপিউস ঝিতীয় জন কসমস ইনডিকোপ্রিউস্টিস (Cosmos Indicopleustis) তিনি নাজ্জাশী এলিস বুয়ানের (Elesboan) নির্দেশে সে সময় বাত্তিমুসের গ্রীক ভাষায় লিখিত বইগুলোর অনুবাদ করেছিলেন। এ সময় তিনি হাবশার সম্মুদ্রোপকূলবর্তী এডোলিশ (Adolis) শহরে

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابٌ أَبْعَدُ مِنْ جَهَنَّمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَحَقُّ بِهِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيرُ

যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালিয়েছে, তারপর তা থেকে তাওবা করেনি, নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহানামের আয়াব এবং জ্ঞালা-পোড়ার শাস্তি।^৬ যারা ইমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য রয়েছে জাহানাতের বাগান যার নিম্নদেশে প্রবাহিত হতে থাকবে করণাধার্য। এটিই বড় সাফল্য।

অবস্থান করছিলেন : তৃতীয়জন হচ্ছেন জোহানাস মালালা (Johnnes Malala) : পরবর্তী বছ ঐতিহাসিক তাঁর রচনা থেকে ঘটনাটি উদ্ভূত করেছেন। এদের পর এফেসুসের জোহানাসের (Johannes of Ephesus) নাম করা যায় : তিনি ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাঁর গীর্জার ইতিহাস গ্রন্থে নাজরানের ঈসায়ী সম্প্রদায়ের ওপর এই নিপীড়নের কাহিনী এ ঘটনার সমসাময়িক বর্ণনাকারী বিশপ শিমউনের (SIMEON) একটি পত্র থেকে উদ্ভূত করেছেন। এ পত্রটি দিয়িত হয় জাবলা ধর্ম মন্দিরের প্রধানের (Abbot Von Gabula) নামে : ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিভিন্ন ইয়ামনবাসীর বর্ণনার মাধ্যমে শিমউন তাঁর এই পত্রটি তৈরি করেন। এ পত্রটি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে রোম থেকে এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ঈসায়ী শহীদানন্দের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে প্রকাশিত হয় : ইয়াকুবী পত্রিয়ার্ক ডিউনিসিউস (Patriarch Dionysius) ও জাকারিয়া সিদনিনি (Zacharia of Mityleene) তাদের সুরিয়ানী ইতিহাসেও এ ঘটনাটি উদ্ভূত করেছেন। নাজরানের ঈসায়ী সমাজ সম্পর্কিত ইয়াকুব সুর্য়ীর গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে। আর রাহা (Edessa) এর বিশপ পোলস (POLLES) নাজরানের নিহতদের উদ্দেশ্যে শোকগীতি দিয়েছেন। এটি এখনো পাওয়া যায় : সুরিয়ানী ভাষার বই “আল হিময়ারীন” এর ইংরেজী অনুবাদ (Book of the Himyarites) ১৯২৪ সালে গওন থেকে প্রকাশিত হয়েছে : এ বইটি মুসলিম ঐতিহাসিকদের বর্ণনার সভ্যতা প্রমাণ করে। বৃটিশ মিউজিয়ামে সেই আমলের এবং তার নিকটবর্তী আমলের কিছু ইথিয়োপীয় শিলালিপি সংরক্ষিত রয়েছে : এগুলো থেকেও এই ঘটনার সমর্থন পাওয়া যায় : কিন্তব তাঁর Arabian Highlands নামক সফরনামায় লিখেছেন : গভর্নেন্সাদের ঘটনা যেখানে সংঘটিত হয়েছিল সে জায়গাটি আজো নাজরানবাসীদের কাছে সুপ্রিয়। ‘উম্ম খারাক’-এর কাছে এক জায়গায় পাথরের গায়ে খোদিত কিছু চিত্রও পাওয়া যায়। আর নাজরানের কাবা যেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল বর্তমান নাজরানবাসীরা সে জায়গাটিও জানে।

إِنْ بَطَشَ رِبْكَ لَشَدِيلٌ ۖ إِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيدُ ۚ وَهُوَ
 الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۗ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۗ فَعَالَ لِمَا يَرِيدُ ۗ هُلْ
 أَتَلَكَ حَلِيلٌ بَنْتُ الْجَنُودِ ۗ فِرْعَوْنُ وَثَمُودُ ۗ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي
 تَكْلِيْفٍ ۗ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ حِسِيطٌ ۗ بَلْ هُوَ قَرَانٌ مَجِيدٌ ۗ
 فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۗ

আসলে তোমার রবের পাকড়াও বড় শক্ত। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করবেন। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়, আরশের মালিক, শ্রেষ্ঠ-সম্মানিত এবং তিনি যা চান তাই করেন।^১ তোমার কাছে কি পোছেছে সেনাদলের থবর? ফেরাউন ও সামুদ্রের সেনাদলের?^২ কিছু যারা কুফরী করেছে, তারা মিথ্যা আরোপ করার কাজে লেগে রয়েছে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে ঘেরাও করে রেখেছেন। (তাদের মিথ্যা আরোপ করায় এ কুরআনের কিছু আসে যায় না) বরং এ কুরআন উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।^৩

হাবশার ঈসায়ীরা নাজরান অধিকার করার পর সেখানে কাবার আকৃতিতে একটি ইমারত তৈরি করে। মকার কাবার মোকাবিলায় এই ঘরটিকে তারা কেন্দ্রীয় মর্যাদা দিতে চাচ্ছিল। এখনকার বিশপরা মাথায় পাগড়ী বৈধতেন। এই ঘরকে তারা হারাম শরীফ গণ্য করেন। রোমান সম্বাটের পক্ষ থেকেও এই কাবাঘরের জন্য আধিক সাহায্য পাঠনো হতো। এই নাজরানের কাবার পাদরী তাঁর সাইয়েদ, আকেব ও উসকুফের নেতৃত্বে ‘মুনায়িরা’ (বিতর্ক) করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হায়ির হয়েছিলেন। সেখানে যে বিখ্যাত ‘মুবাহিলা’র ঘটনা অনুষ্ঠিত হয় সূরা আলে ইমরানের ৬১ আয়াতে তা উল্লেখিত হয়েছে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ২৯ ও ৫৫ টাকা)

৫. এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহর এমন সব গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রতি ইমান আনার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে এগুলোর প্রতি ইমান আনার কারণে যারা অস্বৃষ্ট ও বিকুঠ হয় তারা জালেম।

৬. জাহানামের আয়াব থেকে আবার আলাদাভাবে জ্বালা-পোড়ার শাস্তির উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা মজলুমদেরকে আগুনে তরা গর্তে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়েছিল। সম্ভবত এটা জাহানামের সাধারণ আগুন থেকে তিনি ধরনের এবং তার চেয়ে বেশী তীব্র কোন আগুন হবে এ বিশেষ আগুনে তাদেরকে জ্বালানো হবে।

৭. “তিনি ক্ষমাশীল” বলে এই মর্মে আশাপ্রিত করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি গোনাহ করা থেকে বিরত হয়ে যদি তাওবা করে তাহলে সে আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারে। “প্রেময়” বলে একথা বলা হয়েছে যে, তিনি নিজের সৃষ্টির প্রতি কোন শক্রতা পোষণ করেন না। অথবা তাদেরকে শাস্তি দেয়া তাঁর কাজ নয়। বরং নিজের সৃষ্টিকে তিনি ভালোবাসেন। তাকে তিনি কেবল তখনই শাস্তি দেন যখন সে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করা থেকে বিরত হয় না। “আরশের মালিক” বলে মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগানো হয়েছে যে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের রাজত্বের তিনিই একমাত্র অধিপতি। কাজেই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কেউ তাঁর হাত থেকে নিষ্ঠার পেতে পারে না। “শ্রেষ্ঠ সম্মানিত” বলে এ ধরনের বিপুল মর্যাদাসম্পন্ন সন্তার প্রতি অশোভন আচরণ করার হীন মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর শেষ গুণটি বর্ণনা করে বলা হয়েছে, “তিনি যা চান তাই করেন।” অর্থাৎ আল্লাহ যে কাজটি করতে চান তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা এ সমগ্র বিশ্ব-জাহানে কারোর নেই।

৮. যারা নিজেদের দল ও জনশক্তির জোরে আল্লাহর এ যামীনে বিদ্রোহের ঘাওা বুলন্দ করছে এখানে তাদেরকে সর্বোধন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, তোমাদের কি জানা আছে, ইতিপূর্বে যারা নিজেদের দলীয় শক্তির জোরে এ ধরনের বিদ্রোহ করেছিল তাদের পরিণাম কি হয়েছিল?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, এ কুরআনের লেখা অপরিবর্তনীয়। এর বিলুপ্তি হবে না। আল্লাহর এমন সংরক্ষিত ফলকে এর সেখাণ্ডলো খোদিত রয়েছে যেখানে এর মধ্যে কোন রদবদল করার ক্ষমতা কারোর নেই। এর মধ্যে যে কথা লেখা হয়েছে তা অবশ্যি পূর্ণ হবে। সারা দুনিয়া একজোট হয়ে তাকে বাতিল করতে চাইলেও তাতে সফল হবে না।

আত তারিক

৮৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতে **الْطَّرِيقٍ** শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

বজ্রব্য বিষয়ের উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে মক্কা মুআ'য়মার প্রাথমিক সূরাগুলোর সাথে এর মিল দেখা যায়। কিন্তু মক্কার কাফেররা যখন কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালাইল ঠিক সে সময়ই এ সূরাটি নাযিল হয়।

সর্বপ্রথম আকাশের তারকাণ্ডগুলোকে এ ঘর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এ বিশ্ব-জ্ঞানে কোন একটি জিনিসও নেই যা কোন এক সন্তার রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া নিজের জ্ঞানগায় প্রতিষ্ঠিত ও অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। তারপর মানুষের দৃষ্টি তার নিজের সন্ধার প্রতি আকৃষ্ট করে বলা হয়েছে, দেখো কিভাবে এক বিস্তু তত্ত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করে তাকে একটি ক্ষুলজ্যান্ত গতিশীল মানুষে পরিণত করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, যে আল্লাহ এভাবে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনি নিচিতভাবেই তাকে দ্বিতীয়বার পয়দা করার ক্ষমতা রাখেন। দুনিয়ায় মানুষের যেসব গোপন কাজ পর্দার আড়ালে থেকে গিয়েছিল সেগুলোর পর্যালোচনা ও হিসেব-নিকেশই হবে এই দ্বিতীয়বার পয়দা করার উদ্দেশ্য। সে সময় নিজের কাজের পরিণাম ভোগ করার হাত থেকে বাঁচার কোন ক্ষমতাই মানুষের থাকবে না এবং তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ এগিয়ে আসতেও পারবে না।

সবশেষে বলা হয়েছে, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং মাটি থেকে গাছপালা ও ফসল উৎপাদন যেমন কোন খেলা তামাসার ব্যাপার নয় বরং একটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, ঠিক তেমনি কুরআনে যেসব প্রকৃত সত্য ও নিগৃহ তত্ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোও কোন হাসি তামাসার ব্যাপার নয়। বরং সেগুলো একেবারে পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় কথা। কাফেররা এ ভূল ধারণা নিয়ে বসে আছে যে, তাদের চালবাজী ও কৌশল কুরআনের এই দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। কিন্তু তারা জানে না, আল্লাহও একটি কৌশল অবলম্বন করছেন এবং তাঁর কৌশলের মোকাবিলায় কাফেরদের যাবতীয় চালবাজী ও কৌশল ব্যর্থ হয়ে যাবে। তারপর একটি বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাব্বন্না এবং পর্দাস্তারালে কাফেরদের ধমক দিয়ে কথা এভাবে শেষ করা হয়েছে : তুমি একটু সবর করো এবং কিছুদিন কাফেরদেরকে ইচ্ছেমতো চলার সুযোগ দাও। কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা টের পেয়ে যাবে, তাদের চালবাজী ও প্রতারণা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না। বরং যেখানে তারা কুরআনকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রতিহত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে কুরআন বিজয়ীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে।

আয়াত ১৭

সূরা আত তারিক-মঙ্গী

জন্ম

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মান্বয় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالسَّمَاءِ وَالظَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا الظَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الشَّاقِبُ ۝ إِنَّ
 كُلَّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلُقَ مِنْ مَاءٍ
 دَافِقٌ ۝ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالثَّرَائِبِ ۝ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝

কসম আকাশের এবং রাতে আত্মপ্রকাশকারীর। তুমি কি জানো ঐ রাতে আত্মপ্রকাশকারী কি? উজ্জ্বল তারকা। এমন কোন প্রাণ নেই যার ওপর কোন হেফাজতকারী নেই।^১ কাজেই মানুষ একবার এটাই দেখে নিক কৈ জিনিস থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।^২ তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে প্রবলবেগে নিঃসৃত পানি থেকে, যা পিঠ ও বুকের হাড়ের মাঝখান দিয়ে বের হয়।^৩ নিষ্ঠিতভাবেই তিনি (সৃষ্টি) তাকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।^৪

১. হেফাজতকারী বলতে এখানে আল্লাহকেই বুঝানো হয়েছে। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর ছোট বড় সকল সৃষ্টির দেখাশুনা, তত্ত্ববধান ও হেফাজত করছেন। তিনিই সব জিনিসকে অস্তিত্ব দান করেছেন তিনিই সবকিছুকে টিকিয়ে রেখেছেন। তিনি সব জিনিসকে ধারণ করেছেন বলেই প্রত্যেকটি জিনিস তার নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি সব জিনিসকে তার যাবতীয় থয়োজন পূর্ণ করার এবং তাকে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত বিপদ্মুক্ত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ বিষয়টির জন্য আকাশের ও রাতের অন্ধকারে আত্মপ্রকাশকারী প্রত্যেকটি গ্রহ ও তারকার কসম খাওয়া হয়েছে। আতিধানিক অর্থের দিক দিয়ে শব্দ একবচন হলেও এখানে এর মানে কিন্তু একটি তারকা নয় বরং তারকা মণ্ডলী। ফলে এখানে এ কসমের অর্থ এ দৌড়ায় : রাতের আকাশে এই যে অসংখ্য গ্রহ তারকা ঝলমল করতে দেখা যায় এদের প্রত্যেকটির অস্তিত্ব এ মর্মে সাক্ষ থেদান করছে যে অবশ্যি কেউ একজন আছেন যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, এগুলোকে আলোকিত করেছেন, এগুলোকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং এমনভাবে এদেরকে হেফাজত করছেন যার ফলে এরা নিজেদের স্থান থেকে ছিটকে পড়ে না এবং অসংখ্য তারকা একসাথে আবর্তন করার সময় একটি তারকা অন্য তারকার সাথে ধাক্কা খায় না বা অন্য কোন তারা তাকে ধাক্কা দেয় না।

২. উর্ধজগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর এবার মানুষকে তার নিজের সন্তা সম্পর্কে একটু চিন্তা করার জন্য আহবান জানানো হয়েছে। তাকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? কে পিতার দেহ থেকে নির্গত কোটি কোটি শুক্রকীটের মধ্য থেকে একটি শুক্রকীট এবং মায়ের গর্ভ থেকে নির্গত অসংখ্য ডিমের মধ্য থেকে একটি ডিম বাছাই করে দেয় এবং কোন এক সময় তাদের সম্মিলন ঘটায় এবং তারপর এক বিশেষ মানবীর গর্ভ ধারণ সংগঠিত হয়? গর্ভ সঞ্চারের পর কে মায়ের উদরে তার ক্রমবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে? তারপর কে তাকে একটি জীবিত শিশুর আকারে জন্মাত্ত করার পর্যায়ে পৌছিয়ে দেয়? কে মায়ের গভীরারের মধ্যেই তার শারীরিক কাঠামো এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসমূহের অনুপাত নির্ধারণ করে দেয়? কে জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত তার তত্ত্বাবধান করে? তাকে রোগ মুক্ত করে। দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করে। নানা প্রকার আপদ-বিপদ থেকে বীচায়। তার জন্য বহুতর সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে। তার নিজের এসব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই নেই। এমনকি এগুলো সম্পর্কে কোন চেতনাই তার নেই। এসবকিছুই কি এক মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়াই চলছে?

৩. এখানে মূল আয়তে সূল্ব (صلب) ও তারায়েব (ترائب) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'সূল্ব' মেরুদণ্ডকে ও 'তারায়েব' বুকের পাঁজরকে বলা হয়। যেহেতু যে উপাদান থেকে পূর্ণ ও নারীর জন্য হয় তা মেরুদণ্ড ও বুকের মধ্যস্থিত ধড় থেকে বের হয়, তাই বলা হয়েছে পিঠ ও বুকের মধ্যস্থল থেকে নির্গত পানি থেকে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের হাত-পা কর্তিত অবস্থায়ও এ উপাদান জন্ম নেয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, সারা শরীর থেকে এ উপাদান বের হয়। আসলে শরীরের প্রধান অঙ্গগুলোই হচ্ছে এর উৎস। আর এ' প্রধান অঙ্গগুলো সব ধড়ের সাথে সংযোজিত। মণ্ডিকের কথা আলাদা করে না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, মেরুদণ্ড মৃত্তিকের এমন একটি অংশ যার মাধ্যমে শরীরের সাথে মণ্ডিকের সম্পর্ক বজায় রয়েছে।

* মাসিক তরজুমানুল কুরআনে এই ব্যাখ্যাটি প্রকাশিত হবার পর জনৈক ডাক্তার সাহেব মাওলানা মওলুদীকে (র) লেখেন : “আপনার ব্যাখ্যাটি আমি যন্মেয়েগ সহকারে কয়েকবার পড়লাম। কিন্তু আমি বিষয়টি বুঝতে পাইলাম না। কারণ বাস্তব পর্যবেক্ষণে আমরা দেখি, অঙ্গকোষে (Testicles) বীর্যের জন্ম হয়। তারপর সরু সরু নালীর মাধ্যমে বড় বড় নালীর মধ্য দিয়ে অংসর হয়ে তা পেটের দেয়ালের অভ্যন্তরে কোমরের হাড়ের ঠিক বরাবর একটি নালী (Inguinal Canal) অতিক্রম করে নিকটবর্তী একটি গ্রহিতে প্রবেশ করে। এই গ্রহিতির নাম Prostate. এরপর সেখান থেকে তরল পদার্থ নিয়ে এর নির্গমন হয়। মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মধ্যে এর অংসর হবার ব্যাপারটি আমর বোধগম্য হলো না। অবশ্য এর নির্গমন এমন একটি নার্ত সিস্টেমের মাধ্যমে হয় যা মেরুদণ্ড ও বুকের পাঁজরের মাঝখালে জালের মতো ছড়িয়ে আছে। তাও একটি বিশেষ সীমিত পর্যায়ে। এর নির্গমন ব্যবস্থা আবার মণ্ডিকের মধ্যস্থিত আর একটি গ্রহিত তরল পদার্থের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রয় হচ্ছে এখানে নির্গমনের (যা একটি নারীর মাধ্যমেই হতে পাওয়ে) আমর আবেদন, এর ব্যাখ্যা কি, এটা আপনি বিস্তারিতভাবে লেখেন। আমি আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করলাম এ জন্য যে, আপনি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান চাচ্চায় বিশ্বাস করেন।”

এর জবাবে মাওলানা ১৯৭১ সালের নভেম্বরের তরজুমানুল কুরআন সংখ্যায় পরবর্তী প্যারাটি লেখেন :

৪. অর্থাৎ যেভাবে তিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেন এবং গর্ভ সঞ্চারের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার দেখাশুনা করেন তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে যে, তিনি মৃত্যুর পর আবার তাকে অস্তিত্বশীল করতে পারেন। যদি তিনি প্রথমটির ক্ষমতা রেখে থাকেন এবং তারি বদৌলতে মানুষ দুনিয়ায় জীবন ধারণ করছে, তাহলে তিনি দ্বিতীয়টির ক্ষমতা রাখেন না, এ ধারণা পোষণ করার পেছনে এমন কি শক্তিশালী যুক্তি পেশ করা

যদিও শরীরের বিভিন্ন অংশের কার্যবলী (Functions) আলাদা তবুও কোন' অংশ নিজে এককী কোন কাজ করে না। বরং প্রত্যেকে অনেকের কার্যবলীর সহযোগী (Co-ordination) নিজের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করে। নিসন্দেহে বীর্যের জন্য হয় পুরুষাঙ্গে এবং সেখান থেকে তা বের হয়েও আসে একটা বিশেষ পথ দিয়ে। কিন্তু পাকশ্লী, কলিজা, ফুসফুস, কিডনী, লিভার ও মস্তিষ্ক প্রত্যেকে ব্রহ্মানে নিজের কাজটি না করলে বীর্য জন্মাবার ও নির্গত হবার এ ব্যবস্থাটি কি ব্রতঃচূর্ণভাবে নিজের কাজ করতে সক্ষম? অনুরূপতাবে দৃষ্টান্তবরণ দ্বৰুন, কিডনীতে পেশাব তৈরি হয় এবং একটি নালীর সাহায্যে ঘূর্ণাশে গোছে পেশাব নির্গত হবার পথ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু কিভাবে কোন' কার্যক্রমের ফলে? রক্ত প্রস্তুতকারী ও তাকে সমগ্র দেহে আবত্তি করে কিডনী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবার দায়িত্বে যেসব অঙ্গ নিয়েজিত তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কি কিডনী একাই রক্ত থেকে পেশাবের উপাদানগুলো আলাদা করে সেগুলোকে এক সাথে পেশাবের নালী দিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হবে? তাই কুরআন মজীদে বলা হয়নি যে, এ উপাদানগুলো মেরুদণ্ড ও পাঁজরের হাড় থেকে নির্গত হয় বরং বলা হয়েছে, “এ দু’টোর মধ্যস্থানে শরীরের যে অংশটি রয়েছে সেখান থেকে এ উপাদানগুলো নির্গত হয়।” এতে একথা অবীকার করা হয়নি যে বীর্য তৈরি হবার ও তার নির্গমনের একটি বিশেষ কর্মপ্রণালী (Mechanism) রয়েছে, শরীরের বিশেষ কিছু অংশ এ কাজে নিয়েজিত থাকে। বরং এ থেকে একথা প্রকাশ হয় যে, এ কর্মপ্রণালী ব্রতঃপ্রবৃত্ত নয়। মহান আল্লাহ মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব অঙ্গ সংস্থাপন করেছেন তাদের সমগ্র কর্মের সহায়তায় এ কাজটি সম্পাদিত হয়। এ জন্য আমি আগেই বলেছি যে, সমগ্র শরীর এ কাজে অংশ নেয়ানি। কেননা হাতপা কর্তৃত অবস্থায়ও এ ব্যবস্থাকে কর্মরত দেখা যায়। তবে মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে যেসব বড় বড় অঙ্গ রয়েছে তাদের কোন একটিও যদি না থাকে তাহলে এ কর্মপ্রণালী অচল বলা যেতে পারে।

“ভ্রূগত্ত্বের (Embryology) দৃষ্টিতে এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, বৃন্শের (Foetus) মধ্যে যে অঙ্গকোষে (Testicle) বীর্যের জন্য হয় তা মেরুদণ্ড ও বক্স পাঁজরের মধ্যস্থলে কিডনীর নিকটেই অবস্থান করে এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গে নেমে আসে। এ কার্যধারা সংঘটিত হয় জনের পূর্বে আবার অনেক ক্ষেত্রে তার কিছু পরে। কিন্তু তবুও তার স্বায় ও শিরাগুলোর উপস্থি সবসময় সেখানেই (মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলে) থাকে। বরং পিঠের নিকটবর্তী মহাধমনী (Artery) থেকে শিরাগুলো (Aorta) বের হয় এবং পেটের সমগ্র অংশে সফর করে সেখানে রক্ত সরবরাহ করে। এভাবে দেখা যায় অঙ্গকোষ আসলে পিঠের একটি অংশ। কিন্তু শরীরের অতিরিক্ত উক্ততা সহ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে তাকে পুরুষাঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উপরুু যদিও অঙ্গকোষ বীর্য উৎপাদন করে এবং তা মৌলিক কোষে (Seminal Vesicles) জয়া থাকে তবুও মেরুদণ্ড ও পাঁজরের মধ্যস্থলেই হয় তাকে বের করার ক্ষেত্রীয় সঞ্চালন শক্তি। মস্তিষ্ক থেকে স্বায়ুবিক প্রবাহ এ কেন্দ্রে গোছার পর কেন্দ্রে-সঞ্চালনে (Triger Action) মৌলিক কোষ সংকৃতিত হয়। এর ফলে তরল শুক্র পিচকারীর ন্যায় প্রবল বেগে বের হয়; এ জন্য কুরআনের বক্তব্য চিকিৎসা শাস্ত্রের সর্বাধুনিক গৱীক্ষা- নিরীক্ষা ও অনুসঙ্গান লক্ষ জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যালী।”

মওলানার এই জবাবটি প্রকাপিত হবার পর দু’জন চিকিৎসা বিশেষজ্ঞ দু’টি বিভিন্ন স্থান থেকে মাওলানার বক্তব্য সমর্থন করে যে তথ্য সরবরাহ করেন তা সর্বশেষ প্যারায় সরিবেশিত হয়েছে। -অনুবাদক

يَوْمَ تُبَلَّى السَّرَّائِرُ^١ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ^٢ وَالسَّمَاءُ ذَاتٌ
 لِرَجْعٍ^٣ وَالْأَرْضُ ذَاتٌ الصَّدْعٌ^٤ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ^٥ وَمَا هُوَ
 بِالْمُرْزِلِ^٦ إِنَّمَا يَكْمِلُونَ كَيْلًا^٧ وَأَكْيَلَ كَيْلًا^٨ فَمِيلُ الْكُفَّارِ^٩
 أَمْهَلْمَرْ رَوْبَلَا^{١٠}

যেদিন গোপন রহস্যের যাচাই বাছাই হবে,^৫ সেদিন মানুষের নিজের কোন শক্তি থাকবে না এবং কেউ তার সাহায্যকারীও হবে না। কসম বৃষ্টি বর্ষণকারী আকাশের^৬ এবং (উদ্ভিদ জন্মাবার সময়) ফেটে যাওয়া যমীনের, এটি মাপাজোকা মীমাংসাকারী কথা, হাসি-ঠাট্টা নয়।^৭ এরা কিছু চক্রান্ত করছে^৮ এবং আমিও একটি কৌশল করছি।^৯ কাজেই ছেড়ে দাও, হে নবী! এ কাফেরদেরকে সামান্য কিছু ক্ষণের জন্য এদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও।^{১০}

যেতে পারে? আগ্নেয়হর এই শক্তিকে অশ্঵ীকার করতে হলে আগ্নাহ যে তাকে অস্তিত্বান করেছেন সরাসরি একথাটিই অশ্বীকার করতে হবে। আর যে ব্যক্তি একথা অশ্বীকার করবে তার মন্ত্রিক বিকৃতি একদিন এমন পর্যায়ে পৌছে যাওয়া মোটেই অশ্বাভূতিক ব্যাপার নয় যার ফলে সে দর্বি করে বসবে, এ দুনিয়ায় সমস্ত বইপত্র একদিন ঘটনাক্রমে ছাপা হয়ে গেছে, দুনিয়ার সমস্ত শহর একদিন হঠাৎ ঘটনাক্রমে তৈরি হয়ে গেছে এবং এই দুনিয়ায় হঠাৎ একদিন এমন এক ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে সমস্ত কলকারখানা আপনা আপনি নির্মিত হয়ে তাতে উৎপাদন শুরু হয়ে গেছে। আসলে মানুষ দুনিয়ায় যেসব কাজ করেছে ও করছে তার তুলনায় তার সৃষ্টি ও তার শারীরিক গঠনাকৃতি এবং তার মধ্যে কর্মরত শক্তি যোগ্যতাসম্মূহের সৃষ্টি এবং একটি জীবন্ত সস্তা হিসেবে তার টিকে থাকা অনেক বেশী জটিল কাজ। এত বড় জটিল কাজ যদি এ ধরনের জ্ঞানবস্তা, উন্নত কলাকৌশল, আনুপাতিক ও পর্যায়ক্রমিক কার্যক্রম এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা সহকারে হঠাৎ ঘটনাক্রমে ঘটে যেতে পারে, তাহলে দুনিয়ার আর কোন কাজটি আছে যাকে মন্ত্রিক বিকৃতি রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তি হঠাৎ ঘটে যাওয়া কাজ বলবে না?

৫. গোপন রহস্য বলতে এখানে প্রত্যেক ব্যক্তির এমনসব কাজ বুঝানো হয়েছে যেগুলো রহস্যাবৃত্ত রয়ে গেছে আবার এমন সব কাজও বুঝানো হয়েছে, যেগুলো বাহ্যিক আকৃতিতে জন সমক্ষে এসে গেছে কিন্তু সেগুলোর পেছনে সত্ত্বিয় নিয়ত, উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং সেগুলোর গোপন কার্যকারণ লোক চক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। কিয়ামতের দিন এসব কিছু উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে যাবে। সেদিন কেবলমাত্র কে কি করেছে এর তদন্ত ও হিসেব-নিকেশ হবে না বরং কি কারণে, কি উদ্দেশ্যে, কি নিয়তে ও কোন মানসিকতায় উদ্বৃক্ষ হয়ে এ কাজ করেছিল তারও হিসেব হবে। অনুরূপভাবে এক

৫ " ব্যক্তি যে কাজটি করেছে দুনিয়ায় তার কি প্রভাব পড়েছে, কোথায় কোথায় তার প্রভাব পৌছেছে এবং কতদিন পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থেকেছে—তাও সারা দুনিয়ার চোখ থেকে গোপন থেকেছে, এমনকি যে ব্যক্তি এ কাজটি করেছে তার চোখ থেকেও। আর একটি রহস্যও শুধুমাত্র কিয়ামতের দিনেই উন্মুক্ত হবে এবং সেদিন এর পুরোপুরি তদন্ত শ হিসেব-নিকেশ হবে। সেটি হচ্ছে, এক ব্যক্তি দুনিয়ায় যে বীজ বপন করে গিয়েছিল তার ফসল কতখানি পর্যন্ত কোনু কোনু পদ্ধতিতে সে এবং তার সাথে আর কে কে কাটতে থেকেছে?

৬. আকাশের জন্য ^{بُشِّيٌّ} (বৃষ্টি বর্ষণকারী) বিশেষণটি ব্যবহার করা ইয়েছে। 'বরজুআ' (رَجْعٌ) শব্দের অভিধার্নিক অর্থ হচ্ছে, ফিরে আসা। তবে পরোক্ষভাবে আরবী ভাষায় এ শব্দটি বৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ বৃষ্টি মাত্র একবার বর্ষিত হয়েই খতম হয়ে যায় না বরং একই মণ্ডস্মে বারবার এবং কখনো মণ্ডস্ম ছাড়াই একাধিকবার ফিরে আসে এবং যখন তখন বর্ষিত হয়। বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ হচ্ছে এই যে, পৃথিবীর সম্মুদ্রগুলো থেকে পানি বাস্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাস্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।

৭. অর্থাৎ যেমন আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তার ফলে মাটি চিরে উঞ্চিদের অংকুর গজিয়ে ওঠা কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয় বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিরেট সত্য, ঠিক তেমনি কুরআন মানুষকে আবার তার আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে এই মর্মে যে বিষয়টির খবর দিচ্ছে, সেটিও কোন হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়। বরং সেটি একটি চূড়ান্ত ও শীমাংসাকারী কথা, একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিবর্তনীয় নিরেট সত্য। সেটি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েই ক্ষতি হবে।

৮. অর্থাৎ কাফেরো কুরআনের দাওয়াতকে ব্যর্থ করার জন্য নানা ধরনের অপকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে। তারা ফুঁক দিয়ে এ প্রদীপটি নিভিয়ে দিতে চাচ্ছে। মানুষের মনে সব রকমের সন্দেহের জাল বুনে দিচ্ছে। একের পর এক মিথ্যা দোষারোপ করে যাচ্ছে কুরআনের দাওয়াত পেশকারী নবীর বিরুদ্ধে। এভাবে দুনিয়ায় যাতে তার কথা বিস্তার লাভ করতে না পারে এবং তিনি যে কুফী ও জাহেলিয়াতের আঁধার দূর করতে চান তা যাতে চারদিক আছুর করে রাখে সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯. অর্থাৎ এদের কোন অপকৌশল লাভে কামিয়াব না হয় এবং অবশেষে এরা ব্যর্থ হয়ে যায় আর এই সংগে যে আলোর শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার জন্য এরা সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সেটি যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সে জন্য আমি ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

১০. অর্থাৎ এদেরকে ছেড়ে দাও কিছুক্ষণের জন্য। এরা যাকিছু করতে চায় তা করে দেখুক। বেশী সময় যাবে না, এর ফলাফল এদের সামনে এসে যাবে। তখন আমি যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম তার মোকাবিলায় এদের অপকৌশল কর্তৃকু সাফল্যের মুখ দেখেছে তা এরা বুঝতে পারবে।

আল আ'লা

৮৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত আ'লা শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্ততম। ষষ্ঠ আয়াতে “আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না” এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ত করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশুক্ত করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা তা-হা’র ১১৪ আয়াত ও সূরা কিয়ামাহ’র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে যিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংক্ষিপ্ত আয়াতগুলোর বর্ণনাভূগ্নী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উপ্রোক্ত ঘটনাবলীকে নিপোক্তভাবে সাজানো যায় : সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিচ্যতা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় “হে নবী! এই অহী দ্রুত মুখ্যস্ত করার জন্য নিজের জিহবা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখ্য করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।” শেববার সূরা তা-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতায় কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অশ্ব শৃঙ্খলা থেকে উধাও হয়ে যাবার আশুক্ত করেন, ফলে তিনি সেগুলো শ্বরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয় : “আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌছে না যায়।” এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সা) আর কখনো এ ধরনের আশুক্ত করেননি। কারণ এ তিনটি জ্ঞানগা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইংগিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিনি, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যেই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে শ্রবণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ঝুঁটি, অতাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার খিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভাস্ত আকীদার জন্য হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভাস্তিকর নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, যাহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণাবিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে শ্রবণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তখা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ করার পথ তাকে বাত্তলে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিশ্বাস কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঘরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে : এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাখিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্থ থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে : প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্ত্বের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অঙ্গ পরিণামের তয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগ্য তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে : সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা-বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কল্পতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম শ্রবণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম-আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা-আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, ইয়রত ইবরাহীম (আ) ও ইয়রত মুসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্ত্বের সক্ষান দেয়া হয়েছিল।

আয়াত ১৯

সূরা আল আ'লা-মজী

কৃক্ত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

سَبِّحُوا إِنَّ رَبَّكَ الْأَعْلَىٰ ۚ الَّذِي خَلَقَ فَسَوْىٰ ۝ وَالَّذِي
قَلَّ رَفْهُلِي ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ غُنَاءً أَحَوْيٰ ۝

(হে নবী!) তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।^১ যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কামে করেছেন।^২ যিনি তাকদীর গড়েছেন^৩ তারপর পথ দেখিয়েছেন।^৪ যিনি উদ্বিদ উৎপন্ন করেছেন।^৫ তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।^৬

১. এর শান্তিক অনুবাদ হবে, “তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।” এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহকে এমন নামে ঘৰণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্ত্বার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্ত্বা, শুণবালী বা কার্যবালী সম্পর্কে কোন তুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি। দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু শুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রুফ (পরম মেহশীল), রহীম (পরম করণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদুষ্টী) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবশ্যন করতে হবে। অর্ধাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিনি, পরম শুন্দি, ডক্টি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে, মলম্বুত ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে নিষ্ঠ

থাকে এবং তাঁর নাম উকারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্যুৎ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে। ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো “আল্লাহ তোমাকে দেবেন” একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষেত্রের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষেত্রের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।

হাদীস গ্রহসমূহে হয়রত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে রেওয়ায়াতে উদ্ভৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, **رَسُولُ اللَّهِ سُلَيْمَانُ رَبِّ الْأَعْلَى** সুলায়াহ সুলায়াহ আলাইহি ওয়া সালাম এ আয়াতের তিপ্পিতেই **سَبِّحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى** সুব্হান রবি আলায়া পড়ার হকুম দিয়েছিলেন। আর **رَبُّكُمْ تَعَالَى** তে তিনি **سَبِّحَانَ رَبِّ الْأَعْلَى** সুব্হান রবি আলায়া পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার তিপ্পি ছিল সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াতটি **فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّ الْأَعْلَى** (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিরান, হকেম ইবনুল মুন্যির)

২. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুস্থাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে সূরা আস সাজদায় নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে : **إِنَّ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ** “প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।” এভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের যথোপযোগী ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি হওয়াটাই একথা সুন্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোন এক মহাবিজ্ঞ সৃষ্টি এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কোন আকর্ষিক ঘটনাক্রমে অথবা বহু স্তরের কর্মতৎপরতায় বিশ্ব-জাহানের এই অসংখ্য অংশের সৃষ্টিতে—এ ধরনের সৃষ্টি রূচিশীলতা এবং সামগ্রিকভাবে এদের সবার অংশের সম্মিলনে বিশ্ব-জাহানে এ ধরনের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়।

৩. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে সে খতম হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে “তাকদীর”。 বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি ইষ্টাং উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্তরের সামনে এ জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অন্যায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন,

আল হিজর, ১৩-১৪ টাকা, আল ফুরকান ৮ টাকা, আল ক্ষামার ২৫ টাকা এবং আবাসা ১২ টাকা দেখুন।)

৪. অর্থাৎ কোন জিনিসকে কেবলমাত্র সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সেই কাজ করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। অন্য কথায় তিনি শুধুমাত্র স্টাইল মন, পথপ্রদর্শকও। যে জিনিসটিকে তিনি যে মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন তাকে তার উপযোগী পথনির্দেশনা দেবার এবং তার জন্য শোভনীয় উপায়ে পথ দেখাবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাকে তিনি এক ধরনের পথ দেখিয়েছেন। সে পথে তারা চলছে এবং তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করে যাচ্ছে। আর এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন পানি, বায়ু, আলো, জড়পদার্থ ও খনিজপদার্থকে। সেই অনুযায়ী যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক সেই কাজই তারা করে যাচ্ছে। উদ্বিদকে অন্য এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তারা মাটির অভ্যন্তরে শিকড় বিস্তার করছে ও মাটির বুক চিরে অংকুরিত হচ্ছে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখান থেকে তা আহরণ করছে। কাও ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে, পাতা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য যে কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে তা করে যাচ্ছে। এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন স্থলভাগ, জলভাগ ও শৈল্যে উড়ড়য়নশীল অসংখ্য প্রজাতির এবং তাদের প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য। প্রাণীদের জীবন যাপন এবং তাদের কার্যকলাপে এর বিশ্যবকর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি একজন নাস্তিকও অবশ্যে একথা মানতে বাধ্য হয় যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরা এমন কিছু নেসগিক জ্ঞানের অধিকারী হয় যা মানুষ তার ইন্স্রিয় তো দূরের কথা নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যেও অর্জন করতে পারে না। তারপর মানুষের জন্য রয়েছে আবার দু'টি আলাদা ধরনের পথনির্দেশনা। তার মধ্যে যে দুই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক ধরনের পথনির্দেশনার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের জৈবিক জীবনের সাথে। এরি বদলোভে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই দুধ পান করা শিখে নেয়। এরি মাধ্যমে মানুষের চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত, . স্নায়, শিরা-উপশিরা সবকিছু যার যার কাজ করে যাচ্ছে। এ. ব্যাপারে মানুষ সচেতন থাক বা নাই থাক তাতে কিছু আসে যায় না। তারি ইচ্ছা-অনিষ্টার সাথে এই অংগ-প্রত্যঙ্গগুলোর কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এ পথনির্দেশনার আওতাধীনেই মানুষের মধ্যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যাবস্থায় এমন সব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে যা কোথাও এবং কোন ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছা, সংকল্প, আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন কি তার চেতনা শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। দ্বিতীয় পথনির্দেশনাটির সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের বৃক্ষ ও চেতনাগত জগতের সাথে। চেতনাহীন জগতের পথনির্দেশনা থেকে এর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক ধরনের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। যার ফলে যে ধরনের পথনির্দেশনা স্বাধীন কর্মক্ষমতাবিহীন জীবনের উপযোগী তা এ বিভাগের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনাটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য মানুষ যতই চেষ্টা করুক এবং যতই যুক্তি-তর্কের আধ্যয় নিক না কেন, যে স্ফোট এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানে প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা

سَنْقِرُكَ فَلَا تَنْسِي ۝ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا
يُخْفِي ۝ وَنِسِرُكَ لِلْيُسْرَى ۝ فَلَذِكْرٍ إِنْ نَفَعَتِ الْتِكْرِي ۝
سَيْلَ كَرْمَنْ يَخْشِي ۝ وَيَتَجَنِّبُهَا الْأَشْقَى ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ
الْكَبْرِي ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيِي ۝

আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।^১ তবে আ঳াই যা চান তা ছাড়া,^২ তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যা কিছু গোপন আছে তাও।^৩

আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারী হয়^৪ যে তয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।^৫ আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগ্য, যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।^৬

অনুযায়ী পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় স্বাধীনতাবে সব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারের সঠিক ও ভাস্ত পদ্ধতি কি হতে পারে তা তাকে জানিয়ে দেননি, একথা অবশ্য মেনে নেবার কোন কারণ নেই। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল ৯, ১০, ১৪ ও ৫৬ টাকা, ত্বা-হা ২৩ টাকা, আর রহমান ২ ও ৩ টাকা এবং আদ দাহৰ ৫ টাকা)।

৫. মূলে মারআ (مرعى) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভূক্ত প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ধিদজ্ঞাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ধিদের কথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি কেবল বস্তুকালের আগমন ঘটান না, শীতেরও আগমন ঘটান। তোমাদের চোখ তাঁর উভয় প্রকার ক্ষমতার প্রকাশই দেখছে। একদিকে তিনি সবুজ শ্যামল বৃক্ষলতায় ভরে দেন। তাদের তরুতাজা শ্যামল শোভা দেখে যন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার অন্যদিকে এ বৃক্ষলতাকে তিনি শুক শ্রীহীন করে কালো জঙ্গলে পরিণত করেন। এগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় এবং বন্যার স্নোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তাই এই দুনিয়ায় কোন ব্যক্তির এই ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, সে এখানে কেবল বস্তুকালই দেখবে, শীতের সাথে তার সাক্ষাতই হবে না। এই একই বক্তব্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় অন্যতাবে উপস্থিতি হয়েছে। যেমন দেখুন সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত, সূরা কাহাফ ৪৫ আয়াত এবং সূরা হাদীদ ২০ আয়াত।

৭. হাকেম হ্যরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা) থেকে এবং ইবনে মারদুইয়া হ্যরত আবদুর্রাহ ইবনে আবাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ

ସାଧ୍ୟାହୀନ ଆଗ୍ରାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଭୁଲେ ଯାବାର ଭୟ କୁରାନେର ଶଦ୍ଦଗୁଲୋର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରତେ ଥାକତେନ : ମୁଜାହିଦ ଓ କାଲୀବି ବଲେନ, ଜିବ୍ରିଲ ଅହି ଶୁଣିଯେ ଶେଷ କରାର ଆଗେଇ ଭୁଲେ ଯାବାର ଆଶଙ୍କାୟ ରମ୍ଭୁଗ୍ରାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଗ୍ରାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ଗୋଡ଼ାର ଦିକ ଥେକେ ଆବାର ପଡ଼ତେ ଶୁରୁ କରତେନ । ଏ କାରଣେ ଆଗ୍ରାହ ତାକେ ନିଚ୍ଚଯତା ଦିଯେ ବଲେନ, ଅହି ନାଖିଲେର ସମୟ ତୁମି ନିରବେ ଶୁଣତେ ଥାକୋ : ଆମି ତୋମାକେ ତା ଏମନଭାବେ ପଡ଼ିଯେ ଦେବୋ ଯାର ଫଳେ ଚିରକାଳେର ଜଳ୍ଯ ତୋମାର ମୁଖସ୍ଥ ହେଁ ଯାବେ । ଏର କୋନ ଏକଟି ଶଦ ତୁମି ଭୁଲେ ଯାବେ, ଏ ତୟ କରୋ ନା । ଏ ନିଯେ ତୃତୀୟବାର ରମ୍ଭୁଗ୍ରାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଗ୍ରାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମକେ ଅହି ଆଯତ୍ତ କରାର ପଞ୍ଚାତି ଶେଖାନୋ ହୟ । ଏର ଆଗେ ଆରୋ ଦ୍ଵୀରାର ସ୍ତ୍ରୀ 'ତ୍ରା-ହ'ର ୧୧୪ ଆଯାତେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ 'କିଯାମାହ'ର ୧୬-୧୯ ଆଯାତେ ଏର ଆଲୋଚନା ଏମେହେ । ଏଇ ଆଯାତ ଥେକେ ଏକଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୟ, କୁରାନାନ ଯେମନ ମୁ'ଜିଯା ହିମେବେ ନବୀ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଲ୍‌ଆଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମେର ଉପର ନାଖିଲ କରା ହେଁଛି ଠିକ ତେମନି ମୁ'ଜିଯା ହିମେବେଇ ତାର ପ୍ରତିଟି ଶଦ ତାଁର ଶୃତିତେ ସଂରକ୍ଷିତ କରେ ଦେଯା ହେଁଛି । ଏର କୋନ ଏକଟି ଶଦ ତିନି ଭୁଲେ ଯାବେନ ଅଥବା ଏକଟି ଶଦେର ଜାୟଗାୟ ତାର ସମାର୍ଥକ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ଶଦ ତାଁର ମୁବାରକ କର୍ତ୍ତ ଥେକେ ଉତ୍କାରିତ ହେଁ, ଏ ଧରନେର ସକଳ ସଭାବନାର ପଥିଇ ବକ୍ତ କରେ ଦେଯା ହେଁଛି ।

୮. ଏଇ ବାକ୍ୟଟିର ଦୁ'ଟି ଅର୍ଥ ହତେ ପାରେ । ଏକ, ସମ୍ମ କୁରାନେର ପ୍ରତିଟି ଶଦ ତୋମାର ଶୃତିତେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୟେ ଯାଓୟାର ପେହନେ ତୋମାର ନିଜେର ଶକ୍ତିର କୋନ କୃତିତ୍ତ ନେଇ : ବରଂ ଏଟି ଅପ୍ରାହର ମେହେବାନୀ ଏବଂ ତାଁର ତାଓଫିକେର ଫଳ । ନୟତେ ଆଗ୍ରାହ ଚାଇଲେ ଏଗୁଲୋ ତୋମାର ଶୃତି ଥେକେ ଉଧାଓ କରେ ଦିତେ ପାରେନ । ଏ ବକ୍ୟଟି କୁରାନେର ଅନ୍ୟତ୍ର ନିମୋକ୍ତଭାବେ ବଦା ହେଁଛେ : **وَلِنْ شُئْنَا لَنَذْمَبِنْ بِالذِّي أَوْجَبَنَا الْبُكْرَى** "ଆମି ଚାଇଲେ ଅହିର ମାଧ୍ୟମେ ତୋମାକେ ଯା କିଛି ଦିଲେଛି ସବ ଛିନିଯେ ନିତେ ପାରି ।" (ବନି ଇସରାଇଲ ୮୬) ଦୁ'ଇ, କଥନେ ସାମୟିକଭାବେ ତୋମାର ଭୁଲେ ଯାଓୟା ଏବଂ କୋନ ଆଯାତ ବା ଶଦ ତୋମାର କୋନ ସମୟ ଭୁଲେ ଯାଓୟା ଏହି ଓୟାଦାର ବ୍ୟକ୍ତିକ୍ରମ ଯେ ବ୍ୟାପାରେ ଓୟାଦା କରା ହେଁଛେ ତା ହେଁଛେ ଏଇ ଯେ, ତୁମି ହ୍ରାୟିଭାବେ କୁରାନେର କୋନ ଶଦ ଭୁଲେ ଯାବେ ନା । ସହି ବୁଖାରୀର ନିମୋକ୍ତ ହାଦୀସଟିକେ ଏ ଅର୍ଥେର ସମର୍ଥନେ ପେଶ କରା ଯେତେ ପାରେ : ଏକବାର ଫଣରେ ନାମାଯେ ରମ୍ଭୁଗ୍ରାହ ସାନ୍ତ୍ରାମାହ ଆଗ୍ରାଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ାର ସମୟ ମାବଧାନେ ଏକଟି ଆଯାତ ବାଦ ଦିଯେ ଯାନ । ନାମାଯେର ପର ହୟରତ ଉବାଇ ଇବନେ କା'ବ (ରା) ଏ ଆଯାତଟି ମାନ୍ସ୍ୟ (ରହିତ) ହେଁଛେ କିନ୍ତୁ ଜିଞ୍ଜେସ କରେନ । ଜବାବେ ରମ୍ଭୁଗ୍ରାହ (ସା) ବଲେନ, ଆମି ଭୁଲେ ଗିଯେଛିଲାମ ।

୯. ଏମନିତେ ଏ ଶଦଗୁଲୋ ସାଧାରଣଭାବେ ବ୍ୟବହର୍ତ୍ତ ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ଆଗ୍ରାହ ଗୋପନ ଓ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସବକିଛୁଇ ଜାନେନ । କିନ୍ତୁ ଯେ ବକ୍ୟବ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନେ ଏକଥାଗୁଲୋ ଏଥାନେ ବଲା ହେଁଛେ ତା ସାମନେ ରାଖିଲେ ଏର ଯା ଅର୍ଥ ଦୌଡ଼ାଯା ତା ହେଁଛେ : ତୁମି ଜୀବ୍ରିଲେର (ଆ) ସାଥେ ସାଥେ ଯେ କୁରାନ ପଡ଼େ ଚଢେହୋ । ତା ଆଗ୍ରାହ ଜାନେନ ଏବଂ ଭୁଲେ ଯାବାର ଭୟ ଯେ ଏମନଟି କରହୋ ତାଓ ଆଗ୍ରାହ ଜାନେନ । ତାଇ ତାକେ ନିଚ୍ଚଯତା ଦାନ କରେ ବଲା ହେଁଛେ, ତୋମାର ଭୁଲେ ଯାବାର କୋନ ସଭାବନା ନେଇ ।

୧୦. ସାଧାରଣଭାବେ ମୁଫାସ୍‌ସିରଗଣ ଏ ଦୁ'ଟି ବାକ୍ୟକେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଅର୍ଥେ ଗର୍ହଣ କରେଛେ । ତାରା ଥରମ ବାକ୍ୟେର ଅର୍ଥ କରେଛେ, ଆମି ତୋମାଦେରକେ ଏକଟି ସହଜ ଶରୀଯାତ ଦିନ୍ଦିନ । ଏ ଶରୀଯାତ ଅନୁଯାୟୀ କାଜ କରା ସହଜ । ଆର ଦିତୀୟ ବାକ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ କରେଛେ, ଉପଦେଶ ଦାଓ, ଯଦି ତା କାଜେ ଲାଗେ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ମତେ "ଫାୟାକ୍‌କିର" (ଫାକ୍‌ର୍) ଶଦଟି ଉତ୍ୟ ବାକ୍ୟକେ

قَدْ أَفْلَمَ مِنْ تَرْزُكِيٍّ وَذَكْرَ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلِّيٌّ^{১৪} بِلْ تُؤْتِرُونَ الْحَيَاةَ
الْأَنْتِيَّا^{১৫} وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ^{১৬} إِنَّ هَذَا لِفِي الصُّحْفِ
الْأَوَّلِ^{১৭} صَحْفٌ إِبْرَاهِيمٌ وَمُوسَىٰ^{১৮}

১৯

সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে^{১৩} এবং নিজের রবের নাম শরণ করেছে^{১৪} তারপর নামায পড়েছে^{১৫} কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো^{১৬} অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী^{১৭} পূর্বে অবজীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল, ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।^{১৮}

পরম্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং শেষের বাক্যটির বিষয়বস্তু প্রথম বাক্যটির বিষয়বস্তু ও পরই সংশ্লিষ্ট হয়েছে। তাই আল্লাহর এই বাক্যটির অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে : হে নবী। দীন প্রচারের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন সংকটের মুখোমুখি করতে চাই না। যার ধ্বণশক্তি নেই তাকে শুনাতে হবে এবং যার দৃষ্টিশক্তি নেই তাকে দেখাতে হবে, এ ধরনের সংকটে তোমাকে ফেলতে চাই না। বরং তোমার জন্য একটি সহজ পথ তৈরি করে দিছি। সে পথটি হচ্ছে, যেখানে তুমি অনুভব করো কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত সেখানে উপদেশ দিতে থাকো। এখন কে উপদেশ থেকে উপকৃত হতে এবং কে উপকৃত না হতে চায়, তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সাধারণ প্রচারের মাধ্যমেই। কাজেই সাধারণ প্রচার জারী রাখতে হবে। কিন্তু সেখানে তোমাদের উদ্দেশ্য হবে এমনসব লোকদের খুঁজে বের করা যাবা এর সাহায্যে উপকৃত হয়ে সত্য-সরল পথ অবলম্বন করবে। এসব লোকই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার রাখে এবং এদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এদেরকে বাদ দিয়ে এমনসব লোকের পেছনে পড়ার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা জানতে পেরেছো যে, তার উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তুই সূরা আবাসায অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে : “যে ব্যক্তি বেগরোয়া তার দেখায় তার প্রতি তুমি দৃষ্টি দিচ্ছো। অথচ সে সংশোধিত না হলে তোমার ওপর তার কী দায়িত্ব বর্তায়? আর যে ব্যক্তি নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে দৌড়িরত রয়েছে, তার প্রতি তুমি অনাশঙ্ক দেখাচ্ছো। এতো একটি উপদেশ, যে চায় এটা গ্রহণ করতে পারে।” (৫-১২ আয়াত)।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ডয় এবং খারাপ পরিণতির আশংকা থাকবে সেই ভাবতে থাকবে যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে কি-না এবং সেই ব্যক্তিই হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য এবং সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথের সন্ধান দানকারীর উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে।

১২. অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আয়াব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বীচার মতো বাঁচবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদণ্ড পাবে না। যারা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের উপদেশ আদৌ গ্রহণ করেনি এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরী, শিরক বা নাস্তিকতাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাই এ শাস্তি লাভ করবে। আর যারা মনের অভ্যন্তরে ঈমানকে পোষণ করে কিন্তু নিজেদের খারাপ কাজের দরুণ জাহানামে নিষ্কিঞ্চ হবে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের শাস্তি ভোগ করার পর আগ্নাহ তাদের মৃত্যু দান করবেন। তারপর তাদের পক্ষে শাফা'আত কবুল করা হবে। তাদের অগ্নিদঞ্চ লাশ এমন জাহানের ঝরণার কিনারে ফেলে দেয়া হবে। জাহানাতবাসীদের বলা হবে, ওদের ওপর পানি ঢালো। বৃষ্টির পানি পেয়ে যেমন মৃত উট্টিদ জীবত্ব হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি জাহানের পানি পেয়ে তারাও জেগে উঠবে। এ সম্পর্কিত হাদীস মুসলিমে হ্যরত আবু সাউদ খুদুরী (রা) থেকে এবং বায়ুরে হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. পবিত্রতা অর্থ কুফর ও শিরক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎআচার-আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। সফলতা বলতে পার্থিব সমৃদ্ধি বুঝানো হয়নি বরং আসল ও সত্ত্বিকার সফলতার কথা বুঝানো হয়েছে। এর সাথে পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জিত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ২৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১, ১১, ৫০ টীকা এবং সূরা লুকমান ৪ টীকা।)

১৪. 'শ্রবণ করা' বলতে আগ্নাহকে মনে মনে শ্রবণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুণ্নাহ বা আগ্নাহকে শ্রবণ করার অন্তরভুক্ত হবে।

১৫. অর্থাৎ কেবল শ্রবণ করেই ক্ষতি হয়নি বরং নিয়মিত নামাযও পড়ে সে প্রমাণ করেছে যে, যে আগ্নাহকে সে নিজের ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে কার্যত তাঁর আনুগত্য করতেও সে প্রস্তুত এবং তাঁকে সর্বক্ষণ শ্রবণ করার জন্য সে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এই আয়াতে পর্যায়ক্রমে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আগ্নাহকে শ্রবণ করা তারপর নামায পড়া। এ অনুযায়ী 'আগ্নাহ আকবার' বলে নামায শুনুন করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে পদ্ধতির প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই যে কুরআনের ইশারা-ইংগিত থেকে গৃহীত, এটি তার অসংখ্য প্রমাণের অন্যতম। কিন্তু আগ্নাহের রসূল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ইংগিতগুলো জমা করে নামাযকে এ আকারে সাজানো কোনোক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

১৬. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার আরাম-আয়েশ এবং তার স্বার্থ ও আনন্দ স্বাদ লাভ করার জন্যই তোমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গিত। তোমরা মনে করে থাকো, এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নীট লাভ এবং এখানে যা থেকে বেঞ্চিত হও তাই তোমাদের জন্য আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে অনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধৰ্মসমীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

১৮. এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হ্যরত ইবরাহীম (আ) ও হ্যরত মুসা (আ)-এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আল নাজ্মের তৃতীয় রূক্ত'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।

আল গাশিয়াহ

৮৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের **الْفَاتِحَةُ** শব্দকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির সমগ্র বিষয়বস্তু একথা প্রমাণ করে যে এটিও প্রথম দিকে অবর্তীণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণের মধ্যে বাপকভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করেন এবং মক্কার লোকেরা তাঁর দাওয়াত শুনে তাঁর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করতে থাকে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য একথাটি অবশ্যি সামনে রাখতে হবে যে, ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রধানত দু'টি কথা লোকদেরকে বুঝাবার মধ্যেই তাঁর দাওয়াত সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি তাওহীদ ও দ্বিতীয়টি আখেরাত। আর মক্কাবাসীরা এই দু'টি কথা মেলে নিতে অঙ্গীকার করতে থাকে। এই পটভূমিটুকু অনুধাবন করার পর এবার এই সূরাটির বিষয়বস্তু ও বর্ণনা পদ্ধতি সম্পর্কে চিহ্ন-ভাবনা করুন।

এখানে সবার আগে গাফলতির জীবনে আকর্ষ ডুবে থাকা লোকদেরকে চমকে দেবার জন্য হঠাত তাদের সামনে প্রশ্ন রাখা হয়েছে : তোমরা কি সে সময়ের কোন খবর রাখো যখন সারা দুনিয়ার ওপর ছেয়ে যাবার মতো একটি বিপদ অবর্তীণ হবে? এরপর সাথে সাথেই এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া শুরু হয়েছে। বলা হয়েছে, সে সময় সমস্ত মানুষ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন পরিগামের সম্মুখীন হবে। একদল জাহানামে যাবে। তাদের উমুক উমুক ধরনের ভয়াবহ ও কঠিন আয়াবের সম্মুখীন হতে হবে। দ্বিতীয় দলটি উন্নত ও উচ্চ মর্যাদার জানাতে যাবে। তাদেরকে উমুক উমুক ধরনের নিয়ামত দান করা হবে।

এভাবে লোকদেরকে চমকে দেবার পর হঠাত বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়ে যায়। প্রথ করা হয়, যারা কুরআনের তাওহীদী শিক্ষা ও আখেরাতের খবর শুনে নাক সিটকায় তারা কি নিজেদের চোখের সামনে প্রতি মৃহূতে যেসব ঘটনা ঘটে যাছে সেগুলো দেখে না? আরবের দিগন্ত বিস্তৃত সাহারায় যেসব উটোর ওপর তাদের সমগ্র জীবন যাপন প্রণালী নির্ভরশীল তারা কিভাবে ঠিক মরু জীবনের উপযোগী বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পর্ক পেতে হিসেবে গড়ে

উঠেছে, একথা কি তারা একটুও চিন্তা করে না? পথে সফর করার সময় তারা আকাশ, পাহাড় বা বিশাল বিস্তৃত পৃথিবী দেখে। এই তিনটি জিনিস সম্পর্কেই তারা চিন্তা করে না কেন? মাথার ওপরে এই আকাশটি কেমন করে ছেয়ে গেলো? সামনে ওই পাহাড় খাড়া হলো কেমন করে? পায়ের নাচে এই যমীন কিভাবে বিছানো হলো? এসব কিছুই কি একজন মহাবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান কারিগরী তৎপরতা ছাড়াই হয়ে গেছে? যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, একজন সৃষ্টিকর্তা বিপুল শক্তি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই জিনিসগুলো তৈরি করেছেন এবং দ্বিতীয় আর কেউ তাঁর এই সৃষ্টি কর্মে শরীক নেই তাহলে তাঁকেই একক রব হিসেবে মেনে নিতে তাদের আপত্তি কেন? আর যদি তারা একথা মেনে নিয়ে থাকে যে সেই আল্লাহর এসব কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল, তাহলে সেই আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত করার ক্ষমতাও রাখেন, মানুষদের পুনর্বার সৃষ্টি করার ক্ষমতাও রাখেন এবং জাগাত ও জাহানাম বানাবার ক্ষমতাও রাখেন—এসব কথা কোন যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে মানতে ইতস্তত করছে?

এ সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে বক্তব্য বুঝানো হয়েছে। এরপর কাফেরদের দিক থেকে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরোধন করা হয়েছে। তাঁকে বলা হয়েছে, এরা না মানতে চাইলে না মানুক, তোমাকে তো এদের ওপর বল প্রয়োগকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়নি। তুমি জোর করে এদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে পারো না। তোমার কাজ উপদেশ দেয়া। কাজেই তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। সবশেষে তাদের অবশ্য আমার কাছেই আসতে হবে। সে সময় আমি তাদের কাছ থেকে পুরো হিসেব নিয়ে নেব। যারা মানেনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবো।

আয়াত ২৬

সূরা আল গাশিয়া-মক্কী

কর্তৃ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করশাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

هَلْ أَتَكُ حَلِيثُ الْفَاسِيَةِ ① وَجْوَاهِيْرِ مَيْلٍ خَائِشَةِ ② عَامِلَةِ
 نَاصِبَةِ ③ تَصْلِي نَارَ حَامِيَةِ ④ تَسْقِي مِنْ عَيْنٍ أَنِيَةِ ⑤ لَيْسَ لَهُ
 طَعَاءً إِلَّا مِنْ ضَرِيعَةِ ⑥ لَا يَسْمِنُ وَلَا يَغْنِي مِنْ جَوْعِ ⑦ وَجْوَاهِيْرِ
 يَوْمَئِنْ نَاعِمَةِ ⑧ لِسْعِيْمَارَاضِيَةِ ⑨ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ⑩ لَا تَسْمَعُ فِيهَا
 لَاغِيَةَ ⑪ فِيمَا عَيْنَ جَارِيَةَ ⑫ فِيمَا سَرَرَ مَرْفُوعَةَ ⑬ وَأَكْوَابَ
 مَوْضُوعَةَ ⑭ وَنِمَارَقَ مَصْفُوفَةَ ⑮ وَزَرَابِيَ مَبْثُونَةَ ⑯

তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী বিপদের খবর এসে পৌছেছে কি? ^১ কিছু চেহারা^২ সেদিন হবে ভীতি কাতর, কঠোর পরিশয় রত, ঝালত-পরিশালত। ঝালত আগুনে ঘলসে যেতে থাকবে। ফুট্ট ঝরণার পানি তাদেরকে দেয়া হবে পান করার জন্য। তাদের জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না।^৩ তা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধাও মেটাবে না। কিছু চেহারা সেদিন আলোকোজ্জ্বল হবে। নিজেদের কর্ম সাফল্যে আনন্দিত হবে।^৪ উচ্চ মর্যাদার জানাতে অবস্থান করবে। সেখানে কোন বাজে কথা শুনবে না।^৫ সেখানে থাকবে বহমান ঝরণাধারা। সেখানে উচু আসন থাকবে, পানপাত্রসমূহ থাকবে।^৬ সারি সারি বালিশ সাজানো থাকবে এবং উৎকৃষ্ট বিছানা পাতা থাকবে।

১. এর অর্থ হচ্ছে কিয়ামত। অর্থাৎ যে বিপদটা সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এ প্রসংগে একটি কথা অবশ্য সামনে রাখতে হবে। এখানে সামগ্রিকভাবে আখেরাতের কথা বলা হচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থাপনা ভেঙ্গে পড়ার সূচনা থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষের আবার জীবিত হয়ে উঠা এবং আল্লাহর দরবারে শান্তি ও পুরুষার লাভ করা পর্যন্ত সফর পর্যায়টি এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

أَفَلَا يَنْظَرُونَ إِلَى الْأَبْلِيلِ كَيْفَ خَلَقْتَهُ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رَفَعْتَهُ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نَصَبَتْهُ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سَطَحَتْهُ فَلَمْ يَكُنْ إِنَّمَا أَنْتَ مَنْ كَرِّرَ لَسْتَ عَلَيْهِ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّ وَكَفَرَ فَيَعْنَى بِهِ اللَّهُ الْعَزَّابُ الْأَكْبَرُ إِنَّ إِلَيْنَا يَأْتِيْ إِبَاهِمُ ۝ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُ ۝

(এরা মানছে না) তাহলে কি এরা উটগুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে? আকাশ দেখছে না, কিভাবে তাকে উঠানো হয়েছে? পাহাড়গুলো দেখছে না, কিভাবে তাদেরকে শক্তভাবে বসানো হয়েছে? আর যদীনকে দেখছে না, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে?^১

বেশ (হে নবী!) তাহলে তুমি উপদেশ দিয়ে যেতে থাকো। তুমি তো শুধুমাত্র একজন উপদেশক, এদের ওপর বল প্রয়োগকারী নও।^২ তবে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অঙ্গীকার করবে, আল্লাহ তাকে মহাশান্তি দান করবেন। অবশ্য এদের আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তারপর এদের হিসেব নেয়া হবে আমারই দায়িত্ব।

২. চেহারা শব্দটি এখানে ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মানুষের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সবচেয়ে সুস্পষ্ট অংশ হচ্ছে তার চেহারা। এর মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ফুটে ওঠে। মানুষ ভালো-মন্দ যে অবস্থারই সম্মুখীন হয়, তার প্রকাশ ঘটে তার চেহারায়। তাই “কিছু লোক” না বলে “কিছু চেহারা” বলা হয়েছে।

৩. কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়েছে, জাহানামের অধিবাসীদের খাবার জন্য “শ্যাহুমুম” দেয়া হবে। কোথাও বলা হয়েছে, “গিসলীন” (ক্ষেত্রস্থান থেকে বরে পড়া তরল পদার্থ) ছাড়া তাদের আর কোন খাবার থাকবে না। আর এখানে বলা হচ্ছে, তারা খাবার জন্য কাঁটাওয়ালা শুকনো ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। এ বর্ণনাগুলোর মধ্যে মূলত কোন বৈপর্যাত্তি নেই। এর অর্থ এও হতে পারে যে, জাহানামের অনেকগুলো পর্যায় থাকবে। বিভিন্ন অপরাধীকে তাদের অপরাধ অনুযায়ী সেই সব পর্যায়ে রাখা হবে। তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের আবাব দেয়া হবে। আবাব এর অর্থ এও হতে পারে যে, তারা “শ্যাহুমুম” থেকে না চাইলে “গিসলীন” পাবে এবং তা থেকে অঙ্গীকার করলে কাঁটাওয়ালা ঘাস ছাড়া আর কিছুই পাবে না। মোটকথা, তারা কোন মনের মতো খাবার পাবে না।

৪. অর্থাৎ দুনিয়ায় তারা যেসব প্রচেষ্টা চালিয়ে ও কাজ করে এসেছে আখেরাতে তার চমৎকার ফল দেখে তারা আনন্দিত হবে। তারা এ ব্যাপারে নিষিদ্ধ হয়ে যাবে যে, দুনিয়ায় ইমান, সততা ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে তারা নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার যে কুরবানী দিয়েছে, দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে যে কষ্ট বীকার করেছে, আঢ়াহর বিধানের আনুগত্য করতে গিয়ে যেসব জুলুম নিপীড়নের শিকার হয়েছে, গোনাহ থেকে বীচতে গিয়ে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব স্বার্থ ও স্বাদ আশাদন থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছে তা সবই আসলে বড়ই লাভজনক কারবার ছিল।

৫. এটিকেই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জান্মাতের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মারয়াম ৩৮-টীকা, আত্তুর ১৮ টীকা, আল উয়াক্রিয়াহ ১৩ টীকা এবং আল নিসা ২১ টীকা)

৬. তাদের সামনে সবসময় পানপাত্র ভরা থাকবে। চেয়ে বা ডাক দিয়ে আনিয়ে নেবার প্রয়োজন হবে না।

৭. অর্থাৎ আখেরাতের কথা শুনে এরা যদি বলে, এসব কিছু কেমন করে হতে পারে, তাহলে নিজেদের চারপাশের জগতের প্রতি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে এরা কি কখনো চিন্তা করেনি, এই উট কেমন করে সৃষ্টি হলো? আকাশ কেমন করে বৃলন্দ হলো? পাহাড় কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হলো? এই পৃথিবী কেমন করে বিস্তৃত হলো? এসব জিনিস যদি তৈরি হতে পারে এবং তৈরি হয়ে এদের সামনে বর্তমান থাকতে পারে, তাহলে কিয়ামত কেন আসতে পারবে না? আখেরাতে আর একটা নতুন জগত তৈরি হতে পারবে না কেন? জান্মাত ও জাহানাম হতে পারবে না কেন? দুনিয়ায় চোখ মেলেই যেসব জিনিস দেখা যায় সেগুলো সম্পর্কে যে ব্যক্তি মনে করে যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ তো সম্ভবপর। কারণ সেগুলো অস্তিত্ব লাভ করেছে কিন্তু যেসব জিনিস এখনো তার দৃষ্টিতে পড়েনি এবং সেগুলো সম্পর্কে এখনো সে কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি, সেগুলো সম্পর্কে যদি সে এক কথায় বলে দেয় যে, সেগুলোর অস্তিত্ব লাভ সম্ভব নয়, তাহলে তাকে বৃক্ষ-বিবেকহীন ও চিন্তাশক্তি বিবর্জিত ব্যক্তিই মনে করা হবে। তার মন্ত্রকে যদি একটুও বৃদ্ধি থাকে তাহলে তার অবশ্য চিন্তা করা উচিত যে, যা কিছু বর্তমান আছে এবং অস্তিত্ব লাভ করেছে সেগুলোইবা কেমন করে অস্তিত্ব লাভ করলো? আরবের মুসলিম এলাকার অধিবাসীদের জন্য যে ধরনের বৈশিষ্ট ও গুণাবলীসম্পর্ক প্রাণীর প্রয়োজন এই উটগুলো কেমন করে সেসব বৈশিষ্ট ও গুণাবলী সম্পর্ক হলো? এই আকাশ কেমন করে তৈরি হলো, যার শূন্য পেট শাস নেবার জন্য বাতাসে ভরা? যার মেঘমালা বৃষ্টিবর্ণ করে আনে? যার সূর্য দিনে আলো ও তাপ দেয়? যার চৌদ ও তারা রাতের আকাশে আলো ছড়ায়? পৃথিবীর এই বিশীর্ণ ক্ষেত্র, যেখানে মানুষ বসবাস করে, যেখানে উৎপাদিত শস্য ও ফলমূল তার খাদ্য প্রয়োজন পূর্ণ করে, যার নদী ও কৃপের পানির উপর তার জীবন নির্ভরশীল তাকে কিভাবে বিছানার মতো ছড়িয়ে দেয়া হলো? রং বে-রঙের মাটি ও পাথর এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়ে এ পাহাড়গুলো পৃথিবীর বৃক্ষে কিভাবে গঁজিয়ে উঠেছে? এসব কিছুই কি একজন মহাশক্তিশালী ও বিজ্ঞ সুষ্ঠার সৃষ্টি কৌশল ছাড়া এমনিই তৈরি হয়ে গেছে? কোন চিন্তাশীল বিবেকবান ব্যক্তি এই প্রশ্নের নেতৃত্বাচক জবাব দিতে পারেন না। তিনি যদি জেনী ও হঠধর্মী না হয়ে থাকেন, তাহলে তাকে অবশ্য

মানতে হবে, কোন মহাশক্তির ও মহাবিজ্ঞ সত্তা এগুলোকে সম্ভবপর না করলে এগুলোর প্রত্যেকটি অসম্ভব হিল। আর একজন সর্বশক্তিমানের শক্তির জোরে যদি দুনিয়ার এসব জিনিস তৈরি হওয়া সম্ভবপর হয়ে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে যে জিনিসগুলোর অস্তিত্ব লাভের খবর দেয়া হচ্ছে সেগুলোকে অসম্ভব মনে করার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই।

৮. অর্থাৎ ন্যায়সংগত যুক্তি মানতে যদি কোন যুক্তি প্রস্তুত না হয়, তাহলে মানা না মানা তার ইচ্ছা। তবে তোমাকে এই দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়নি যে, যে যুক্তি মানতে প্রস্তুত নয় তাকে জবরদস্তি মানাতে হবে। তোমার কাজও কেবল এতটুকু : লোকদেরকে ডুল ও সঠিক এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য জানিয়ে দাও। তাদেরকে ডুল পথে চলার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করো। কাজেই এ দায়িত্ব ভূমি পালন করে যেতে থাকো।

আল ফজ্র

৮৯

নামকরণ

প্রথম শব্দ **وَالْفَجْرِ** কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

এই সূরার বিষয়বস্তু থেকে জানা যায়, এটি এমন এক যুগে নাযিল হয় যখন মক্কা মুয়ায়হায় ইসলাম প্রচারকারীদের ওপর ব্যাপকভাবে নিপীড়ন নির্যাতন চলছিল। তাই মক্কাবাসীদেরকে আদ, সামুদ ও ফেরাউনের পরিণাম দেখিয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও শুল্ক বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাতের শাস্তি ও পুরুষারের সত্যতা প্রমাণ করা। কারণ মক্কাবাসীরা একথা অঙ্গীকার করে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে ধারাবাহিক পর্যায়ে যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সে ধারাবাহিকতা সহকারে এ বিষয়টি গর্বালোচনা করতে হবে।

প্রথমে ফজ্র, দশটি রাত, জোড় ও বেজোড় এবং বিদায়ী রাতের কসম থেমে শোতাদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যে বিষয়টি তোমরা অঙ্গীকার করছো তার সত্যতার সাক্ষ দেবার জন্য কি এই জিনিসগুলো যথেষ্ট নয়? সামনের দিকে টীকায় আমি এ চারটি জিনিসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তা থেকে জানা যাবে যে, দিনরাত্রির ব্যবস্থায় যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায় এগুলো তারই নির্দশন। এগুলোর কসম থেমে প্রশ্ন করা হয়েছে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান সম্ভত ব্যবস্থাপনা প্রত্যক্ষ করার প্রাণ যে আল্লাহ এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি আখেরাত কায়েম করার ক্ষমতা রাখেন এবং মানুষের কাছ থেকে তার কার্যাবলীর হিসেব নেয়া তৌর এ বিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অপরিহার্য দাবী, একথার সাক্ষ প্রমাণ পেশ করার জন্য কি আর কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকে?

এরপর মানব জাতির ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করে উদাহরণ স্বরূপ আদ ও সামুদ জাতি এবং ফেরাউনের পরিণাম পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যখন তারা সীমা পেরিয়ে গেছে এবং পৃথিবীতে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে তখন আল্লাহর আয়াব তাদেরকে গ্রাস করেছে। একথা প্রমাণ করে যে, কোন অঙ্গ-বধির শক্তি এই বিশ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে না এবং এ দুনিয়াটা কোন অর্থব রাজার মঠের মূল্যক্ষণ নয়। বরং একজন মহাবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী শাসক এ বিশ-জাহানের ওপর কর্তৃত্ব করছেন। তিনি বুদ্ধি-জ্ঞান ও নৈতিক অনুভূতি দান করে যেসব সৃষ্টিকে এ দুনিয়ায় স্বাধীন ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দিয়েছেন তাদের কাজের হিসেব-নিকেশ করা এবং তাদেরকে শাস্তি ও পুরুষার দেয়া তৌর জ্ঞানবস্তা ও ন্যায়পরায়ণতার অনিবার্য দাবী। মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা এর অবিজ্ঞপ্ত প্রকাশ দেখি।

তারপর মানব সমাজের সাধারণ নৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে আরব জাহেলিয়াতের অবস্থা সে সময় সবার সামনে বাস্তবে সুস্পষ্ট ছিল। বিশেষ করে তার দুটি দিকের সমালোচনা করা হয়েছে। এক, সাধারণ মানুষের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। যার ফলে তারা নৈতিক ভালো-মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র পার্থিব ধন-দণ্ডনাত, মর্যাদা ও প্রতিপন্থি অর্জন বা এর অভাবকে সম্মান লাভ ও সম্মানহানির মানদণ্ড গণ্য করেছিল। তারা ভূলে গিয়েছিল, সম্পদশালিতা কোন পূরক্ষার নয় এবং আর্থিক অভাব অনটন কোন শাস্তি নয় বরং এ দুই অবস্থাতেই মহান আল্লাহ মানুষের পরীক্ষা নিছেন। সম্পদ লাভ করে মানুষ কি দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বন করে এবং আর্থিক অনটন ক্ষিট হয়ে সে কোন পথে চলে—এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুই, লোকদের সাধারণ কর্মনীতি। পিতার মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের সমাজে এতিম ছেলেমেয়েরা চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হয়। গরীবদের খবর নেবার এবং তাদের পক্ষে কথা বলার একটি লোকও পাওয়া যায় না। যার ক্ষমতা থাকে সে মৃত্যুর সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে বসে। দুর্বল হকদারদের খেদিয়ে দেয়া হয়। অর্থ ও সম্পদের লোড একটি দুর্নিবার ক্ষুধার মতো মানুষকে তাড়া করে ফেরে। যত বেশী পায় ততুও তার পেট ভরে না। দুনিয়ার জীবনে যেসব লোক এ ধরনের কর্মনীতি অবলম্বন করে তাদের কাজের হিসেব নেয়া যে ন্যায়সংগত, লোকদের কাছ থেকে এ স্বীকৃতি আদায় করাই হচ্ছে এ সমালোচনার উদ্দেশ্য।

সবশেষে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, সমালোচনা ও হিসেব-নিকেশ অবশ্যি হবে। আর সেদিন এই হিসেব-নিকেশ হবে যেদিন আল্লাহর আদালত কায়েম হবে। শাস্তি ও পূরক্ষার অঙ্গীকারকারীদেরকে হাজার বুঝালেও আজ তারা যে কথা মেনে নিতে পারছে না। সেদিন তা তাদের বোধগম্য হবে। কিন্তু তখন বুঝতে পারায় কোন লাভ হবে না। অঙ্গীকারকারী সেদিন আফসোস করে বলবে : হায়, আজকের দিনের জন্য যদি আমি দুনিয়ায় কিছু সরঞ্জাম তৈরি করতাম। কিন্তু এই সজ্জা ও দুঃখ তাকে আল্লাহর আযাবের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তবে যেসব লোক আসমানী কিতাব ও আল্লাহর নবীগণের পেশকৃত সত্য পূর্ণ মানসিক নিচিততা সহকারে মেনে নিয়েছিল আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তারাও আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিদান পেয়ে সন্তুষ্ট হবে। তাদেরকে আহবান জানানো হবে, তোমরা নিজেদের রবের প্রিয় বাল্দাদের অন্তরভুক্ত হয়ে জানাতে প্রবেশ করো।

আয়াত ৩০

সূরা আল ফজ্র-মুক্তি

ফজ্র ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

গুরু করণামে মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفِعِ وَالْوَتْرِ وَالنَّلِيلِ إِذَا يَسِّرَ^①
 هَلْ فِي ذَلِكَ قَسْرٌ لِنَّى حِجْرٌ^②

ফজরের কসম, দশটি রাতের, জোড় ও বেজোড়ের এবং রাতের কসম যখন তা বিদ্যায় নিতে থাকে। এর মধ্যে কোন বৃক্ষিমানের জন্য কি কোন কসম আছে?

১. এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যায় মুফসুসিরগণের মধ্যে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এমন কি জোড় ও বেজোড় সম্পর্কে ছত্রিশটি বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন বর্ণনায় এগুলোর ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও সম্পর্কিত করা হয়েছে। কিন্তু আসলে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে কোন ব্যাখ্যা প্রমাণিত নেই। নয়তো তাঁর ব্যাখ্যার পর সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তী তাফসীরকারদের মধ্য থেকে কোন একজনও এই আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা নির্ধারণ করার সাহস করতেন না।

বর্ণনাভঙ্গি সম্পর্কে চিন্তা করলে পরিকার বুঝা যায়, প্রথম থেকে কোন আলোচনা চলছিল। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কথা পেশ করছিলেন এবং অঙ্গীকারকরীরা তা অঙ্গীকার করছিল। এ প্রসংগে রসূলের কথার সত্ত্বতা প্রমাণ করে বলা হয়েছে, ওমুক ওমুক জিনিসের কসম। এর অর্থ হিল, এই জিনিসগুলোর কসম, যা কিছু মুহাম্মাদ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন সব সত্য। তারপর এ প্রশ্নের ভিত্তিতে এ বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, কোন বৃক্ষিমান লোকের জন্য কি এর মধ্যে কোন কসম আছে? অর্থাৎ এই সত্য কথাটির পক্ষে সাক্ষ দেবার জন্য এরপর কি আর কোন কসমের প্রয়োজন আছে? মুহাম্মাদ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কথা বলছেন তা জেনে নেবার জন্য কি একজন বৃক্ষ-বিবেকিন্মান ব্যক্তির জন্য এই কসমই যথেষ্ট নয়?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যে প্রসংগে এই চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা কি ছিল? এ জন্য আমাদের পরবর্তী আয়াতগুলোতে “তুমি কি দেখনি তোমার রঁব তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছিলেন” থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সমগ্র আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এ থেকে জানা যায়, আলোচনা চলছিল শান্তি ও পুরস্কার সম্পর্কে। যক্কাবাসীরা একথা অঙ্গীকার করছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের থেকে এর শীকৃতি আদায় করার জন্য অনবরত তাদেরকে দাওয়াত ও উপদেশ দিয়ে চলছিলেন। এ জন্য ফজর, দশটি রাত, জোড়-বেজোড় এবং বিদ্যায়ী রাতের কসম

খেয়ে বলা হয়েছে, এই বিষয়টি উপরকি করার জন্য এই চারটি জিনিস যথেষ্ট নয় কি? এ জন্য কোন বুদ্ধি-বিবেকবান ব্যক্তির সামনে কি আর কোন জিনিস পেশ করার প্রয়োজন আছে?

এই কসমগুলোর এই পরিবেশ-পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর পরবর্তী আলোচনা এগুলোর যে অর্থ নির্দেশ করে আমাদের অপরিহার্যভাবে সেই অর্থই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে বলা হয়েছে “ফজুরের কসম”। ফজুর বলা হয় প্রভাত হয়ে যাওয়াকে। অর্থাৎ যখন রাতের অন্ধকার ভেদ করে দিনের প্রথম আলোক রশ্মি পূর্বদিগন্তে একটি সাদা রেখার মতো আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বলা হয়েছে “দশটি রাতের কসম।” ধারাবাহিক বর্ণনাগুলো সামনে রাখলে জানা যায়, এর অর্থ হচ্ছে মাসের তিরিশটি রাতের প্রত্যেক দশটি রাত। প্রথম দশটি রাতের চৌদ সুর কাস্তের আকারে শুরু হয়ে প্রতি রাতে বাড়তে থাকে। এভাবে তার অর্ধেকেরও বেশী এদাকা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দশটি রাতে চৌদের আলোয় রাতের বৃহস্পতি অংশ আলোকিত থাকে। শেষ দশটি রাতে চৌদ আস্তে আস্তে একেবারে ছোট হয়ে যেতে থাকে এবং রাতের বেশীর ভাগ অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। এমনকি মাসের শেষ রাতটি হয় পুরোপুরি অন্ধকার। এরপর বলা হয়েছে, “জোড় ও বেজোড়ের কসম।” জোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে দু’টি সমান ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন ২, ৪, ৬, ৮, ১০। অন্যদিকে বেজোড় বলা হয় এমন সংখ্যাকে যাকে সমান দু’ভাগে ভাগ করা যায় না। যেমন ১, ৩, ৫, ৭, ৯। সাধারণভাবে দেখলে এর অর্থ হতে পারে বিশ-জাহানের সমন্বয় জিনিস। কারণ প্রতিটি জিনিস হয় জোড়, নয় বেজোড়। কিন্তু যেহেতু এখানে দিন ও রাতের কথা আলোচনা হচ্ছে তাই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কের প্রেক্ষিতে এখানে জোড় ও বেজোড় মানে হচ্ছে, দিন-রাত্রির পরিবর্তন। অর্থাৎ মাসের তারিখ এক খেকে দুই এবং দুই খেকে তিন হয়ে যায়। আর প্রত্যেকাটি পরিবর্তন একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি করে। সবশেষে বলা হয়েছে, “রাতের কসম যখন তা বিদায় নিতে থাকে।” অর্থাৎ সূর্য ডোবার পর থেকে পৃথিবীর বুকে যে অন্ধকার ছেয়ে ছিল তার অবসান ঘটেছে এবং আলোকময় উষার উদয় হতে যাচ্ছে।

এখন হ্যরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামু শান্তি ও পুরস্কারের যে খবর দিল্লিলেন তার সত্যতা প্রমাণ করার জন্য যে চারটি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তাদের উপর একবার সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করুন। এসব জিনিস এই সত্যটি প্রমাণ করছে যে, একজন মহাশক্তিশালী মৃষ্টা এই বিশ-জাহানের উপর রাজত্ব করছেন। তিনি যে কাজটি করছেন, তা উদ্দেশ্যহীন, ধক্ষহীন, অর্থহীন নয় এবং তার পেছনে কোন বিজ্ঞতাপূর্ণ পরিকল্পনা নেই একথা বলা যাবে না। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা সত্ত্বিক রয়েছে। তাঁর পৃথিবীতে কখনো এমন দেখ যাবে না যে, এখনই রাত আবার এখনই হঠাৎ সূর্য একেবারে মাথার উপর উঠেছে। অথবা একদিন চৌদ উঠলো কাত্তের মতো সরু হয়ে এবং তারপর দিন একেবারে গোল থালার মতো পূর্ণচন্দ্র আকাশে শোভা পেতে শাগলো। অথবা রাত এলো কিন্তু তা আর শেষই হচ্ছে না, হায়ীভাবে ঠায় একই জ্যাগায় দৌড়িয়ে রাইলো। অথবা আদতে দিন রাত্রির পরিবর্তনের কোন হায়ী ব্যবস্থাই নেই। যার ফলে তারিখের হিসাব রাখা যায় না। আজ কোনু মাসের কয় তারিখ, কোন তারিখে কোনু কাজটি শুরু করা হয়েছিল এবং কবে খতম হবে,

الْمَرْتَرِ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝ أَرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ
 مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۝ وَنَمُودَ الَّذِينَ جَاءُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝ وَفِرْعَوْنَ
 ذِي الْأَوْتَادِ ۝ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝ فَأَكْثَرُهُوَا فِيهَا الْفَسَادِ ۝
 فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سُوتَ عَنَّ أَبِ ۝ إِنْ رَبُّكَ لَيَالْبِرِ صَادِ ۝

তুমি^১ কি দেখনি তোমার রব সুউক্ত শঙ্গের অধিকারী আদে-ইরামের^২ সাথে
 কি আচরণ করেছেন, যাদের মতো কোন জাতি দুনিয়ার কোন দেশে সৃষ্টি করা
 হয়নি^৩ আর সামুদ্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ
 করেছিল^৪ আর কীলকধারী ফেরাউনের^৫ সাথে? এরা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে বড়ই
 সীমালংঘন করেছিল এবং সেখানে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে তোমার রব
 তাদের ওপর আয়াবের কশাঘাত করলেন। আসলে তোমার রব ৪৫ পেতে আছেন।^৬

শ্রীঘূর্ণ কবে থেকে শুরু হচ্ছে এবং বর্ষাকাল ও শীতকাল কবে আসবে—এসব জানা
 সম্ভব হয় না। বিশ্ব-জাহানের অন্যান্য অসংখ্য জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধুমাত্র দিন
 রাত্রির এই যথা নিয়মে যাওয়া আসার বিষয়টি মনোযোগ সহকারে দেখে এবং এ
 ব্যাপারটি নিয়ে একটু মাথা ঘামায়, তাহলে এক সর্বশক্তিমান সত্তা যে এই বিরাট
 নিয়ম-শৃংখলা ও আইনের রাজত্ব কায়েম করেছেন এবং এই নিয়ম-শৃংখলার সাথে
 এখানে সৃষ্টজীবের অসংখ্য স্বার্থ ও কর্মপ্রবাহ জড়িত তার সাক্ষ-প্রমাণ সে এর মধ্যেই
 পেয়ে যাবে। এখন এই ধরনের জ্ঞানবান ও বিজ্ঞানময় এবং মহাশক্তিধর মুষ্টার আখেরাতে
 শান্তি ও পুরস্কার দেবার বিষয়টি যদি দুনিয়ার কোন মানুষ অঙ্গীকার করে তাহলে সে
 দু'টি নির্বাচিতার মধ্য থেকে কোন একটিতে অবশ্যি লিঙ্গ। হয় সে তাঁর ক্ষমতা অঙ্গীকার
 করে এবং মনে করে তিনি এই অকর্মনীয় নিয়ম-শৃংখলা সহকারে এই বিশ্ব-জাহান
 সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন কিন্তু মানুষকে পুনর্বার সৃষ্টি করে তাকে শান্তি ও পুরস্কার দান
 করার ক্ষমতা তাঁর নেই অথবা সে তাঁর জ্ঞানবান ও বিজ্ঞানময়তা অঙ্গীকার করে এবং
 তাঁর সম্পর্কে একথা মনে করে নিয়েছে যে, তিনি মানুষকে দুনিয়ায় বুদ্ধি-বিবেক ও
 ক্ষমতা-ইথিতিয়ার দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ঠিকই কিন্তু তিনি কখনো তার কাছ থেকে এই
 বুদ্ধি-বিবেক ও ক্ষমতা-ইথিতিয়ারকে সে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে তার হিসেব নেবেন
 না। আর তিনি ভালো কাজের পুরস্কার দেবেন না এবং খারাপ কাজের শান্তি ও দেবেন না।
 এই দু'টি কথার কোন একটিকেও যে ব্যক্তি মেনে নেবে সে একজন প্রথম শ্রেণীর
 নির্বোধ।

২. দিন-রাত্রির অবৰ্তন ব্যবস্থা থেকে শান্তি ও পুরস্কার বিধানের প্রমাণ পেশ করার
 পর এখন তার নিচিত সত্য হবার ব্যাপারে মানুষের ইতিহাস থেকে প্রমাণ পেশ করা

হচ্ছে। ইতিহাসের কয়েকটি পরিচিত জাতির কর্মপদ্ধতি ও তাদের পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে একথা বলার উদ্দেশ্যে যে, এই বিশ্ব-জাহান কোন অক্ষ ও বাধির প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে না। বরং এক বিজ্ঞানময় আল্লাহ এই সমগ্র বিশ্ব ব্যবহ্যা পরিচালনা করছেন। আর এই আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের মধ্যে তোমরা যাকে প্রাকৃতিক আইন মনে করো কেবলমাত্র সেই আইনটিই সক্রিয় নেই বরং এই সাথে একটি নৈতিক আইনও এখানে সক্রিয় রয়েছে, যার অনিবার্য দাবী হচ্ছে, কাজের প্রতিফল এবং শাস্তি ও পুরস্কার দান। এই আইন যে সক্রিয় রয়েছে তার চিহ্ন এই দুনিয়াতেই বার বার প্রকাশ হতে থেকেছে এবং তা থেকে বৃদ্ধি-বিবেকবান মানুষ বিশ্ব-জাহানের শাসন কর্তৃত্বের প্রকৃতি ও স্বত্ব সুম্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে। এখানে যেসব জাতি আখেরাতের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং আল্লাহর শাস্তি ও পুরস্কারের ভয় না করেই নিজেদের জীবনের ব্যবহ্যা পরিচালনা করেছে তারা পরিণামে বিপর্যস্ত হয়েছে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী রূপে আত্ম-প্রকাশ করেছে। আর যে জাতিই এ পথে চলেছে বিশ্ব-জাহানের রব তার ওপর শেষ পর্যন্ত আয়াবের চাবুক বর্ষণ করেছেন। মানুষের ইতিহাসের এই ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা দু'টি কথা সুম্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে : এক, আখেরাত অঙ্গীকার করার কারণে প্রত্যেক জাতি বিপথে পরিচালিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত তা তাকে খৎসের আবর্তে নিষ্কেপ করেছে। কাজেই আখেরাত একটি যথার্থ সত্য। প্রত্যেক সত্যের সাথে সংঘর্ষে লিঙ্গ হবার যে ভয়াবহ পরিণতি হয় এর সাথে সংঘর্ষে লিঙ্গ হবার ফলও তাই হয়। দুই, কর্মফল কোন এক সময় পূর্ণ মাত্রায়ও দেয়া হবে। কারণ বিপর্যয় ও বিকৃতির শেষ পর্যায়ে এসে আয়াবের চাবুক যাদের ওপর বর্ষিত হয়েছে তাদের পূর্বে শত শত বছর পর্যন্ত বহু লোক এই বিপর্যয়ের বীজ বপন করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিল এবং তাদের ওপর কোন আয়াব আসেনি। আল্লাহর ইনসাফের দাবী এই যে, কোন এক সময় তাদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং তারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করুক। কুরআন মজীদে আখেরাতের ব্যাপারে এই ঐতিহাসিক ও নৈতিক যুক্তির বিশ্লেষণ বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে এবং সবজায়গায় আমি এর ব্যাখ্যা করেছি। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত জায়গাগুলো দেখুন : তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৫-৬ টীকা, ইউনুস ১২, হৃদ ৫৭, ১০৫, ১১৫ টীকা, ইবরাহীম ৯ টীকা, আন নহল ৬৬ ও ৮৬ টীকা, আররূম ৮ টীকা, সাবা ২৫ টীকা, সাদ ২৯ ও ৩০ টীকা, আল মু'মিন ৮০ টীকা, আদ দুখান ৩৩ ও ৩৪ টীকা; আল জাসিয়াহ-২৭ ও ২৮ টীকা, কাফ ১৭ টীকা এবং আয় যারিয়াত ২১ টীকা।)

৩. 'আদে ইরাম' বলতে আদ জাতির সেই প্রাচীন ধারাটির কথা বুঝানো হয়েছে যাকে কুরআন মজীদ ও আরবের ইতিহাসে 'আদে উলা' (পথ) বলা হয়েছে। সূরা আন নাজমে বলা হয়েছে : **وَأَنْتَ أَهْلُكَ عَادَانَ الْأَلْيَى** (৫০ আয়াত) অর্থাৎ সেই আদ জাতিকে যাদের কাছে হ্যরত হৃদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল এবং যাদের ওপর আয়াব নাযিল হয়েছিল। অনদিকে এই জাতির যেসব লোক আয়াব থেকে রেহাই পাওয়ার পর নিজেদের জাতি সন্তার সমৃদ্ধি সাধন করেছিল, আরবের ইতিহাসে তাদেরকে 'আদে উখ্রা' (ছিতীয় আদ) নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন আদ জাতিকে 'আদে ইরাম' বলার কারণ হচ্ছে এই যে, তারা সিরিয় বংশজ্ঞাত আদদের সেই বংশধারার সাথে সম্পর্কিত যাদের উদ্ভব হয়েছিল নৃহ আলাইহিস সালামের নাতি ও সামের ছেলে ইরাম থেকে। ইতিহাসে আদদের এই শাখার আরো

কয়েকটি উপশাখা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামুদ্র এদের অন্যতম। কুরআনে এই জাতিটির উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আরামিয়ান (Arameana) জাতি। এরা প্রথমে সিরিয়ার উত্তর এলাকায় বসবাস করতো। এদের ভাষা আরামী (Aramic)। সিরিয়ার ভাষাগুলোর মধ্যে এই ভাষাটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

আদের জন্য 'যাতুল ইমাদ' (সুউচ্চ স্তরের অধিকারী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা বড় বড় উচু উচু ইমারত তৈরি করতো। দুনিয়ায় তারাই সর্বপ্রথম উচু উচু স্তরের ওপর ইমারত নির্মাণ করার কাজ শুরু করে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় তাদের এই বৈশিষ্ট্যকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : হযরত হৃদ (আ) তাদেরকে বলেন,

أَتَبْنُنَّ بِكُلِّ رِيشٍ أَيَّةً تَعْبِثُنَّ وَتَتْخِنُنَّ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُنَّ

"তোমাদের এ কেমন অবস্থা, প্রত্যেক উচু জায়গায় অনর্থক একটি শৃঙ্খলা তৈরি করছে এবং বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করছে, যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে।"

(আশ শু'আরা, ১২৮-১২৯)

৪. অর্থাৎ তারা সমকালীন জাতিদের মধ্যে ছিল একটি তুলনাবিহীন জাতি। শক্তি শৌর্য-বীর্য, গৌরব ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে সে যুগে সারা দুনিয়ায় কোন জাতি তাদের সমকক্ষ ছিল না। কুরআনের অন্যান্য স্থানে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : "وَذَرَكُمْ فِي الْخَلْقِ بِصُطْطَةٍ" দৈহিক গঠনের দিক দিয়ে তোমাদের অবয়বকে অত্যন্ত সম্মুখ করেছেন। (আল আরাফ, ৬৯)

فَامَّا عَادٌ فَاسْتَكْبِرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا

قُوَّةً

"আর তাদের ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয়, 'তারা কোন অধিকার ছাড়াই পৃথিবীর বুকে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করেছে। তারা বলেছে : কে আছে আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী?' (হা-মীম আস্ সাজদাহ, ১৫)

৫. উপত্যকা বলতে 'আলকুরা' উপত্যকা বুঝানো হয়েছে। সামুদ্র জাতির সোকেরা সেখানে পাথর কেটে কেটে তার মধ্যে গৃহ নির্মাণ করেছিল। সম্ভবত ইতিহাসে তারাই প্রথম জাতি হিসেবে চিহ্নিত যারা পাহাড়ের মধ্যে এভাবে ইমারত নির্মাণের রীতি প্রচলন করেছিল। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আরাফ ৫৭-৫৯ টীকা, আল হিজ্র ৪৫ টীকা এবং আশ শু'আরা ১৫-১৯ টীকা)

৬. ফেরাউনের জন্য 'যুল আউতাদ' (কীলকধারী) শব্দ এর আগে সূরা সাদের ১২ আয়াতেও ব্যবহার করা হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। তার সেনাবাহিনীকে কীলকের সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং সেই অর্থে কীলকধারী মানে সেনাবাহিনীর

فَإِنَّمَا إِلَّا إِنْسَانٌ إِذَا مَا أَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَةً فَيَقُولُ رَبِّي
أَكْرَمَنِي وَأَمَا إِذَا مَا أَبْتَلَهُ فَقُلْ رَّبُّهُ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِي

কিন্তু মানুষের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তার রব যখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তাকে সম্মান ও নিয়ামত দান করেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আবার যখন তিনি তাকে পরীক্ষায় ফেলেন এবং তার রিয়িক তার জন্য সংকীর্ণ করে দেন তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন।^১

অধিকারী: কারণ তাদেরই বদৌগতে তার রাজত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যেমন কীলকের সাহায্যে তাঁরু মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এর অর্থ সেনা দলের সংখ্যাধিকাও হতে পারে। এফ্ফেক্টে এর অর্থ হবে, তার সেনাদল যেখানে গিয়ে তাঁরু গাড়তো সেখানেই চারদিকে শুধু তাঁরুর কীলকই পোতা দেখা যেতো। আবার এর অর্থ সেই কীলকও হতে পারে যা মানুষের শরীরে গেড়ে দিয়ে সে তাদেরকে শাস্তি দিতো। এও হতে পারে, মিসরের পিরামিডগুলোকে কীলকের সাথে ভূলনা করা হয়েছে। কারণ সেগুলো ফেরাউনদের পরাক্রম ও শান-শওকতের নির্দর্শন হিসেবে হাজার হাজার বছর থেকে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

৭. জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কার্যকলাপের প্রতি নজর রাখার জন্য ওঁৎ পেতে থাকা প্রবাদটির ব্যবহার করা হয়েছে রূপক হিসেবে। কোন ব্যক্তির কারো অপেক্ষায় কোন গোপন হানে এই উদ্দেশ্যে লুকিয়ে বসে থাকা যে, তার আয়ত্তের মধ্যে আসার সাথে সাথেই সে তার ওপর ঝীপিয়ে পড়বে, একে বলা হয় ওঁৎপেতে থাকা। যার জন্য লুকিয়ে বসে থাকা হয় সে জানতে পারে না যে, তার ওপর আক্রমণ করার জন্য কেউ কোথাও লুকিয়ে বসে আছে। সে নিচিতে চারদিক সম্পর্কে অসর্ক হয়ে এই স্থান অতিক্রম করতে থাকে তখন অক্ষাংশ সে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়ায় যেসব জালেম বিপর্যয়ের তুফান সৃষ্টি করে থাকে আগ্নাহীর মোকাবিলায় তাদের অবস্থাও অনুরূপ হবে। আগ্নাহ যে একজন আছেন এবং তিনি তার সমস্ত কার্যকলাপের প্রতি লক্ষ রাখছেন, এ অনুভূতিই তার থাকে না। সে একেবারে নির্ভয়ে দিনের পর দিন বেশী বেশী শয়তানী কাজ করে যেতে থাকে। তারপর একদিন যখন সে এক সীমান্তে পৌছে যায় যেখান থেকে আগ্নাহ তাকে আর এগিয়ে যেতে দিতে চান না, তখন তার ওপর হঠাৎ আগ্নাহীর আয়াবের চাবুক বর্ষিত হয়।

৮. এখন শোকদের সাধারণ নৈতিক অবস্থার সমাপ্তেচনা করে বলা হচ্ছে, যেসব শোক দুনিয়ার জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবণীর হিসেব কখনো না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? দুনিয়ায় এসব কাজ-কারবার করে যখন মানুষ বিদায় নেবে তখন তার কাজের জন্য সে কোন শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করবে না একে বৃদ্ধি ও নৈতিক বৃদ্ধির দাবী বলে কেমন করে মেনে মেয়া যেতে পারে।

৯. অর্থাৎ এটি হচ্ছে মানুষের বস্তুবাদী জীবন দর্শন। এই দুনিয়ার ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্বকেই সে সবকিছু মনে করে। এগুলো পেলে সে আনন্দে উপস্থিত হয়। এবং বলে

كَلَّا بَلْ لَا تَكِرُّمُونَ الْيَتِيمَ^{١٠} وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ^{١١}
 وَتَأْكُلُونَ التِّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا^{١٢} وَتَحْبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمًا^{١٣} كَلَّا
 إِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا^{١٤} وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا^{١٥}
 وَجَاءَ يَوْمَئِنِي بِجَهَنَّمَةِ يَوْمَئِنِي يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنِّي لَهُ
 الِّذِي كُرِيَ^{١٦} يَقُولُ يَلَيْتَنِي قُلْ مُتَحَيَّاتِي^{١٧} فَيَوْمَئِنِي لَا يَعْلَمُ^{١٨}
 عَلَّا بَاهَ أَهْلَ^{١٩} وَلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهُ أَهْلَ^{٢٠}

কথনই নয়,^{১০} বরং তোমরা এতিমের সাথে সম্মানজনক ব্যবহার কর না^{১১} এবং মিসকীনকে খাওয়াবার জন্য পরম্পরাকে উৎসাহিত কর না।^{১২} তোমরা মীরাসের সব ধন-সম্পদ সম্পূর্ণরূপে খেয়ে ফেলো।^{১৩} এবং ধন-সম্পদের প্রেমে তোমরা মারাত্কভাবে বাঁধা পড়েছ।^{১৪} কথনই নয়,^{১৫} পৃথিবীকে যখন চূণবিচূণ করে বালুকাময় করে দেয়া হবে এবং তোমার রব এমন অবস্থায় দেখা দেবেন।^{১৬} যখন ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দৌড়িয়ে থাকবে। সেদিন জাহানামকে সামনে আনা হবে। সেদিন মানুষ বুঝবে কিন্তু তার বুঝতে পারায় কী লাভ?^{১৭} সে বলবে, হায়, যদি আমি নিজের জীবনের জন্য কিছু আগাম ব্যবস্থা করতাম! সেদিন আল্লাহ যে শাস্তি দেবেন তেমন শাস্তি কেউ দিতে পারবে না। এবং আল্লাহ যেমন বাঁধবেন আর কেউ তেমন বাঁধতে পারবে না।

আল্লাহ আমাকে মর্যাদা দান করেছেন। আবার না পেলে বলে, আল্লাহ আমাকে লাখ্তি ও অপমানিত করেছেন। অর্থাৎ ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-কর্তৃত্ব পাওয়া-নাপাওয়াই হচ্ছে তার কাছে মর্যাদা ও লাঞ্ছনিক মানদণ্ড। অথচ প্রকৃত ব্যাপারটিই সে বোঝে না। আল্লাহ দুনিয়ায় যাকেই যা কিছুই দিয়েছেন পরীক্ষার জন্যই দিয়েছেন। ধন ও শক্তি দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। এগুলো পেয়ে মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না অকৃতজ্ঞ হয়, তা তিনি দেখতে চান। দারিদ্র ও অভাব দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। ধৈর্য ও পরিতৃষ্টি সহকারে মানুষ আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকে এবং বৈধ সীমার মধ্যে অবস্থান করে নিজের সমস্যা ও সংকটের মোকাবিলা করে, না সততা, বিশ্বাস ও নেতৃত্বকার সব বাঁধন ছির করে আল্লাহকেই গালমন্দ দিতে থাকে, তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতে চান।

১০. অর্থাৎ এটি কখনই মর্যাদা ও লাঙ্ঘনার মানদণ্ড নয়। তোমরা মস্তবড় ভুল করছে। একে সৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তি ও অসৎ চারিত্রিক মনোবৃত্তির পরিবর্তে তোমরা মর্যাদা ও লাঙ্ঘনার মানদণ্ড বানিয়ে রেখেছে।

১১. অর্থাৎ তার বাপ জীবিত থাকাকালে তার সাথে তোমরা এক ধরনের ব্যবহার করো। আর তার বাপ যারা যাবার সাথে সাথেই প্রতিবেশী ও দূরের আঢ়ায়দের তো কথাই নেই, চাচা, মামা এমনকি বড় ভাই পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১২. অর্থাৎ তোমাদের সমাজে গরীবদের আহার করাবার কোন রেওয়াজই নেই। কোন ব্যক্তি নিজে অগ্রসর হয়ে কোন অঙ্গুষ্ঠকে আহার করাবার উদ্যোগ নেয় না। অথবা ক্ষুধার্তদের ক্ষুধা নিবারণ করার কোন চিন্তাই তোমাদের মনে আসে না এবং এর ব্যবস্থা করার জন্য তোমরা পরম্পরাকে উৎসাহিতও করো না।

১৩. আরবে মেয়েদের ও শিশুদের এমনিতেই মীরাস থেকে বাস্তিত রাখা হতো। এ ব্যাপারে লোকেরা যে মত পোষণ করতো তা ছিল এই যে, মীরাস লাভ করার অধিকার একমাত্র এমন সব পূর্ণবের আছে যারা লড়াই করার ও পরিবারের লোকদের হেফাজত করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে। এছাড়াও মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হতো সে নিচিতে সমস্ত মীরাস নিজের একার দখলে নিয়ে নিতো এবং যারা নিজেদের অংশ হাসিল করার ক্ষমতা রাখতো না তাদের সবারটা গ্রাস করে ফেলতো। অধিকার ও কর্তব্যের কোন গুরুত্বই তাদের কাছে ছিল না। অধিকারী নিজের অধিকার হাসিল করতে পারলে বা না পারলে ইমানদারীর সাথে নিজের কর্তব্য মনে করে তাকে তার অধিকার প্রদান করার কথা তারা চিন্তাই করতো না।

১৪. অর্থাৎ বৈধ-অবৈধ ও হালাল-হারামের কোন পার্থক্যই তোমাদের কাছে নেই। যে কোন পদ্ধতিতে সম্পদ অর্জন করতে তোমরা মোটেই ইতস্তত করো না। যত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদই তোমরা লাভ করো না কেন তোমাদের লোকের ক্ষুধা মেটে না।

১৫. অর্থাৎ তোমাদের চিন্তা ভুল। তোমরা দুনিয়ায় যত দিন জীবন যাপন করবে, এসব কিছুই করতে থাকবে এবং এজন্য তোমাদের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, একথা ঠিক নয়। যে শাস্তি ও পুরুষারের বিষয়টি অধীক্ষাকার করে তোমরা এই জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করেছো সেটি কোন অসম্ভব ও কান্ননিক ব্যাপার নয়। বরং সে বিষয়টি অবশ্যি সংঘটিত হবে। সামনের দিকে সেটি কখন সংঘটিত হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

১৬. মূলে বলা হয়েছে **جَاءَ رَبِّكَ** এর শান্তিক অনুবাদ হচ্ছে, “তোমার রব আসবেন।” তবে আঢ়াহর জন্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই না। তাই একে ঝুপক অথবাই গ্রহণ করতে হবে। এর উদ্দেশ্য এমনি ধরনের একটি ধারণা দেয়া যে, সে সময় আঢ়াহর সার্বভৌম কর্তৃত্ব, শাসন ও প্রতাপের নির্দশনসমূহ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। দুনিয়ায় কোন বাদশাহৰ সমগ্র জ্ঞানদল এবং তার মন্ত্রণাপরিষদ ও সভাসদদের আগমনে ঠিক ততটা প্রভাব ও প্রতাপ সৃষ্টি হয় না যতটা বাদশাহৰ নিজের দরবারে আগমনে সৃষ্টি হয়। এই বিষয়টিই এখানে বুঝানো হয়েছে।

يَا يَتَمَّا النَّفْسُ الْمَطْمُئِنَةُ ۝ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي ۝

(অন্যদিকে বলা হবে) হে প্রশান্ত আত্মা! ১৮ চলো তোমার রবের দিকে, ১৯ এমন অবস্থায় যে তুমি (নিজের শুভ পরিণতিতে) সন্তুষ্ট (এবং তোমার রবের) প্রিয়পাত্র। শামিল হয়ে যাও আমার (নেক) বাস্তাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্মাতে।

১৭. مَلِئْ يَوْمَنْدِ يُتَذَكَّرُ الْأَنْسَانُ وَأَنْسَى لَهُ الدَّكْرُ ۝ এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সেদিন মানুষ দুনিয়ায় যা কিছু করে এসেছে তা খরণ করবে এবং সেজন্য লজ্জিত হবে। কিন্তু তখন খরণ করায় এবং লজ্জিত হওয়ায় কোন লাভ হবে না। দুই, সেদিন মানুষ সচেতন হবে। সে উপদেশ গ্রহণ করবে। সে বুঝতে পারবে, নবীগণ তাকে যা কিছু বলেছিলেন তাই ছিল সঠিক এবং তাদের কথা না মেনে সে বোকাখি করেছে। কিন্তু সে সময় সচেতন হওয়ায়, উপদেশ গ্রহণ করায় এবং নিজের ভূল বুঝতে পারায় কী লাভ?

১৮. 'প্রশান্ত আত্মা' বলে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিধান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিষ্ট সত্যে নয় বরং এই বিশ্বাস সহকারে বর্জন করেছে যে, সত্যই তা খারাপ। সত্য-প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্থীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নিষিদ্ধিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশ্ত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ, ঐশ্বর্য ও সুখ-সঙ্গার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তাঁর নিজের মধ্যে কোন ক্ষেত্র বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এজন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নিশ্চিন্ততা অনুভব করেছে। কুরআনের অন্যত্র এই অবস্থাটিকে 'শারহে সদর' বা 'হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয়া অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। (আল আন'আম, ১২৫)

১৯. একথা তাকে মৃত্যুকালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে প্রেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতিটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিষ্চয়তা দান করা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আল বালাদ

৯০

নামকরণ

الْأَقْسِمُ بِهَا الْبَلْدُ
প্রথম আয়াত এর আল বালাদ শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নামিসের সময়-কাল

এই সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভূগী মুক্তায় আয়াতের প্রথম যুগের সূরাগুলোর মতোই। তবে এর মধ্যে একটি ইংগিত পাওয়া যায়, যা থেকে জানা যায়, এই সূরাটি ঠিক এমন এক সময় নামিল হয়েছিল যখন মুক্তার কাছের রান্নার নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগেছিল এবং তাঁর ওপর সব রকমের জুলুম নিপীড়ন চালানো নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

একটি অনেক বড় বিষয়বস্তুকে এই সূরায় মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। একটি পূর্ণ জীবন দর্শন, যা বর্ণনার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থের কলেবরণও যথেষ্ট বিবেচিত হতো না তাকে এই ছোট সূরাটিতে মাত্র কয়েকটি ছোট ছোট বাক্যে অভ্যন্ত হৃদয়গাহী পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। এটি কুরআনের অলৌকিক বর্ণনা ও প্রকাশ পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ প্রমাণ। এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, দুনিয়ায় মানুষের এবং মানুষের জন্য দুনিয়ার সঠিক অবস্থান, মর্যাদা ও ভূমিকা বুঝিয়ে দেয়া। মানুষকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, আল্লাহ মানুষের জন্য সৌভাগ্যের ও দুর্ভাগ্যের উভয় পথই খুলে রেখেছেন, সেগুলো দেখার ও সেগুলোর ওপর দিয়ে চলার যাবতীয় উপকরণও তাদেরকে সরবরাহ করেছেন। এখন মানুষ সৌভাগ্যের পথে চলে শুভ পরিপত্তি লাভ করবে অথবা দুর্ভাগ্যের পথে চলে অশুভ পরিণতির মুখোযুক্তি হবে, এটি তার নিজের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ওপর নির্ভর করে।

প্রথমে মুক্তা শহরকে, এর মধ্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব বিপদের সম্মুখীন হতে হয় সেগুলোকে এবং সমগ্র মানব জাতির অবস্থাকে এই সত্যটির সপক্ষে এই মর্মে সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হয়েছে যে, এই দুনিয়াটা মানুষের জন্য কোন আরাম আয়োশের জায়গা নয়। এখানে ডোগ বিলাসে মন্তব্য হয়ে আনন্দ উপ্রাপ্ত করার জন্য তাকে পয়দা করা হয়েছি। বরং এখানে কষ্টের মধ্যেই তার জন্য হয়েছে। এই বিষয়বস্তুটিকে সূরা আল নাজ্মের লিস্ত লান্সান। **لَيْسَ لِلْأَنْسَانِ مَا يَشَاءُ** মানুষ যতটুকু প্রচেষ্টা চালাবে ততটুকু ফলেরই সে অধিকারী হবে। আয়াতটির সাথে মিলিয়ে দেখলে একথা একেবারে

সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুনিয়ার এই কর্মচাঙ্গল্যে মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার কর্মতৎপরতা, প্রচেষ্টা, পরিষম ও কষ্টসহিষ্ণুতার ওপর।

এরপর মানুষই যে এখানে সবকিছু এবং তার ওপর এমন কোন উচ্চতর ক্ষমতা নেই যে তার কাজের তত্ত্বাবধান করবে এবং তার কাজের যথাযথ হিসেব নেবে, তার এই ভুল ধারণা দূর করে দেয়া হয়েছে।

তারপর মানুষের বহুতর জাহেলী নৈতিক চিন্তাধারার মধ্য থেকে একটিকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করে দুনিয়ায় সে অহংকার ও প্রেষ্ঠত্বের যেসব ভুল মানদণ্ডের প্রচলন করে রেখেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের বড়াই করার জন্য বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ ব্যয় করে সে নিজেও নিজের এই বিপুল ব্যয় রহস্যের জন্য গর্ব করে এবং লোকেরা তাকে বাহবা দেয়। অর্থ যে সর্বশক্তিমান সত্তা তার কাজের তত্ত্বাবধান করছেন তিনি দেখতে চান, সে এই ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে এবং কিভাবে, কি উদ্দেশ্যে এবং কোন মনোভাব সহকারে এসব ব্যয় করছে।

এরপর মহান আল্লাহ বলছেন, আমি মানুষকে জানের বিভিন্ন উপকরণ এবং চিন্তা ও উপলক্ষ্মির যোগ্যতা দিয়ে তার সামনে তালো ও মন্দ দু'টো পথই উন্মুক্ত করে দিয়েছি। একটি পথ মানুষকে নৈতিক অধিপাতে নিয়ে যায়। এ পথে চলার জন্য কোন কষ্ট স্বীকার করতে হয় না। বরং তার প্রবৃত্তি সাধ মিটিয়ে দুনিয়ার সম্পদ উপভোগ করতে থাকে। দ্বিতীয় পথটি মানুষকে নৈতিক উন্নতির দিকে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্ম গিরিপথের মতো। এ পথে চলতে গেলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটাতে হয়। কিন্তু নিজের দুর্বলতার কারণে মানুষ এই গিরিপথে ওঠার পরিবর্তে গভীর খাদের মধ্যে গড়িয়ে পড়াই বেশী পছন্দ করে।

তারপর যে গিরিপথ অতিক্রম করে মানুষ ওপরের দিকে যেতে পারে সেটি কি তা আল্লাহ বলেছেন। তা হচ্ছে : গর্ব ও অহংকার মূলক এবং লোক দেখানো ও প্রদর্শনী মূলক ব্যয়ের পথ পরিভ্যাগ করে নিজের ধন-সম্পদ এতিম ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহর প্রতি ও তাঁর দীনের প্রতি দ্বিমান আনতে হবে আর দ্বিমানদারদের দলের অন্তরভুক্ত হয়ে এমন একটি সমাজ গঠনে অংশ গ্রহণ করতে হবে, যা ধৈর্য সহকারে সত্ত্বাপ্রাপ্তির দাবী পূরণ এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি করণা প্রদর্শন করবে। এই পথে যারা চলে তারা পরিণামে আল্লাহর রহমতের অধিকারী হয়। বিপরীত পক্ষে অন্যপথ অবলম্বনকারীরা জাহানামের আগন্তে জ্বলবে। সেখান থেকে তাদের বের হবার সমস্ত পথই খাকবে বৰ্ক।

আয়াত ২০

সূরা আল বালাদ-মক্কী

কুরুক্ষেত্র ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় যেহেরবান আল্লাহর নামে

لَا أَقْسِرُ بِمَنِ الْبَلِيٌّ وَأَنْفَحْ حِلْ بِمَنِ الْبَلِيٌّ وَالِّي وَمَا
 وَلَنِ لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا نَسَانَ فِي كَبِيٌّ أَيْحَسَبَ أَنْ لَنْ يَنْقِلْ
 عَلَيْهِ أَحَدٌ

না,^১ আমি কসম খাছি এই নগরের,^২ আর অবস্থা হচ্ছে এই যে (হে নবী!)
 তোমাকে এই নগরে হালাল করে নেয়া হয়েছে।^৩ কসম খাছি বাপের এবং তার
 উরসে যে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার।^৪ আসলে আমি মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের
 মধ্যে সৃষ্টি করেছি।^৫ সে কি মনে করে বেঝেছে, তার উপর কেউ জোর খাটোতে
 পারবে না?^৬

১. ইতিপূর্বে সূরা কিয়ামাহর ১ ঢাকায় “না” বলে বক্তব্য শুরু করে তারপর কসম
 খেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছি। সেখানে
 আমি বলেছি, এভাবে বক্তব্য শুরু করার মানে হয়, লোকেরা কোন ভুল কথা বলছিল,
 তার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, আসল কথা তা নয় যা তোমরা মনে করছো বরং আমি
 অমুক অমুক জিনিসের কসম খেয়ে বলছি আসল ব্যাপার হচ্ছে এই। এখন প্রশ্ন দেখা
 দেয়, যে কথার প্রতিবাদে এই ভাষণটি নায়িল হয়েছে সেটি কি ছিল? এর জবাবে বলা
 যায়, পরবর্তী আলোচ্য বিষয়টি একথা প্রকাশ করছে। মক্কার কাফেররা বলছিল, আমরা
 যে ধরনের জীবনধারা অবলম্বন করেছি তাতে কোন দোষ নেই, কোন গলদ নেই।
 খাও-দাও ফুর্তি করো, তারপর একদিন সময় এলে টুপ করে মরে যাও, ব্যাস, এই তো
 দুনিয়ার জীবন! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) খামখা আমাদের এই
 জীবনধারাকে ক্রটিপূর্ণ গণ্য করছেন এবং আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন, এসব ব্যাপারে আবার
 নাকি আমাদের একদিন জবাবদিহি করতে হবে এবং নিজেদের কাজের জন্য আমাদের
 শাস্তি ও পুরস্কার লাভ করতে হবে।

২. অর্থাৎ মক্কা নগরের। এখানে এই নগরের কসম কেন খাওয়া হচ্ছে সে কথা বলার
 কোন প্রয়োজন ছিল না। মক্কাবাসীরা নিজেরাই তাদের নগরের পটভূমি জানতো। তারা
 জানতো, কিভাবে পানি ও বৃক্ষলতাহীন একটি ধূসর উপত্যকায় নির্জন পাহাড়ের

মাঝখানে হয়েরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের এক স্তু ও একটি দুধের বাঢ়াকে এখানে এনে নিঃসংগতভাবে ছেড়ে গিয়েছিলেন। কিভাবে এখানে একটি ঘর তৈরি করে হজ্জের ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। অথচ বহু দূর-দূরাত্তে এই ঘোষণা শোনারও কেউ ছিল না। তারপর কিভাবে একদিন এই নগরটি সমগ্র আরবের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং এমন একটি 'হারম'-সম্মানিত স্থান হিসেবে গণ্য হলো, যা শত শত বছর পর্যন্ত আরবের সরজিমিনে, যেখানে আইন শৃঙ্খলার কোন অস্তিত্বই ছিল না সেখানে এই নগরটি ছাড়া আর কোথাও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যেতো না।

৩. মূলে বলা হয়েছে **أَنْتَ حَلٌّ بِهِذَا الْبَلَدِ**। মুফাস্সিরগণ এর তিনটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এক, তুমি এই শহরে 'মুকীম' অর্থাৎ মুসাফির নও। তোমার 'মুকীম' হবার কারণে এই শহরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বেড়ে গেছে। দুই, যদিও এই শহরটি 'হারম' তবুও এমন এক সময় আসবে যখন কিছুক্ষণের জন্য এখানে মুক্ত করা তোমার জন্য হালাল হয়ে যাবে। তিনি, এই শহরের বনের পশ্চদের পর্যন্ত মেরে ফেলা এবং গাছপালা পর্যন্ত কেটে ফেলা আরববাসীদের নিকট হারাম এবং সবাই এখানে নিরাপত্তা লাভ করে। কিন্তু অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে হে নবী, তোমার জন্য এখানে কোন নিরাপত্তা নেই। তোমাকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয়া এবং তোমাকে হত্যা করার উপায় উদ্ভাবন করা হালাল করে নেয়া হয়েছে। যদিও এখানে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে তিনটি অর্থেরই অবকাশ রয়েছে তবুও পরবর্তী বিশ্ববস্তু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, প্রথম অর্থ দু'টি এর সাথে কোন সম্পর্কই রাখে না এবং তৃতীয় অর্থটির সাথে এর মিল দেখা যায়।

৪. যেহেতু বাপ ও তার উরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তানদের ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সামনের দিকে মানুষের কথা বলা হয়েছে, তাই বাপ মানে আদম আলাইহিস সালামই হতে পারেন। আর তাঁর উরসে জন্ম গ্রহণকারী সন্তান বলতে দুনিয়ায় বর্তমানে যত মানুষ পাওয়া যায়, যত মানুষ অতীতে পাওয়া গেছে এবং তবিষ্যতেও পাওয়া যাবে সবাইকে বুঝানো হয়েছে।

৫. ওপরে যে কথাটির জন্য কসম খাওয়া হয়েছে এটিই সেই কথা। মানুষকে কষ্ট ও পরিশ্রমের মধ্যে সৃষ্টি করার মানে হচ্ছে এই যে, এই দুনিয়ায় আনন্দ উপভোগ করার ও আরামে শুয়ে শুয়ে শুধুর বাঁশী বাজাবার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং তার জন্য এ দুনিয়া পরিশ্রম, মেহনত ও কষ্ট করার এবং কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার জায়গা। এই অবস্থা অতিক্রম না করে কোন মানুষ সামনে এগিয়ে যেতে পারে না। এই মুক্তি শহর সাক্ষী, আল্লাহর কোন এক বাল্দা এক সময় কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন বলেই আজ এই শহরটি আবাদ হয়েছে এবং আরবের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই শহরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সাক্ষ দিচ্ছে, একটি আদর্শের খাতিরে তিনি নানা প্রকার বিপদের সম্মুখীন হচ্ছেন।

বন্য পশুদের পর্যন্ত এখানে নিরাপত্তা আছে কিন্তু তাঁর প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই। আর মায়ের গর্ভে এক বিন্দু শুক্র হিসেবে অবস্থান লাভের পর থেকে নিয়ে মৃত্যুকালে শেষ নিঃস্থাসাটি ত্যাগ করা পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের জীবন এই মর্মে সাক্ষ দিচ্ছে যে, তাকে প্রতি পদে পদে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত, বিপদ ও কঠিন অবস্থার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। যাকে তোমরা দুনিয়ায় সবচেয়ে লোভনীয় অবস্থায় দেখছো সেও যখন

يَقُولُ أَهْلُكُتْ مَا لِلْبَدَأِ ۚ أَيْحَسَبْ أَنْ لَمْ يَرِهِ أَهْلُ
 الْأَرْضِ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنِيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۖ وَهَلْ يَنْهِ
 النَّجْلَيْنِ ۗ فَلَا اقْتَحَمَ الرَّغْبَةَ ۗ وَمَا أَدْرِكَ مَا الرَّغْبَةَ ۗ
 فَكُلْ رَغْبَةً ۗ أَوْ اطْعَمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۗ يَتَمَّمَا ذَامَرَبَةٍ ۗ
 أَوْ مِسْكِينًا ذَامَرَبَةٍ ۗ

সে বলে, আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।^৭ সে কি মনে করে কেউ তাকে দেখেনি?^৮ আমি কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহবা ও দু'টি ঠোট দেইনি?^৯ আমি কি তাকে দু'টি সুস্পষ্ট পথ দেখাইনি?^{১০} কিন্তু সে দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করার সাহস করেনি।^{১১} তুমি কী জানো সেই দুর্গম গিরিপথটি কি? কোন গলাকে দাসত্বাত্মক করা অথবা অনাহারের দিন কোন নিকটবর্তী এতিম বা ধূলি মলিন মিস্কিনকে থাবার খাওয়ানো।^{১২}

মায়ের পেটে অবস্থান করছিল তখন সর্বক্ষণ তার মরে যাওয়ার তয় ছিল। সে মায়ের পেটেই মরে যেতে পারতো। অথবা গর্ভপাত হয়ে তার দফারফা হয়ে যেতে পারতো। প্রসবকালে তার মৃত্যু ও জীবনের মধ্যে মাত্র এক চুলের বেশী দূরত্ব ছিল না। জন্মাত করার পর সে এত বেশী অসহায় ছিল যে, দেখাশুনা করার কেউ না থাকলে সে একাকী পড়ে মরে যেতো। একটু ইটা চুলার ক্ষমতা লাভ করার পর প্রতি পদে পদে আঢ়াড় খেয়ে পড়তো। শৈশব থেকে ঘোবন এবং তারপর বার্ধক্য পর্যন্ত তাকে এমন সব শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয়েছে যে, এর মধ্য থেকে কোন একটি পরিবর্তনও যদি ডুল পথে হতো তাহলে তার জীবন বিপর হতো। সে যদি বাদশাহ বা একন্যায়ক হয় তাহলে কোন সময় কোথাও তার বিরুদ্ধে কোন ঘড়্যন্ত না হয় এই ভয়ে সে এক মৃহূত নিশ্চিন্তে আরাম করতে পারে না। সে বিশ্ববিজয়ী হলেও তার সেনাপতিদের মধ্য থেকে কেউ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করে বসে এই ভয়ে সে সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে। সে নিজের যুগে কারনের মতো ধনী হলেও কিভাবে নিজের ধন-সম্পদ আরো বাঢ়াবে এবং কিভাবে তা রক্ষা করবে, এই চিন্তায় সবসময় পেরেশান থাকে। মোটকথা কোন ব্যক্তিও নিরিবাদে শাস্তি, নিরাপত্তা ও নিচ্ছন্তার নিয়ামত লাভ করেনি। কারণ মানুষের জন্মই হয়েছে কষ্ট, পরিশ্রম, মেহনত ও কঠিন অবস্থার মধ্যে।

৬. অর্থাৎ এসব অবস্থার মধ্যে যে মানুষ ঘেরাও হয়ে আছে সে কি এই অহংকারে মন হয়েছে যে, দুনিয়ায় সে যা ইচ্ছা করে যাবে, তাকে পাকড়াও করার ও তার মাথা নীচু করাবার মতো কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই? অথচ আবেরাত আসার আগে এই

দুনিয়াতেই সে প্রতি মুহূর্তে দেখছে, তার তকদীরের ওপর অন্য একজনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্তের সামনে তার নিজের সমস্ত জারিজুরি, কলা-কৌশল পুরোপুরি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ভূমিকাম্পের একটি ধাক্কা, ঘূর্ণিঝড়ের একটি আঘাত এবং নদী ও সাগরের একটি জলোচ্ছাস তাকে একথা বলে দেবার জন্য যথেষ্ট যে, আল্লাহর শক্তির তুলনায় সে কঠটুকু ক্ষমতা রাখে। একটি আকর্ষিক দুর্ঘটনা একজন সুস্থ সবল সক্ষম মানুষকে পংশু করে দিয়ে যায়। তাগের একটি পরিবর্তন একটি প্রবল পরাক্রান্ত বিপুল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তিকে আকাশ থেকে পাতালে নিষ্কেপ করে। উন্নতির উচ্চতম শিখরে অবস্থানকারী জাতিদের ভাগ্য যখন পরিবর্তিত হয় তখন এই দুনিয়ায় যেখানে তাদের চোখে চোখ মেলাবার হিস্ত কারোর ছিল না সেখানে তারা লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়। এহেন মানুষের মাথায় কেমন করে একথা স্থান পেলো যে, তার ওপর কারোর জোর খাটবে না?

৭. أَنْفَقْتُ مَا لِبْدًا **আমি** প্রচুর ধন-সম্পদ খরচ করেছি বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে **আমি প্রচুর ধন-সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি।** এই শব্দগুলোই প্রকাশ করে, বজ্ঞা তার ধন-সম্পদের প্রাচুর্যে কী পরিমাণ গর্বিত। যে বিপুল পরিমাণ ধন সে খরচ করেছে নিজের সামগ্রিক সম্পদের তুলনায় তার কাছে তার পরিমাণ এত সামান্য ছিল যে, তা উড়িয়ে বা ফুকিয়ে দেবার কোন পরোয়াই সে করেনি। আর এই সম্পদ সে কোনু কাজে উড়িয়েছে? কোন প্রকৃত নেকীর কাজে নয়, যেমন সামনের আয়তগুলো থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। বরং এই সম্পদ সে উড়িয়েছে নিজের ধনাঢ়িতার প্রদর্শনী এবং নিজের অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করার জন্য। তোশামোদকারী কবিদেরকে সে বিপুলভাবে পুরস্কৃত করেছে। বিবাহ ও শোকের মজলিসে হাজার হাজার লোককে দাওয়াত দিয়ে আহার করিয়েছে। জুয়ায় খেলায় গো-হারা হেরে বিপুল পরিমাণ অর্থ খুইয়েছে। জুয়ায় জিতে শত শত উট জবাই করে ইয়ার বকুলের ভূরি তোজন করিয়াছে। মেলায় ধূমধাম করে গিয়েছে এবং অন্যান্য সরদারদের চাইতে অনেক বেশী জাঁকজমক ও আড়ুব দেখিয়েছে। উৎসবে অচেল খাবার তৈরি করেছে এবং যে চায় সে এসে খেয়ে যেতে পারে বলে সব মানুষকে খাবার জন্য সাধারণ আহবান জানিয়েছে অথবা নিজের বাড়িতে প্রকাশ্য লংঘনখানা খুলে দিয়েছে, যাতে দূর-দূরান্তে একথা ছড়িয়ে পড়ে যে, অমুক ধর্মীর দানশীলতার তুলনা নেই। এসব এবং এই ধরনের আরো অনেক প্রদর্শনীমূলক ব্যয় বহু ছিল যেগুলোকে জাহেলী যুগে মানুষের দানশীলতা ও উদার্যের নির্দশন এবং তার শ্রেষ্ঠত্বের নিশানী মনে করা হতো। এসবের জন্য তাদের প্রশংসন উৎকো বাজতো, তাদের প্রশংসন কবিতা রচিত ও পঢ়িত হতো এবং তারা নিজেরাও এজন্য অন্যের মোকাবেলায় নিজেদের গৌরব করে বেড়াতো।

৮. أَر্থাৎ এই গৌরবকারী কি দেখে না, ওপরে আল্লাহও একজন আছেন? তিনি দেখছেন সবকিছু। কোনু পথে সে এ ধন-সম্পদ উপার্জন করেছে, কোনু কাজে ব্যয় করেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, কোনু নিয়তে ও স্বার্থে সে এসব কাজ করেছে তা তিনি দেখছেন। সে কি মনে করে, আল্লাহর ওখানে এই অমিতব্যয়িতা, খ্যাতিলাভের আকাখ্যা ও অহংকারের কোন দাম হবে? সে কি মনে করে, দুনিয়ায় মানুষ যেমন তার কাজেকর্মে প্রতারিত হয়েছে তেমনি আল্লাহও প্রতারিত হবেন?

৯. এর অর্থ হচ্ছে, আমি কি তাকে জ্ঞান ও বৃক্ষির উপকরণগুলো দেইনি? দু'টি চোখ মানে গরু ছাগলের চোখ নয়, মানুষের চোখ। যে চোখ মেলে তাকালে চারদিকে এমনসব নিশালী নজরে পড়বে, যা মানুষকে প্রকৃত সত্যের সঞ্চান দেবে এবং তাকে ভুল ও নির্ভুল এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুবিয়ে দেবে। জিহবা ও ঠোট মানে নিছক কথা বলার যন্ত্র নয় বরং যে ব্যক্তি কথা বলে এবং ঐ যন্ত্রগুলোর পেছনে বসে যে ব্যক্তি চিন্তা যোগায় তারপর মনের কথা প্রকাশ করার জন্যে তার সাহায্য গ্রহণ করে।

১০. অর্থাৎ শুধুমাত্র বৃক্ষি ও চিন্তার শক্তি দান করে তাকে নিজের পথ নিজে খুঁজে নেবার জন্য হেঢ়ে দেইনি। বরং তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি। তার সামনে ভালো ও মন্দ এবং নেকী ও গোনাহের দু'টি পথ সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছি। ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তার মধ্য থেকে নিজ দায়িত্বে যে পথটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করতে পারে। সূরা দাহরণে এই একই কথা বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে: "আমি মানুষকে একটি মিথিত বীর্য থেকে পয়দা করেছি, যাতে তার পরীক্ষা নেয়া যায় এবং এ উদ্দেশ্যে আমি তাকে ঘৰণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী করেছি। আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে সে শোকরকারী হতে পারে বা কুফরকারী।" (২-৩ আয়াত) আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ্দাহর ৩-৫ টাকা।

১১. মূল বাক্যটি হচ্ছে, **فَلَا أَفْتَنْمُ الْعَقْبَةَ** এখানে ইকতিহাম (افتحام) মানে হচ্ছে, নিজেকে কোন কঠিন ও পরিশ্রম সাধ্য কাজে নিযুক্ত করা। আর পর্বতশৃঙ্গে যাবার জন্য পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয় তাকে বলা হয় আকাবাহ (عقبة)। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে, দু'টি পথ আমি তাকে দেখিয়েছি। একটি গেছে ওপরের দিকে। কিন্তু সেখানে যেতে হলে খুব কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হয়। সে পথটি বড়ই দুর্গম। সে পথে যেতে হলে মানুষকে নিজের প্রবৃত্তি ও তার আকাবাহ এবং শয়তানের প্রয়োচনার সাথে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। আর দ্বিতীয় পথটি বড়ই সহজ। এটি খাদের মধ্যে নেমে গেছে। এই পথ দিয়ে নীচের দিকে নেমে যাবার জন্য কোন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। বরং এ জন্য শুধুমাত্র নিজের প্রবৃত্তির বীধনটা একটু আলগা করে দেয়াই যথেষ্ট। তারপর মানুষ আপনা আপনি গড়িয়ে যেতে থাকে। এখন এই যে ব্যক্তিকে আমি দু'টি পথই দেখিয়ে দিয়েছিলাম সে ঐ দু'টি পথের মধ্য থেকে নীচের দিকে নেমে যাবার পথটি গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ওপরের দিকে যে পথটি গিয়েছে সেটি পরিত্যাগ করেছে।

১২. ওপরে তার অমিতব্যয়িতার কথা বলা হয়েছে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রদর্শনী ও অহংকার প্রকাশ করার জন্য সে অর্থের অপচয় করতো। তাই এখানে তার মোকাবেলায় এমন ব্যয় ও ব্যয়ক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে যা মানুষের নৈতিক অধিপতন রোধ করে তাকে উর্ভার দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এতে প্রবৃত্তির কোন সুখানুভব নেই। বরং এ জন্য মানুষকে প্রবৃত্তির ওপর জোর খাটিয়ে ত্যাগের মহড়া দিতে হয়। নিজেই কোন দাসকে দাসত্বমুক্ত করে সেই ব্যয়ের দৃষ্টিতে পেশ করা যায়। অথবা তাকে আর্থিক সাহায্য করা যেতে পারে। তার ফলে সে নিজের মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে পারে। অথবা অর্থ সাহায্য করে কোন গরীবের গলাকে ঝণমুক্ত করা যেতে পারে। অথবা কোন অসচল ব্যক্তি যদি কোন অর্থদণ্ডের বোঝার তলায় চাপা পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে তা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে কোন নিকটবর্তী (অর্থাৎ আত্মায় বা

প্রতিবেশী) এতিম এবং এমন কোন ধরনের অসহায় অভাবীকে আহার করিয়ে এই অর্থ ব্যয় করা যায় যাকে দারিদ্র ও উৎকট অর্থহীনতা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে এবং যাকে হাত ধরে তোলার ক্ষেত্রে নেই। এই ধরনের লোকদের সাহায্য করলে মানুষের খ্যাতির ডংকা বাজে না। এদেরকে খাওয়ালে কারো ধনাড়াও ও বদান্যতার তেমন কোন চৰ্চা হয় না। বরং হাজার হাজার সংচল ব্যক্তি ও ধনীদের জন্য শান্দার জিয়াফতের ব্যবস্থা করে তার তুলনায় অনেক বেশী শোহরতের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু নৈতিক উন্নতির পথটি এই দুর্গম গিরিপথটি অতিক্রম করেই এগিয়ে গেছে।

এই আয়াতগুলোতে যেসব সৎকাজের উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বাণীর মাধ্যমে সেগুলোর বিপুল মর্যাদা ও সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। فَكُلْ رَقْبَةً (গলাকে দাসত্বমুক্ত করা) সম্পর্কিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৰ্ষ হাদীস উদ্বৃত্ত হয়েছে। একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন হয়রত আবু হুরাইরা (রা)। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি একজন মু'মিন গোলামকে আযাদ করে আল্লাহ ঐ গোলামের প্রতিটি অংগের বদলে আযাদকারীর প্রতিটি অংগকে জাহানামের আগুন থেকে বীচাবেন। হাতের বদলে হাত, পায়ের বদলে পা এবং লজ্জাস্থানের বদলে লজ্জাস্থান। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসাই।) হয়রত আলী ইবনে হসাইন (ইমাম যাইনুল আবেদীন) এই হাদীসের বর্ণনাকারী সা'দ ইবনে মারজানাহকে জিজ্ঞেস করেন, তুঃ কি নিজে আবু হুরাইরার (রা) কাছ থেকে এ হাদীসটি শুনেছো? তিনি জবাব দেন, হাঁ। কথা শুনে ইমাম যাইনুল আবেদীন নিজের সবচেয়ে মূল্যবান গোলামটিকে ডাকেন এবং সেই মুহূর্তেই তাকে আযাদ করে দেন। মুসলিম শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে, এই গোলামটির জন্য লোকেরা তাঁকে দশ হাজার দিরহাম দিতে চেয়েছিল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম শা'বী (র) এই আয়াতের ভিত্তিতে বলেন, গোলাম আযাদ করা সাদকার চাইতে ভালো। কারণ আল্লাহ সাদকার কথা বলার আগে তার কথা বলেছেন।

মিসকিনদের সাহায্য করার ফজিলত সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও অসংখ্য হাদীসে উদ্বৃত্ত হয়েছে। এর মধ্যে হয়রত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

الساعي على الارملة والمسكين كالساعي في سبيل الله واحسبه

قال كالقائم لا يفتروكا لصائم لا يفطر -

শিখিবা ও মিসকিনদের সাহায্যার্থে যে ব্যক্তি প্রচেষ্টা চালায় সে আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত ব্যক্তির সমতুল্য। (আর হয়রত আবু হুরাইরা বলেন :) আমার মনে হচ্ছে, রসূলুল্লাহ (সা) একথাও বলেন যে, সে ঠিক সেই ব্যক্তির মতো যে নামাযে রত আছে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে নামায পড়ে যাচ্ছে, আরাম করছে না এবং সেই রোয়াদারের মতো যে অনবরত রোয়া রেখে যাচ্ছে, কখনো রোয়া ভাঙ্গে না।” (বুখারী ও মুসলিম)

এতিমদের সম্পর্কেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য বাণী রয়েছে। হয়রত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ أَمْنَوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا
بِالْمَرْحَمَةِ ۖ ۗ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِاِيمَانِنَا
هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْنَمَةِ ۖ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَلَةٌ ۖ ۗ

তারপর (এই সংগে) তাদের মধ্যে শামিল হওয়া যারা ঈমান এনেছে^{১৩} এবং যারা পরম্পরকে সবর ও (আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি) রহম করার উপদেশ দেয়।^{১৪} এরাই ডানপন্থী। আর যারা আমার আয়ত মানতে অঙ্গীকার করেছে তারা বামপন্থী।^{১৫} এদের উপর আগুন হচ্ছে থাকবে।^{১৬}

বলেন : “যে ব্যক্তি কোন আত্মীয় বা অনাত্মীয় এতিমের ভরণ পোষণ করে সে ও আমি জানাতে ঠিক এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলী দু’টি পাশাপাশি রেখে দেখান এবং দু’টি আঙুলের মধ্যে সামান্য ফাঁক রাখেন।” (বুখারী) হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উদ্বৃত্ত করেছেন, “মুসলমানদের বাড়িগুলোর মধ্যে যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে সম্বৰহার করা হচ্ছে সেটিই সর্বোত্তম বাড়ি এবং যে বাড়িতে কোন এতিমের সাথে অসম্বৰহার করা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে খারাপ বাড়ি।” (ইবনে মাজাহ, বুখারী ফিল আদাবিল মুফরাদ)। হ্যরত আবু উমামাহ বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “যে ব্যক্তি কোন এতিমের মাথার হাত বুলায় এবং নিছক আগ্রাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বুলায়, সে ঐ এতিমের মাথায় যতগুলো চুলের উপর হাত বুলিয়েছে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে তার জন্য নেকী শেখা হবে। আর যে ব্যক্তি কোন এতিম ছেলে বা মেয়ের সাথে সম্বৰহার করে সে ও আমি জানাতে এভাবে থাকবো। একথা বলে তিনি নিজের দু’টি আঙ্গুল মিলিয়ে দেখান। (মুসনাদে আহমাদ ও তিরমিয়ী)। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “যে ব্যক্তি নিজের পানাহারে কোন এতিমকে শামিল করে আল্লাহ তার জন্য জানাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন। তবে সে ব্যক্তি যদি ক্ষমার অযোগ্য কোন গোলাহ করে থাকে তাহলে তিনি কথা (শারহস সুন্নাহ) হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করেন, “আমার মন বড় কঠিন।” রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন, “এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং মিসকিনকে আহার করাও।” (মুসনাদে আহমাদ)।

১৩. অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত গুণাবলী অর্জনের সাথে সাথে তার জন্য মু’মিন হওয়াও জরুরী। কারণ ঈমান ছাড়া কোন কাজ সৎকাজ হিসেবে চিহ্নিত হতে এবং আগ্রাহের কাছেও গৃহীত হতে পারে না। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঈমান সহকারে যে সৎকাজ করা হয় একমাত্র সেটিই নেকী ও মুক্তির উপায় হিসেবে গৃহীত হয়। যেমন সূরা নিসায় বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করে সে যদি মু’মিন হয়, তাহলে সে জানাতে প্রবেশ করবে।” (১২৪)

আয়াত) সূরা নাহলে বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে ব্যক্তিই সৎকাজ করবে সে যদি মু’মিন হয় তাহলে আমি তাকে পবিত্র জীবন যাপন করাবো এবং এই ধরনের লোকদেরকে তাদের সর্বোত্তম কাজ অনুযায়ী প্রতিদান দেবো।” (১৭ আয়াত) সূরা মু’মিনে বলা হয়েছে : “পুরুষ বা নারী যে-ই সৎকাজ করবে সে যদি মু’মিন হয় তাহলে সে জাগ্রাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাকে দেয়া হবে বেহিসেব রিযিক।” (৪০ আয়াত) যে কোন ব্যক্তিই কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন এ কিতাবের যেখানেই সৎকাজ ও তার উত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেখানেই অবশ্যই তার সাথে ঈমানের শর্ত লাগানো হয়েছে। ঈমান বিহীন আমল আল্লাহর কাছে কোথাও গ্রহণযোগ্য হয়নি। কোথাও এ ধরনের কাজের বিনিয়য়ে কোন প্রতিদানের আশ্বাস দেয়া হয়নি। এ প্রসংগে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, আয়াতে একথা বলা হয়নি, “তারপর সে ঈমান এনেছে।” বরং বলা হয়েছে, “তারপর সে তাদের মধ্যে শামিল হয়েছে যারা ঈমান এনেছে।” এর অর্থ হয়, নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে তার নিজের ঈমান আনাই কেবলমাত্র এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং এখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে সে দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ঈমান এনেছে তার সাথে শামিল হয়ে যাবে। এর ফলে ঈমানদারদের একটি জামায়াত তৈরি হয়ে যাবে। মু’মিনদের একটি সমাজ গড়ে উঠবে। সামগ্রিক ও সমাজবন্ধভাবে নেকী, সততা ও সৎবৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যেগুলো প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঈমানের দাবী। অন্যদিকে অসৎবৃত্তি ও পাপ নির্মূল হয়ে যাবে, যেগুলো খতম করাই ছিল ঈমানের মৌলিক চাহিদার অঙ্গরভূত।

১৪. এখানে মুসলিম সমাজের দু’টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টকে দু’টি ছেট ছেট বাক্যে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম বৈশিষ্ট হচ্ছে, এই সমাজের সদস্যরা পরম্পরাকে সবর করার উপদেশ দেবে এবং দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে, তারা পরম্পরাকে রহম ও পরম্পরার প্রতি মেহাদ্ব ব্যবহারের উপদেশ দান করবে।

সবরের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বাবার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি, কুরআন মজীদ যে ব্যাপক অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার করেছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে মু’মিনের সমগ্র জীবনকেই সবরের জীবন বলা যায়। ঈমানের পথে পা রাখার সাথে সাথেই মানুষের সবরের পরীক্ষা শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ যেসব ইবাদাত ফরয করেছেন, সেগুলো সম্পাদন করতে গেলে সবরের প্রয়োজন। আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করার ও সঠিকভাবে মেনে চলার জন্যও সবরের দরকার। আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন সবরের সাহায্য ছাড়া সেগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়াও কঠিন। নৈতিক অসৎবৃত্তি পরিহার করা ও সৎবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য সবরের প্রয়োজন। প্রতি পদে পদে গোনাহ মানুষকে উতুক করে। তার মোকাবেলা করা সবর ছাড়া সম্ভব নয়। জীবনের এমন বহু সময় আসে যখন আল্লাহর আইনের আনুগত্য করলে বিপদ-আপদ, কষ্ট, ক্ষতি ও বঞ্চণার সম্মুখীন হতে হয়। আবার এর বিপরীত পক্ষে নাফররমানির পথ অবলম্বন করলে লাভ, ফায়দা, আনন্দ ও তোগের পেয়ালা উপচে পড়তে দেখা যায়। সবর ছাড়া কোন মু’মিন এ পর্যায়গুলো নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারে না। তারপর ঈমানের পথ অবলম্বন করতেই মানুষ বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। নিজের স্তন-স্তুতির, পরিবারের, সমাজের, দেশের, জাতির ও সারা দুনিয়ার মানুষ ও জীবন শয়তানদের। এমনকি তাকে আল্লাহর পথে হিজরত এবং জিহাদও করতে হয়। এসব

অবস্থায় একমাত্র সবরের গুণই মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল রাখতে পারে। একথা সুস্পষ্ট যে, এক একজন মু'মিন একা একা যদি এই ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, তাহলে তার সবসময় পরাজিত হবার ভয় থাকে। অতি কঠো হয়তো সে কখনো সাফল্য লাভ করতে পারে। বিপরীত পক্ষে যদি মু'মিনদের এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত থাকে, যার প্রত্যেকটি সদস্য সবরকারী হয় এবং এই সমাজের সদস্যরা সকরের এই ব্যাপকতর পরীক্ষায় পরম্পরাকে সাহায্য সহায়তা দান করতে থাকে তাহলে সাফল্যের ডালি এই সমাজের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। সেখানে পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শীমাইন শক্তির প্রবাহ সৃষ্টি হবে। এভাবে মানুষের সমাজকে ন্যায়, সততা ও নেকীর পথে আনার জন্য একটি জবরদস্ত শক্তিশালী সেনাবাহিনী তৈরি হয়ে যাবে।

আর রহমের ব্যাপারে বলা যায়, ইয়ানদারদের সমাজের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, এটা কোন জালেম, নির্দয়, বেরহম, পাষাণ হৃদয় ও হৃদয়হীনদের সমাজ হয় না। বরং সমগ্র মানবতার জন্য এটি হয় একটি মেহেলী, করণাপ্রবণ এবং নিজেদের পরম্পরারের জন্য সহানৃতিশীল ও পরম্পরারের দুঃখে-শোকে বেদনা অনুভবকারী একটি সৎবেদনশীল সমাজ। ব্যক্তি হিসেবেও একজন মু'মিন হয় আল্লাহর কর্মণার মূর্ত প্রকাশ এবং দলগতভাবেও মু'মিনদের দল আল্লাহর এমন এক নবীর প্রতিনিধি যার প্রশংসন্য বলা হয়েছে- **وَمَا أَرْسَلْنَاكُمْ لِتُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ** (বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও করণা হিসেবেই তোমাকে পাঠিয়েছি।) (আবিয়া : ১০৭) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উষ্মাতের মধ্যে এই রহম ও করণাবৃত্তিটির মতো উন্নত নৈতিক বৃত্তিটিকেই সবচেয়ে বেশী প্রসারিত ও বিকশিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত ব্রহ্ম তাঁর নিম্নোক্ত বাণিজ্যগুলো দেখুন। এগুলো থেকে তাঁর দৃষ্টিতে এর গুরুত্ব কি ছিল তা জানা যাবে। হযরত জারীর ইবনে আবদ্দুল্লাহ রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ

“যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি রহম করে না, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না।”

(বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদ্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

أَرْجِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَانُ - اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ -

“রহমকারীদের প্রতি আল্লাহ রহম করেন। পৃথিবীবাসীদের প্রতি রহম করো। আকাশবাসী তোমার প্রতি রহম করবেন।” (আবু দাউদ ও তিরমিয়ী)

হযরত আবু সাইদ খুদুরী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : “যে ব্যক্তি রহম করে না তার প্রতি রহম করা হয় না।” (বুখারী ফিল আদাবিল মুফস্রাদ)

হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَفَّيْرَنَا وَلَمْ يُؤْقِرْ كَبِيرَتَا

“যে ব্যক্তি আমাদের ছেটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়।” (তিরিমিয়া)

ইমাম আবু দাউদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদীসটি হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে আমরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَفَّيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَتَا فَلَيْسَ مِنَّا

“যে ব্যক্তি আমাদের ছেটদের প্রতি রহম করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না, সে আমাদের দলভূক্ত নয়।”

হয়েরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমি আবুল কাসেম (নবী কৃষ্ণম) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বক্তব্য শুনেছি : “হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় থেকেই রহম তুলে নেয়া হয়।” (মুসনাদে আহমাদ, তিরিমিয়া)

হয়েরত ঈয়ায় ইবনে হিমার (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি ধরনের লোক জানাতী। তার মধ্যে একজন হচ্ছে :

رَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٌ -

“যে ব্যক্তি প্রত্যেক অঙ্গীয় ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দয়াপূর্ণ হৃদয় ও কোমল প্রাণ”
(মুসলিম)

হয়েরত নু’মান ইবনে বশীর বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

تَبَرَّى الْمُؤْمِنِينَ وَتَرَاهُمْ وَتَوَاهُمْ وَتَعَا طَفُّهُمْ كَمَثْلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمْى -

“তোমরা মু’মিনদেরকে পরম্পরারের মধ্যে রহম, ভালোবাসা ও সহানুভূতির ব্যাপারে একটি দেহের মতো পাবে। যদি একটি অংগে কোন কষ্ট অনুভূত হয় তাহলে সারা দেহ তাতে নিপ্রাইনতা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।” (বুখারী ও মুসলিম)

হয়েরত আবু মসা আবু’আরী (রা) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “**الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ** যিশ্দ بعضاً بعضاً” মু’মিন অন্য মু’মিনের জন্য এমন দেয়ালের মতো যার প্রতিটি অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।” (বুখারী ও মুসলিম) .

হয়েরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটি উন্নত করেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخْوَ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخْبِهِ كَانَ
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

"মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার উপর জুলুম করে না এবং তাকে সাহায্য করতেও বিরত হয় না। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের কোন প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করার কাজে লেগে থাকবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে যথান আল্লাহ কিয়ামতের দিনের বিপদগুলোর মধ্য থেকে একটি বিপদ থেকে তাকে উদ্ধার করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন করবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)

সৎকর্মকারীদেরকে ইমান আনার পর ইমানদারদের দলে শামিল হবার যে নির্দেশ কুরআন মজিদের এই আয়াতে দেয়া হয়েছে তার ফলে কোনু ধরনের সমাজ গঠন করতে চাওয়া হয়েছে, তা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই উকিগুলো থেকে জানা যায়।

১৫. ডানপাশী ও বামপাশীর ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে সূরা ওয়াকি'আর তাফসীরে করে এসেছি। দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল ওয়াকি'আ ৫-৬ টাঁকা।

১৬. অর্থাৎ আগুন তাদেরকে চারদিক থেকে এমনভাবে ঘিরে থাকবে যে তা থেকে বের হবার কোন পথ থাকবে না।

আশ শামস

৯১

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আশ শামসকে (الشمس) এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে জানা যায়, এ সূরাটিও মঙ্গা মু'আয়মায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। কিন্তু এটি এমন সময় নাযিল হয় যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা তুলে উঠেছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে, সৎ ও অসৎ নেকী ও গোনাহর পার্থক্য বুঝানো এবং যারা এই পার্থক্য বুঝতে অক্ষীকরণ করে আর গোনাহর পথে চলার উপরই জোর দেয় তাদেরকে খারাপ পরিণতির তয় দেখানো।

মূল বক্তব্যের দিক দিয়ে সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু হয়েছে সূরার সূচনা থেকে এবং ১০ আয়াতে গিয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগটি ১১ আয়াত থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশে তিনটি কথা বুঝানো হয়েছে। এক, সূর্য ও চন্দ্র, দিন ও রাত, পৃথিবী ও আকাশ যেমন পরম্পর থেকে ভির এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়ে পরম্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি সৎ ও অসৎ এবং নেকী ও গোনাহও পরম্পর ভির এবং প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও তারা পরম্পর বিরোধী। এদের উভয়ের আকৃতি এক নয় এবং ফলাফলও এক হতে পারে না। দুই, মহান আল্লাহ মানবাত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয় ও বৃদ্ধি শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় একেবারে চেতনাইনভাবে ছেড়ে দেননি বরং একটি প্রাকৃতিক চেতনার মাধ্যমে তার অবচেতন মনে নেকী ও গোনাহর পার্থক্য, ভালো ও মন্দের প্রভেদ এবং ভালোর ভালো হওয়া ও মন্দের মন্দ হওয়ার বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি, মানুষের মধ্যে পার্থক্য বোধ, সংকেত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে শক্তিসমূহ আল্লাহ ক্রেতে দিয়েছেন, সেগুলো ব্যবহার করে সে নিজের প্রবৃত্তির ভালো ও মন্দ প্রবণতাগুলোর মধ্য থেকে কাউকে উদ্দীপিত করে আবার কাউকে দাবিয়ে দেয়। এরি উপর তার ডবিষ্যত নির্ভর করে। যদি সে সংপ্রবণতাগুলোকে উদ্দীপিত করে এবং অসৎ-প্রবণতাসমূহ থেকে নিজের নফসকে পবিত্র করে তাহলে সে সাফল্য লাভ করবে। বিপরীত পক্ষে যদি সে নফসের সংপ্রবণতাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করতে থাকে এবং অসৎ-প্রবণতাকে উদ্দীপিত করতে থাকে তাহলে সে ব্যর্থ হবে।

দ্বিতীয় অংশে সামুদ্র জাতির ঐতিহাসিক নজীর পেশ করে রিসালাতের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। ভালো ও মন্দের যে চেতনালক্ষণ আল্লাহ মানুষের প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন তা মানুষের সঠিক পথের সঙ্গান লাভ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং তাকে পুরোপুরি না বুঝার কারণে মানুষ ভালো ও মন্দের বিভিন্নিক দর্শন ও মানবত নির্ণয় করে পথচার হতে থেকেছে। তাই মহান আল্লাহ এই প্রকৃতিগত চেতনাকে সাহায্য করার জন্য আবিয়া আলাইহিমুস সালামদের উপর সুস্পষ্ট এ ঘ্যাখাইন অহী নাবিল করেছেন। এর ফলে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে লোকদেরকে নেকী ও গোনাহ কি তা জানাতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ দুনিয়ায় নবী ও রসূল পাঠিয়েছেন। এই ধরনেরই একজন নবী ছিলেন হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালাম। তাকে সামুদ্র জাতির কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সামুদরা তাদের প্রবৃত্তির অসংগ্রহণতার মধ্যে ঢুবে গিয়ে বড় বেশী হকুম অমান্য করার ভূমিকা অবলম্বন করেছিল। যার ফলে তাঁরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের মুজিয়া দেখাবার দাবী অনুযায়ী তিনি তাদের সামনে একটি উটনী পেশ করলেন। তাঁর সাবধান বাণী সম্ভেদ এই জাতির সবচেয়ে দুর্চরিত ব্যক্তিটি সমগ্র জাতির ইচ্ছা ও দাবী অনুযায়ী উটনীটিকে হত্যা করলো। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সমগ্র জাতি ধ্বনি ও বরবাদ হয়ে গেলো।

সামুদ্র জাতির এ কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে সমগ্র সূরার কোথাও একথা বলা হয়নি যে, হে কুরাইশ সম্পদায়। যদি তোমরা সামুদরের মতো তোমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে তোমরাও সামুদের মতো একই পরিণামের সময়ীন হবে। সালেহ আলাইহিস সালামের মোকাবেলায় সামুদ জাতির দুর্চরিত লোকেরা যে অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছিল মুক্তায় সে সময় সেই একই অবস্থা বিরাজ করছিল। তাই এ অবস্থায় এই কাহিনী শনিয়ে দেয়াটা আসপে সামুদরের এই ঐতিহাসিক নজীর কিভাবে মক্কাবাসীদের সাথে যাপ খেয়ে যাচ্ছে, তা বুবিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

আয়াত ১৫

সূরা আশ শামস-ঘৰী

কঠুন্দ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالشَّمَسِ وَضَحِّيَّهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا
جَلَّهَا ۝ وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشِيَهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بِهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا
طَحَّهَا ۝ وَنَفِّسٍ وَمَا سُوْنَاهَا ۝ فَاللَّهُمَّ افْجُورْهَا وَتَقْوِيْهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ
مِنْ ذَكْرِهَا ۝ وَقَدْ حَابَ مِنْ دَسْهَا ۝

সূর্যের ও তার বোদ্দের ক্ষম।^১ চাঁদের ক্ষম যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। দিনের ক্ষম যখন তা (সূর্যকে) প্রকাশ করে। রাতের ক্ষম যখন তা (সূর্যকে) ঢেকে নেয়।^২ আকাশের ও সেই সন্তার ক্ষম যিনি তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।^৩ পৃথিবীর ও সেই সন্তার ক্ষম যিনি তাকে বিছিয়েছেন। মানুষের নফসের ও সেই সন্তার ক্ষম যিনি তাকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন।^৪ তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।^৫ নিসন্দেহে সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নফসকে পরিশুল্ক করেছে এবং যে তাকে দাবিয়ে দিয়েছে সে ব্যর্থ হয়েছে।^৬

১. মূলে দুহা (শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। দুহা মানে সূর্যের আলো ও তাপ দুটোই। আরবী ভাষায় এর পরিচিত মানে হচ্ছে চাশ্তের সময়, যখন সূর্য উদয়ের পরে যথেষ্ট উপরে উঠে যায় কিন্তু উপরে উঠার পরে কোন আলোই বেড়ে যায় না, তাপও বিকীরণ করতে থাকে। তাই ‘দুহা’ শব্দটি যখন সূর্যের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন তার আলো বা তার বদৌলতে যে দিনের উদয় হয় তা থেকে তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ হয় না। বরং এর ভুগনায় ক্রোড় শব্দটি তার সঠিক ও পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।

২. রাতের আগমনে সূর্য সুকিয়ে যায়। সারা রাত তার আলো দেখা যায় না। এই অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : রাত সূর্যকে ঢেকে নেয়। কারণ সূর্যের দিগন্ত রেখার নীচে নেমে যাওয়াকেই রাত বলে। এর ফলে পৃথিবীর যে অংশে রাত নামে সেখানে সূর্যের আলো পৌছতে পারে না।

৩. ছাদের মতো পৃথিবীর বুকে তাকে উঠিয়ে দাঢ় করিয়ে দিয়েছেন। এই আয়াতে এবং এর পরের দুটি আয়াতে 'মা' (م) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মা-বানাহা (سَابِنَهَا) মা-তাহাহা (مَاطْحَامًا) ও মা-সাওওয়াহা (مَاسَوَاهًا)। মুফাসিরগণের একটি দল এই 'মা' শব্দটিকে ধাতুগত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তারা এই আয়াতগুলোর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন : আকাশ ও তাকে প্রতিষ্ঠিত করার কসম, পৃথিবী ও তাকে বিছিয়ে দেবার কসম এবং মানুষের নফসের ও তাকে ঠিকভাবে গঠন করার কসম। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ এই তিনটি বাক্যের পরে নিম্নোক্ত বাক্যটি আনা হয়েছে : "তারপর তার পাপ ও তার তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন।" আর এই বাক্যটি আগের বাক্য তিনটির সাথে খাপ খায় না। অন্য মুফাসিরগণ এখানে 'মা' (م) কে মান (من) বা 'আল্লায়ী' (الذين) এর অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তারা এই বাক্যগুলোর অর্থ করেছেন : যিনি আকাশকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যিনি পৃথিবীকে বিছিয়েছেন এবং যিনি মানুষের নফসকে ঠিকভাবে গঠন করেছেন। আমার মতে এই দ্বিতীয় অর্থটিই সঠিক। এর বিষয়কে এ আপত্তি ওঠানো ঠিক হতে পারে না যে, আরবী ভাষায় 'মা' শব্দ প্রাণহীন বস্তু ও বুদ্ধিহীন জীবের জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ যেদের কুরআনেই 'মা' কে 'মান' অর্থে বহু জ্ঞান্যায় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, **وَلَا أَنْتَمْ عَبْدُنِي مَا أَعْبُد** (আর না, তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি)। **فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ** (কাজেই মেয়েদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পসন্দ করো বিয়ে করে নাও)। **وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكِحْتُ مِنَ النِّسَاءِ** (আর যেসব মেয়েকে তোমাদের বাপেরা বিয়ে করেছে তাদেরকে বিয়ে করো না)।

৪. 'ঠিকভাবে গঠন করেছেন' মানে হচ্ছে, তাকে এমন একটি দেহ দান করেছেন, যা তার সুজ্ঞেল গঠনাকৃতি, হাত-পা ও মস্তিষ্ক সংযোজনের দিক থেকে মানবিক জীবন যাপন করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী ছিল। তাকে দেখার, শুনার, স্পর্শ করার, স্বাদ গ্রহণ করার ও প্রাণ নেবার জন্য এমন ইন্দ্রিয় দান করেছেন যা তার বৈশিষ্ট ও আনুপ্রাপ্তিক কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে তার জন্য জ্ঞান অর্জনের সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারতো। তাকে চিন্তা ও বুদ্ধি-বিবেচনার শক্তি, যুক্তি উপস্থাপন ও প্রমাণ পেশ করার শক্তি, কঞ্চন শক্তি, শৃঙ্খল শক্তি, পার্থক্য করার শক্তি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শক্তি, সংকলন শক্তি এবং এমন অনেক মানসিক শক্তি দান করেছেন যার ফলে সে এই দুনিয়ায় মানুষের মতো কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এছাড়া 'ঠিকভাবে গঠন করার' মধ্যে এ অর্থও রয়েছে যে, তাকে জন্মগত পাপী ও প্রকৃতিগত বদমায়েশ হিসেবে তৈরি না করে বরং সহজ সরল প্রকৃতির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। তার ঘঠনাকৃতিতে এমন ধরনের কোন বক্তৃতা রয়ে দেননি যা তাকে সোজাপথ অবলম্বন করতে চাইলেও কর্তৃতে দিতো না। একথাটিকেই **فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا** ("সেই প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও যার উপর আগ্রাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন") (২০ আয়াত) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এ কথাটিকেই একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "এমন কোন শিশু নেই যে প্রকৃতি ছাড়া অন্যকিছুর উপর পয়দা হয়। তারপর মা-বাপ তাকে ইহদি, খৃষ্টান বা অযিউ উপাসক বানায়। এটা তেমনি যেমন পশুর পেট থেকে সুস্থ, সবল ও পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট বাচ্চা পয়দা হয়। তোমরা'কি তাদের কাউকে কানকাটা পেয়েছো? (বুখারী ও মুসলিম) অর্থাৎ পরবর্তী কালে মুশরিকরা তাদের জাহেলী

কুসংস্কারের কারণে পশ্চদের কান কেটে দেয়। নয়তো আল্লাহ কোন পশ্চকে তার মায়ের পেট থেকে কানকাটা অবস্থায় পয়দা করেননি। অন্য একটি হাদীসে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “আমর রব বলেন, আমার সকল বান্দাকে আমি হানীফ (সঠিক প্রকৃতির উপর) সৃষ্টি করেছিলাম। তারপর শয়তানরা এসে তাদেরকে তাদের দীন (অর্থাৎ তাদের প্রাকৃতিক দীন) থেকে সরিয়ে দিয়েছে এবং তাদের উপর এমন সব জিনিস হারাম করে দিয়েছে যা আমি তাদের জন্য হালাল করে দিয়েছিলাম। শয়তানরা আমার সাথে তাদেরকে শরীক করার জন্য তাদেরকে হকুম দিয়েছে, অথচ আমার সাথে তাদের শরীক হবার ব্যাপারে আমি কোন প্রমাণ নাযিল করিনি।” (মুসনাদে আহমাদ, ইমাম মুসলিমও প্রায় একই রকম শব্দ সহকারে এ হাদীসটি উদ্ভৃত করেছেন)

৫. ইলহাম শুভটির উৎপত্তি লহ্ম (**لَهْمُ**) থেকে। এর মানে গিলে ফেলা। যেমন বলা হয়, **لَهْمُ الشَّيْءِ التَّهْمَةُ** মানে হয়, আমি উমুক জিনিসটি তাকে গিলিয়ে দিয়েছি বা তার গলার মীচে নামিয়ে দিয়েছি। এই মৌলিক অর্থের দিক দিয়ে ইলহাম শব্দ পারিভাষিক অর্থে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কঞ্চা বা চিপ্তাকে অবচেতনভাবে বান্দার মন ও মস্তিষ্কের গোপন প্রদেশে নামিয়ে দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মানুষের প্রতি তার পাপ এবং তার নেকী ও তাকওয়া ইলহাম করে দেয়ার দু'টি অর্থ হয়। এক, স্তুষ্টি তার মধ্যে নেকী ও গোনাহ উভয়ের ঝৌক প্রবণতা রেখে দিয়েছেন। প্রত্যেক বাক্তিই এটি অনুভব করে। দুই, প্রত্যেক ব্যক্তির অবচেতন মনে আল্লাহ এ চিপ্তাটি রেখে দিয়েছেন যে, নেতৃত্বাতার ক্ষেত্রে কোন জিনিস ভালো ও কোন জিনিস মন্দ এবং সৎ নৈতিক বৃত্তি ও সৎকাজ এবং অসৎ নৈতিক বৃত্তি ও অসৎকাজ সমান নয়। ফুজুর (দৃঢ়ত্ব ও পাপ) একটি খারাপ জিনিস এবং তাকওয়া (খারাপ কাজ থেকে দূরে থাকা) একটি ভালো জিনিস, এ চিপ্তাখারা মানুষের জন্য নতুন নয়। বরং তার প্রকৃতি এগুলোর সাথে পরিচিত। স্তুষ্টি তার মধ্যে জন্মগতভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। একথাটিই সূরা আল বালাদে এভাবে বলা হয়েছে : **وَكَدِينَةُ النَّجْدَيْنِ** “আর আমি ভালো ও মন্দ উভয় পথ তার জন্য সুস্পষ্ট করে রেখে দিয়েছি।” (১০ আয়াত) সূরা আদ্দাহরে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : **إِنَّا هَدَيْنَاهُ إِلَيْنَا سُبْلِيلَ امْأَ شَاكِرًا وَمَا كَفُورًا** “আমি তাদেরকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, চাইলে তারা কৃতজ্ঞ হতে পারে আবার চাইলে হতে পারে অব্যুক্তারকারী।” (৩ আয়াত) একথাটিই সূরা আল কিয়ামাহে বর্ণনা করা হয়েছে এভাবেঃ মানুষের মধ্যে একটি নক্সে লাওয়ামাহ (বিবেক) আছে। সে অসৎকাজ করলে তাকে তিরস্কার করে। (২ আয়াত) আর প্রত্যেক ব্যক্তি সে যতই উজ্জর পেশ করুক না কেন সে কি তা সে খুব ভালো করেই জানে। (১৪-১৫ আয়াত) ”

এখানে একথাটিও ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মহান আল্লাহ ব্রহ্মাবজ্ঞাত ও প্রকৃতিগত ইলহাম করেছেন প্রত্যেক সৃষ্টির প্রতি তার মর্যাদা, ভূমিকা ও স্বরূপ অনুযায়ী। যেমন সূরা তা-হা'য বলা হয়েছে : **كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَةٌ مِّنْ مَّا** “যিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে তার আকৃতি দান করেছেন, তারপর তাকে পথ দেখিয়েছেন।” (৫০ আয়াত) যেমন প্রাণীদের প্রত্যেক প্রজাতিকে তার প্রয়োজন অনুযায়ী ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। যার ফলে মাছ নিজে নিজেই সাঁতার কাটে। পাখি উড়ে বেড়ায়। মৌমাছি

মৌচাক তৈরি করে। চাতক বাসা বানায়। মানুষকেও তার বিভিন্ন পর্যায় ও ভূমিকার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে। মানুষ এক দিক দিয়ে প্রাণী গোষ্ঠীভূক্ত। এই দিক দিয়ে তাকে যে ইলহামী জ্ঞান দান করা হয়েছে তার একটি সৃষ্টিপ্রদৰ্শন হচ্ছে, মানব শিশু জন্মের সাথে সাথেই মায়ের শুন চুক্তে থাকে। আগ্নাহ যদি প্রকৃতিগতভাবে তাকে এ শিক্ষাটি না দিতেন তাহলে তাকে এ কোশলটি শিক্ষা দেবার সাধ্য কারো ছিল না। অন্যদিক দিয়ে মানুষ একটি বৃদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী। এদিক দিয়ে তার সৃষ্টির শুরু থেকেই আগ্নাহ তাকে অনবরত ইলহামী পথনির্দেশনা দিয়ে চলছেন। এর ফলে সে একের পর এক উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার বিকাশ সাধন করছে। এই সমস্ত উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের ইতিহাস অধ্যয়নকারী যে কোন ব্যক্তিই একথা অনুভব করবেন যে, সম্ভবত যানুষের চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল হিসেবে দু' একটি ব্যক্তিক্রম ছাড়া প্রত্যেকটি আবিষ্কার আকস্মিকভাবে শুরু হয়েছে। ইঠাং এক ব্যক্তির মাথায় একটি চিন্তার উদয় হয়েছে এবং তারই ভিত্তিতে সে কোন জিনিস আবিষ্কার করেছে। এই দু'টি মর্যাদা ছাড়াও মানুষের আর একটি মর্যাদা ও ভূমিকা আছে। সে একটি নৈতিক জীবণ। এই পর্যায়ে আগ্নাহ তাকে ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি এবং ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ জানার অনুভূতি ইলহাম করেছেন। এই শক্তি, বোধ ও অনুভূতি একটি বিশ্বজীবী সত্ত্ব। এর ফলে আজ পর্যন্ত দুনিয়ায় এমন কোন সমাজ সভ্যতা গড়ে উঠেছে যেখানে ভালো ও মন্দের ধারণা ও চিন্তা কার্যকর ছিল না। আর এমন কোন সমাজ ইতিহাসে কোন দিন পাওয়া যায়নি এবং আজো পাওয়া যায় না যেখানকার ব্যবস্থায় ভালো ও মন্দের এবং সৎ ও অসৎকর্মের জন্য পুরস্কার ও শাস্তির কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়নি। প্রতিযুগে, প্রত্যেক জায়গায় এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রত্যেক পর্যায়ে এই জিনিসটির অস্তিত্বেই এর ব্রতাবজ্ঞাত ও প্রকৃতিগত হবার সৃষ্টিপ্রমাণ। এছাড়াও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুষ্টা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই এটি গচ্ছিত রেখেছেন, একথাও এ থেকে প্রমাণিত হয়। কারণ যেসব উপাদানে মানুষ তৈরি এবং যেসব আইন ও নিয়মের মাধ্যমে জড় জগত চলছে তার কোথাও নৈতিকতার কোন একটি বিষয়ও চিহ্নিত করা যাবে না।

৬. একথাটির উপরই উপরের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে। শুই জিনিসগুলো থেকে একথাটি কিভাবে প্রমাণ হয় তা এখন চিন্তা করে দেখুন। যেসব গভীর তত্ত্ব আগ্নাহ মানুষকে বুঝাতে চান সেগুলো সম্পর্কে তিনি কুরআনে যে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করেছেন তা হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রমাণ করার জন্য তিনি হাতের কাছের এমন কিছু সৃষ্টিপ্রমাণ ও সর্বজন পরিচিত জিনিস পেশ করেন, যা প্রত্যেক ব্যক্তি তার আশেপাশে অথবা নিজের অস্তিত্বের মধ্যে প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্তে দেখে। এই নিয়ম অনুযায়ী এখানে এক এক জোড়া জিনিস নিয়ে তাদেরকে পরম্পরারের বিরুদ্ধে পেশ করা হয়েছে। তারা পরম্পরারের বিপরীতধর্মী কাজেই তাদের প্রভাব ও ফলাফলও সমান নয়। বরং অনিবার্যভাবে তারা পরম্পরার বিভিন্ন। একদিকে সূর্য, অন্যদিকে চাঁদ। সূর্যের আলো অত্যন্ত প্রবর্ত। এর মধ্যে রয়েছে তাপ। এর তুলনায় চাঁদের নিজের কোন আলো নেই। সূর্যের উপস্থিতিতে সে আকাশে থাকলেও আলোহীন থাকে। সূর্য ডুবে যাবার পর সে উজ্জ্বল হয়। সে সময়ও তার আলোর মধ্যে রাতকে দিন বানিয়ে দেবার উজ্জ্বল্য থাকে না। সূর্য তার আলোর প্রভাবতা দিয়ে দুনিয়ায় যে কাজ করে চাঁদের আলোর মধ্যে সে প্রভাবতা থাকে না। তবে তার নিজস্ব কিছু প্রভাব রয়েছে। এগুলো সূর্যের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ ভির প্রকৃতির।

এভাবে একদিকে আছে দিন এবং অন্যদিকে রাত। এরা পরম্পরের বিপরীতধর্মী। উভয়ের প্রভাব ও ফলাফল এত বেশী বিভিন্ন যে, এদেরকে কেউ একসাথে জমা করতে পারে না। এমন কি সবচেয়ে নিবোধ্য ব্যক্তিটির পক্ষেও একথা বলা সম্ভব হয় না যে, রাত হলেই বা কি আর দিন হলেই বা কি, এতে কোন পার্থক্য হয় না। ঠিক তেমনি একদিকে রয়েছে আকাশ। মষ্টা তাকে উচুতে স্থাপন করেছেন। অন্যদিকে রয়েছে পৃথিবী। এর মষ্টা একে আকাশের তলায় বিছানার মতো করে বিছিয়ে দিয়েছেন। এরা উভয়েই একই বিশ্ব জাহানের ও তার ব্যবস্থার সেবা করছে এবং তার প্রয়োজন পূর্ণ করছে। কিন্তু উভয়ের কাজ এবং প্রভাব ও ফলাফলের মধ্যে আসমান-যৰীন ফারাক। উর্ধজগতের এই সাক্ষ প্রমাণগুলো পেশ করার পর মানুষের নিজের শরীর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় ও মস্তিষ্কের শক্তিগুলোকে আনুপ্রাপ্তিক ও সমতাপূর্ণ মিশণের মাধ্যমে সুগঠিত করে মষ্টা তার মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয় প্রবনতা ও কার্যকরণসমূহ রেখে দিয়েছেন। এগুলো পরম্পরের বিপরীত ধর্মী। ইলহামী তথা অবচেতনভাবে তাকে এদের উভয়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এদের একটি হচ্ছে ফুজুর-দুর্ভুতি, তা খারাপ এবং অন্যটি হচ্ছে, তাকওয়া-আন্নাহতীতি, তা ভালো। এখন যদি সূর্য ও চন্দ্র, রাত ও দিন এবং আকাশ ও পৃথিবী এক না হয়ে থাকে বরং তাদের প্রভাব ও ফলাফল অনিবার্যভাবে পরম্পর থেকে আলাদা হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের নফসের দুর্ভুতি ও তাকওয়া পরম্পরের বিপরীতধর্মী হওয়া সত্ত্বেও এক হতে পারে কেমন করে? মানুষ নিজেই এই দুনিয়ায় নেকী ও পাপকে এই মনে করে না। নিজের মনগড়া দর্শনের দৃষ্টিতে সে যদি ভালো ও মন্দের কিছু মানদণ্ড তৈরি করে নিয়েই থাকে তাহলেও যে জিনিসটিকে সে নেকী মনে করে, সে সম্পর্কে তার অভিমত হচ্ছে এই যে, তা প্রশংসনীয় এবং প্রতিফল ও পূর্বপ্রাপ্ত লাভের যোগ্য। অন্যদিকে যাকে সে অসৎ ও গোনাহ মনে করে, সে সম্পর্কে তার নিজের নিরপেক্ষ অভিমত হচ্ছে এই যে, তা নিন্দনীয় ও শাস্তির যোগ্য। কিন্তু আসল ফায়সালা মানুষের হাতে নেই। বরং যে মষ্টা মানুষের প্রতি তার গোনাহ ও তাকওয়া ইলহাম করেছেন তার হাতেই রয়েছে এর ফায়সালা। মষ্টার দৃষ্টিতে যা গোনাহ ও দুর্ভুতি আসলে তাই হচ্ছে গোনাহ ও দুর্ভুতি এবং তাঁর দৃষ্টিতে যা তাকওয়া আসলে তাই হচ্ছে তাকওয়া। মষ্টার কাছে এ দু'টির রয়েছে পৃথক পরিণাম। একটির পরিণাম হচ্ছে, যে নিজের নফসের পরিশুল্ক করবে সে সাফল্য লাভ করবে এবং অন্যটির পরিণাম হচ্ছে, যে ব্যক্তি নিজের নফসকে দাবিয়ে দেবে সে ব্যর্থ হবে।

তাযাকা (بِرْزَك) পরিশুল্ক করা মানে পাক-পবিত্র করা, বিকশিত করা এবং উদ্বৃদ্ধ ও উন্নত করা। পূর্বপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর পরিকার অর্থ দীড়ায়, যে ব্যক্তি নিজের নফস ও প্রবৃত্তিকে দুর্ভুতি থেকে পাক-পবিত্র করে, তাকে উদ্বৃদ্ধ ও উন্নত করে তাকওয়ার উচ্চতম পর্যায়ে নিয়ে যায় এবং তার মধ্যে সংগ্রহণতাকে বিকশিত করে, সে সাফল্য লাভ করবে। এর মোকাবেলায় দাসুসাহা (بِرْسَد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর শব্দমূল হচ্ছে তাদসীয়া (بِرْسَد) তাদসীয়া মানে হচ্ছে দাবিয়ে দেয়া, লুকিয়ে ফেলা, ছিনিয়ে নেয়া, আত্মসাং করা ও পথ্রের করা। পূর্বপর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর অর্থও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ব্যর্থ হবে, যে নিজের নফসের মধ্যে নেকী ও সংকর্মের যে প্রবণতা পাওয়া যাচ্ছিল তাকে উদ্বৃত্তিত ও বিকশিত করার পরিবর্তে দাবিয়ে দেয়, তাকে

বিভাগ করে অসংবর্গতার দিকে নিয়ে যায় এবং দৃষ্টিকে তার ওপর এত বেশী প্রবল করে দেয় যার ফলে তাকওয়া তার নীচে এমনভাবে মুখ ঢাকে যেমন কোন লাশকে কবরের মধ্যে রেখে তার ওপর মাটি চাপা দিলে তা ঢেকে যায়। কোন কোন তাফসীরকার এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَكَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ مِنْ دُسْسِيِّ اللَّهُ نَفْسَهُ** অর্থাৎ যে ব্যক্তির নফসকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সাফল্য লাভ করেছে এবং যার নফসকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন সে ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এ ব্যাখ্যাটি প্রথমত ভাষার দিক দিয়ে কুরআনের বর্ণনাভঙ্গীর পরিপন্থী। কারণ আল্লাহর মৃদি একথা বলাই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি এভাবে বলতেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَزَكَهُ اللَّهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ مِنْ دُسْسِيِّ اللَّهُ** (যে নফসকে আল্লাহ পাক-পবিত্র করে দিয়েছেন সে সফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে সেই নফস যাকে আল্লাহ দাবিয়ে দিয়েছেন।) দ্বিতীয়, এই ব্যাখ্যাটি এই বিষয়বস্তু সংবলিত, কুরআনের অন্যান্য বর্ণনার সাথে সংঘর্ষশীল। সূরা আলায় মহান আল্লাহ বলেছেন : **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَهُ اللَّهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ مِنْ دُسْسِيِّ اللَّهُ** (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে—৪ আয়াত) সূরা আবাসায় মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরোধন করে বলেছেন : **وَمَا عَلِيكُمْ أَلَا يَرْكَبُ "تَوْمَادِيرَ"** তোমাদের ওপর কি দায়িত্ব আছে যদি তারা পবিত্রতা অবলম্বন না করে? এই দুটি আয়াতে পবিত্রতা অবলম্বন করাকে বান্দার কাজ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ ছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই দুনিয়ায় মানুষের পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন সূরা দাহুর-এ বলা হয়েছে : “আমি মানুষকে একটি মিথিত শুক্র থেকে পয়দা করেছি, যাতে তাকে পরীক্ষা করতে পারি, তাই তাকে আমি শোনার ও দেখার ক্ষমতা দিয়েছি।” (২ আয়াত) সূরা মূলকে বলা হয়েছে : “তিনি মৃত্যু ও জীবন উদ্ভাবন করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা যায় যে, তোমাদের মধ্যে কে ভালো কাজ করে।” (২ আয়াত) যখন একথা সুস্পষ্ট, পরীক্ষা গ্রহণকারী যদি আগেভাগেই একজন পরীক্ষার্থীকে সামনে বাড়িয়ে দেয় এবং অন্যজনকে দাবিয়ে দেয় তাহলে আদতে পরীক্ষাই অর্থৈন হয়ে পড়ে। কাজেই কাতাদাহ, ইকরামা, মুজাহিদ ও সাইদ ইবনে জুবাইর যা বলেছেন সেটিই হচ্ছে এর আসল তাফসীর। তারা বলেছেন : যাকাহা ও দাস্সাহ’র কর্তা হচ্ছে বান্দা, আল্লাহ নন। আর ইবনে আবী হাতেম জুওয়াইর ইবনে সাইদ থেকে এবং তিনি যাহ্বাক থেকে এবং যাহ্বাক ইবনে আবুস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে রসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়া সাল্লাম, নিজেই এই আয়াতের অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন : **أَفْلَحَتْ نَفْسٌ رَزَكَهُ اللَّهُ عَرْجَل** (সফল হয়ে গেছে সেই ব্যক্তি যাকে মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পবিত্র করে দিয়েছেন।) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলা যায়, এখনে রসূলুল্লাহ (সা)-এর যে উক্তি পেশ করা হয়েছে তা আসলে তাঁর থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ এই সনদের রাবী জুওয়াইর একজন প্রত্যাখ্যাত রাবী। অন্যদিকে ইবনে আবুসেন সাথে যাহ্বাকের সাক্ষাত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, নাসাই ও ইবনে আবী শাইবা হ্যরত, যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতটি করেছেন সেটি অবশ্য একটি সহীহ হাদীস। তাতে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু, আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করতেন :

اللَّهُمَّ اتِّنْفَسِي تَقْوَاهَا وَرَزِّكَهَا أَنْتَ خَيْرُ مِنْ رَزَكَاهَا أَنْتَ وَلِيَهَا وَمَوْلَاهَا

كَلْ بَتْ تَهُودٍ يُطْغِيْهَا ۝ إِذْ أَنْبَعْتَ أَشْقِيْهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ
نَّاَقَةً اللَّهِ وَسَقِيَهَا ۝ فَكَلْ بُوْهَ فَعَقَرَوْهَا ۝ فَدَمْ مَمْ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمْ بْنُ نِبِيِّهِمْ فَسُونَهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عَقْبِهَا ۝ ۝ ۝

সামুদ্র জাতি^১ নিজের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা আরোপ করলো।^৮ যখন সেই জাতির সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকটি ক্ষেপে গল্লো, আল্লাহর রসূল তাদেরকে বললো : সাবধান! আল্লাহর উটনীকে স্পর্শ করো না এবং তাকে পান করতে (বাধা দিয়ো না)^৯ কিন্তু তারা তার কথা প্রত্যাখ্যান করলো এবং উটনীটিকে মেরে ফেললো।^{১০} অবশেষে তাদের গোনাহের কারণে তাদের রব তাদের ওপর বিপদের পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। আর তিনি (তাঁর এই কাজের) খারাপ পরিণতির কোন ভয়ই করেন না।^{১১}

“হে আল্লাহ! আমার নফসকে তার তাকওয়া দান করো এবং তাকে পবিত্র করো। তাকে পবিত্র করার জন্যে তুমই সর্বোত্তম সম্ভা। তুমই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক।”

রসূলের প্রায় এই একই ধরনের দোয়া তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনুল মুনয়ির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস থেকে এবং ইমাম আহমাদ হযরত আমেশা থেকে উদ্ভৃত করেছেন। মূলত এর অর্থ হচ্ছে, বাদ্দা কেবল তাকওয়া ও তায়কীয়া তথা পবিত্রতা অবশ্যই করার ইচ্ছাই প্রকাশ করতে পারে। তবে তা তার ভাগ্যে জুটে যাওয়া আল্লাহর ইচ্ছা ও তাওফীকের ওপর নির্ভর করে। তাদসীয়া তথা নফসকে দাবিয়ে দেবার ব্যাপারেও এই একই অবস্থা অর্থাৎ আল্লাহ জোর করে কোন নফসকে দাবিয়ে দেন না। কিন্তু বাদ্দা যখন এ ব্যাপারে একেবারে আদা-পানি থেয়ে শাশে তখন তাকে তাকওয়া ও তায়কীয়ার তাওফীক থেকে বাস্তিত করেন এবং সে তার নফসকে যে ধরনের ময়লা আবর্জনার মধ্যে দাবিয়ে দিতে চায় তার মধ্যেই তাকে ছেড়ে দেন।

৭. ওপরের আয়াতগুলোতে নীতিগতভাবে যেসব কথা বর্ণনা করা হয়েছে এখন একটি ঐতিহাসিক নজীরের সাহায্যে তাকে সুস্পষ্ট করে তোলা হচ্ছে। এটি কিসের নজীর এবং ওপরের বর্ণনার সাথে এর কি সম্পর্ক তা জানার জন্যে কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনার আলোকে ৭ থেকে ১০ আয়াতে বর্ণিত দু’টি মৌলিক সত্য সম্পর্কে তাজভাবে চিন্তা গবেষণা করা উচিত।

এক : সেখানে বলা হয়েছে, মানুষের নফসকে একটি সুগঠিত ও সুসামঝস্য প্রতিকৃতির ওপর সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তার দৃঢ়তি ও তাকওয়া তার প্রতি ইলহাম করেছেন। কুরআন এ সত্যটি বর্ণনা করার পর একথা পরিকার করে দিয়েছে যে, দৃঢ়তি ও তাকওয়ার এই ইলহামী (চেতনালক্ষ) জান প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্বভাবে বিস্তারিত পথ

নির্দেশনা লাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। বরং এই উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ অহীর মাধ্যমে নবীগণকে বিস্তারিত পথনির্দেশনা দান করেছেন। তাতে দুর্ভিতির আওতায় কি কি জিনিস পড়ে, যা থেকে দূরে থাকতে হবে এবং তাকওয়া কাকে বলে, তা কিভাবে হাসিল করা যায়—এসব কথা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হয়েছে। যদি অহীর মাধ্যমে প্রেরিত এই বিস্তারিত পথনির্দেশনা মানুষ গ্রহণ না করে, তাহলে সে দুর্ভিতি থেকে নিজেকে বৌঢ়াতে পারবে না এবং তাকওয়া অবলম্বনের পথও পাবে না।

দুই : এই আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, দুর্ভিতি ও তাকওয়া দু'টোর মধ্যে থেকে যে কোনটি অবলম্বন করার অনিবার্য ফল হচ্ছে পূরুষার ও শাস্তি। নফসকে দুর্ভিতি মৃক্ষ ও তাকওয়ার সাহায্যে উন্নত করার ফলে সাফল্য অর্জিত হয়। আর তার সপ্তবরণতাগুলোকে দাবিয়ে দিয়ে তাকে দুর্ভিতির মধ্যে ডুবিয়ে দেবার ফল হচ্ছে ব্যর্থতা ও ধূংস।

একথাটি বুঝাবার জন্যে একটি ঐতিহাসিক নজীর পেশ করা হচ্ছে। এ জন্যে নমুনা হিসেবে সামুদ্র জাতিকে পেশ করা হয়েছে। কারণ অভীতে ধূংসপ্রাণ জাতিদের মধ্যে এই জাতিটির এলাকা ছিল মকাবাসীদের সবচেয়ে কাছে। উত্তর হিজায়ে এর ঐতিহাসিক ধূংসবশেষ ছিল। মকাবাসীদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া যাবার পথে প্রায়ই এই স্থানটি অতিক্রম করতো। জাহেলী যুগের কবিতায় এই জাতির উপ্রেখ যেমন ব্যাপকভাবে করা হয়েছে তাতে বুঝা যায়, আরববাসীদের মধ্যে তাদের ধূংসের চর্চা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল।

৮. অর্থাৎ তারা হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামের নবুওয়াতকে মিথ্যা গণ্য করলো। তাদেরকে হেদয়াত করার জন্যে হ্যরত সালেহকে পাঠানো হয়েছিল। যে দুর্ভিতিতে তারা লিঙ্গ হয়েছিল। তা ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত ছিল না এবং হ্যরত সালেহ (আ) যে তাকওয়ার দিকে তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছিলেন তা গ্রহণ করতে তারা চাইছিল না। নিজেদের এই বিদ্রোহী মনোভাব ও কার্যক্রমের কারণে তাই তারা তার নবুওয়াতকে মিথ্যা বলছিল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল আরাফ ৭৩-৭৬ আয়াত, হদ ৬১-৬২ আয়াত, আশ শু'আরা ১৪১-১৫৩ আয়াত, আন নাম্ল ৪৫-৪৯ আয়াত, আল কুমার ২৩-২৫ আয়াত।

৯. কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সামুদ্র জাতির লোকেরা হ্যরত সালেহ আলাইহিস সালামকে এই বলে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে কোন নিশানী (মুজিয়া) পেশ করো। একথায় হ্যরত সালেহ (আ) মুজিয়া হিসেবে একটি উটনী তাদের সামনে হাথির করেন, তিনি বলেন : এটি আল্লাহর উটনী। যামীনের যেখানে ইচ্ছা সে চরে বেড়াবে। একদিন সে একা সমস্ত পানি পান করবে এবং অন্যদিন তোমরা সবাই ও তোমাদের পগুরা পানি পান করবে। যদি তোমরা তার গায়ে হাত লাগাও তাহলে মনে রেখো তোমাদের ওপর কঠিন আঘাত বর্ষিত হবে। একথায় তারা কিছুদিন পর্যন্ত ভয় করতে থাকলো। তারপর তারা তাদের সবচেয়ে বড় শয়তান ও বিদ্রোহী সরদারকে ডেকে বললো, এই উটনীটিকে শেষ করে দাও। সে এই কাজের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এলো। (আল আরাফ ৭৩ আয়াত, আশ শু'আরা ১৫৪-১৫৬ আয়াত এবং আল কুমার ২৯ আয়াত)

১০. সূরা আরাফে বলা হয়েছে : উটনীকে হত্যা করার পর সামৃদ্রের লোকেরা সালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, তুমি আমাদের যে আযাবের ভয় দেখাতে এখন সেই আযাব আনো। (৭৭ আয়াত) সূরা হুদে বলা হয়েছে, হ্যরত সালেহ (আ) তাদেরকে বললেন, তিনদিন পর্যন্ত নিজেদের গৃহে আরো আয়েশ করে নাও, তারপর আযাব এসে যাবে এবং এটি এমন একটি সতর্কবাণী যা মিথ্যা প্রমাণিত হবে না। (৬৫ আয়াত)

১১. অর্থাৎ দুনিয়ার বাদশাহ ও শাসকদের মতো নন। তিনি কোন জাতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সময় এর পরিণাম কি হবে, একথা ভাবতে বাধ্য হন না। তিনি সবার ওপর কর্তৃত্বশালী। সামৃদ্র জাতির সাহায্যকারী এমন কোন শক্তি আছে যে তার প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসবে, এ ভয় তাঁর নেই।

আল লাইল

৯২

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ উয়াল লাইল (وَالْيَل) -কে এই সূরার নাম গণ্য করা হয়েছে।

নামসের সময়-কাল

পূর্ববর্তী সূরা আশু শামসের সাথে এই সূরাটির বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এদিক দিয়ে এদের একটিকে অপরটির ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। একই কথাকে সূরা আশু শামসে একভাবে বলা হয়েছে আবার সেটিকে এই সূরায় অন্যভাবে বলা হয়েছে। এখেকে আন্দজ করা যায়, এ দু'টি সূরা প্রায় একই যুগে নামিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

জীবনের দু'টি তিনি তিনি পথের পার্থক্য এবং তাদের পরিণাম ও ফলাফলের প্রভেদ বর্ণনা করাই হচ্ছে এর মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ সূরাটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগটি শুরু থেকে ১১ আয়াত পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ভাগটি ১২ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত বিভৃত।

প্রথম অংশে বলা হয়েছে, মানুষ ব্যক্তিগত, জাতিগত ও দলগতভাবে দুনিয়ায় যা কিছু থচেষ্টা ও কর্ম তৎপরতা চালায় তা অনিবার্যভাবে নৈতিক দিক দিয়ে ঠিক তেমনি বিভিন্ন যেমন দিন ও রাত এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্নভাৱে রয়েছে। তারপর কুরআনের ছোট ছোট সূরাগুলোর বর্ণনাভূগী অনুযায়ী থচেষ্টা ও কর্মের সমগ্র মৌগফল থেকে এক ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট এবং অন্য ধরনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট নিয়ে নমুনা হিসেবে পেশ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্টগুলোর বর্ণনা শুনে এদের মধ্যকার পার্থক্য সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এক ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট যে ধরনের জীবন পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে অন্য ধরনের মৌলিক বৈশিষ্টে ঠিক তার বিপরীতধর্মী জীবন পদ্ধতির চিহ্ন ফুটে উঠে। এই উভয় প্রকার নমুনা বর্ণনা করা হয়েছে ছোট ছোট, আকর্ষণীয়, সুস্মরণ ও সুগঠিত বাক্যের সাহায্যে। শোনার সাথে সাথে এগুলোর মর্মবাণী মানুষের মনের মধ্যে গোঁথে যায় এবং সে সহজে সেগুলো আওড়াতে থাকে। প্রথম ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে : অর্থ-সম্পদ দান করা, আল্লাহভীতি ও তাকওয়া অবলম্বন করা এবং সৎবৃত্তিকে সৎবৃত্তি বলে মনে নেয়া। দ্বিতীয় ধরনের বৈশিষ্টগুলো হচ্ছে ১. কৃপণতা করা, আল্লাহর সমুষ্টি ও অসমুষ্টির পরোয়া না করা এবং তালো কথাকে মিথ্যা গণ্য করা। তারপর বলা হয়েছে, এই উভয় ধরনের সুস্পষ্ট পরম্পর বিরোধী কর্মপদ্ধতি নিজের পরিণাম ও ফলাফলের দিক

থেকে মোটেই এক নয়। বরং যেমন এরা পরম্পর বিপরীতধর্মী, ঠিক তেমনি এদের ফলাফলও বিপরীতধর্মী। যে ব্যক্তি বা দল প্রথম কর্মপদ্ধতিটি গ্রহণ করবে তার জন্য মহান আল্লাহ জীবনের সত্য সরল পথটি সহজ লভ্য করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য সংক্ষৈজ করা সহজ ও অসংকাজ করা কঠিন হয়ে যাবে। আর যারা দ্বিতীয় কর্মপদ্ধতিটি অবলম্বন করবে আল্লাহ জীবনের নোংরা, অপরিচ্ছন্ন ও কঠিন পথ তাদের জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তাদের জন্য অসংকাজ করা সহজ এবং সংকাজ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ বর্ণনা এমন একটি বাক্যের দ্বারা শেষ করা হয়েছে যা তীরবেগে হৃদয়ে প্রবেশ করে মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে বাক্যটি হচ্ছে : দুনিয়ার এই ধন-সম্পদ যার জন্য মানুষ প্রাণ দিয়ে দেয়, এসব তো কবরে তার সাথে যাবে না, তাহলে মরণের পরে এগুলো তার কি কাজে লাগবে?

দ্বিতীয় অংশেও এই একই রকম সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি মৌলিক তত্ত্ব পেশ করা হয়েছে। এক, দুনিয়ার এই পরীক্ষাগারে আল্লাহ মানুষকে অগ্রিম কিছু না জানিয়ে একেবারে অঙ্গ করে পাঠিয়ে দেননি। বরং জীবনের বিভিন্ন পথের মধ্যে সোজা পথ কোনটি এটি তাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজের জিঞ্চায় নিয়েছেন। এই সংগে একথা বলার প্রয়োজন ছিল না যে, নিজের রসূল ও নিজের কিতাব পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন। কারণ সবাইকে পথ দেখবার জন্য রসূল ও কুরআন সবার সামনে উপস্থিত ছিল। দুই, দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর কাছে দুনিয়া চাইলে তাও পাওয়া যাবে আবার আখেরাত চাইলে তাও তিনি দেবেন। এখন মানুষ এর মধ্য থেকে কোনটি চাইবে—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা মানুষের নিজের দায়িত্ব। তিনি, রসূল ও কিতাবের মাধ্যমে যে ন্যায় ও কল্যাণ পেশ করা হচ্ছে, যে হতভাগ্য ব্যক্তি তাকে মিথ্যা গণ্য করবে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে জুলন্ত আগুন। আর যে আল্লাহভীর ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিষ্পার্থভাবে নিছক নিজের রবের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের ধন-মাল সংর্পণে ব্যয় করবে তার রব তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন এবং তাকে এত বেশী দান করবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আয়াত ২১

সূরা আল লাইল-মঙ্গী

১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَاللَّيلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۚ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّ ۖ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ كَرَّ
 وَالاَنْثَىٰ ۚ إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۖ فَمَا مَانَ أَعْطَىٰ وَاتَّقِيَ ۚ
 وَصَدَقَ بِالْحَسْنِي ۖ فَسَنِيسِرَةُ الْلِّيْسِرِي ۖ وَأَمَانَ بَخِلَّ
 وَاسْتَفْنَىٰ ۖ وَكَلَّبَ بِالْحُسْنِي ۖ فَسَنِيسِرَةُ الْعَسِرِي ۖ
 وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَا لَهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۖ

রাতের কসম যখন তা চেকে যায়। দিনের কসম যখন তা উজ্জ্বল হয়। আর সেই
 সম্ভার কসম যিনি পুরুষ ও স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। আসলে তোমাদের প্রচেষ্টা নানা
 ধরনের।^১ কাজেই যে (আল্লাহর পথে) ধন-সম্পদ দান করেছে, (আল্লাহর
 নাফরমানি থেকে) দূরে থেকেছে এবং সৎভূতিকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে,^২ তাকে
 আমি সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।^৩ আর যে কৃপণতা করেছে, আল্লাহ
 থেকে বেপরোয়া হয়ে গেছে এবং সৎভূতিকে যিথ্যা গণ্য করেছে,^৪ তাকে আমি
 কঠিন পথের সুযোগ-সুবিধা দেবো।^৫ আর তার ধন-সম্পদ তার কোনু কাজে
 লাগবে যখন সে ধ্রংস হয়ে যাবে।^৬

১. এ কথার জন্যই রাত ও দিন এবং নারী ও পুরুষের জন্মের কসম খাওয়া হয়েছে।
 এর অর্থ হচ্ছে, যেভাবে রাত ও দিন এবং পুরুষ ও নারী পরম্পর থেকে ভির এবং তাদের
 প্রত্যেক জোড়ার প্রভাব ও ফলাফল পরম্পর বিরোধী, ঠিক তেমনি তোমরা যেসব পথে ও
 যেসব উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছ সেগুলোও বিভির ধরনের এবং সেগুলোর পরিণাম বিভির
 বিপরীতধর্মী ফলাফলেরও উদ্ভব ঘটে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে : এসব বিভির
 প্রচেষ্টা দু'টি বড় বড় ভাগে বিভক্ত।

২. এটি এক ধরনের মানবিক প্রচেষ্টা। তিনটি জিনিসকে এর অংগীভূত করা হয়েছে।
 গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, এগুলোর মধ্যে সব গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে। এর

মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ যেন অর্থ লিপ্তায় ডুবে না যায়। বরং নিজের অর্থ-সম্পদ, যে পরিমাণ আল্লাহ তাকে দিয়েছেন, তা আল্লাহ ও তাঁর বাস্তাদের অধিকার আদায়ে, সৎ-কাজে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে সাহায্য করার কাজে ব্যয় করে। দিতীয়টি হচ্ছে, তার মনে যেন আল্লাহর ভয় জাগরুক থাকে। সে যেন নিজের যাবতীয় কর্ম, আচার-আচরণ, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি জীবনের প্রতিটি বিভাগে আল্লাহর অসম্ভুষ্টির কারণ হতে পারে এমন প্রত্যেকটি কাজ থেকে দূরে থাকে। আর তৃতীয়টি হচ্ছে, সে যেন সৎবৃত্তি ও সৎকাজের সত্যতার শীকৃতি দেয়। সৎবৃত্তি ও সৎকাজ অত্যন্ত ব্যাপক অর্থবোধক। বিশ্বাস, বৈনিক চরিত্র ও কর্ম তিনটি সৎবৃত্তির অন্তরভুক্ত। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির শীকৃতি হচ্ছে, শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদ পরিতাগ করে মানুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আহোরাতকে সত্য বলে মেনে নেবে। আর কর্ম ও বৈনিক চরিত্রের ক্ষেত্রে সৎবৃত্তির শীকৃতি হচ্ছে, কোন নিস্তিষ্ঠ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ছাড়াই নিছক নিজের অজ্ঞাতসারে কোন সৎকাজ সম্পাদিত হওয়া নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও সৎবৃত্তির যে ব্যবস্থা দান করা হয়েছে মানুষ তাঁর সত্যতার শীকৃতি দেবে। আল্লাহ শরীয়ত নামক যে ব্যাপকতর ব্যবস্থাটি দান করেছেন এবং যার মধ্যে সব ধরনের ও সকল প্রকার সৎবৃত্তি ও সৎকাজকে সৃষ্টিখন্ডভাবে একটি ব্যবস্থার আওতাধীন করেছেন, মানুষ তাকে শীকার করে নিয়ে সেই অনুযায়ী সৎকাজ করবে।

৩. এটি হচ্ছে এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল। সহজ পথ মানে মানুষের স্বতাব ও প্রকৃতির সাথে মিল রয়েছে এমন পথ। যে স্থৰ্ঘ মানুষ ও এই সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করেছেন তিনি যেমন চান তেমন পথ। যে পথে নিজের বিবেকের সাথে লড়াই করে মানুষকে চলতে হয় না। যে পথে মানুষকে নিজের দেহ, আণ, বৃক্ষ ও মনের শক্তিগুলোর ওপর জোর খাটিয়ে যে কাজের জন্যে তাদেরকে এ শক্তি দান করা হয়নি জ্বরদস্তি তাদের থেকে সেই কাজ আদায় করে নিতে হয় না। বরং তাদের থেকে এমন কাজ নেয় যে জন্য তাদেরকে প্রকৃতপক্ষে এই শক্তিগুলো দান করা হয়েছে। পাপগূর্ণ জীবনে চতুরদিকে যেমন প্রতি পদে পদে সংঘাত, সংবর্ধ ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়, এ পথে মানুষকে তেমনি ধরনের কোন বাধা ও সংবাতের সম্মুখীন হতে হয় না। বরং মানুষের সমাজে প্রতি পদে পদে সে সহানুভূতি, সহযোগিতা, প্রেম, তালোবাসা, মর্যাদা ও সশ্রান্তি লাভ করতে থাকে। একথা সৃষ্টি, যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করে, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করে, নিজের জীবনকে অঙ্গীল কার্যকলাপ ও দৃঢ়ত্বমুক্ত রাখে, নিজের লেন-দেনের ব্যাপারে পরিচ্ছব ও ন্যায়-নিষ্ঠ থাকে, কারো সাথে বেইমানী, শপথ ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যার পক্ষ থেকে কারোর প্রতি জুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় আচরণের আশকা থাকে না। যে প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে সহ্যবহার করে এবং যার চরিত্র ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার স্থূলগ কারোর থাকে না, সে যতই নষ্ট ও ভষ্ট সমাজে বাস করুক না কেন সেখানে অবশ্যি সে মর্যাদার আসনে সমাজীন থাকে। মানুষের মন তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে থাকে। মানুষের হৃদয়ে তাঁর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তাঁর নিজের মন ও বিবেকও নিচিত হয়ে যায়। সমাজে তাঁর এমন মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়, যা কোন অস্বীকৃতি ও দৃঢ়ত্বকারী কোন দিন লাভ করতে পারে না। একথাটিকেই সূরা আন্ত নাহলে নিশ্চেতনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ نَكَرٍ أَوْ أُنْثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُخْبِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

“যে ব্যক্তি সৎকাজ করে, সে পূর্ণ হোক বা নারী, সে মুমিন হলে আমি অবশ্য তাকে ভালো জীবন যাপন করাবো।” (৯৭ আয়াত)

আবার একথাটি সূরা মারয়ামে নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ أَمْنَوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وَدًا -

“নিম্নে যারা ইমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে রহমান তাদের জন্য হৃদয়গুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন।” (৯৬ আয়াত)

তাছাড়া এটিই মানুষের জন্য দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত পূর্ণ আনন্দের একমাত্র পথ। একমাত্র এ পথেই আছে আরাম ও প্রশান্তি। এর ফলাফল সাময়িক ও ক্ষণকালীন নয় বরং এটা হচ্ছে চিরতন ও চিরস্থায়ী ফল, এর কোন ক্ষয় নেই।

এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলছেন, আমি তাকে এ পথে চলার সহজ সুযোগ দেবো। এর মানে হচ্ছে, যখন সে সৎবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, এটিই তার উপযোগী পথ এবং দুর্ভিতির পথ তার উপযোগী নয়, আর যখন সে কার্যত আর্থিক ত্যাগ ও তাকওয়ার জীবন অবলম্বন করে একথা প্রমাণ করবে যে, তার এই স্বীকৃতি সত্য, তখন আল্লাহ এ পথে চলা তার জন্য সহজ করে দেবেন। এ অবস্থায় তার জন্য আবার গোনাহ করা কঠিন এবং নেকী করা সহজ হয়ে যাবে। হারাম অর্ধ-সম্পদ তার সামনে এলে সে তাকে লাভের সওদা মনে করবে না। বরং সে অনুভব করবে, এটা জ্ঞান অংগার, একে সে হাতের তালুতে উঠিয়ে নিতে পারে না। ব্যতিচারের সুযোগ সে পাবে। কিন্তু তাকে সে ইন্দ্রিয় লিপ্তা চরিতার্থ করার সুযোগ মনে করে সেদিকে পা বাঢ়াবে না। বরং জাহানামের দরজা মনে করে তা থেকে দূরে পালিয়ে যাবে। নামায তার কাছে কঠিন মনে হবে না বরং নামাযের সময় হয়ে গেলে নামায না পড়া পর্যন্ত তার মনে শান্তি আসবে না। যাকাত দিতে তার মনে কষ্ট হবে না। বরং যাকাত আদায় না করা পর্যন্ত নিজের ধন-সম্পদ তার কাছে নাপক মনে হবে। মোটকথা, প্রতি পদে পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পথে চলার সুযোগ ও সুবিধা সে লাভ করতে থাকবে। অবস্থাকে তার উপযোগী বানিয়ে দেয়া হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, ইতিপূর্বে সূরা আল বালাদে এ পথটিকে দুর্গম পার্বত্য পথ বলা হয়েছিল আর এখানে একে বলা হচ্ছে, সহজ পথ। এই দু'টি কথাকে কিভাবে এক করা যাবে? এর জবাব হচ্ছে, এই পথ অবলম্বন করার আগে এটা মানুষের কাছে দুর্গম পার্বত্য পথই মনে হতে থাকে। এ উচ্চ দুর্গম পার্বত্য পথে চলার জন্য তাকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা নিজের বৈষয়িক সাথের অনুরাগী পরিবার পরিজন, নিজের আঙ্গীয়-স্বজন, বন্ধু-বাস্তব ও কাজ-কারবারের লোকজন এবং সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করতে হয়। কারণ এদের প্রত্যেকেই তাকে এ পথে চলতে বাধা দেয় এবং একে ভীতিপূর্দ বানিয়ে তার সামনে হায়ির করে। কিন্তু যখন মানুষ সৎবৃত্তির স্বীকৃতি দিয়ে সে পথে চলার সংকল্প করে, নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং তাকওয়ার পথ অবলম্বন করে কার্যত এই সংকল্পকে পাকাপোক্ত করে নেয়, তখন এই দুর্গম পথ

পাড়ি দেয়া তার জন্য সহজ এবং নৈতিক অবনতির গভীর খাদে গড়িয়ে পড়া কঠিন হয়ে পড়ে।

৪. এটি দ্বিতীয় ধরনের মানসিক প্রচেষ্টা। প্রথম ধরনের প্রচেষ্টাটির সাথে প্রতি পদে পদে রয়েছে এর অধিল। কৃপণতা মানে শুধুমাত্র প্রচলিত অর্থে যাকে কৃপণতা বলা হয় তা নয়। অর্থাৎ এক একটি পয়সা গুণে গুণে রাখা, খরচ না করা, না নিজের জন্য না নিজের ছেলেমেয়ের জন্য। বরং এখনে কৃপণতা বলতে আল্লাহর পথে এবং মেকী ও কল্যাণমূলক কাজে অর্থ ব্যয় না করা বুঝাচ্ছে। এদিক দিয়ে বিচার করলে এমন ব্যক্তিকেও কৃপণ বলা যায়, যে নিজের জন্য, নিজের আরাম-আয়েশ ও বিলাস-ব্যাসনের স্বার্থে এবং নিজের ইচ্ছামতো খুশী ও আনন্দ বিহারে দু'হাতে টাকা উড়ায় কিন্তু কোন ভালো কাজে তার পকেট থেকে একটি পয়সাও বের হয় না। অথবা কখনো বের হলেও তার পেছনে থাকে এর বিনিময়ে দুনিয়ার খ্যাতি, যশ, শাসকদের মৈকট্য লাভ বা অন্য কোন রকমের পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার। বেগরোয়া হয়ে যাওয়ার অথ দুনিয়ার বৈষয়িক লাভ ও স্বার্থকে নিজের যাবতীয় প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের লক্ষ্যে পরিণত করা এবং আল্লাহর ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাওয়া। কোন্ কাজে আল্লাহ খুশী হন এবং কোন্ কাজে নাখোশ হন তার কোন তোয়াক্তা না করা। আর সৎস্বত্ত্বিকে মিথ্যা গণ্য করার মানে হচ্ছে, সৎকাজকে তার সকল বিস্তারিত আকারে সত্য বলে মেনে না নেয়া এখানে এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ ইতিপূর্বে সৎস্বত্ত্বিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার বিষয়টি আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

৫. এ পথকে কঠিন বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পথে যে পাড়ি জমাতে চায় সে যদিও বৈষয়িক লাভ, পার্থিব ভোগ-বিলাস ও বাহ্যিক সাফল্যের লোতে এ দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু এখনে সর্বক্ষণ তাকে নিজের প্রকৃতি, বিবেক, বিশ-জাহানের মষ্টার তৈরি করা আইন এবং তার চারপাশের সমাজ পরিবেশের সাথে যুক্তে লিঙ্গ থাকতে হয়। সততা, ন্যায় পরায়ণতা, বিশৃঙ্খলা, ভদ্রতা, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা ও নীতি-নৈতিকতার সীমালংঘন করে যখন সে সর্বপ্রকারে নিজের স্থানসিদ্ধি ও গোড়-লালসা পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালায়, যখন তার মাধ্যমে আল্লাহর সৃষ্টির কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ হতে থাকে এবং সে অন্যের অধিকার ও মর্যাদার ওপর হস্তক্ষেপ করতে থাকে তখন নিজের চোখেই সে লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত জীবে পরিণত হয় এবং যে সমাজে সে বাস করে সেখানেও তাকে প্রতি পদে পদে লড়াই করে এগিয়ে যেতে হয়। সে দুর্বল হলে এসব কার্যকলাপের জন্য তাকে নানা ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। আর সে ধনী, শক্তিশালী ও প্রভাবশালী হলে সারা দুনিয়া তার শক্তির সামনে যাথা নত ক্রলেও কারো মনে তার জন্য সামান্যতমও শুভাকংক্ষা, সম্মানবোধ ও ভালোবাসার প্রবণতা জাগে না। এমন কি তার কাজের সাথী-সহযোগীরাও তাকে একইন বজ্জাত-দুর্বল হিসেবেই গণ্য করতে থাকে। আর এ ব্যাপারটি কেবলমাত্র ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী জাতিরাও যখন নৈতিকতার সীমানালংঘন করে নিজেদের শক্তি ও অর্থের বিভিন্ন পড়ে অসৎকাজে লিঙ্গ হয় তখন একদিকে বাইরের জগত তাদের শক্ত হয়ে দাঁড়ায় এবং অন্যদিকে তাদের নিজেদের সমাজ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, আত্মহত্যা, মেশাখোরী, দুরারোগ্য ব্যাধি, পারিবারিক জীবনের ধ্বংস, যুব সমাজের অসংগঠ অবলম্বন, শ্রেণী সংঘাত এবং জুনুম নিপীড়নের

إِنَّ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ إِنَّ لَنَا لِلآخرَةِ وَالاُولَىٰ فَأَنذِرْنَاكُمْ
 نَارًا تَلَظِّي لَا يَصْلَمَهَا إِلَّا أَشْقَىٰ الَّذِي كَذَّبَ
 وَتَوَلَّ وَسِيَجَنَّبَهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتَىٰ مَالَهُ يَتَرَكُّىٰ
 وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
 الْأَعْلَىٰ وَلِسُوفَ يُرْضِىٰ

নিসন্দেহে পথনির্দেশ দেয়া তো আমার দায়িত্বের অস্তরভূক্ত।^৭ আর আসলে আমি তো আবেরাত ও দুনিয়া উভয়েরই মালিক।^৮ তাই আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি জুলন্ত আগুন থেকে। যে চরম হতভাগ্য ব্যক্তি মিথ্যা আরোপ করেছে ও মৃখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ছাড়া আর কেউ তাতে ঝলসে যাবে না। আর যে পরম মৃত্যুকী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের ধন-সম্পদ দান করে তাকে তা থেকে দূরে রাখা হবে।^৯ তার প্রতি কারো কোন অনুগ্রহ নেই যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। সেতো কেবলমাত্র নিজের রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এ কাজ করে।^{১০} আর তিনি অবশ্য (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।^{১১}

বিপুলাকার রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি উন্নতির উচ্চতম শিখর থেকে একবার পতন ঘটার পর ইতিহাসের পাতায় তাদের জন্য কলংক, লানত ও অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই থাকেনি।

আর এই ধরনের লোককে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো, একথা বলার মানে হচ্ছে, তার থেকে সৎপথে চলার সুযোগ ছিনিয়ে নেয়া হবে। অসৎপথের দরজা তার জন্য খুলে দেয় হবে। অসৎকাজ করার যাবতীয় উপকরণ ও কার্যকারণ তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হবে। খারাপ কাজ করা তার জন্য সহজ হবে এবং ভালো কাজ করার চিন্তা মনে উদয় হওয়ার সাথে সাথেই সে মনে করবে এই বৃক্ষি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকেই কুরআনে অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে : “আন্নাহ যাকে পথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য খুলে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহির মধ্যে ঠেলে দেবার এরাদা করেন তার বক্ষদেশকে সংকীর্ণ করে দেন এবং তাকে এমনভাবে সংকৃতি করেন যার ফলে (ইসলামের কথা মনে হলেই) সে অনুভব করতে থাকে যেন তার প্রাণবায়ু উড়ে যাচ্ছে। (আনআম ১.২৫ আয়াত) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে : নিসন্দেহে নামায একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ, কিন্তু আন্নাহ অনুগত বাস্তুর জন্য নয়।” (আল বাকারাহ ৪৬ আয়াত) আর মোনাফেকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “তারা নামাযের দিকে এলেও গড়িমসি করে আসে এবং আন্নাহর পথে খরচ করলেও যেন মন চায় না তবুও খরচ

করে।” (আত তাওবাহ ৫৪ আয়াত) আরো বলা হয়েছে : “তাদের মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা আল্লাহর পথে কিছু খরচ করলে তাকে নিজেদের ওপর জবরদস্তি আরোপিত জরিমানা মনে করে।” (আত তাওবাহ ৯৮ আয়াত)

৬. অন্য কথায় বলা যায়, একদিন তাকে অবশ্য মরতে হবে। তখন এখানে আয়েশ আরামের জন্য সে যা কিছু সংগ্রহ করেছিল সব এই দুনিয়াতেই রেখে যেতে হবে। যদি নিজের আখেরাতের জন্য এখান থেকে কিছু কামাই করে না নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে দুনিয়ার এ-ধন-সম্পদ তার কোন্ কাজে লাগবে? সে তো কোন দালান কোঠা, মোটরগাড়ি, সম্পত্তি বা জমানো অর্থ সংগে করে কবরে যাবে না।

৭. অর্থাৎ মানুষের স্মষ্টা হ্বার কারণে মহান আল্লাহ নিজের জ্ঞানপূর্ণ কর্মনীতি, ন্যায়নিষ্ঠা ও রহমতের ভিত্তিতে নিজেই মানুষকে এ দুনিয়ায় এমনভাবে ছেড়ে দেননি যে, সে কিছুই জানে না। বরং সঠিক পথ কোনৃটি ও ভূল পথ কোনৃটি, নেকী, গোনাহ, হালাল ও হারাম কি, কোন্ কর্মনীতি তাকে নাফরমান বাদার ভূমিকায় এনে বসাবে—এসব কথা জানিয়ে দেবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন।

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ
একথাটিকেই সূরা আল নাহলে এভাবে বলা হয়েছে : “আর সোজা পথ দেখাবার দায়িত্ব আল্লাহরই ওপর বার্তায় যখন বাঁকা পথও রয়েছে।” (৯ আয়াত) ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল নাহল, ৯ টীকা।

৮. এ বক্তব্যটির কয়েকটি অর্থ হয়। সবগুলো অর্থই সঠিক। এক, দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত কোথাও তোমরা আমার নিয়ন্ত্রণ ও পাকড়াও এর বাইরে অবস্থান করছো না। কারণ আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুই, তোমরা আমার দেখানো পথে চলো বা না চলো আসলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ের ওপর আমার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। তোমরা ভূল পথে চললে তাতে আমার কোন ক্ষতি হবে না, তোমাদের ক্ষতি হবে। আর তোমরা সঠিক পথে চললে আমার কোন লাভ হবে না, তোমারাই লাভবান হবে। তোমাদের নাফরমানির কারণে আমার মালিকানায় কোন কর্মতি দেখা দেবে না এবং তোমাদের আনগত্য তার মধ্যে কোন বৃক্ষিও ঘটাতে পারবে না। তিনি, আমিই উভয় জাহানের মালিক। দুনিয়া তথ্য বৈষয়িক স্বার্থ চাইলে তা আমার কাছ থেকেই তোমরা পাবে। আবার আখেরাতের কল্যাণ চাইলে তাও দেবার ক্ষমতা একমাত্র আমারই আছে। একথাটিই সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে :

وَمَنْ يُرِيدُ شَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۝ وَمَنْ يُرِيدُ شَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا

“যে ব্যক্তি দুনিয়ায় সওয়াব হাসিলের সংকলে কাজ করবে আমি তাকে দুনিয়া থেকেই দেবো আর যে ব্যক্তি আখেরাতের সওয়াব হাসিলের সংকলে কাজ করবে আমি তাকে আখেরাত থেকে দেবো।”

সূরা শুরা ২০ আয়াতে একথাটি নিশ্চেতনভাবে বলা হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ الْآخِرَةِ نَزِدْلَهُ فِي حَرثِهِ ۝ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرثَ
الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۝ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ۔

“যে ব্যক্তি আখেরাতের কৃষি চায় তার কৃষিকে আমি বাঢ়িয়ে দেই আর যে দুনিয়ার কৃষি চায় তাকে দুনিয়া থেকেই দান করি, কিন্তু আখেরাতে তার কোন অংশ নেই।”

আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আলে ইমরান ১০৫ টীকা এবং আশুরা ৩৫ টীকা।

৯. এর অর্থ এই নয় যে, চরম হতভাগ্য ছাড়া আর কেউ জাহানামে যাবে না এবং পরম মুক্তাকী ছাড়া আর কেউ তার হাত থেকে নিন্দিতি পাবে না। বরং দু'টি চরম পরম্পরার বিরোধী চরিত্রিকে পরম্পরার বিরুদ্ধে পেশ করে তাদের পরম্পর বিরোধী চরম পরিণাম বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। এক ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শিক্ষাকে মিথ্যা বলে এবং আনুগত্যের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেবল ঈমান এনেই ক্ষত হয় না বরং পরম আন্তরিকতা সহকারে কোন প্রকার লোক দেখানো প্রবণতা, নাম যশ ও খ্যাতির মোহ ছাড়াই শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে পাক-পবিত্র মানুষ হিসেবে গণ্য হবার আকাঞ্চ্য আল্লাহর পথে নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। এই দু' ধরনের চরিত্র সম্পর লোক সে সময় মক্কার সমাজে সবার সমানে বর্তমান ছিল। তাই কারো নাম না নিয়ে লোকদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে, জাহানামের আগনে দ্বিতীয় ধরনের চরিত্র সম্পর লোক নয় বরং প্রথম ধরনের চরিত্র সম্পর লোকই পুড়বে। আর এই আগন থেকে প্রথম ধরনের লোক নয় বরং দ্বিতীয় ধরনের লোককেই দূরে রাখা হবে।

১০. এখানে সেই মুক্তাকী ও আল্লাহভীর ব্যক্তির আন্তরিকতার আরো বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। সে নিজের অর্থ যাদের জন্য ব্যয় করে, আগে থেকেই তার কোন অনুগ্রহ তার ওপর ছিল না, যার বদলা সে এখন চুকাচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে তাদের থেকে আরো স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তাদেরকে উপহার উপটোকন ইত্যাদি দিচ্ছে এবং তাদেরকে দাওয়াত খাওয়াচ্ছে। বরং সে নিজের মহান ও সর্বশক্তিমান রবের সন্তুষ্টিলাভের জন্য এমনসব লোককে সাহায্য করছে, যারা ইতিপূর্বে তার কোন উপকার করেনি এবং ভবিষ্যতেও তাদের উপকার করার কোন আশা নেই। এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হচ্ছে হ্যরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহ আনহৰ গোলাম ও বাঁদীদের আযাদ করার কাজটি। মঙ্গা মু'আয্যমার যে অসহায় গোলাম ও বাঁদীরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই অপরাধে তাদের মালিকরা তাদের ওপর চরম অকৰ্ত্তব্য নির্যাতন ও নিপীড়ন চালাছিল হ্যরত আবু বকর (রা) তাদেরকে মালিকদের জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্য কিনে নিয়ে আযাদ করে দিছিলেন। ইবনে জারীর ও ইবনে আসাকির হ্যরত আয়ের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের এই রেওয়ায়াতটি উদ্ভৃত করেছেন : হ্যরত আবু বকরকে এভাবে গরীব গোলাম ও বাঁদীদেরকে গোলামী মুক্ত করার জন্য অর্থ ব্যয় করতে দেখে তাঁর পিতা তাকে বলেন, হে পুত্র! আমি দেখছি তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করে দিচ্ছো, যদি এ টাকাটা ভূমি শক্তিশালী জোয়ানদের মুক্ত করার জন্য খরচ করতে তাহলে তারা তোমার হাতকে শক্তিশালী করতো। একথায় হ্যরত আবু বকর (রা) তাঁকে বলেন : أَبَاهُ أَنَّمَا أَرِيدُ مَا عَذَالَّ^۱ আব্রাজান। আমি তো আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান চাই।”

১১. এ আয়াতের দু'টি অর্থ হতে পারে। দু'টি অর্থই সঠিক। একটি অর্থ হচ্ছে, নিচয়ই আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, শীঘ্রই আল্লাহ এ ব্যক্তিকে এতসব কিছু দেবেন যার ফলে সে খুশী হয়ে যাবে।

আদ দুহা

৯৩

নামিলের সময়-কাল

সূরার প্রথম শব্দ ওয়াদুহ (وَالضَّحْيَ) -কে এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

এই সূরার বক্তব্য বিষয় থেকে একথা পুরোপুরি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এটি মুক্ত মু'আয্যমায় প্রথম যুগে নাযিল হয়। হাদিস থেকেও জানা যায়, কিছুদিন অহীর অবতরণ বঙ্গ ছিল। এ জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। বাবাবার তাঁর মনে এই আশক্তির উদয় হচ্ছিল, হয়তো তাঁর এমন কোন জ্ঞান হয়ে গেছে যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তাঁকে পরিভ্যাগ করেছেন। এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, কোন প্রকার অস্বুষ্টির কারণে অহীর সিলসিলা বঙ্গ করা হয়নি। বরং এর পেছনে সেই একই কারণ সত্ত্বিয় ছিল যা আলোকোজ্জ্বল দিনের পরে রাতের নিষ্ঠুরতা এ প্রশান্তি হেয়ে যাবার মধ্যে সক্রিয় থাকে। অর্থাৎ অহীর প্রথম কিরণ যদি একনাগড়ে তাঁর প্রতি বর্ষিত হতো তাহলে তাঁর স্নায় তা বরদাশ্ত করতে পারতো না। তাই মাঝখানে বিরতি দেয়া হয়েছে। তাঁকে আরাম ও প্রশান্তি দান করাই এর উদ্দেশ্য। নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অবস্থার মুখ্যমুখ্য হন। সে সময় অহী নামিলের কষ্ট বরদাশ্ত করার অভ্যাস তাঁর গড়ে উঠেনি। তাই মাঝে মাঝে ফাঁক দেবার প্রয়োজন ছিল। সূরা মুদ্দাসুসিরের ভূমিকায় আমি একথা সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আর অহী নামিলের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নায়ুর ওপর এর কী গভীর প্রভাব-পড়তো তা আমি সূরা মুয়াবিলের ৫ টীকায় বলেছি। পরে তাঁর মধ্যে এই ঘটাতার বরদাশ্ত করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয়ে গেলে আর দীর্ঘ ফাঁক দেবার প্রয়োজন থাকেনি।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য রস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়। আর এই সান্ত্বনা দানের উদ্দেশ্য ছিল অহী নামিলের সিলসিলা বঙ্গ হয়ে যাবার কারণে তাঁর মধ্যে যে পেরেশানী দেখা দিয়েছিল তা দূর করা। প্রথমে আলো ঝলমল দিনের এবং রাতের নীরবতা ও প্রশান্তির ক্ষমতা এই মর্যে নিচিত্ততা দান করা হয়েছে যে, তাঁর রব তাঁকে মোটেই পরিভ্যাগ করেননি এবং তিনি তাঁর প্রতি অস্বুষ্ট হননি। এরপর তাঁকে

সুসংবাদ দান করা হয়েছে যে, ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে যেসব কঠিন সমস্যা ও সংকটের সম্মুখীন হতে ইচ্ছে এগুলো মাত্র কয়েকদিনের বাপার। তাঁর জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি পর্যায় পূর্ববর্তী পর্যায় থেকে উন্নততর হয়ে যেতেই থাকবে এবং কিছুদিনের মধ্যেই মহান আল্লাহ তাঁর উপর এমনভাবে তাঁর দান বর্ণ করতে থাকবেন যার ফলে তিনি খুশী হয়ে যাবেন। কুরআনের যেসব সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তীকালে অঙ্গরে অঙ্গরে পূর্ণ হয় এটি তাঁর অন্যতম। অথচ যে সময় এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন যেসব অসহায় সাহায্য-সম্বলহীন ব্যক্তি মকায় সমগ্র জাতির জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত ছিল তাঁরা যে কোনদিন এত বড় বিশ্বাসকর সাফল্যের মুখ দেখবে এর কোন দূরবর্তী আলামতও কোথাও দেখা যায়নি।

তারপর মহান আল্লাহ তাঁর বক্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি তোমাকে পরিত্যাগ করেছি এবং তোমার প্রতি অস্তুষ্ট হয়েছি—এ ধরনের পেরেশানীতে তুমি ভুগছো কেন? আমি তো তোমার জন্মের দিন থেকেই তোমার প্রতি অবিরাম মেহেরবানী করে আসছি। তুমি এতিম অবস্থায় জন্মলাভ করেছিলে। আমি তোমার প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সর্বোন্নম ব্যবস্থাপনা করেছি। তুমি অনভিজ্ঞ ছিলে। আমি তোমাকে পথের সন্ধান দিয়েছি। তুমি অর্থ-সম্পদহীন ছিলে। আমি তোমাকে বিস্তৃশালী করেছি। এসব কথা পরিকারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, তুমি শুরু থেকেই আমার প্রিয়পাত্র আছো এবং আমার মেহেরবানী, অনুগ্রহ দান স্থায়ীভাবে তোমার সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সুরা ত্বা-হ'র ৩৭ থেকে ৪২ পর্যন্ত আয়াতগুলোও সামনে রাখতে হবে। এই আয়াতগুলোতে হ্যরত মূসাকে ফেরাউনের মতো শক্তিশালী জালেমের বিরুদ্ধে পাঠাবার সময় আল্লাহ তাঁর পেরেশানী দূর করার জন্য তাঁর জন্মের পর থেকে কিভাবে আল্লাহর মেহেরবানী তাঁকে ধিরে রেখেছিল সে কথা তাঁকে বলেন। এই সংগে তাঁকে একথাও বলেন যে, এ অবস্থায় তুমি নিচিত থাকো, এই ত্যাবহ অভিযানে তুমি একাকী থাকবে না বরং আমার মেহেরবানীও তোমার সাথে থাকবে।

সবশেষে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেসব অনুগ্রহ করেছেন তাঁর জবাবে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে তাঁর কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং তাঁর নিয়ামতের শুকরিয়া কিভাবে আদায় করতে হবে একথা তাঁকে জানিয়ে দেন।

আয়াত ১১

সূরা আদ দুহা-মুক্তি

মুক্তি ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْفُخْسِيٌّ وَالْيَلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَ عَكْرَبَكَ وَمَا قَلَىٰ ۝
وَلَلَّا خِرَةً خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأَوْلَىٰ ۝ وَلَسْوَفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَىٰ ۝

উজ্জ্বল দিনের কসম^১ এবং রাতের কসম যখন তা নিষ্কুম হয়ে যায়।^২ (হে নবী!) তোমার রব তোমাকে কখনো পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি অসমৃষ্টও হননি।^৩ নিসলেহে তোমার জন্য পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো।^৪ আর শীত্রই তোমার রব তোমাকে এত দেবেন যে, তুমি খুশী হয়ে যাবে।^৫

১. এখানে “দুহা” শব্দটি রাতের মোকাবেশায় ব্যবহার করা হয়েছে তাই এর অর্থ উজ্জ্বল দিবা। সূরা আ’রাফের নিম্নোক্ত আয়াতটিকে এর নজীর হিসেবে পেশ করা যায় :

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرْبَىٰ أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا بَيَّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرْبَىٰ
أَنْ يَأْتِيهِمْ بَأْسُنَا ضَحْنَىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ -

‘জনপদবাসীরা কি এ ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে পড়েছে যে, তাদের ওপর রাতে আমার আধাব আসবে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকবে? আর জনপদের লোকেরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে তাদের ওপর দিন-দুপুরে আমার আধাব আসবে যখন তারা খেলতে থাকবে?’ (১৭-১৮ আয়াত) এই আয়াতগুলোতেও “দুহা” (পুরুষ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে রাতের মোকাবেশায়। আর এর অর্থ চাপৃষ্ঠ এর সময় নয়, বরং দিন।

২. মূলে রাতের সাথে سجىٰ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে শুধুমাত্র অঙ্ককার ছেয়ে যাবাইরই নয় বরং নিষ্কুম ও শাস্তি হয়ে যাবার অর্থও পাওয়া যায়। সামনের দিকে যে বর্ণনা আসছে তার সাথে রাতের এই শৃণাবলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

৩. হাদীস থেকে জানা যায়, কিছুদিন রসূলুল্লাহ আল্লাহই ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বস্তু ছিল। এ সময়টা কতদিনের ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। ইবনে জুরাইজ ১২ দিন, কালবী ১৫ দিন, ইবনে আবাস ২৫ দিন, সুন্দী ও মুকাতিল এর মেয়াদ ৪৫ দিন বলে বর্ণনা করেছেন। মোটকোথা, সময়টা এত দীর্ঘ ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সা) নিজে এ জন্য খ্রিয়মান হয়ে পড়েছিলেন এবং বিরোধীরাও তাকে বিদ্যুপ করতে শুরু করেছিল। কারণ তার ওপর নতুন নতুন সূরা নাযিল হলে তিনি তা

লোকদের শুনাতেন। তাই দীর্ঘদিন যখন তিনি লোকদেরকে কোন অঙ্গী শুনালেন না তখন বিরোধীরা মনে করলো এ কানাম যেখান থেকে আসতো সে উৎস বক্ষ হয়ে গেছে। অনুব ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন জিরুল আলাইহিস সালামের আসার সিলসিলা থেমে গেলো, মুশরিকরা বলতে শুরু করলো : মুহাম্মাদকে (সা) তাঁর রব পরিত্যাগ করেছেন। (ইবনে জারীর, তাবারানী, আব্দ ইবনে হমাইদ, সাঈদ ইবনে মনসুর ও ইবনে মারদুইয়া) অন্যান্য বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল (সা)-এর চাচী আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের ঘর ছিল তাঁর ঘরের সাথে লাগোয়া। সে তাঁকে ডেকে বললো : “মনে হচ্ছে তোমার শয়তান তোমাকে পরিত্যাগ করেছে।” আউফী ও ইবনে জারীর হয়রত ইবনে আব্দুস (রা) থেকে রেওয়ায়াত উন্নত করে বলেন : কয়েকদিন পর্যন্ত জিরুলের আসা বক্ষ থাকার কারণে রসূলুল্লাহ (সা) পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। অন্যদিকে মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। কাতাদাহ ও যাতুহাক বর্ণিত মুরসাল* হাদীসেও প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এ অবস্থায় বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) গভীর দুঃখ ও মর্মব্যধির কথাও বর্ণিত হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কারণ প্রেমাঙ্গের দিক থেকে বাহ্যত অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা, কৃফর ও ঈমানের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যাবার পর এই প্রাণস্তুকর সংঘাত সংঘাতের মাঝ দারিয়ায় যে শক্তিটি ছিল তাঁর একমাত্র সহায় তাঁর সাহায্য থেকে বাহ্যত বর্ধিত হওয়া এবং এর উপর বাঢ়তি বিপদ হিসেবে শক্তিদের বিদ্রূপ-ভর্তসনা ইত্যাদি। এসব কিছু মিলে অবশ্য তাঁর জন্য মারাত্মক ধরনের পেরেশানী সৃষ্টি করে দিয়েছিল। এ অবস্থায় তাঁর মনে বারবার এ সন্দেহ জেগে থাকবে যে, তিনি এমন কোন ভুল তো করেননি যার ফলে তাঁর রব তাঁর প্রতি নারাজ হয়ে গেছেন এবং তিনি হক ও বাতিলের এই লড়াইয়ে তাঁকে একাকী ছেড়ে দিয়েছেন।

এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। এতে দিনের আলোর ও রাতের নিরবতার কসম থেকে রসূলুল্লাহকে (সা) বলা হয়েছে : তোমার রব তোমাকে পরিত্যাগ করেননি এবং তোমার প্রতি নারাজও হননি। একথার জন্য যে সহস্রের ভিত্তিতে এই দু'টি জিনিসের কসম খাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দিনের আলোকমালায় উদ্ভাসিত হওয়া এবং রাতের নিমুমতা ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়া যেমন আল্লাহর দিনে মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট এবং রাতে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকার জন্য নয় বরং একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনে এই দু'টি অবস্থার উন্নত হয় ঠিক তেমনি তোমার কাছে কথনো অঙ্গী পাঠানো এবং তা পাঠানো বক্ষ করাও একটি বিরাট বিজ্ঞানময় ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্যের আওতাধীনেই হয়ে থাকে। মহান

* মুরসাল এমন এক ধরনের হাদীসকে বলা হয় যেখানে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী হিসেবে সাহাবীর নাম উল্লেখিত হয়নি অর্থাৎ তাবেরী সাহাবীর নাম উল্লেখ ছাড়াই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীসের বর্ণনা করেছেন। ইমামদের মধ্যে আবু হানিফা (রা) ও মালিক (রা)-ই একমাত্র এ ধরনের হাদীসকে প্রশংস হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ ইবনে হাবল (রা) মুরসাল হাদীসের ভিত্তিতে ফতওয়া দিয়েছেন এবং এর বিপরীত রায়কে রদ করেছেন। (আ'লামুল মুকিইন, ইবনে কাইয়েম) -অনুবাদক

আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকলে অহী পাঠান এবং যখন অহী পাঠান না তখন মনে করতে হবে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তোমাকে ত্যাগ করেছেন—এ ধরনের কোন কথা বা বক্তব্যের কোন সম্পর্ক এখানে নেই। এ ছাড়া এই বিষয়বস্তুর সাথে এই কসমের আরো সম্পর্ক রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, দিনে সূর্যের ক্রিয়ণ যদি অনবরত মানুষের ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তাকে ক্লান্ত ও অবশ করে দেবে। তাই একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত দিনের আলো বিরাজ করে। এরপরে রাতের আসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে মানুষ ক্লান্তি দূর করতে ও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। অনুরূপভাবে অহীর ক্রিয়ণ যদি অনবরত তোমার ওপর পড়তে থাকে তাহলে তা তোমার স্নায়ুর সহ্যের অতীত হয়ে পড়বে। তাই যারে মধ্যে ফাতরাতুল অহীর (অহী নাযিলের সিলসিলা বক্ত হয়ে যাওয়া) একটি সময়ও আল্লাহ ঠিক করে রেখেছেন। এভাবে অহী নাযিল হওয়ার কারণে তোমার ওপর যে চাপ পড়ে তার প্রভাব খতম হয়ে যাবে এবং তুমি মানসিক প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। অর্থাৎ অহী সূর্যের উদয় যেন ঠিক উজ্জ্বল দিনের সমতুল্য এবং ফাতরাতুল অহীর সময়টি রাতের প্রশান্তির পর্যায়ভূক্ত।

৪. মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সুখবরটি এমন এক সময় দেন যখন মাত্র মৃষ্টিমেয় কয়েকজন লোক ছিল তাঁর সংহয়োগী এবং অন্যদিকে সমগ্র জাতি ছিল তাঁর বিরোধী। বাহ্যত সাফল্যের কোন দূরবর্তী চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। ইসলামের প্রদীপ মকাতে চিম চিম করে ছালচ্ছিল। চতুরদিকে ঝড় উঠেছিল তাকে নিভিয়ে দেবার জন্য। সে সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন : প্রাথমিক যুগের সংকটে তুমি মোটেই পেরেশান হয়ে না। তোমার জন্য পরবর্তী প্রত্যেকটি যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো প্রমাণিত হবে। তোমার শক্তি, সম্মান, প্রতিপত্তি ও মর্যাদা দিনের পর দিন বাঢ়তে থাকবে। তোমার প্রভাব ও অনুপ্রবেশের সীমানা বিস্তৃত হতেই থাকবে। আবার এই ওয়াদা কেবল দুনিয়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। এর মধ্যে এ ওয়াদাও আছে যে, আবেরাতে তুমি যে মর্যাদা লাভ করবে তা দুনিয়ায় তোমার অর্জিত মর্যাদা থেকে অনেক গুণ বেশী হবে। তাবারানী তাঁর আওসাত গছে এবং বাইহাকী তাঁর দালায়েল গ্রন্থে ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ভূত করেছেন তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “আমার পরে আমার উস্তাদ যেসব দেশ জয় করবে তা আমার সামনে পেশ করা হয়। তাতে আমি খুব খুশী হই। তখন মহান আল্লাহ একথা নাযিল করেন যে, আবেরাত তোমার জন্য দুনিয়া থেকেও ভালো।”

৫. অর্থাৎ দিতে কিছুটা দেরী হলে সেসময় দূরে নয়, যখন তোমার ওপর তোমার রবের দান ও মেহেরবানী এমনভাবে বর্ষিত হবে যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে। এই ওয়াদাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনেই পূর্ণ হয়েছে। সমগ্র আরব ভূখণ্ড, দক্ষিণের সমুদ্র উপকূল থেকে উপরে রোম সাম্রাজ্যের সিরীয় সীমান্ত ও পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাকী সীমান্ত পর্যন্ত এবং পূর্বে পারস্য উপসাগর থেকে নিয়ে পচিমে লোহিত সাগর পর্যন্ত এলাকা তাঁর শাসনাধীনে চলে আসে। আরবের ইতিহাসে এই প্রথমবার এই সমগ্র ভূখণ্ডটি একটি আইন ও শাসন ব্যবস্থার আওতাধীন হয়। যে শক্তিই এর সাথে সংযর্থে লিঙ্গ হয়, সে চূৰ্ণ-বিচূৰ্ণ হয়ে যায়। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহর কালেমায় সমগ্র দেশ শুঁজরিত হয়ে ওঠে। যে দেশে মুশারিক ও আহলি কিতাবী নিজেদের মিথ্যা মতবাদ ও

الْمَرْيَجِلُكَ يَتِيمًا فَأَوَىٰ ۚ وَوَجَلَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ۖ ۗ وَوَجَلَكَ
عَالِلًا فَأَغْنَىٰ ۖ ۗ فَأَمَا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهِرُ ۚ وَأَمَا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ
ۖ وَأَمَا بِنِسْعَمَةِ رَبِّكَ فَحَلِّتُ ۖ ۗ

তিনি কি তোমাকে এতিম হিসেবে পাননি? তারপর তোমাকে আশ্রয দেননি।^৬ তিনি তোমাকে পথ না পাওয়া অবস্থায পান, তারপর তিনিই পথ দেখান।^৭ তিনি তোমাকে নিঃস্ব অবস্থায পান, তারপর তোমাকে ধনী করেন।^৮ কাজেই এতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না।^৯ প্রাণীকে তিরক্ষার করো না।^{১০} আর নিজের রবের নিয়মত প্রকাশ করো।^{১১}

আদশকে বিজয়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে প্রাণস্তকর প্রচেষ্টা চালিয়েছিল সেখানে মানুষ কেবল আনুগত্যের শিরই নত করেনি বরং তাদের মনও বিজিত হয়ে যায় এবং তাদের বিশ্বাসে, নেতৃত্বে ও কর্মকাণ্ডে বিরাট বিপ্রব সাধিত হয়। জাহেলিয়াতের গভীর পৎকে নিমজ্জিত একটি জাতি মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে এমনভাবে বদলে যায় যে, সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এর কোন নজীর নেই। এরপর নবী (সা) যে আদোলনের বীজ বপন করে গিয়েছিলেন তা বিপুল শক্তিমন্ত্র সহকারে জেগে উঠে এবং এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিন মহাদেশের বিরাট অংশে ছেয়ে যায় এবং দুনিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এসব মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে দিয়েছেন দুনিয়ায়। আর আবেরাতে তাঁকে যা কিছু দেবেন তার বিপুলতা ও মহত্বের কল্পনাই করা যাবে না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ১১২ টাকা)

৬. অর্থাৎ তোমাকে ত্যাগ করার ও তোমার প্রতি অসমৃষ্ট হবার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। যখন তুমি এতিম অবস্থায জন্মলাভ করেছিলে তখন হেকেই তো আমি তোমার প্রতি যেহেরবানী করে আসছি। যায়ের গর্তে থাকাকালীন ছয় মাসের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা ইস্তিকাল করেন। কাজেই এতিম হিসেবেই তিনি পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু এ অবস্থায মহান আল্লাহ একদিনও তাঁকে অসহায অবস্থায ছেড়ে দেননি। ছ'বছর বয়স পর্যন্ত যা তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। তাঁর মেহেছায়া থেকে বাস্তিত হবার পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদা তাঁকে প্রতিপালন করেন। দাদা কেবল তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেনই তাই না বরং তাঁর জন্য গর্বও করতেন। তিনি লোকদের বলতেন, আমার এই ছেলে একদিন দুনিয়ায বিপুল খ্যাতির অধিকারী হবে। তার ইস্তিকালের পর চাচা আবু তালিব তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব নেন। চাচা তাঁর সাথে এমন প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন যে, কোন পিতার পক্ষেও এর চেয়ে বেশী প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এমনকি নবুওয়াত লাভের পর সমগ্র যখন তাঁর শক্তি হয়ে গিয়েছিল তখন দশ বছর পর্যন্ত তিনিই তার সাহায্যার্থে চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন।

৭. মূলে “দাল্লান” (الدَّلَلَانْ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি এসেছে “দালালাত” (ضَلَالٌ) থেকে। এর কয়েকটি অর্থ হয়। এর একটি অর্থ গোমরাহী। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এক ব্যক্তি পথ জানে না, এক জায়গায় গিয়ে সে সামনে বিভিন্ন পথ দেখে কোনু পথে যাবে তা ঠিক করতে না পেরে কিংকর্তব্যবিমৃঢ় হয়ে পড়ে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে হারিয়ে যাওয়া বা হারানো জিনিস। আরবী প্রবাদে বলা হয়, **ضُلُّ إِلَّا فِي الْبَنِ** অর্থাৎ পানি দুধের মধ্যে হারিয়ে গেছে। মরম্ভুমির মধ্যে যে গাছটি এককি দাঁড়িয়ে থাকে এবং তার আশেপাশে কোন গাছ থাকে না তাকেও আরবীতে “দাল্লাহ” বলা হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া অর্থেও “দালাল” (ضَلَالٌ) বলা হয়। যেমন, অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে কোন জিনিস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেখানেও “দালাল” শব্দ ব্যবহার করা হয়। আবার গাফলতির জন্যও “দালাল”, ব্যবহার করা হয়। যেমন কুরআন মজীদে এর দৃষ্টান্ত দেখা যায় : **يَضْلِلُ رَبِّيْ وَلَا يَنْسِيْ** (إِلَّا حَ ৫২) এই বিভিন্ন অর্থের মধ্য থেকে প্রথম অর্থটি এখানে খাপ খায় না। কারণ ইতিহাসে রসূলের শৈশব থেকে নিয়ে নবুওয়াত লাভ করার পূর্বে পর্যন্ত সময়—কালের যেসব অবস্থা লিপিবদ্ধ রয়েছে তাতে কোথাও তিনি কখনো **مُتْكِبُّ**, শিরক বা নাস্তিক্যবাদে লিঙ্গ হয়েছিলেন অথবা তাঁর জাতির মধ্যে যেসব জাহেলী কার্যকলাপ, রীতিনীতি ও আচার আচরণের প্রচলন ছিল তার সাথেও তিনি কোনক্রমে জড়িত হয়েছিলেন বলে সামান্যতম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই **أَلَّا يَجْعَلَ** বাক্যে কোনক্রমেই এ অর্থ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁকে বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে গোমরাহ হিসেবে পেয়েছিলেন। তবে অন্যান্য অর্থগুলো কোন না কোনভাবে এখানে খাপ খেতে পারে। বরং বিভিন্ন দিক থেকে হয়তো প্রত্যেকটি অর্থই এখানে কার্যকর হতে পারে। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অঙ্গত্বে ও তাঁর একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এতে সন্দেহ নেই। সে সময় তাঁর জীবন গোনাহ মুক্ত এবং নৈতিক শুণাবলী সফলিত ছিল। কিন্তু সত্যদীন এবং তাঁর মূলনীতি ও বিধান সংস্করে তিনি কিছুই জানতেন না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে : **مَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا اِنْيَمَانُ** অর্থাৎ “তুমি জানতে, না কিভাব কি এবং ঈমানই বা কি।” (আশুরা ৫২ আয়াত) এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে, নবী (সা) একটি জাহেলী সমাজের বুকে হারিয়ে গিয়েছিলেন এবং নবুওয়াত লাভের আগে একজন পথপ্রদর্শক ও পথের দিশা দানকারী হিসেবে তাঁর ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে সামনে আসেনি। এর এ অর্থও হতে পারে যে, জাহেলিয়াতের মরম্ভুমিতে আগনি দাঁড়িয়েছিলেন একটি নিসংগ বৃক্ষের মতো। এই বৃক্ষের ফল উৎপাদনের ও চারাগাছ বৃক্ষি করে আর একটি বাগান তৈরি করার যোগ্যতা ছিল। কিন্তু নবুওয়াতের পূর্বে এ যোগ্যতা কোন কাজে আগেনি। এ অর্থও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ আপনাকে অসাধারণ ক্ষমতা দান করেছিলেন। জাহেলিয়াতের অনুপযোগী ও বিরোধী পরিবেশে তা নষ্ট হতে বসেছিল। “দালাল”কে গাফলতির অর্থেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পরে আল্লাহ তাঁকে যেসব জ্ঞান ও সত্যের সাথে পরিচিত করিয়েছেন ইতিপূর্বে তিনি সেগুলো থেকে গাফেল ছিলেন। কুরআনেও এক জায়গায় বলা হয়েছে। **وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لِمَنِ الْفَلَقِينَ** (ইউসুফ ৩) এ ছাড়াও দেখুন সূরা আল বাকারাহ ২৮৩ আয়াত এবং আশু শু'আরা ২০ আয়াত।

৮. নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৈতৃক সূত্রে উন্নরাধিকার হিসেবে শুধুমাত্র একটি উটনী ও একটি বৌদী লাভ করেছিলেন। এভাবে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূচনা হয়। তারপর এমন এক সময় আসে যখন মকার সবচেয়ে ধনী মহিলা হয়েরত খাদীজা (রা) প্রথমে ব্যবসায়ে তাঁকে নিজের সাথে শরীক করে নেন। তারপর তিনি তাঁর সাথে বিবাহ বক্ষনেও আবদ্ধ হন। এভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবসায়ের দায়িত্বও তিনি নিজের হাতে তুলে নেন। এই সুবাদে তিনি কেবল ধনীই হননি এবং তাঁর ধনাচ্ছতা নিছক ত্রুটি ধনের ওপর নির্ভরশীল ছিল না বরং তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি বিধানে তাঁর নিজের যোগ্যতা ও শ্রম বিরাট ভূমিকা পালন করে।

৯. অর্থাৎ যেহেতু ভূমি নিজে এতিম ছিলে, আল্লাহ তোমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন এবং এতিম অবস্থায় সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তোমাকে সাহায্য-সহায়তা দান করেছেন, তাই আল্লাহর এই সাহায্যের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাবর্ণন ভূমি কথনো কোন এতিমের প্রতি জ্ঞান করবে না।

১০. এর দু'টি অর্থ হয়। যদি প্রার্থীকে সাহায্য প্রার্থনাকারী অভাবী হিসেবে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, তাকে সাহায্য করতে পারলে করো আর না করতে পারলে কোমল শরে তাকে নিজের অক্ষমতা বৃঞ্জিয়ে দাও। কিন্তু কোনক্রমে তার সাথে কৃত ব্যবহার করো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই নির্দেশটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—“ভূমি অভাবী ছিলে তারপর আল্লাহ তোমাকে ধনী করে দিয়েছেন। আর যদি প্রার্থীকে জিজেসকারী অর্থাৎ দীনের কোন বিষয় বা বিধান জিজেসকারী অর্থে ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হয়, এই ধরনের লোক যতই মূর্খ ও অজ্ঞ হোক না কেন এবং যতই অযৌক্তিক পদ্ধতিতে সে প্রশং করুক বা নিজের মানসিক সংকট উপস্থাপন করুক না কেন, সকল অবস্থায়ই মেহশীলতা ও কোমলতা সহকারে তাকে জবাব দাও এবং জ্ঞানের অহংকারে বদমেজাজ লোকদের মতো ধরক দিয়ে বা কড়া কথা বলে তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়ো না। এই অর্থের দিক দিয়ে এই বাণিটিকে আল্লাহর সেই অনুগ্রহের জবাবে দেয়া হয়েছে বলা যেতে পারে, যাতে বলা হয়েছে—“ভূমি পথের খোঝ জানতে না তারপর তিনিই তোমাকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন।” হয়রত আবু দারদা (রা) হাসান বসরী (র), সুফিয়ান সগরী (র) এবং অন্যান্য কয়েকজন মনীষী এই দ্বিতীয় অর্থটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ তাদের মতে বক্তব্য বিন্যাসের দিক দিয়ে বিচার করলে এ বক্তব্যটি পালাফাহ ও জড়ক পালাফাহ এর জবাবেই দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

১১. নিয়ামত শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর অর্থ এমনসব নিয়ামত হয়, যা এই সূরাটি নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর রসূলকে দান করেছিলেন। আবার এমন সব নিয়ামতও হয়, যা এই সূরায় প্রদত্ত নিজের ওয়াদা এবং পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা দান প্রসংগে তিনি রসূলকে প্রদান করেছিলেন। এর উপর আবার হকুম দেয়া হয়েছে, হে নবী! আল্লাহ তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন তার প্রত্যেকটির কথা স্মরণ কর। এ নিয়ামত প্রকাশ করার পদ্ধতি বিভিন্ন হতে পারে এবং নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি নিয়ামত বিশেষ আকারে নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত প্রকাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ : মুখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে এবং

একধার স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমি যেসব নিয়ামত লাভ করেছি সবই আল্লাহর মেহেরবানী ও অনুগ্রহের ফল। নয়তো এর মধ্যে কোন একটিও আমার নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের ফসল নয়। দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করে নবুওয়াতের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। লোকদের মধ্যে বেশী বেশী করে কুরআন প্রচার করে এবং তার শিক্ষাবলীর সাহায্যে মানুষের হৃদয়দেশ আলোকিত করে কুরআনের নিয়ামত প্রকাশ করা যেত পারে। পথহারা মানুষদের সরল সত্য পথ দেখিয়ে দিয়ে এবং সবরের সাহায্যে এই কাজের যাবতীয় তিক্ততা ও কষ্টের মোকাবেলা করে হেদয়াত লাভের নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। এতিম অবস্থায় সাহায্য-সহায়তা দান করে আল্লাহ যে অনুগ্রহ দেখিয়েছেন এতিমদের সাথে ঠিক তেমনি অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার করে এই নিয়ামতটি প্রকাশ করা যেতে পারে। দারিদ্র্য ও অভাব থেকে সচ্ছলতা ও ধনাচ্ছিতা দান করার জন্য যে অনুগ্রহ আল্লাহ করেছেন অভাবী মানুষদের সাহায্য করেই সেই নিয়ামত প্রকাশ করা যেতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ ও নিয়ামতসমূহ বর্ণনা করার পর একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে তাঁর রসূলকে এই গভীর ও ব্যাপক অর্থপূর্ণ হেদয়াত দান করেন।

আলাম নাশরাহ

৯৪

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ দু'টিকেই এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

সূরা আদ দুহার সাথে এর বিষয়বস্তুর গভীর মিল দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় এ সূরা দু'টি প্রায় একই সময়ে একই অবস্থার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বলেন, যেকো মু'আয্যমায় আদ দুহার পরেই এই সূরাটি নাযিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটির উদ্দেশ্যও রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দান করা। নবুওয়াত শাড় করার পর ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই তাঁকে যেসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, নবুওয়াত লাভের আগে তাঁকে কখনো তেমনি অবস্থার মুখ্যমূল্য হতে হয়নি। তাঁর নিজের জীবনে এটি ছিল একটি মহাবিপ্রব। নবুওয়াত পূর্বে জীবনে এ ধরনের কোন বিপুরের ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি ইসলাম প্রচারের কাজ শুরু করার সাথে সাথেই দেখতে দেখতে সমগ্র সমাজ তাঁর দৃশ্যমন হয়ে যায়। অথচ পূর্বে এই সমাজে তাঁকে বড়ই মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো। যেসব আজ্ঞায়-স্বজ্ঞন, বঙ্গ-বাঙ্গব, গোত্রীয় সোকজ্ঞন ও মহস্তাবাসী ইতিপূর্বে তাঁকে মাথায় তুলে রাখতো তাঁরাই এখন তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকে। মক্ষায় এখন আর কেউ তাঁর কথা শুনতে প্রতৃত ছিল না। পথে তাঁকে দেখলে লোকেরা শিশ দিতো, যা তা মন্তব্য করতো। প্রতি পদে পদে তিনি সংকটের সম্মুখীন হতে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে এসব অবস্থার মোকাবেলা করতে তিনি অভ্যন্তর হয়ে উঠেন। কিন্তু তবুও এই প্রথম দিকের দিনগুলো তাঁর জন্য ছিল বড়ই কঠিন এবং এগুলো তাঁর মনোবল ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

এ জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথমে সূরা আদ দুহা এবং পরে এই সূরাটি নাযিল হয়।

এই সূরায় মহান আল্লাহ প্রথমেই তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন; আমি তোমাকে তিনটি বিরাট বিরাট নিয়ামত দান করেছি। এগুলোর উপস্থিতিতে তোমার মানসিক দিক দিয়ে তেঙ্গে পড়ার কোন কারণ নেই। তার মধ্যে একটি হচ্ছে হৃদয়দেশ উন্মুক্ত করে দেয়ার নিয়ামত। দ্বিতীয় নিয়ামতটি হচ্ছে, নবুওয়াত লাভের পূর্বে যে তাঁরী বোৰা তোমার কোমর তেঙ্গে দিচ্ছিল তা কি আমি তোমার উপর থেকে নামিয়ে দেইনি? তৃতীয়টি হচ্ছে, সুনাম ও

সুখ্যাতিকে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নিয়ামত। এই নিয়ামতটি তাঁর চেয়ে বেশী আর কাউকে দেয়া তো দূরের কথা তাঁর সমানও কাউকে কখনো দেয়া হয়নি। সামনের দিকের ব্যাখ্যায় আমি এ তিনটি নিয়ামত বলতে কি বুঝানো হয়েছে এবং এগুলো কত বড় নিয়ামত ছিল তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

এরপর বিশ্ব-জাহানের প্রভু তাঁর বান্দা ও রসূলকে এই মর্মে নিশ্চন্ততা দান করেছেন যে, সমস্যা ও সংকটের যে যুগের মধ্যে দিয়ে তুমি এগিয়ে চলছো এটা কোন সূনীর্ঘ যুগ নয়। বরং এখানে সমস্যা, সংকট ও সংক্রীণতার সাথে সাথে প্রশংস্ততার যুগও চলে আসছে। এই এক কথাই সূরা আদৃ দুহায় এভাবে বলা হয়েছে : তোমার জন্য প্রত্যেকটি পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে ভালো হবে এবং শ্রীগুই তোমার রব তোমাকে এমন সবকিছু দেবেন যাতে তোমার মন খুশীতে ভরে যাবে।

সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, প্রাথমিক যুগের এসব কঠিন অবস্থার মোকাবেলা করার শক্তি তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে একটি মাত্র জিনিসের সাহায্যে। সেটি হচ্ছে : নিজের কাজ-কর্ম থেকে ফুরসত পাবার সাথে সাথেই তুমি পরিশ্রম পূর্ণ ইবাদাত ও আধ্যাত্মিক সাধনায় লিঙ্গ হয়ে যাও। আর সমস্ত জিনিসের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজের রবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো এটি সেই একই উপদেশের পুনরাবৃত্তি যা সূরা মুয়াম্মিলের ৯ আয়াতে আরো বেশী বিস্তারিতভাবে তাঁকে দান করা হয়েছে।

আয়াত ৮

সূরা আলাম নাশরাহ-মক্কা

মক্কা ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْمَرْسَحُ لِكَاصِلَرَكَ^١ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزَرَكَ^٢ الَّذِي أَنْقَضَ
 ظَهِيرَكَ^٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ^٤ فَإِنَّ مَعَ الْعَسْرِ سَرَّاً^٥ إِنَّ مَعَ
 الْعَسْرِ سَرَّاً^٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ^٧ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ^٨

হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি ।^১ আমি তোমার ওপর থেকে ভারী বোৰা নামিয়ে দিয়েছি, যা তোমার কোমর ভেঙ্গে দিছিল ।^২ আর তোমার জন্য তোমার খ্যাতির কথা বুলব করে দিয়েছি ।^৩ আসলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্ততাও রয়েছে ।^৪ অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্ততাও রয়েছে । কাজেই যখনই অবসর পাও ইবাদাতের কঠোর শ্রমে লেগে যাও এবং নিজের রবেরই প্রতি মনোযোগ দাও ।^৫

১. এ প্রশংস্তি সহকারে বক্তব্য শুরু করায় এবং এর পরবর্তী বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে তা থেকে প্রকাশ হয় ইসলামী দাওয়াতের কাজ শুরু করার পর প্রথম মুগে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কঠিন বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো তাঁকে ভীষণভাবে পেরেশান করে রেখেছিল । এ অবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সম্মোধন করে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, হে নবী ! আমি কি তোমার প্রতি অযুক্ত অযুক্ত মেহেরবানী করিনি ? তাহলে এই প্রাথমিক সংকটগুলোর মুখোমুখি হয়ে তুমি পেরেশান হচ্ছো কেন ?

কুরআন মজীদের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দৃষ্টি অর্থ জানা যায় । এক, সূরা আল আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে : “**فَمَنْ يُرِدُ اللَّهُ أَنْ يُهْدِيَ يُشَرِّحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ**” কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দর্দি করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন ।” আর সূরা যুমারের ২২ আয়াতে বলা হয়েছে :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ

“তাহলে কি যার বক্ষদেশ আল্লাহ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, তারপর যে তার রবের পক্ষ থেকে একটি আলোর দিকে চলেছে.....?”

এই উভয় স্থানে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থই হচ্ছে, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে একথার ওপর নিচিত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং যে হেদোয়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। দুই, সূরা শু'আরার ১২-১৩ আয়াতে বলা হয়েছে : আল্লাহ যখন হযরত মুসাকে নবুওয়াতের মহান দায়িত্বে নিযুক্ত করে ফেরাউন ও তার বিশাল সাম্রাজ্যের সাথে সংঘাত-সংঘর্ষের হকুম দিচ্ছিলেন তখন হযরত মুসা (আ) আরয করেন :

رَبِّ ائْتِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُنِي وَيَضْعِفْ صَدْرِي

“হে আমার রব। আমার তয় হচ্ছে তারা আমাকে মিথ্যা বলবে এবং আমার বক্ষদেশ সংকীর্ণ হয়ে যাবে।”

আর সূরা ত্বা-হা’র ২৫-২৬ আয়াতে বলা হয়েছে :

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

“হে আমার রব। আমার বক্ষদেশ আমার জন্য খুলে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।”

এখানে সংকীর্ণতার মানে হচ্ছে, নবুওয়াতের মতো একটি মহান দায়িত্ব সম্পাদন করার এবং একটি অতি প্রাকৃতমশালী কুফরী শক্তির সাথে একাকী সংবর্ধ মুখের হবার হিস্ত মানুষের হয় না। আর বক্ষদেশের প্রশংসিতার মানে হচ্ছে, হিস্ত বুলবুল হওয়া, কোন বৃহত্তর অভিযানে অগ্রসর হওয়া ও কোন কঠিনতর কাজ সম্পর্ক করার ব্যাপারে ইতস্তত না করা এবং নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব পালন করার হিস্ত সৃষ্টি হওয়া।

একটু চিন্তা করলে এ বিষয়টি অনুভব করা যায় যে, এই আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার এ দু’টি অর্থই প্রযোজ্য। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হয়, নবুওয়াত লাভের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের মুশরিক, খৃষ্টান, ইহুদী, অয়ি উপাসক সবার ধর্মকে মিথ্যা মনে করতেন আবার আরবের কোন কোন তাওহীদের দাবীদারের মধ্যে যে ‘হানীকী’ ধর্মের প্রচলন ছিল তার প্রতিও তিনি আহশাল ছিলেন না। কারণ এটি ছিল একটি অস্পষ্ট আকীদা। এখানে সঠিক পথের কোন বিস্তারিত চেহারা দেখা যেতো না। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আস সাজ্দার ৫ টীকায় আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।) কিন্তু তিনি নিজে যেহেতু সঠিক পথ জানতেন না তাই মারাত্তক ধরনের মানসিক সংশয়ে ডুগছিলেন। নবুওয়াত দান করে আল্লাহ তাঁর এই সংশয় দূর করেন। তাঁর সামনে সঠিক পথ উন্মুক্ত করে মেলে ধরেন। এর ফলে তিনি পূর্ণ মানসিক নিশ্চিত্তা ও প্রশান্তি লাভ করেন। দ্বিতীয় অর্থটির দৃষ্টিতে এর মানে হয়, নবুওয়াত দান করার সাথে সাথে এই মহান দায়িত্বের বোঝা উঠাবার জন্য যে ধরনের মনোবল, সাহস, সংকরের দৃঢ়তা এবং মানসিক উদারতা ও প্রশংসিতার প্রয়োজন তা আল্লাহ তাঁকে দান করেন। তিনি এমন বিপুল ও ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হন, যা তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোন মানুষের মধ্যে স্থিতি লাভ করতে পারতো না। তিনি এমন বাস্তব বুদ্ধি ও কলাকৌশলের অধিকারী হন, যা বৃহত্তম বিকৃতি দূর ও সংশোধন করার যোগ্যতা

রাখতো। তিনি জাহেলিয়াতের মধ্যে আকর্ষ ভূবে থাকা এবং নিরেট মূর্খ ও অজ্ঞ সমাজে কোন প্রকার সহায় সহল ও বাহ্যত কোন পৃষ্ঠপোষকতাহীন শক্তির সহায়তা ছাড়াই ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে দাঙিয়ে যাবার, বিরোধিতা ও শক্তির বড় বড় তুফানের মোকাবেলায় ইত্তেত না করার এবং এই পথে যেসব কষ্ট ও বিপদ আপদ আসে সবরের সাথে তা বরদাশ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করেন। কোন শক্তিই তাঁকে নিজের অবস্থান থেকে এক বিন্দু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখতো না। এই বক্ষদেশ উন্মোচন এবং হৃদয়ের অংগন প্রশংস্ত করার অমৃল্য সম্পদ যখন তাঁকে দান করা হয়েছে তখন কাজের সূচনা লগ্নে যেসব সমস্যা সংকল্প-বিপদ-কষ্ট দেখা দিয়েছে তাতে তিনি ঘর্মাহত হচ্ছেন কেন?

কোন কোন তাফসীরকার বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে বক্ষ বিদীর্ণ করা অর্থে গ্রহণ করেছেন। মূলত এই মু'জিয়াটির প্রমাণ হাদীস নির্ভর। কুরআন থেকে এর প্রমাণ পেশ করার চেষ্টা করা ঠিক নয়। আরবী ভাষার দিক দিয়ে বক্ষদেশ উন্মুক্ত করাকে (শর্হ صدر) কোনভাবেই বক্ষবিদীর্ণ করার (شق صدر) অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে না। আল্লামা আল্সী রহমত মা'আনী গ্রন্থে বলেন :

حمل الشرح في الآية على شق الصدر ضعيف عند المحققين

“গবেষক আলেমগণের মতে এই আয়াতে উন্মুক্ত করাকে বক্ষবিদীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা একটি দুর্বল কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।”

২. কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ এভাবে নিয়েছেন যে, নবুওয়াত পূর্ব জাহেলী যুগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ত্রুটি করেছিলেন যেগুলোর চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান থাকতেন এবং যেগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত তারী মনে হতো। এই আয়াতটি নাযিল করে আল্লাহ তাঁর এই ত্রুটি মাফ করে দিয়েছেন বলে তাঁকে নিশ্চিন্ত করে দেন। কিন্তু আমার মতে, এখানে এই অর্থ গ্রহণ করা এক মারাত্মক পর্যায়ের ভূল। প্রথমত “বিয়রুন্ন” (بَرْوَنْ) শব্দের অর্থ যে অবশ্যই গোনাহ হতে হবে তা নয়। বরং ভারী বোঝা অর্থেও এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তাই অথবা একে খারাপ অর্থে গ্রহণ করার কোন কারণ নেই। দ্বিতীয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ব জীবনও এত বেশী পাক পরিষ্কার ছিল যার ফলে কুরআন মজীদের বিরোধীদের সামনে তাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। তাই কাফেরদেরকে সম্বোধন করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ দিয়ে একথা বলানো হয়েছে :

“فَقُلْ لِيَتْ فِيكُمْ عَمَراً مِنْ قَبْلِهِ” এই কুরআন পেশ করার আগে তোমাদের মধ্যে আমি জীবনের একটি বিরাট অংশ অতিবাহিত করেছি। (ইউনুস ১৬ আয়াত) আবার সবাইকে শুকিয়ে গোপনে গোপনে একটি গোনাহ করবেন এমন ধরনের লোকও তিনি ছিলেন না। (নাউয়ুবিল্লাহ) এমনটি যদি হতো, তাহলে আল্লাহ সে সম্পর্কে অনবাহিত থাকতেন না এবং নিজের চরিত্রে গোপন কলংক বহন করে ফিরেছেন এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে সর্ব সমক্ষে সূরা ইউনুসের পূর্বেক্ষিত আয়াতে যে কথা বলা হয়েছে তা বলাতেন না। কাজেই আসলে এই আয়াতে “বিয়র” শব্দের সঠিক অর্থ হচ্ছে তারী বোঝা। আর এই ভারী বোঝা বলতে নিজের জাতির মূর্খতা ও জাহেলী কর্মকাণ্ড দেখে তাঁর অনুভূতিপ্রবণ মন যেভাবে দৃঢ়, ব্যথা, কষ্ট, দুঃস্থি ও মর্মবেদনায় তারাক্রান্ত হয়ে

উঠেছিল তাই এখানে বুঝানো হয়েছে। তিনি দেখছিলেন লোকেরা হাতে বানানো মৃত্তির পূজা করছে। চারদিকে শির্ক ও শির্ক উৎপাদিত কল্পনাবাদ ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি নির্লজ্জতা, অশীলতা ও নৈতিক চরিত্রের অবনতি গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজে জুনুম, নিপীড়ন ও লেনদেনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। শক্তিশালীদের পাঞ্জার নীচে শক্তিহীনরা পিষে মরছিল। মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হচ্ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের ওপর অতক্ষিত আক্রমণ চালিয়ে সুটোরাজ করতো। কোন কোন ক্ষেত্রে শত শত বছর পর্যন্ত চলতো প্রতিশোধমূলক নড়াইয়ের জের। কারো পেছনে শক্তিশালী দলীয় শক্তি ও মজবুত জনবল না থাকলে তার ধন, প্রাণ, ইচ্ছাত, আবৰু সংরক্ষিত থাকতো না। এই অবস্থা দেখে তিনি মনে মনে অত্যন্ত স্ফুর্দ্ধ ও মর্যাদাত হতেন। কিন্তু এই গলদ দ্র করার কোন পথই তিনি দেখছিলেন না। এই চিন্তাই তাঁর কোমর ভেঙ্গে দিছিল। মহান আল্লাহ হেদয়াতের পথ দেখিয়ে এই বিরাট বোঝা তাঁর ওপর থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্বে সমাসীন হতেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনাই এমন একটি চাবিকাটি যা দিয়ে মানব জীবনের সব রকমের বিকৃতির তালা খোলা যেতে পারে এবং জীবনের সকল দিকে সংশোধনের পথ পরিকল্পনা করা যেতে পারে। মহান আল্লাহর এই পথনির্দেশনা তাঁর মানসিক দৃষ্টিতার সমস্ত বোঝা হালকা করে দিয়েছিল। এর মাধ্যমে তিনি কেবল আরবের নয় বরং আরবের বাইরে ও সমগ্র দুনিয়ার মানব সমাজ যেসব অন্যায় ও দুর্ভিতিতে লিঙ্গ ছিল তা থেকে তাদেরকে মুক্ত করতে পারবেন বলে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন।

৩. যে সময় একথা বলা হয়েছিল তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, মাত্র হাতেগোণা কয়েকজন লোক যে ব্যক্তির সংগী হয়েছে এবং কেবলমাত্র মক্কা শহরের মধ্যে যার সমস্ত কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ, তাঁর আওয়াজ আবার কেমন করে সারা দুনিয়ায় বুলন্দ হবে এবং কোন ধরনের ঘ্যাতিই বা তিনি অর্জন করবেন। কিন্তু এই অবস্থায় আল্লাহর তাঁর রসূলকে এ সুসংবাদ দিলেন এবং অদ্ভুত পদ্ধতিতে তা বাস্তবায়িতও করলেন। সর্বপ্রথম তাঁর নাম বুলন্দ ও তাঁর চৰ্চা ব্যাপক করার কাজ সম্পর্ক করলেন তিনি তাঁর শক্রদের সাহায্যে। মক্কার কাফেররা তার ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করলো। এর মধ্যে একটি পদ্ধতি ছিল নিম্নরূপ : হঙ্গের সময় আরবের সমগ্র এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক লোক মক্কা শহরে জমায়েত হতো। এ সময় কাফেরদের প্রতিনিধি দল হাজীদের প্রত্যেকটি তাঁবুতে যেতো এবং তাদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দিতো যে, এখানে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামে একজন ভয়ংকর লোকের আবির্ত্বাব হয়েছে। তিনি লোকদের ওপর এমনভাবে যাদু করেন যার ফলে পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই, ও স্থামী-স্ত্রীর মধ্যে ছড়াছড়ি হয়ে যায়। কাজেই আপনারা তাঁর সংস্পর্শ বাঁচিয়ে চলবেন। হঙ্গের মওসুম ছাড়া অন্যান্য দিনেও যারা কাবা শরীফ যিয়ারত করতে আসতো অথবা ধ্যাবনায় উপলক্ষে যারা মক্কায় আসতো তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক্কে দূর্নাম রটাতো কিন্তু এর ফলে আরবের বিভিন্ন প্রচ্ছন্ন এলাকায়ও তাঁর নাম পৌছে গেলো। মক্কার অপরিচিত গভীর ভেতর থেকে বের করে এনে শক্ররাই সারা আরব দেশের বিভিন্ন গোত্রের সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিল। এরপর লোকদের মনে এই প্রয় জাগা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, এই লোকটি কে? কি বলতে চায়? সে কেমন লোক? তাঁর যাদুতে কারা প্রভাবিত হচ্ছে এবং তাদের ওপর তাঁর যাদুর কি প্রভাব পড়ছে? মক্কার কাফেরদের

প্রচারণা যত বেশী বেড়েছে লোকদের মধ্যে এই জানার আগ্রহ তত বেশী বেড়েছে। তারপর অনুসন্ধানের মাধ্যমে লোকেরা তাঁকে জেনেছে। তাঁর চরিত্র ও কাজ-কারবারের সাথে পরিচিত হয়েছে। লোকেরা কুরআন শুনেছে। তিনি যেসব বিষয় পেশ করছেন সেগুলো জেনেছে। যখন তারা দেখলো, যে জিনিসকে যাদু বলা হচ্ছে, তাতে যারা প্রভাবিত হয়েছে তাদের জীবন ধারা আরবের সাধারণ লোকদের জীবনধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে, তখন দুর্নীম সনামে ঝুপান্তরিত হয়ে যেতে লাগলো। এমন কি হিজরতের আগেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গেলো যার ফলে দূরের ও কাছের এমন কোন আরব গোত্রই ছিল না যার কোন না কোন লোক বা পুরু পরিবার ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং যার কিছু কিছু লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল ও আগ্রহী হয়ে উঠেনি। এটি ছিল তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হবার প্রথম পর্যায়। এরপর হিজরতের পর থেকে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়ে গেলো। এর মধ্যে একদিকে মোনাফেক, ইহুদি ও সমগ্র আরবের মুশরিক প্রধানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুর্নীম রটাতে তৎপর হয়ে উঠলো এবং অন্যদিকে মদীনা তাইয়েবার ইসলামী রাষ্ট্রটি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ ভীতি, তাকওয়া, ইবাদাত, বন্দেগী, চারিত্রিক পরিচ্ছন্নতা, সুস্থ সামাজিকতা, ইনসাফ, ন্যায়নিষ্ঠা, মানবিক সাময়, ধর্মীদের বদান্যতা, গরীবদেরকে সাহায্য সহায়তা দান, অংগীকার ও শপথ রক্ষা এবং মানুষের সাথে ব্যবহার ও লেনদেনের ক্ষেত্রে সততার এমন বাস্তব নমুনা পেশ করছিল, যা মানুষের হৃদয় জয় করে চলছিল। শক্রন্না যুদ্ধের মাধ্যমে তাঁর এই বর্ধিষ্ঠ প্রভাব বিশীন করতে চাইলো। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে ঈমানদারদের শক্তিশালী জামায়াত তৈরী হয়েছিল। নিয়ম-শৃংখলা, বীরত্ব-সাহসিকতা, মৃত্যুকে তয় না করা এবং যুক্তাবস্থায়ও নৈতিক সীমাবেধাকে কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে এই জামায়াত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার ফলে সমগ্র আরব তার প্রভাবাধীন হয়ে গেলো। দশ বছরের মধ্যে তাঁর খ্যাতির কথা বুলন্দ হয়ে গেল। অর্থাৎ যে দেশে তাঁর বিরোধীরা তাঁকে বদনাম করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তাঁর সমগ্র এলাকায় এবং প্রত্যন্ত প্রদেশে ও সর্বত্র “আশহাদু আমা মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ” এর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। তারপর এই তৃতীয় পর্যায়টি শুরু হলো খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামল থেকে। সে সময় তাঁর মুবারক নাম সারা দুনিয়ায় উচ্চারিত হতে লাগলো। এই সিলসিলাটি আজ পর্যন্ত বেড়েই চলছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত বেড়ে যেতেই থাকবে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গা নেই যেখানে মুসলমানদের কোন জনপদ নেই এবং দিনের মধ্যে পাঁচবার আযানের মধ্যে বুলন্দ আওয়াজে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের ঘোষণা করা হচ্ছে না, নামাযে রসূলুল্লাহর (সা) ওপর দরজ পড়া হচ্ছে না, জুম'আর খুতবায় তাঁর পবিত্র নাম পাঠ করা হচ্ছে না এবং বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন সময় এমন নেই যখন সারা দুনিয়ার কোন না কোন জায়গায় তাঁর মুবারক নাম উচ্চারিত হচ্ছে না। নব্বওয়াতের প্রাথমিক যুগে যখন আল্লাহ বলেছিলেন (وَرَفِعْنَا لَكَ نَكْرَبْ) (আর-তোমার নাম ও খ্যাতির কথা আমি বুলন্দ করে দিয়েছি অর্থাৎ অর্ত্যন্ত ব্যাপকভাবে সম্প্রচার করেছি।) তখন কেউ একথা অন্যান্য করতে পারতো না যে, এমন সাড়ত্বে ও ব্যাপকভাবে এই নাম বুলন্দ করার কাজটি সম্পূর্ণ হবে। এটি কুরআনের সত্যতার একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ। হয়রত আবু সাউদ খুদরী (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন : প্রজ্ঞাল আমার কাছে আসেন। আমাকে বলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞেস করছেন : আমি কিভাবে তোমার নাম বুলন্দ (رَفِيعَ ذِكْرٍ) করেছি? আমি আরজ করি, আল্লাহ ভালো জানেন। তিনি বলেন, আল্লাহর উক্তি হচ্ছে : যখন আমার নাম বলা হয় তখন সেই সাথে তোমার নামও বলা হবে।” (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, মুসনাদে আবু লাইলা, ইবনুল মুন্ফির, ইবনে হিয়ান, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু’আইম) পরবর্তীকালের সমগ্র ইতিহাস সাক্ষ দিচ্ছে, একথাটি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়েছে।

৪. একথাটি দু’বার বলা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামকে পুরোপুরি সান্ত্বনা দেয়াই এর উদ্দেশ্য। সে সময় তিনি যে কঠিন অবস্থা ও পর্যায় অভিক্রম করেছিলেন তা বেশীক্ষণ স্থায়ী থাকবে না বরং এরপর শিগ্নির ভালো অবস্থা শুরু হবে, একথা তাঁকে বুঝিয়ে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। আপাত দৃষ্টিতে সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্ততা এবং দারিদ্র্যের সাথে সচ্ছলতা এ দু’টি পরম্পর বিরোধী জিনিস একই সময় একসাথে জমা হতে পারে না। কিন্তু তুরুণ সংকীর্ণতার পর প্রশংস্ততা না বলে সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্ততা এই অর্থে বলা হয়েছে যে, প্রশংস্ততার যুগ এত বেশী নিকটবর্তী যেন মনে হয় সে তার সাথেই চলে আসছে।

৫. অবসর পাওয়ার অর্থ হচ্ছে, নিজের কাজকাম থেকে অবসর পাওয়া, তা ইসলামের দাওয়াত দেয়া ও ইসলাম প্রচারের কাজ হতে পারে বা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে শিক্ষা ও তরবিয়ত দানের কাজও হতে পারে অথবা নিজের ঘরের ও বাইরের বৈষয়িক কাজও হতে পারে। এই নির্দেশটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আর কোন কাজ থাকবে না তখন নিজের অবসর সময়টুকু ইবাদাতের পরিশ্রম ও সাধনায় ব্যয় করো এবং সবদিক থেকে দৃষ্টি ও মনোযোগ ফিরিয়ে এনে একমাত্র নিজের রবের প্রতি মনোযোগী হয়ে যাও।

আত তীন

৯৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দ আত্তীন (الْتَّيْنِ) —কে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

কাতাদাহ এটিকে মাদানী সূরা বলেন। ইবনে আবুস (রা) থেকে এ ব্যপারে দু'টি বক্তব্য উদ্ভৃত হয়েছে। একটি বক্তব্যে একে মক্কী এবং অন্যটিতে মাদানী বলা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ আলেম একে মক্কী গণ্য করেছেন। এর মক্কী হিবার সুস্পষ্ট আলামত হচ্ছে এই যে, এই সূরায় মক্কা শহরের জন্য **الْبَلَدُ الْأَمْنِينُ** (এই নিরাপদ শহরটি) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, যদি মর্দীনার্য এটি নাযিল হতো তাহলে মক্কার জন্য “এই শহরটি” বলা ঠিক হতো না। তাছাড়াও সূরার বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে এটিকে মক্কা মু'আয্যমারও প্রথম দিকের সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত বলে মনে হয়। কারণ এর নাযিলের সময় কুফর ও ইসলামের সংঘাত শুরু হয়ে গিয়েছিল এমন কোন চিহ্নও এতে পাওয়া যায় না। বরং এর মধ্যে মক্কী যুগের প্রথম দিকের সূরাগুলোর মতো একই বর্ণনাগুলী পাওয়া যায়। এই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে অতি সংক্ষেপে এবং অত্যন্ত স্বদৰ্শনাত্মক পদ্ধতিতে লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, আবেরাতের পুরস্কার ও শাস্তি অপরিহার্য এবং একান্ত যুক্তিসঙ্গত।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে পুরস্কার ও শাস্তির বীকৃতি। এই উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম মহান মর্যাদাশালী নবীগণের আত্মপ্রকাশের স্থানসমূহের কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছেন। এই বাস্তব বিষয়টি কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন কোথাও বলা হয়েছে : মানুষকে আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি করেছেন এবং ফেরেশতাদেরকে তাঁর সামনে সিজদা করার হকুম দিয়েছেন। (আল বাকারাহ ৩০-৩৪, আল আরাফ ১১, আল আন'আম ১৬৫, আল হিজর ২৪-২৯, আন নাহল ৬২, সাদ ৭১-৭৩ আয়াত) কোথাও বলা হয়েছে : মানুষ আল্লাহর এমন একটি আমানতের বাহক হয়েছে যা বহন করার শক্তি পৃথিবী, আকাশ ও পাহাড় কাঠো ছিল না। (আল আহ্যার ৭২ আয়াত) আবার কোথাও বলা হয়েছে : আমি বনী আদমকে মর্যাদাশালী করেছি এবং নিজের বহু সুষ্ঠির উপর তাকে প্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (বনী ইসরাইল ৭০ আয়াত) কিন্তু এখানে বিশেষ করে নবীগণের আত্মপ্রকাশের

হানগুলোর কসম খেয়ে বলা হয়েছে, মানুষকে সর্বোভ্যব কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে। এর অর্থ এই দোড়ায়, মানুষকে এমন উভয় কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে তার মধ্যে নবুওয়াতের ঘত সর্বাধিক উন্নত পদমর্যাদা সম্পর্ক লোক জন্য নিয়েছে। আর এই নবুওয়াতের চাইতে উচ্চ পদমর্যাদা আল্লাহর অন্য কোন সৃষ্টি নাভ করেনি।

এরপর বলা হয়েছে, দুনিয়ায় দুই ধরনের মানুষ পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ এই সর্বোভ্যব কাঠামোয় সৃষ্টি হবার পর দৃঢ়ত্ব দিকে ঝুঁকে পড়ে বেং নৈতিক অধিগতনের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতে একেবারে সর্বনিষ্প গভীরতায় পৌছে যায়। সেখানে তাদের চাইতে নীচে আর পৌছতে পারে না। দ্বিতীয় ধরনের মানুষ দ্বিমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতন থেকে রক্ষা পায়। তাদেরকে সর্বোভ্যব কাঠামোয় সৃষ্টি করার অপরিহার্য দাবী যে উন্নত স্থান সে স্থানেই তারা প্রতিষ্ঠিত থাকে। মানব জাতির মধ্যে এই দুই ধরনের লোকের অস্তিত্ব এমন একটি বাস্তব সত্য যাকে কোনক্রমেই অঙ্গীকার করা যেতে পারে না। কারণ মানুষের সমাজে সব জায়গায় সবসময় এটি দেখা যাচ্ছে।

সবশেষে এই বাস্তব সত্যটির মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে যখন এই দু'টি আলাদা আলাদা এবং পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের মানুষ পাওয়া যায় তখন কাজের প্রতিদানের ব্যাপারটি কেমন করে অঙ্গীকার করা যেতে পারে? যারা অধিগতনের গভীর গর্তে নেমে গেছে এবং যারা উন্নতির উচ্চতম শিখরে পৌছে গেছে তাদেরকে যদি কোন প্রতিদান না দেয়া হয় এবং উভয় দলের পরিণতি একই হয়, তাহলে এর অর্থ এই দোড়ায় যে, আল্লাহর রাজত্বে কোন ইনসাফ নেই। অথচ শাসককে ইনসাফ অবশ্যি করতে হবে, এটা মানুষের সাধারণ জ্ঞান এবং মানবিক প্রকৃতির দাবী। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ যিনি সকল শাসকের বড় শাসক তিনি ইনসাফ করবেন না, একথা কেমন করে কম্বনা করা যেতে পারে।

আয়াত ৮

সূরা আততীন-মক্কা

মক্কা ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মগাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْتَّيِّنَ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينِ ۝ وَهَنَ الْبَلَى الْأَمِينِ ۝
 لَقَلْ خَلَقْنَا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيرٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَقْلِينِ ۝
 إِلَّا أَنَّ يَنَّ أَمْنَوْا عَمِلُوا الصَّلَاحِ ۝ فَلَمْ يَرْجِعُوا مِنْ نَوْيِنِ ۝
 فَمَا يَكِنْ بِكَ بَعْدَ يَلِيْنِ ۝ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَكَمِينِ ۝

তীন ও যায়তূন,^১ সিনাই পর্বত^২ এবং এই নিরাপদ নগরীর (মক্কা) কসম। আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোন্ম কাঠামোয়।^৩ তারপর তাকে উন্টো ফিরিয়ে নীচতমদেরও নীচে পৌছিয়ে দিয়েছি^৪ তাদেরকে ছাড়া যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করতে থাকে। কেননা তাদের রয়েছে এমন পুরস্কার যা কোনদিন শেষ হবে না।^৫ কাজেই (হে নবী!) এরপর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে কে তোমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে?^৬ আল্লাহ কি সব শাসকের চাইতে বড় শাসক নন?^৭

১. এর ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরগণের মধ্যে অনেক বেশী মতবিরোধ দেখা যায়। হাসান বসরী, ইকরায়াহ, আতা ইবনে আবী রাবাহ, জাবের ইবনে যায়েদ, মুজাহিদ ও ইবরাহীম নাখুয়ী রাহেমাহমুদ্বাহ বলেন, তীন বা ইন্জীর (গোল হালুকা কালুচে বর্ণের এক রকম মিষ্টি ফল) বলতেও এই সাধারণ তীনকে বুঝানো হয়েছে, যা লোকেরা খায়। আর যায়তূন বলতেও এই যায়তূনই বুঝানো হয়েছে, যা থেকে তেল বের করা হয়। ইবনে আবী হাতেম ও হাকেম এরি সমর্থনে হযরত ইবনে আবাসের (রা) একটি উক্তিও উন্নত করেছেন। যেসব তাফসীরকার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন তারা তীন ও যায়তূনের বিশেষ শুণাবলী ও উপকারিতা বর্ণনা করে এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এসব শুণের কারণে মহান আল্লাহ এই দু'টি ফলের কসম খেয়েছেন। সন্দেহ নেই, একজন সাধারণ আরবী জানা ব্যক্তি তীন ও যায়তূন শব্দ শনে সাধারণভাবে আরবীতে এর পরিচিত অর্থটিই গ্রহণ করবেন। কিন্তু দু'টি কারণে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় না। এক, সামনে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। আর দু'টি ফলের সাথে দু'টি শহরের কসম খাওয়ার ব্যাপারে কোন ফিল নেই। দুই, এই চারটি জিনিসের কসম খেয়ে সামনের দিকে যে বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে সিনাই পর্বত ও মক্কা শহরের আলোচনা তার সাথে খাপ খায় কিন্তু এই ফল দু'টির

আলোচনা তার সাথে মোটেই খাপ খায় না। মহান আল্লাহর কুরআন মজীদে যেখানেই কোন জিনিসের কসম খেয়েছেন তার প্রের্তৃ ও উপকারিতা গুণের জন্য খাননি। বরং কসম খাবার পর যে বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে সেই বিষয়ের জন্যই কসম খেয়েছেন। কাজেই এই ফল দু'টির বিশেষ গুণবলীকে কসমের কারণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যাই না।

অন্য কোন কোন তাফসীরকার তীন ও যায়তুল বলতে কোন স্থান বুঝিয়েছেন! কা'ব আহবার, কাতাদাহ ও ইবনে যায়েদ বলেন, তীন বলতে দামেশক এবং যায়তুল বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। ইবনে আবাসের (রা) একটি উক্তি ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ভৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, তীন বলতে হ্যরত নূহ আলাইহিস সালাম জুনী পাহাড়ে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন তাকে বুঝানো হয়েছে। আর যায়তুল বলতে বায়তুল মাকদিস বুঝানো হয়েছে। কিন্তু একজন সাধারণ আরবের মনে “ওয়াত্ত তীন ওয়াত্ত যায়তুল” (وَالْتَّيْنِ وَالرَّبِّيْنِ) শব্দগুলো শুনামাত্রই এই অর্থ উকি দিতে পারতো না এবং তীন ও যায়তুল যে এই দু'টি স্থানের নাম কুরআনের প্রথম শ্রোতা আরববাসীদের কাছে তা মোটেই সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত ছিল না।

তবে যে এলাকায় যে ফলাটি বিগুল পরিমাণে উৎপন্ন হতো অনেক সময় সেই ফলের নামে সেই এলাকার নামকরণ করার রীতি আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই প্রচলন অনুসারে তীন ও যায়তুল শব্দের অর্থ এই ফল দু'টি উৎপাদনের সমগ্র এলাকা হতে পারে। আর এটি হচ্ছে সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকা। কারণ সে মুঠের আরবে তীন ও যায়তুল উৎপাদনের জন্য এ দু'টি এলাকাই পরিচিত ছিল। ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়েম, যামাখুশারী ও আলুসী রাহেমহুম্মাহ এই ব্যাখ্যা অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইবনে জারীর প্রথম বক্তব্যটিকে অগ্রাধিকার দিলেও একথা মনে নিয়েছেন যে, তীন ও যায়তুল মানে এই ফল দু'টি উৎপাদনের এলাকাও হতে পারে। হাফেজ ইবনে কাসীরও এই ব্যাখ্যাটি প্রতিধানযোগ্য মনে করেছেন।

২. আসলে বলা হয়েছে তুরে সীনীনা। (طُور سِينِينَ) হচ্ছে সিনাই উপস্থিপের দ্বিতীয় নাম। একে সাইনা বা সীনাই এবং সীনীনও বলা হয়। কুরআনে এক জায়গায় “তুরে সাইনা” (طُور سِينِنَا) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে যে এলাকায় তুর পর্বত অবস্থিত তা সীনাই নামেই খ্যাত। তাই আমি অনুবাদে সীনাই শব্দ ব্যবহার করেছি।

৩. একথাটির উপরই তীন ও যায়তুলের এলাকা অর্থাৎ সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এবং তুর পর্বত ও মক্কার নিরাপদ শহরের কসম খাওয়া হয়েছে। মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করা হয়েছে, একথার মানে হচ্ছে এই যে, তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের দৈহিক সৌর্তুর দান করা হয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীকে দেয়া হয়নি। তাকে এমন উন্নত পর্যায়ের চিন্তা, উপলক্ষ জ্ঞান ও বুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেয়া হয়নি। তারপর যেহেতু নবীগণই হচ্ছেন মানব জাতির প্রতি এই অনুগ্রহ ও পূর্ণতাগুণের সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের নমুনা এবং মহান আল্লাহ তার সৃষ্টিকে নবুওয়াত দান করার জন্য নির্বাচিত করে নিয়েছেন তার জন্য এর চাইতে বড় পর্যাদা আর কিছুই হতে পারে না, তাই মানুষের সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি হবার প্রমাণ ব্রহ্মপ আল্লাহর নবীদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের কসম খাওয়া হয়েছে। সিরিয়া ও ফিলিস্তীন এলাকায় হ্যরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে হ্যরত ইসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত অসংখ্য নবীর

আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় পর্বতে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত লাভ করেন। আর যেকো মু'আয়মার ভিত্তি স্থাপিত হয় হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈলের (আ) হাতে। তৌদেরই বাদৌলতে এটি আরবের সবচেয়ে পৰিব্রত কেন্দ্ৰীয় নগৱে পৰিণত হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এ দোয়া করেছিলেন : **رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلْدًا أَمْنًا** “হে আমার রব! একে একটি নিরাপদ শহরে পৰিণত করো।” (আল বাকারাহ ১২৬) আর এই দোয়াৰ বৱৰকতে আৱৰ উপধীপেৰ সৰ্বত্র বিশ্বখনার মধ্যে একমাত্ৰ এই শহৱটিই আড়াই হজার বছৰ থেকে শান্তি ও নিৱাপত্তাৰ কেন্দ্ৰ হিসেবে পৰিচিত ছিল। কাজেই এখনে বজ্বৰেৰ অৰ্থ হচ্ছে : আমি মানব জাতিকে এমন উত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি কৱেছি যে, তাৰ মধ্যে নবুওয়াতেৰ ন্যায় মহান মৰ্যাদাৰ অধিকাৰী মানুষৰে জন্ম হয়েছে।

৪. মুফাসিসিৱগণ সাধাৰণত এৱ দু'টি অৰ্থ বৰ্ণনা কৱেছেন। এক, আমি তাকে বাৰ্ধক্যেৰ এমন এক অবস্থাৰ দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি যেখানে সে কিছু চিন্তা কৱাৰ, বুৰাব ও কাজ কৱাৰ যোগতা হারিয়ে ফেলে। দুই, আমি তাকে জাহানামেৰ সৰ্বনিম্ন পৰ্যায়েৰ দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বজ্বৰেৰ যে উদ্দেশ্যটি প্ৰমাণ কৱাৰ জন্য এই সূৱাটি নাযিল কৱা হয়েছে এই দু'টি অৰ্থকে তাৰ জন্য প্ৰমাণ হিসেবে দাঁড় কৱানো যেতে পাৱে না। সূৱাটিৰ উদ্দেশ্য হচ্ছে, আখেৱাতে পুৱৰ্কাৰ ও শান্তিৰ ব্যবস্থা যে যথোৰ্থ সত্য তা প্ৰমাণ কৱা। এদিক দিয়ে মানুষদেৱ মধ্যে থেকে অনেককে চৱম দুৰ্বলতম অবস্থায় পৌছিয়ে দেয়া হয় এবং মানুষদেৱ একটি দলকে জাহানামে ফেলে দেয়া হৰে—এ দু'টি কথাৰ একটিও এই অৰ্থেৰ সাথে খাপ যায় না। প্ৰথম কথাটি শান্তি ও পুৱৰ্কাৰেৰ প্ৰমাণ হতে পাৱে না। কাৰণ ভালো ও খাৱাপ উভয় ধৰনেৰ লোক বাৰ্ধক্যেৰ শিকাৰ হয়। কাউকে তাৰ কাজেৰ শান্তি ভোগ কৱাৰ জন্য এই অবস্থাৰ শিকাৰ হতে হয় না। অন্যদিকে দ্বিতীয় কথাটি আখেৱাতে কাৰ্যকৰ হৰে একে কেৱল কৱে এমন সব লোকেৰ কাছে হিসেবে পেশ কৱা যেতে পাৱে যাদেৱ থেকে আখেৱাতে শান্তি ও পুৱৰ্কাৰ লাভেৰ ব্যবস্থাৰ পক্ষে স্বীকৃতি আদায় কৱাৰ জন্য এই সমস্ত যুক্তি-প্ৰমাণ পেশ কৱা হচ্ছে; তাই আমাৰ মতে আয়াতেৰ সঠিক অৰ্থ হচ্ছে, সৰ্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি কৱাৰ পৰ যখন মানুষ নিজেৰ দৈহিক ও মানসিক শক্তিগুলোকে দুঃুতিৰ পথে ব্যবহাৰ কৱে তখন আল্লাহ তাকে দুঃুতিৰই সুযোগ দান কৱেন এবং নিচেৰ দিকে গড়িয়ে দিতে দিতে তাকে এমন নিম্নতম পৰ্যায়ে পৌছিয়ে দেন যে, অন্য কোন সৃষ্টি সেই পৰ্যায়ে নেমে যেতে পাৱে না। এটি একটি বাস্তব সত্য। মানুষেৰ সমাজে সচৱাচৰ এমনটি দেখা যায়। লোভ, লালসা, স্বার্থবাদিতা, কামাকৃতা, নেশাখোরী, নীচতা, ক্রোধ এবং এই ধৰনেৰ অন্যান্য বদু স্বতাৰ যেসব লোককে পেয়ে বসে তাৰা সত্ত্বাই নৈতিক দিক দিয়ে নীচতমদেৱও নীচে পৌছে যায়। দৃষ্টান্ত স্বৰূপ শুধু মাত্ৰ একটি কথাই ধৱা যাক। একটি জাতি যখন অন্য জাতিৰ প্ৰতি শক্রতা পোৱণ কৱাৰ ব্যাপকভাৱে অৰু হয়ে যায় তখন সে হিংস্তায় দুনিয়াৰ হিংস্র পশুদেৱকেও হার মানায়। একটি হিংস্র পশু কেবলমাত্ৰ নিজেৰ ক্ষুধাৰ খাদ্য যোগাড় কৱাৰ জন্য অন্য পশু শিকাৰ কৱে। যে ব্যাপকভাৱে পশুদেৱ হত্যা কৱে চলে না। কিন্তু মানুষ নিজেই নিজেৰ সম্পদায়ভুক্ত মানুষদেৱকে ব্যাপকভাৱে হত্যা কৱে চলছে। পশুৱা কেবলমাত্ৰ নিজেদেৱ নথৰ ও দৌৰ্ত ব্যবহাৰ কৱে শিকাৰ কৱে। কিন্তু এই সৰ্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি মানুষ নিজেৰ বৃদ্ধিৰ সাহায্যে বন্দুক, কামান, টাংক, বিমান, আণবিক বোমা, উদজান বোমা এবং অন্যান্য অসংখ্য মাৰণাল্পা তৈৱী কৱেছে এবং সেগুলোৱ

সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে সুবিশাল জনপদগুলো ধ্রঃ করে দিছে। পশ্চাত্তা কেবল আহত বা হত্যা করে। কিন্তু মানুষ নিজেদেরই মতো মানুষকে নির্যাতন করার জন্য এমন সব তয়াবহ পদ্ধতি আবিক্ষার করেছে যেগুলোর কথা পশ্চাত্তা কোন দিন কর্তৃনাও করতে পারে না। তারপর নিজেদের শক্তি ও প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য তারা নীচতার শেষ পর্যায়ে পৌছে যায়। তারা মেয়েদের উলংগ করে তাদের মিছিল বের করে। এক একজন মেয়ের ওপর দশ বিশ জন ঝাপিয়ে পড়ে নিজেদের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। বাপ, তাই ও বামীদের সামনে তাদের স্ত্রী ও মা-বোনদের শ্লীলাত্মানি করে। মা-বাপের সামনে স্ত্রানন্দেরকে হত্যা করে। নিজের গর্ভজাত স্ত্রানন্দের রক্ত পান করার জন্য মাকে বাধ্য করে। মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে এবং জীবন্ত করব দেয়। দুনিয়ায় পশ্চদের মধ্যেও এমন কোন হিস্তিম গোষ্ঠী নেই যাদের বর্বরতাকে কোন পর্যায়ে মানুষদের এই বর্বরতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মানুষের অন্যান্য বড় বড় গুণের ব্যাপারেও এই একই কথা বলা যায়। এগুলোর মধ্য থেকে যেটির দিকে মানুষ মুখ ফিরিয়েছে সেটির ব্যাপারেই নিজেকে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি প্রমাণ করেছে। এমনকি ধর্ম যা মানুষের কাছে সবচেয়ে পৰিব্রত, তাকেও সে এমন সংকীর্ণ করে দিয়েছে, যার ফলে সে গাছপালা, জীব-জন্ম ও পাথরের পূজা করতে করতে অবনতির চরম পর্যায়ে পৌছে গিয়ে নারী ও পুরুষের লিংগেরও পূজা করতে শুরু করেছে। দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম মন্দিরে দেবদাসী রাখেছে। তাদের সাথে ব্যতিচার করাকে পৃষ্ঠের কাছ মনে করছে। যাদেরকে তারা দেবতা ও উপাস্য গণ্য করেছে তাদের সাথে সম্পর্কিত দেবকাহিনীতে এমন সব কৃৎসিত কাহিনী জুড়ে দিয়েছে যা জগন্য ও নিকৃষ্টতম মানুষের জন্যও লজ্জার ব্যাপার।

৫. যেসব মুফাস্সির “আসফালা সা-ফেলীন” - এর অর্থ করেছেন, বার্ধক্যের এমন একটি অবস্থা যখন মানুষ নিজের চের্তনা ও স্বাভাবিক জ্ঞান-বৃদ্ধি হারিয়ে ফেলে, তারা এই আয়াতের অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন, “কিন্তু যারা নিজেদের ঘোবনকালে ও সুস্থিতায় ইমান এনে সংকোচ করে তাদের জন্য বার্ধক্যের এই অবস্থায়ও সেই একই নেকী লেখা হবে এবং সেই অনুযায়ী তারা প্রতিদানও পাবে। বয়সের এই পর্যায়ে তারা ঐ ধরনের সংকোচগুলো করেনি বলে তাদের ভালো প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে কিছুই কম করা হবে না।” আর যেসব মুফাস্সির “আসফালা সাফেলীনের” দিকে উল্টো ফিরিয়ে দেবার অর্থ ‘জাহানামের নিম্নতম শ্রেণে নিষেপ করা’ করেছেন তাদের মতে এই আয়াতের অর্থ হচ্ছে : “ইমান এনে যারা সংকোচ করে তারা এর বাইরে তাদেরকে এই পর্যায়ে উল্টো ফেরানো হবে না। বরং তারা এমন পুরুষার পাবে যার ধারাবাহিকতা কোনদিন ঘটম হবে না।” কিন্তু এই সূরায় শাস্তি ও পুরুষারের সত্ত্বাতার পক্ষে যে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তার সাথে এই উভয় অর্থের কোন পিল নেই। আমার মতে এই আয়াতের সঠিক অর্থ হচ্ছে, মানুষের সমাজে যেমন সাধারণতাবে দেখা যায়, যেসব লোকের নৈতিক অধিগতন শুরু হয় তারা অধিগতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদের নীচে চলে যায়, ঠিক তেমনি প্রতি যুগে সাধারণতাবে দেখা যায়, যারা আল্লাহ, রসূল ও আব্দুরাতের প্রতি ইমান আনে এবং সংকোচের কাঠামোয় নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে নেয় তারা এই পতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে এবং আল্লাহ মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোয় সৃষ্টি করেছিলেন তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাই তারা অশেষ শুভ প্রতিদানের অধিকারী। অর্থাৎ তারা এমন পুরুষার পাবে, যা তাদের যথার্থ পাওনা থেকে কম হবে না এবং যার ধারাবাহিকতা কোনদিন শেষও হবে না।

৬. এই আয়াতটির আর একটি অনুবাদ এবং হতে পারে : “কাজেই (হে মানুষ) এরপর কোন জিনিসটি তোমাকে শাস্তি ও পুরস্কারের বিষয়টি মিথ্যাপ্রতিপন্থ করতে উদ্বৃদ্ধ করে?” উভয় অর্থের দ্বিতীয় লক্ষ ও মূল বক্তব্য একই থাকে। অর্থাৎ মানুষের সমাজে প্রকাশ্যে দেখা যায় সর্বোচ্চম কাঠামোয় সৃষ্টি মানুষদের একটি দল নৈতিক অধিপাতে যেতে যেতে একেবারে নীচতমদেরও নীচে পৌছে যায় আবার অন্য একটি দল সৎকাজের পথ অবলম্বন করে এই পতনের হাত থেকে নিষেদের রক্ষা করে এবং মানুষকে সর্বোচ্চম কাঠামোয় সৃষ্টি করার যে উদ্দেশ্য ছিল তার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এ অবস্থায় পুরস্কার ও শাস্তিকে কেমন করে মিথ্যা বলা যেতে পারে? বৃষ্টি কি একথা বলে, উভয় ধরনের মানুষের একই পরিণাম হবে? ইনসাফ কি একথাই বলে, অধিপাতে যেতে যেতে নীচতমদেরও নীচে যারা পৌছে যায় তাদেরকে কোন শাস্তিও দেয়া যাবে না এবং এই অধিপতন থেকে নিষেদেরকে রক্ষা করে যারা পবিত্র জীবন যাপন করে তাদেরকে কোন পুরস্কারও দেয়া যাবে না! এই কথাটিকেই কুরআনের অন্যান্য স্থানে এভাবে বলা হয়েছে :

أَفْنِجِلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ - مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ -

“আমি কি অনুগতদেরকে অপরাধীদের মতো করে দেবো? তোমাদের কি হয়ে গেছে? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো? (আল কলম ৩৫-৩৬ আয়াত)

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السُّيُّونَ أَنْ نُجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَوَاءٌ مَّخِيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ مَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ -

“দ্রুতকারীরা কি একথা মনে করেছে, আমি তাদেরকে এমন গোকদের মতো করে দেবো যারা ইমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে? উভয়ের জীবন ও মৃত্যু এক রকম হবে? খুবই খারাপ সিদ্ধান্ত যা এরা করছে।” (আল জাসিয়া ২১ আয়াত)

৭. অর্থাৎ যখন দুনিয়ার ছোট ছোট শাসকদের থেকেও তোমরা চাও এবং আশা করে থাকো যে, তারা ইনসাফ করবে, অপরাধীদেরকে শাস্তি দেবে এবং তালো কাজ যারা করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করবে তখন আগ্রাহ যাপারে তোমরা কি মনে করো? তিনি কি সব শাসকের বড় শাসক নন? যদি তোমরা তাঁকে সবচেয়ে বড় শাসক বলে শীকার করে থাকো তাহলে কি তাঁর সম্পর্কে তোমরা ধারণা করো যে, তিনি ইনসাফ করবেন না! তাঁর সম্পর্কে কি তোমরা এই ধারণা পোষণ করো যে, তিনি মন্দ ও ভাগোকে একই পর্যায়ে ফেলবেন? তোমরা কি মনে করো তাঁর দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে খারাপ কাজ করবে আর যারা সবচেয়ে তালো কাজ করবে তারা সবাই মরে মাটির সাথে মিশে যাবে। কাউকে তাঁর খারাপ কাজের শাস্তি দেয়া হবে না এবং কাউকে তাঁর তালো কাজের পুরস্কারও দেয়া হবে না!

ইয়াম আহমাদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ, ইবনুল মুন্দির, বায়হাকী, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া হয়রত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন “ওয়াত তীনে ওয়ায়্যায় ওয়াতুন” সূরা পড়তে পড়তে আয়াতটিতে পৌছে তখন যেন সে বলে, (হী, এবং আমি তাঁর ওপর সাক্ষদানকারীদের একর্জন)। আবার কোন কোন হাদীসে বলা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াতটি পড়তেন, তিনি বলতেন, (হে আল্লাহ তুমি পবিত্র! আর তুমি এই যা বলছো তা সত্য)।

আল'আলাক

৯৬

নামকরণ

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লেখিত আলাক (علق) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিসের সময়-কাল

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি এক্ষেত্রে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে এ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি مَالِمٌ عِلْمٍ لَيُطْعِنِ থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবরীণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উচ্চাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একত্র। এ প্রসঙ্গে ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে ইয়রত আয়েশা (রা) থেকে যে হাদীসটি উভূত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে ইয়রত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা স্তো বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আবুস (রা), আবু মুসা আশ'আরী (রা) ও সাহারীগণের একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাকে ইমর্কি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

অহীর সূচনা

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহুরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহুরী এ ঘটনা হয়ের উরণওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হয়ের আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হয়ের আয়েশা (রা) বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য ব্যপ্তির (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো ব্যপ্তি) মাধ্যমে। তিনি যে ব্যপ্তি দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তা দেখতেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরো শুহায় অবস্থান করে দিনরাত; ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। (হয়ের আয়েশা (রা) তাহাম্মাস (تحت) শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহুরী তা'আবুদ (تعبد) বা ইবাদাত-বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তিনি কোন

ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি। ঘর থেকে খাবার-দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হ্যরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবারসমগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরো গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর উপর ওহী নায়িল হলো। ফেরেশ্তা এসে তাঁকে বললেন : “পড়ো” এরপর হ্যরত আয়েশা (রা) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উচ্চত করেছেন : আমি বললাম, “আমি তো পড়তে জানি না।” একথায় ফেরেশ্তা আমাকে ধরে বুকের সাথে ডয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেলেম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো!” আমি বললাম, “আমি তো, পড়তে জানি না।” তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ডয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, “পড়ো!” আমি আবার বললাম, “আমি তো পড়া জানি না।” তিনি ত্বরিত আমাকে বুকের সাথে ডয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি ব্যতম হ্যার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, **أَفْرَا بِإِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখান থেকে মাল্ম يَغْلِمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হ্যরত আয়েশা (রা) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হ্যরত খাদীজার (রা) কাছে ফিরে এসে বললেন : “আমার গায়ে কিছু (চাদর-কবল) জড়িয়ে দাও। আমার গায়ে কিছু (চাদর-কবল) জড়িয়ে দাও!” তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর হয়ে গেলে তিনি বললেন : “হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।” হ্যরত খাদীজা বললেন : “মোটেই না। বরং খৃশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম। আল্লাহ কখনো আপনাকে অগমাণিত করবেন না। আপনি আত্মায়দের সাথে তালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোধা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। তালো কাজে সাহায্য করেন।” তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ইসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখিতেন। অত্যন্ত বৃক্ষ ও অঙ্ক হয়ে পড়েছিলেন। হ্যরত খাদীজা (রা) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা) বললেন : “ভাতিজা! তুম কি দেখেছো?” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন : “ইনি সেই নামস (অহী বহনকারী ফেরেশ্তা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ) ওপর নায়িল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুওয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : “এরা কি আমাকে বের করে দেবে?” ওয়ারাকা বললেন : “হী, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শক্রতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার

সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।”
কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই উয়ারাকা ইতিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মুহূর্ত আগেও
রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে
তিনি বিশ্ববিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকংক্ষী ইওয়া তো
দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কথনে
কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল ইওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে
যাওয়া তাঁর জন্যে ছিল একটি আকর্ষিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর উপর ঠিক
তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকর্ষিক ঘটনা ঘটে
যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়ে
এগিয়ে আসেন তখন মুকার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু
তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশুকা করেছিলাম আপনি কোন
একটা কিছু ইওয়ার দাবী করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছুকাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি
নিছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুওয়াতের আগে তাঁর জীবন ক্ষেমন পরিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও
কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হ্যুন্ত খাদীজা (রা) কোন অস্ত
বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চাম বছর। পনের বছর
ধরে তিনি রসূলের জীবন সক্রিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে
পাওয়া না। এই দীর্ঘ দার্শনে হ্যুন্ত খাদীজা (রা) তাঁকে এমনিই উচ্চ মর্যাদা সম্পর
হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে স্তো গৃহার ঘটনা শুনান তখনই নিষিদ্ধাম
তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থেই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে
এসেছিলেন। অনুরূপভাবে উয়ারাকা ইবনে নওফলও মুকার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা
ছিলেন। তিনি শৈশব থেকেই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সা) জীবন দেখে আসছিলেন, তাহাড়া
পনের বছরের নিকট আজীব্যতার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আজো গভীরভাবে অবগত
ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্রোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে
সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই “নামুস” যিনি মৃত্যু আলাইহিস সালামের কাছে
এসেছিলেন। এর অর্থ এই দৌড়ায়, তাঁর মতেও ‘মুহাম্মদ (সা)’ এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব
ছিলেন যে, তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা দাত করা কোন বিশ্বকর ব্যাপার ছিল না।

বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট

রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে
নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হমকি দিয়ে ও ডয় দেখিয়ে তা থেকে
বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সুরার দিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়,
নবী হবার পর প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লালাহু
আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু
করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশেরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন
দীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু

জেহেলের জাহেলী শিরা-উপশিরা উন্মেষিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধর্মকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) ও হয়রত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দৃঢ়তি উল্লেখিত হয়েছে।

হয়রত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন : আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, “মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যথীনের ওপর মুখ রাখছে? লোকেরা জবাব দেয়, ‘হৈ’। একথায় সে বলে, ‘শাত ও উয়্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রংগড়ে দেবো।’ তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্যে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু ইঠাঁৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বীচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তাঁর মাবাখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারেকাছে ফেসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমাদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনফির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাদেম ইসফাহানী ও রায়হাকী)

ইবনে আবাস (রা) থেকে বর্ণিত : আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তাঁর ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনাট করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (বুখারী, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হমাইদ, ইবনুল মুনফির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আবাস (রা) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিমেধ করিনি? একথা বলে সে তাঁকে ধর্মকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধর্মক দিলেন। তাঁর ধর্মকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে তয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনফির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এই ঘটনাবলীর কারণে স্থানে ল্যাটেফি থেকে সূরার যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

আয়াত ১৯

সূরা আল 'আলাক-মক্কী

কুকু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মগাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِقْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ^۱ خَلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلْقٍ^۲ إِقْرَا
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ^۳ الَّذِي عَلِمَ^۴ بِالْقَلْبِ^۵ عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ^۶

পড়ো^১ (হে নবী), তোমার রবের নামে।^২ যিনি সৃষ্টি করেছেন।^৩ জমাট বাঁধা
রত্তের দলা থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।^৪ পড়ো, এবং তোমার রব বড়
মেহেরবান, যিনি কল্মের সাহায্যে জ্ঞান শিখিয়েছেন।^৫ মানুষকে এমন জ্ঞান
দিয়েছেন, যা সে জানতো না।^৬

১. ইতিপূর্বে ভূমিকায় বলে এসেছি, ফেরেশতা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে বললেন, পড়ো। তিনি জ্বাব দিলেন, আমি পড়া জানি না। এ থেকে জানা যায়,
ফেরেশতা অহীর এই শব্দগুলো লিখিত আকারে তাঁর সামনে পেশ করেছিলেন এবং তাঁকে
সেগুলো পড়তে বলেছিলেন। কারণ ফেরেশতার কথার অর্থ যদি এই হতো, আমি বলতে
থাকি এবং আপনি পড়তে থাকুন তাহলে আমি পড়া জানি না একথা বলার তাঁর প্রয়োজন
হতো না।

২. অর্থাৎ তোমার রবের নাম নিয়ে পড়ো। অন্য কথায়, বিসমিল্লাহ বলো এবং পড়ো।
এ থেকে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অহী
আসার আগে একমাত্র আল্লাহকেই নিজের রব হিসেবে জানতেন ও মানতেন। এ জন্যই
তাঁর রবকে, একথা বলার প্রয়োজন হয়নি বরং বলতে হয়েছে, তোমার রবের নাম নিয়ে
পড়ো।

৩. শুধু বলা হয়েছে, “সৃষ্টি করেছেন।” কাকে সৃষ্টি করেছেন তা বলা হয়নি। এ থেকে
আপনা আপনিই এ অর্থ বের হয়ে আসে, সেই রবের নাম নিয়ে পড়ো যিনি সৃষ্টা, যিনি
সমগ্র বিশ্ব-জাহান এবং বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।

৪. সাধারণতাবে বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টির কথা বলার পর বিশেষ করে মানুষের কথা
বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ কেমন হীন অবস্থা থেকে তার সৃষ্টিপূর্ব শুরু করে তাকে
পূর্ণাংগ মানুষে রূপান্তরিত করেছেন। আলাক (عَلْق) হচ্ছে আলাকাহ (عَلَّف) শব্দের
বহবচন। এর মানে জমাট বাঁধা রক্ত। গর্ত সঁওতারের পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে যে
অবস্থার সৃষ্টি হয় এটি হচ্ছে সেই প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তা গোশ্তের আকৃতি ধারণ

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغِيٌ^۱ أَنْ رَاهُ أَسْتَغْنَىٰ^۲
 الرَّجْعِ^۳ أَرَءَيْتَ النِّيَّابَنِ^۴ عَبْدًا إِذَا صَلَّى^۵

কখনই নয়,^১ মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ সে নিজেকে দেখে অভাবযুক্ত,^২ (অথচ) নিশ্চিতভাবেই তোমার রবের দিকেই ফিরে আসতে হবে।^৩ তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে এক বাস্তাকে নিষেধ করে যখন সে নামায পড়ে?^৪

করে। এরপর পর্যায়ক্রমে মানুষের আকৃতি লাভের কার্যক্রম শুরু হয়। (বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হজ্জ ৫ আয়াত, ৫ থেকে ৭ টীকা)

৫. অর্থাৎ তাঁর অশেষ মেহেরবানী। এই ইন্তিম অবস্থা থেকে শুরু করে তিনি মানুষকে জ্ঞানের অধিকারী করেছেন এটি স্থিতি সবচেয়ে বড় শুণ হিসেবে ঝীকৃত। আর তিনি মানুষকে কেবল জ্ঞানের অধিকারীই করেননি, কলম ব্যবহার করে তাকে লেখার কৌশল শিখিয়েছেন। এর ফলে কলম জ্ঞানের ব্যাপক প্রসার, উন্নতি এবং বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠা ও সত্ত্বক্ষণের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। যদি তিনি ইগুহামী চেতনার সাহায্যে মানুষকে কলম ব্যবহার করার ও লেখার কৌশল না শেখাতেন তাহলে মানুষের জ্ঞানগত যোগ্যতা শুরু ও পঞ্চ হয়ে যেতো। তাঁর বিকশিত ও সম্প্রসারিত হবার এবং বংশানুক্রমিক অংগগতি তথা এক বংশের জ্ঞান আর এক বংশে পৌছে যাবার এবং সামনের দিকে আরো উন্নতি ও অংগগতি লাভ করার সুযোগই তিনিই হতো।

৬. অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তাঁর জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটিই এভাবে বলা হয়েছে : **وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ** [البقرة: ٢٥] “আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চাঁ তাঁর বেশী কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না।” (আল বাকারাহ ২৫৫) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্ত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তাঁর জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তাঁর জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করেছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা) হাদীস থেকে জানা যায় : এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাইতে বেশী বরদাশ্ত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জ্ঞানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সর্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অঙ্গীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে নবুওয়াত

১০ "লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে। আরো ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল মুদ্দাসিসের ভূমিকা।

৭. অর্থাৎ যে মেহেরবান আল্লাহ এত বড় মেহেরবানী করেছেন তাঁর মোকাবেলায় মূর্খতার বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কর্মনীতি অবলম্বন করা উচিত নয় যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৮. অর্থাৎ দুনিয়ায় ধন-দৌলত, সম্মান-প্রতিপন্থি যা কিছু সে চাইতো তার সবই সে লাভ করেছে এ দৃশ্য দেখে সে কৃতজ্ঞ হবার পরিবর্তে বরং বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেছে এবং সীমালংঘন করতে শুরু করেছে।

৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় সে যাই কিছু অর্জন করে থাকুক না কেন এবং তার তিতিতে অহংকার ও বিদ্রোহ করে ফিরুক না কেন, অবশেষে তাকে তোমার রবের কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই মনোভাব ও কর্মনীতির পরিণাম সে জানতে পারবে।

১০. বান্দা বলতে এখনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুরানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে কুরআনের কয়েক জায়গায় তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন

سُبْحَنَ اللَّهِ الَّذِي أَشْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ
الْأَقْصَا -

"পবিত্র সেই সন্তা যিনি তাঁর বান্দাকে নিয়ে গিয়েছেন এক রাতে মসজিদে হারম থেকে মসজিদে আকসার দিকে।" (বনি ইসরাইল ১)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَبَ

"সমস্ত প্রশংসা সেই সন্তার যিনি তাঁর বান্দার ওপর নাযিল করেছেন কিতাব।"

(আল কাহফ ১)

وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً -

"আর আল্লাহর বান্দা যখন তাকে ডাকাবে জন্য দাঢ়ালো তখন গোকেরা তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হলো।" (আল জিন ১৯)

এ থেকে জানা যায়, এটা ভালোবাসার একটা বিশেষ ধরনের প্রকাশতৎগ্রী। এ পদ্ধতিতে আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ নবুওয়াতের দায়িত্বে নিযুক্ত করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কুরআনের কোথাও এই পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। কোথাও বলা হয়নি, হে নবী। তুম এভাবে নামায পড়ো। কাজেই কুরআনে যে অবী লিখিত হয়েছে কেবলমাত্র এই অইট্টুই যে রসূলের (সা) ওপর নাযিল হতো না— এটি তার আর একটি প্রমাণ। বরং এরপরও অবীর মাধ্যমে আরো এমন সব বিষয়ের তালিম দেয়া হতো যা কুরআনে লিখিত হয়নি।

أَرْعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ^١ أَوْ أَمْرًا بِالْتَّقْوَىٰ^٢ أَرْعَيْتَ إِنْ
 كَنَبَ وَتَوَلَّ^٣ أَلَمْ يَعْلَمْ بَأَنَّ اللَّهَ يَرَى^٤ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ
 لَنْسَفَعًا بِالنَّاصِيَةِ^٥ نَاصِيَةٌ كَادِبَةٌ خَاطِئَةٌ^٦ فَلِيدُعْ نَادِيَهُ^٧ سَنْدُعُ
 الرَّبَّانِيَّةَ^٨ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُلْ وَاقْتَرِبْ^٩

তুমি কি মনে করো, যদি (সেই বাস্তা) সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়। তুমি কি মনে করো, যদি (এই নিষেধকারী সত্ত্বের প্রতি) মিথ্যা আরোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে কি জানে না, আল্লাহ দেখছেন।^১ কখনই নয়,^{১২} যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি তার কপালের দিকের চুল ধরে তাকে টানবো, সেই কপালের চুল (ওয়ালা) যে মিথ্যুক ও কঠিন অগ্রাধকারী।^{১৩} সে তার সমর্থক দলকে ডেকে নিক।^৪ আমিও ডেকে নিই আযাবের ফেরেশতাদেরকে।^{১৫} কখনই নয়, তার কথা মেনে নিয়ো না, তুমি সিজ্দা করো এবং (তোমার রবের) নৈকট্য অর্জন করো।^{১৬}

১১. বাহ্যত মনে হয়, এখানে প্রত্যেকটি ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিকে সরোধন করা হয়েছে। তাকে জিজেস করা হচ্ছে, তুমি কি সেই ব্যক্তির বার্যকলাপ দেখেছো যে আল্লাহর এক বাস্তাকে ইবাদাত করা থেকে বিরত রাখছে? যদি সেই বাস্তা সঠিক পথে থাকে অথবা মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখায় এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, আর এই ইবাদাতে বাধাপ্রাদানকারী সত্ত্বের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তার এই তৎপরতা সম্পর্কে তুমি কি মনে করো? যে ব্যক্তি এই কর্মনীতি অবলম্বন করেছে সে যদি জ্ঞানতো, যে বাস্তা নেকীর কাজ করে আল্লাহ তাকেও দেখেন আবার যে সত্ত্বের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে সচেষ্ট তাকেও দেখেন তাহলে সে কি এই কর্মনীতি অবলম্বন করতে পারতো? আল্লাহ জালেমের জুলুম দেখছেন এবং মজলুমের মজলুমীও দেখছেন। তাঁর এই দেখা এ বিষয়টিকে অবশ্যিক্ত করে তুলেছে যে, তিনি জালেমের শাস্তি দেবেন এবং মজলুমের ফরিয়াদ শুনবেন।

১২. অর্ধাংশ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম যদি নামায পড়েন তাহলে এই ব্যক্তি নিজের পায়ের চাপে তার ঘাড় পিষে ফেলবে বলে যে হমকি দিলে তা কখনো সম্ভবপ্র হবে না। সে কখনো এমনটি করতে পারবে না।

১৩. কপালের দিক বলে এখানে যার কপাল তাকে বুঝানো হয়েছে।

১৪. যেমন তুমিকায় আমরা বলেছি, আবু জেহলের হমকির জবাবে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম তাকে ধমক দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল, হে

মুহাম্মদ। তুমি কিসের জোরে আমাকে ডয় দেখাচ্ছে? আল্লাহর কসম, এই উপত্যকায় আমার সমর্থকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। তার এই কথায় এখানে বলা হচ্ছে : নাও, এখন তাহলে তোমার সেই সমর্থকদের ডেকে নাও।

১৫. মূলে 'যাবানীয়াহ' (زبانیہ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাতাদাহর খ্যাত্যা অনুযায়ী এটি আরবী ভাষায় পুলিশের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর 'যাবান' (بَنْ) শব্দের আসল মানে হচ্ছে, ধাক্কা দেয়া। রাজা বাদশাহদের দরবারে লাঠিধারী চোবদার থাকতো। তাদের কাজ হতো যার প্রতি বাদশাহ নারাজ হতেন তাকে ধাক্কা দিয়ে দরবার থেকে বের করে দেয়। কাজেই এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, সে তার সমর্থকদেরকে ডেকে আনুক, আর আমি আমার পুলিশ বাহিনী তথা আয়াবের ফেরেশাতাদেরকে ডেকে আনি। এই আয়াবের ফেরেশতারা তার সমর্থকদেরকে ঠাণ্ডা করে দিক।

১৬. সিজ্দা করা মানে নামায পড়া। অর্থাৎ হে নবী। তুমি নির্ভয়ে আসের মতো নামায পড়তে থাকো। এর মাধ্যমে নিজের রবের নৈকট্য গ্রান্ত করো। সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হ্যরত আবু হৱাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস উন্নত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : "বাস্তা সিজ্দায় থাকা অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে বেশী নিকটবর্তী হয়।" আবার মুসলিমে হ্যরত আবু হৱাইরা (রা) এ গ্রেওয়ায়াতটিও উন্নত হয়েছে যে, রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এ আয়াতটি পড়তেন তখন তেলাওয়াতে সিজ্দা করতেন।

আল কাদুর

৯৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতের 'আল কদুর' (الْقَدْرِ) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

এর মক্কী বা মাদানী হ্বার ব্যাপারে দিমত রয়ে গেছে। আবু হাইয়ান বাহরল্ল মুহীত ঘষে দাবী করেছেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটা মাদানী সূরা। আলী ইবনে আহমাদুল ওয়াহেদী তাঁর তাফসীরে বলেছেন, এটি মদীনায় নামিলকৃত প্রথম সূরা। অন্যদিকে আল মাওয়ারদী বলেন, অধিকাংশ আলেমের মতে এটি মক্কী সূরা। ইমাম সুযুতী ইতকান গঙ্গে একথাই লিখেছেন। ইবনে মারওয়াইয়া ইবনে আবাস (রা), ইবনে মুবাইর (রা) ও হয়রত আয়েশা (রা) থেকে এ উক্তি উচ্চত করেছেন যে, সূরাটি মকাব নামিল হয়েছিল। সূরার বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলেও একথাই প্রতীয়মান হয় যে, এর মকাব নামিল হওয়াটাই যুক্তিযুক্ত। সামনের আলোচনায় আমি একথা সুন্পট করে তুলে ধরবো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

লোকদেরকে কুরআন মজিদের মৃল্য, মর্যাদা ও শুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করাই এই সূরাটির বিষয়বস্তু। কুরআন মজিদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাক্রের পরে রাখাই একথা প্রকাশ করে যে, সূরা আলাক্রের প্রাথমিক পীচটি আয়াতের মাধ্যমে যে পবিত্র কিতাবটির নামিল শর্ক হয়েছিল তা কেমন ভাগ্য নির্ণয়কারী রাতে নামিল হয়, কেমন মহান মর্যাদা সম্পর কিতাব এবং তার এই নামিল হওয়ার অর্থ কি—এই সূরায় সেকথাই লোকদেরকে জানানো হয়েছে।

প্রথমেই আস্ত্রাহ বলেছেন, আমি এটি নামিল করেছি। অর্থাৎ এটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা নয় বরং আমিই এটি নামিল করেছি।

এরপর বলেছেন, কদরের রাতে আমার পক্ষ থেকে এটি নামিল হয়েছে। কদরের রাতের দু'টি অর্থ। দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। এক, এটি এমন একটি রাত যে রাতে তক্ডীরের ফায়সালা করা হয়। অথবা অন্য কথায় এটি সাধারণ রাতের মতো কোন মামুলি রাত নয়। বরং এ রাতে ভাঙ্গা গড়া চলে। এই রাতে এই কিতাব নামিল হওয়া নিষ্ঠক একটি কিতাব নামিল হওয়া নয় বরং এটি শুধুমাত্র কুরাইশ ও আরবের নয়,

০ "সারা দুনিয়ার ভাগ্য পান্তে দেবে। একথাটিই সূরা দুখানেও বলা হয়েছে (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা দুখানের ভূমিকা ও ৩ নম্বর টাকা)। দুই, এটি বড়ই মর্যাদা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের রাত। সামনের দিকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। এর সাহায্যে মক্কার কাফেরদেরকে পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা নিজেদের অঙ্গতার কারণে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশকৃত এই কিতাবকে নিজেদের জন্য একটি বিগদ মনে করেছো। তোমাদের ওপর এ এক আগদ এসে পড়েছে বলে তোমরা তিরঙ্কার করছো। অথচ যে রাতে এর নাযিল হবার ফায়সালা জারী করা হয় সেটি ছিল পরম কল্যাণ ও বরকতের রাত। এই একটি রাতে মানুষের কল্যাণের জন্য এত বেশী কাজ করা হয়েছে যা মানুষের ইতিহাসে হাজার মাসেও করা হয়নি। একথাটিও সূরা দুখানের তৃতীয় আয়তে অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সূরা দুখানের ভূমিকায় আমি এ বিষয়টির ওপর অস্পোকপাত করেছি।

সবশেষে বলা হয়েছে, এই রাতে ফেরেশতারা এবং জিবীল নিজেদের রবের অনুমতি নিয়ে সব রকমের আদেশ নির্দেশ সহকারে নাযিল হন। (সূরা দুখানের চতুর্থ আয়তে একে "مَرْكُبٌ مِّنْ جَانِمَয় বা সুষ্ঠু বিধান বলা হয়েছে।) সন্দ্ব্য থেকে সকাল পর্যন্ত এটি হয় পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তার রাত। অর্থাৎ কোন প্রকার অনিষ্ট এ রাতে প্রতাব ফেলতে পারে না। কারণ আল্লাহর সমস্ত ফায়সালার মূল লক্ষ্য হয় কল্যাণ। মানুষের জন্য তার মধ্যে কোন অকল্যাণ থাকে না। এমনকি তিনি কোন জাতিকে ধৰ্ম করার ফায়সালা করলেও তা করেন মানুষের কল্যাণের জন্য, তার অকল্যাণের জন্য নয়।

আয়াত ৫

সূরা আল কাদুর-মক্কী

১৮০

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করম্মাম্য মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ^১ وَمَا أَدْرِكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ^২
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ^৩ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ^৪ سُلْطَانٌ^৫ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ^৬

আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে।^১ তুমি কি জানো, কদরের রাত কি?^২ কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশী ভালো।^৩ ফেরেশতারা ও রহস্য এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হকুম নিয়ে নাযিল হয়।^৪ এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।^৫

১. মূল শব্দ হচ্ছে আন্যালনাহ (أَنْزَلْنَاهُ) আমি একে নাযিল করেছি" কিন্তু আগে কুরআনের কোন উক্তো না করেই কুরআনের দিকে ইগতি করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, "নাযিল করা" শব্দের মধ্যেই কুরআনের অর্থ রয়ে গেছে। যদি আগের বকল্য বা বর্ণনাভঙ্গী থেকে কোন সর্বনাম কোন বিশেষের জাগ্রায় বসেছে তা প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে এমন অবস্থায় আগে বা পরে কোথাও সেই বিশেষ্যটির উক্তো না থাকলেও সর্বনামটি ব্যবহার করা যায়। কুরআনে এর একাধিক দ্বিতীয় রয়ে গেছে। (এ ব্যাপারে আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন্দ নাম্ম ১ টাকা)

এখানে বলা হয়েছে, আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি আবার সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, "রম্যান মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে।" (১৮৫ আয়াত) এ থেকে জানা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হেরো গুহায় যে রাতে আল্লাহর ফেরেশতা অবী নিয়ে এসেছিলেন সেটি ছিল রম্যান মাসের একটি রাত। এই রাতকে এখানে কদরের রাত বলা হয়েছে। সূরা দুখানে একে মুবারক রাত বলা হয়েছে। বলা হয়েছে : "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ" অবশ্যি আমি একে একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাযিল করেছি।" (৩ আয়াত)

এই রাতে কুরআন নাযিল করার দুটি অর্থ হতে পারে। এক, এই রাতে সমগ্র কুরআন অবীর ধারক ফেরেশতাদেরকে দিয়ে দেয়া হয়। তারপর অবস্থা ও ঘটনাবলী অনুযায়ী তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে জিরুল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হকুমে তার

আয়াত ও সূরাগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করতে থাকেন। ইবনে আরাস (রা) এ অর্থটি বর্ণনা করেছেন। (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনয়ির, ইবনে আবী হাতেম, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হকী) এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই রাত থেকেই কুরআন নাযিলের সূচনা হয়। এটি ইমাম শা'বীর উক্তি। অবশ্য ইবনে আবাসের (রা) ওপরে বর্ণিত বজ্রব্যের মতো তাঁর একটি উক্তিও উদ্ভৃত করা হয়। (ইবনে জারীর) যা হোক, উভয় অবস্থায় কথা একই থাকে। অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কুরআন নাযিলের সিলসিলা এই রাতেই শুরু হয় এবং এই রাতেই সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাযিল হয়। তবুও এটি একটি অভ্যন্তর সত্য, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং তাঁর ইসলামী দাওয়াতের জন্য কোন ঘটনা বা ব্যাপারে সঠিক নির্দেশ সাড়ের প্রয়োজন দেখা দিলে তখনই আল্লাহ কুরআনের সূরা ও আয়াতগুলো রচনা করতেন না। বরং সমগ্র বিশ্ব-জাহান সৃষ্টির পূর্বে অনাদিকালে মহান আল্লাহ পৃথিবীতে মানব জাতির সৃষ্টি, তাদের মধ্যে নবী প্রেরণ, নবীদের ওপর কিতাব নাযিল, সব নবীর পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানো এবং তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল করার সমস্ত পরিকল্পনা তৈরি করে রেখেছিলেন। কদরের রাতে কেবলমাত্র এই পরিকল্পনার শেষ অংশের বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই সময় যদি সমগ্র কুরআন অহী ধারক ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়ে থাকে তাহলে তা মোটেই বিশ্বয়কর নয়।

কোন কোন তাফসীরকার কদরকে তকদীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ এই রাতে আল্লাহ তকদীরের ফায়সালা জারী করার জন্য তা ফেরেশতাদের হাতে তুলে দেন। সূরা দুখানের নিম্নোক্ত আয়াতটি এই বজ্রব্য সমর্থন করে : **فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ أُمَّةٍ حَكْيَمٌ** “এই রাতে সব ব্যাপারে জ্ঞানগত ফায়সালা প্রকাশ করা হবে থাকে।” (৪ আয়াত) অন্যদিকে ইমাম যুহুরী বলেন, কদর অর্থ হচ্ছে শেষ্ঠে ও মর্যাদা। অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মর্যাদাশীল রাত। এই অর্থ সমর্থন করে এই সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটি “কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও উত্তম।”

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কোনু রাত ছিল? এ ব্যাপারে ব্যাপক মতবিরোধ দেখা যায়। এ সম্পর্কে প্রায় ৪০টি মতের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে আলেম সমাজের সংখ্যাগুরু অংশের মতে রম্যানের শেষ দশ তারিখের কোন একটি বেজোড় রাত হচ্ছে এই কদরের রাত। আবার তাদের মধ্যেও বেশীরভাগ লোকের মত হচ্ছে সেটি সাতাশ তারিখের রাত। এ প্রসংগে বর্ণিত নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো এখানে উল্লেখ করছি।

হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাইলাতুল কদর সম্পর্কে বলেন : সেটি সাতাশের বা উন্ত্রিশের রাত। (আবু দাউদ) হ্যরত আবু হুরাইরার (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে সেটি রম্যানের শেষ রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

যির ইবনে হবাইশ হ্যরত উবাই ইবনে কাবকে (রা) কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি হলফ করে কোন কিছুকে ব্যক্তিগত হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বলেন, এটা সাতাশের রাত। (আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও ইবনে হিবান)

হয়রত আবু যারকে (রা) এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি বলেন, হয়রত উমর (রা), হয়রত হ্যাইফা (রা) এবং রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু সাহাবার মনে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ ছিল না যে, এটি রম্যানের সাতাশতম রাত। (ইবনে আবী শাইবা)

হয়রত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, রম্যানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর যেমন একুশ, তেইশ, পাঁচশ, সাতাশ, উনত্রিশ বা শেষ রাতের মধ্যে রয়েছে কদরের রাত। (মুসনাদে আহমাদ)

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তাকে যৌজ রম্যানের শেষ দশ রাতের মধ্যে যখন যাস শেষ হতে আর নয় দিন বাকি থাকে। অথবা সাত দিন বা পাঁচ দিন বাকি থাকে। (বুখারী) অধিকাংশ আলেম এর অর্থ করেছেন এভাবে যে, রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখনে বেজোড় রাতের কথা বলতে চেয়েছেন।

হয়রত আবু বকরাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নয় দিন বাকি থাকতে বা সাত দিন বা পাঁচ দিন বা এক দিন বাকি থাকতে অথবা শেষ রাত। তৌর বক্তব্যের অর্থ ছিল, এই তারিখগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো। (তিরমিয়ী ও নাসায়ী)

হয়রত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ কদরের রাতকে রম্যানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে তালাশ করো। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিয়ী) হয়রত আয়েশা (রা) ও হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) এও বর্ণনা করেছেন যে, রসূলগ্রাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতেকাগের পূর্ব পর্যন্ত রম্যানের শেষ দশ রাতে ইতিকাফ করেছেন।

এ প্রসংগে হয়রত মু'আবীয়া (রা) হয়রত ইবনে উমর (রা), হয়রত ইবনে আবাস (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ যে রেওয়ায়াত করেছেন তার ভিত্তিতে পূর্ববর্তী আলেমগণের বিরাট অংশ সাতাশ রম্যানকেই কদরের রাত বলে মনে করেন। সম্ভবত কদরের রাতের শেষেষ্ঠ ও মাহাত্ম্য থেকে লাভবান হবার আগ্রহে যাতে লোকেরা অনেক বেশী রাত ইবাদাতে কাটাতে পারে এবং কোন একটি রাতকে যথেষ্ট মনে না করে সে জন্য আল্লাহ ও তৌর রসূলের পক্ষ থেকে কোন একটি রাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, যখন মক্কা মু'আয্যমায় রাত হয় তখন দুনিয়ার একটি বিরাট অংশে থাকে দিন, এ অবস্থায় এসব এলাকার লোকেরা তো কোন দিন কদরের রাত লাভ করতে পারবে না। এর জবাব হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'রাত' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে দিন ও রাতের সমষ্টিকে বলা হয়। কাজেই রম্যানের এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে যে তারিখটিই দুনিয়ার কোন অংশে পাওয়া যাবে তার দিনের পূর্বেকার রাতটিই সেই এলাকার জন্য কদরের রাত হতে পারে।

২. মুফাস্সিরগণ সাধারণভাবে এর অর্থ করেছেন, এ রাতের সৎকাজ হাজার মাসের সৎকাজের চেয়ে ভালো। কদরের রাত এ গণনার বাইরে থাকবে। সন্দেহ নেই একথাটির মধ্যে যথার্থ সত্য রয়ে গেছে এবং রসূলগ্রাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই রাতের আমলের বিপুল ফর্যালত বর্ণনা করেছেন। কাজেই বুখারী ও মুসলিমে হয়রত

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَامَ لِيَلَّةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَأَحْسَابًا غُفرَلَهُ مَا تَقدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ

“যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমানের সাথে এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের
উদ্দেশ্যে ইবাদাতের জন্যে দাঁড়িলো তার পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করা হয়েছে।”

মুসনাদে আহমাদে হ্যরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে,
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কদরের রাত রয়েছে রম্যানের
শেষ দশ রাতের মধ্যে। যে ব্যক্তি প্রতিদান লাভের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসব রাতে ইবাদাতের
জন্য দাঁড়িয়ে থাকে আল্লাহ তার আগের পিছনের সব গোনাহ মাফ করে দেবেন।” কিন্তু
الْعَمَلُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ كُلِّ الْعَمَلِ فِي الْفَلَوْرِ
(কদরের রাতের আমল হাজার রাতের আমলের চেয়ে ভালো)
বরং বলা হয়েছে, “কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে ভালো।” আর মাস বলতে একেবারে
গুণে গুণে তিরাশি বছর চার মাস নয়। বরং আরববাসীদের কথার ধরনই এই রকম ছিল,
কোন বিগুল সংখ্যার ধারণা দেবার জন্য তারা “হাজার” শব্দটি ব্যবহার করতো। তাই
আয়াতের অর্থ হচ্ছে, এই একটি রাতে এত বড় নেকী ও কল্যাণের কাজ হয়েছে যা
মানবতার সুন্দীর্ঘ ইতিহাসে কোন দীর্ঘতম কালেও হয়নি।

৩. ঝুঁহ বলতে জিবীল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁর প্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার
কারণে সমস্ত ফেরেশতা থেকে আলাদা করে তাঁর উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তারা নিজেদের তরফ থেকে আসে না। বরং তাদের রবের অনুমতিক্রমে
আসে। আর প্রত্যেকটি হৃকুম বলতে সূরা দুখানের ৫ আয়াতে “আমরে হাকীম”
(বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ) বলতে যা বুঝানো হয়েছে এখানে তার কথাই বলা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত সারাটা রাত শুধু কল্যাণে পরিপূর্ণ। সেখানে
ফিতনা, দুঃক্ষতি ও অনিষ্টকারিতার ছিটেফোটাও নেই।

আল বাইয়েনাহ

৯৮

নামকরণ

প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ আল বাইয়েনাহ (البِيَنَةُ) থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

এ সূরাটিরও মক্ষী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। অনেক মুফাস্সির বলেন, অধিকাল্প আলেমের মতে এটি মক্ষী সূরা। আবার অনেক মুফাস্সির বলেন, অধিকাল্প আলেমের মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনুল যুবাইর ও আতা ইবনে ইয়াসানের উক্তি মতে এটি মাদানী সূরা। ইবনে আবাস ও কাতাদাহর এ ব্যাপারে দু'ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। এক উক্তি অনুযায়ী এটি মক্ষী এবং অন্য উক্তি অনুযায়ী মাদানী সূরা। হযরত আয়েলা (র্যা) একে মক্ষী গণ্য করেন। বাহরল্ল মুহায়ত গ্রহ প্রণেতা আবু হাইয়ান ও আহকামুল কুরআন গ্রহ প্রণেতা আবদুল মুনইম ইবনুল ফারাস এর মক্ষী হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেন। অন্যদিকে সূরাটির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন কোন আলামত পাওয়া যায় না যা থেকে এর মক্ষী বা মাদানী হবার ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত ফায়সালা করা যেতে পারে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

কুরআন মজীদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে একে সূরা আলাক ও সূরা কদরের পত্রে রাখাটাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সূরা আলা'কে সর্বপ্রথম নামিলকৃত অঙ্গী লিপিবদ্ধ হয়েছে। সূরা কদরে বলা হয়েছে সেগুলো কবে নামিল হয়। আর এই সূরায় এই পবিত্র কিতাবের সাথে একজন রসূল পাঠানো জরুরী ছিল কেন তা বলা হয়েছে।

সর্বপ্রথম রসূল পাঠাবার প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে এই যে, আহলি কিতাব ও মূশারিক নিরিশেষে দুনিয়াবাসীরা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে। একজন রসূল পাঠানো ছাড়া এই কুফরীর বেড়াজাল তেদে করে তাদের বের হয়ে আসা সম্ভব নয়। এ রসূলের অঙ্গিত্ব তাঁর রিসালাতের জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে পরিগণিত হতে হবে এবং তিনি লোকদের সামনে আল্লাহর কিতাবকে তাঁর আসল ও সঠিক আকৃতিতে পেশ করবেন। অঙ্গীতের আসমানী কিতাবসমূহে যেমন বাতিলের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছিল তেমন কোন মিশ্রণ তাঁতে থাকবে না এবং তা হবে পুরোপুরি সত্য ও সঠিক শিক্ষা সমন্বিত।

এরপর আহলি কিতাবদের গোমরাহী তুলে ধরা হয়েছে, বলা হয়েছে তাদের এই বিভিন্ন ভূল পথে ছুটে বেড়ানোর মানে এ নয় যে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখাননি। বরং

তাদের সামনে সঠিক পথের বর্ণনা সৃষ্টিভাবে এসে যাবার পরপরই তারা ভুল পথে পাড়ি জমিয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ হয়, নিজেদের ভূলের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এখন আবার আল্লাহর এই রসূলের মাধ্যমে সত্য আর এক দফা সৃষ্টি হবার প্রণালী তারা বিভাসের মতো ভুল পথে ছুটে বেড়াতে থাকে তাহলে তাদের দায়িত্বের বোঝা আরো বেশী বেড়ে যাবে।

এ প্রসংগে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নবী এসেছিলেন তাঁরা সবাই একটি মাত্র হকুম দিয়েছিলেন এবং যেসব কিতাব পাঠানো হয়েছিল সেসবে একটি মাত্র হকুমই বর্ণিত হয়েছিল। সেটি হচ্ছে : সব পথ ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর পথ অবলম্বন করো। তাঁর ইবাদাত, বন্দেগী ও আনুগত্যের সাথে আর কারোর ইবাদাত-বন্দেগী, আনুগত্য ও উপাসনা আরাধনা শামিল করো না। নামায কায়েম করো এবং যাকাত দাও। চিরকাল এটিই সঠিক দীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে আসছে। এ থেকেও স্বাভাবিকভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, আহলি কিতাবরা এই আসল দীন থেকে সরে গিয়ে নিজেদের ধর্মে যেসব নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে নিয়েছে সেগুলো সবই বাতিল। আর আল্লাহর এই নবী যিনি এখন এসেছেন তিনি তাদেরকে এই আসল দীনের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দিচ্ছেন।

সবশেষে পরিকারভাবে বলে দেয়া হয়েছে, যেসব আহলি কিতাব ও মুশরিক এই রসূলকে মেনে নিতে অঙ্গীকার করবে তারা নিকৃষ্টতম সৃষ্টি। তাদের শান্তি চিরস্তন জাহানাম। আর যারা ঈমান এনে সৎকর্মের পথ অবলম্বন করবে এবং দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে জীবন ধাপন করবে তারা সর্বোত্তম সৃষ্টি। তারা চিরকাল জান্মাতে থাকবে। এই তাদের পুরস্কার। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও হয়েছে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

আয়াত ৮

সুরা আল বাইয়েনাহ-মক্কী

কুরুক্ষেত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণ্যাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ
 مُنْفِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ ۝ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو مُصْحَّفًا
 مَطْهَرًا ۗ ۝ فِيهَا كِتَبٌ قَيِّمةٌ ۝

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের^১ মধ্যে যারা কাফের ছিল^২ তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা (নিজেদের কুফরী থেকে) বিরত থাকতে প্রস্তুত ছিল না।^৩ (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল^৪ যিনি পবিত্র সহীফা পড়ে শুনাবেন,^৫ যাতে একেবারে সঠিক কথা লেখা আছে।

১. আহলি কিতাব ও মুশরিক উভয় দলই কুফরী কর্মকাণ্ডে জড়িত হলেও দু'দলকে দু'টি পৃথক নাম দেয়া হয়েছে। যাদের কাছে আগের নবীদের আনা কোন আসমানী কিতাব ছিল, তা যত বিকৃত আকারেই থাক না কেন, তারা তা মেনে চলতো, তাদেরকে বলা হয় আহলি কিতাব। আর যারা কোন নবীর অনুসারী ছিল না কোন আসমানী কিতাবও মানতো না তারা মুশরিক। কুরআন মজীদের বহু স্থানে আহলি কিতাবদের শির্কের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন খৃষ্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “তারা বলে, আল্লাহ তিন খোদার একজন।” (আল মায়দেহাই ৭৩) “তারা মসীহকেও খোদা বলে।” (আল মায়দেহাই ১৭) “তারা মসীহকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করে।” (আত তাওবা ৩০) আবার ইহুদিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : “তারা উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে” (আত তাওবা ৩০) কিন্তু এসব সত্ত্বেও কুরআনের কোথাও তাদের জন্য মুশরিক পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। বরং তাদের উল্লেখ করা হয়েছে “আহলি কিতাব” বা “যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল” শব্দের মাধ্যমে। অথবা ইয়াছদ ও নাসারা শব্দব্যয়ের মাধ্যমে। কারণ তারা আসল তাওহিদী ধর্ম মানতো, তারপর শিরীক করতো। বিপরীত পক্ষে অ-আহলি কিতাবদের জন্য পারিভাষিক পর্যায়ে মুশরিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ তারা শিরককেই আসল ধর্ম গণ্য করতো। তাওহীদকে তারা পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে অবীকার করতো। এ দু'টি দলের মধ্যকার এ পার্থক্যটা শুধুমাত্র পরিভাষার পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, শরীয়াতের বিধানের মধ্যেও এ পার্থক্য ছিল। আহলি কিতাবরা আল্লাহর নাম নিয়ে যদি কোন হালাল প্রাণীকে সঠিক পদ্ধতিতে ঘৰে করে তাহলে তা মুসলমানদের জন্য হালাল গণ্য করা হয়েছে।

তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে মুশারিকদের যবেহ করা থাণীও হালাল নয় এবং তাদের মেয়েদেরকে বিয়ে করারও অনুমতি দেয়া হয়নি।

২. এখানে কুফরী শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার কুফরী দৃষ্টিভঙ্গী এর অন্তরভুক্ত। যেমন কেউ এই অর্থে কাফের ছিল যে, সে আদৌ আল্লাহকে মানতো না। আবার কেউ আল্লাহকে মানতো ঠিকই কিন্তু তাঁকে একমাত্র মাবুদ বলে মানতো না। বরং আল্লাহর সন্তা ও তাঁর সার্বভৌম কর্তৃত্বের শুণাবলী ও ক্ষমতায় কোন না কোনভাবে অন্যদেরকে শরীক করে তাদের বন্দেগীও করতো। কেউ আল্লাহর একত্র স্বীকার করতো কিন্তু এ সত্ত্বেও আবার কোন না কোন ধরনের শিরকও করতো। কেউ আল্লাহকে মানতো কিন্তু তাঁর নবীদেরকে মানতো না এবং নবীদের মাধ্যমে যে হেদয়াত এসেছিল তাকে মানতে অস্বীকার করতো। কেউ এক নবীকে মানতো কিন্তু অন্য নবীকে অস্বীকার করতো। মোটকথা, বিভিন্ন ধরনের কুফরীতে লোকেরা নিষ্ঠ ছিল। এখানে 'আহলি কিতাব ও মুশারিকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল', একথা বলার অর্থ এ নয় যে, তাদের মধ্যে তাহলে কিছু লোক ছিল যারা কুফরীতে নিষ্ঠ ছিল না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, কুফরীতে নিষ্ঠ দু'টি দল ছিল, একটি আহলি কিতাব ও অন্যটি মুশারিক। এখানে মিন (মেন) শব্দটি কতক বা কিছু অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। বরং 'মিন' এখানে বর্ণনাযুক্ত। যেমন সূরা ইজের ৩০ আয়াতে বলা হয়েছে : **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْأَوْتَانِ** অর্থাৎ মৃত্যুদের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ এ নয় যে, মৃত্যুদের মধ্যে যে অপবিত্রতা আছে তা থেকে দূরে থাকো। তেমনি **أَمْلَى الْكِتَبِ** এর অর্থও হচ্ছে : যারা কুফরী করে, যারা আহলি কিতাব ও মুশারিকদের দলের অন্তরভুক্ত। এর অর্থ এ নয় যে, এই দু'টি দলের মধ্য থেকে যারা কুফরী করে।

৩. অর্থাৎ একটি সুম্পষ্ট প্রমাণ এসে তাদেরকে কুফরীর প্রতিটি গলদ ও সত্য বিরোধী বিষয় বুঝাবে এবং যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে সুম্পষ্ট পক্ষতাত্ত্বিকভাবে সত্য সঠিক পথ তাদের সামনে পেশ করবে, এ ছাড়া এই কুফরীর অবস্থা থেকে বের হবার আর কোন পথ তাদের সামনে ছিল না। এর মানে এ নয় যে, এই সুম্পষ্ট প্রমাণটি এসে যাবার পর তারা সবাই কুফরী পরিত্যাগ করবে। বরং এর মানে হচ্ছে এই প্রমাণটির অনুপস্থিতিতে তাদের এই অবস্থার মধ্য থেকে বের হয়ে আসা সম্ভবপ্রয়োগ ছিল না। তবে তার আসার পরও তাদের মধ্য থেকে যারা নিজেদের কুফরীর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়। এরপর তারা আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে পারবে না যে, আপনি আমাদের হেদয়াতের কোন ব্যবস্থা করেননি। এই ধরনের কথা কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে **وَعَلَى اللَّهِ قَضْدُ السُّبْبِيلِ** বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। যেমন সূরা নাহলে বলা হয়েছে : **"سُোজা পথ দেখানো আল্লাহরই দায়িত্ব!"** (৯ আয়াত) সূরা লাইলে বলা হয়েছে : **"পথ দেখাবার দায়িত্ব আমার।"** (১২ আয়াত)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ

رَسُّلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُّلِ -

“আমি তোমার প্রতি ঠিক তেমনিতাবে অহী পাঠিয়েছি যেভাবে নৃহ ও তারপর নবীদের প্রতি পাঠিয়েছিলাম.....এই রসূলদেরকে সুসংবাদদানকারী ও সতর্ককারী করা হয়েছে যাতে রসূলদের পর শোকদের জন্য আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন যুক্তি না থাকে।” (আন নিসা ১৬৩-১৬৫)

يَأَمِلُ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِنَ الرَّسُّلِ أَنْ تَقُولُوا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَ كُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ

“হে আলিম কিতাব। রসূলদের সিলসিলা দীর্ঘকাল বঙ্গ থাকার পর প্রকৃত সত্যকে সুস্পষ্ট করার জন্য তোমাদের কাছে আমার রসূল এসেছে। যাতে তোমরা বলতে না পারো আমাদের কাছে না কোন সুসংবাদদানকারী এসেছিল, না এসেছিল কোন সতর্ককারী। কাজেই নাও, এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদানকারী এসে গেছে এবং সতর্ককারীও।” (আল মায়দাহ ১৯)

৪. এখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ বলা হয়েছে। কারণ তাঁর নবুওয়াত নাড়ের আগের ও পরের জীবন, নিরক্ষর হওয়া সন্ত্রেও তাঁর কুরআনের মতো কিতাব পেশ করা, তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে ঈমান গ্রহণকারীদের জীবনে অস্থানাবিক পরিবর্তন সূচিত হওয়া, তাঁর পুরোপুরি যুক্তিসংগত আকীদা-বিশ্বাস, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ইবাদাত-বন্দেগী, চৃড়াত পর্যায়ের পবিত্র ও নিষ্কল্প নৈতিক চরিত্র এবং মানব জীবন গঠনের জন্য সবচেয়ে ভালো মূলনীতি ও বিধি-বিধান শিক্ষা দেয়া, তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে পুরোপুরি সামঞ্জস্য থাকা এবং সব ধরনের বিরোধিতা ও বাধা-বিপত্তির মোকাবেলায় সীমাহীন দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর নিজের দাওয়াতের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—এসব বিষয়ই তিনি যে যথার্থেই আল্লাহর রসূল সে কথারই ছিল সুস্পষ্ট আলামত।

৫. আভিধানিক অর্থে ‘সহীফা’ বলা হয় “নিখিত পাতাকে।” কিন্তু কুরআন মজীদে এ শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে নবীগণের ওপর নাযিলকৃত কিতাব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর পবিত্র সহীফা মানে হচ্ছে এমন সব সহীফা যার মধ্যে কোন প্রকার বাতিল, কোন ধরনের গোমরাহী ও ভ্রষ্টতা এবং কোন নৈতিক অপবিত্রতার মিশ্রণ নেই। কোন ব্যক্তি এই কথাগুলোর পুরোপুরি গুরুত্ব তখনই অনুধাবন করতে পারবেন যখন তিনি কুরআনের পাশাপাশি বাইবেল (এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থগুলোও) অধ্যয়ন করবেন। সেখানে তিনি দেখবেন সঠিক কথার সাথে সাথে এমন কথাও লেখা আছে, যা সত্য ও ন্যায় এবং সুস্থ বিবেক-বৃদ্ধিরও পরিপন্থী। আবার এই সংগে নৈতিক দিক দিয়েও অত্যন্ত নিম্নমানের। এসব কথা পড়ার পর কুরআন পড়লে যে কোন ব্যক্তি তার অসাধারণ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَمَا
أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبَدُوا إِلَهًا لِّهُ أُلْيَّانٌ هُنَّ حَنَفاءُ وَيَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَبَئُوتُوا الزَّكُورَةَ وَذِلِّكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ۖ

প্রথমে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে তো বিভেদ সৃষ্টি হলো তাদের কাছে (সত্য পথের) সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে যাওয়ার পর।^৬ তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোন হ্রস্ব দেয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দীন।^৭

৬. অর্থাৎ ইতিপূর্বে আহলি কিতাবরা বিভিন্ন ভূল পথে পাড়ি জমিয়ে যেসব বিভিন্ন দল ও উপদলের উন্নত ঘটিয়েছিল তার কারণ এ ছিল না যে, মহান আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে পথ দেখাবার জন্য সুস্পষ্ট প্রমাণ পাঠাবার ব্যাপারে কোন ফাঁক রেখেছিলেন। বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে পথনির্দেশনা আসার পর তারা নিজেরাই এ কর্মনীতি অবলম্বন করেছিল। কাজেই নিজেদের গোমরাহীর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী ছিল। কারণ তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য পৃষ্ঠাগাম ব্যবস্থা অবলম্বন করে প্রমাণ পূর্ণ করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে এখন যেহেতু তাদের সহীফাগুলো পাক-পবিত্র ছিল না এবং তাদের কিতাবগুলো একেবারে সত্য সঠিক, শিক্ষা সংবলিত ছিল না, তাই মহান আল্লাহ একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ হিসেবে নিজের একজন রসূল পাঠিয়ে এবং তাঁর মাধ্যমে পুরোপুরি সত্য-সঠিক শিক্ষা সংবলিত পাক-পবিত্র সহীফা পেশ করে আবার তাদের ওপর প্রমাণ পূর্ণ করে দিলেন। ফলে এর পরেও যদি তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় তাহলে এর দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তাবে। আল্লাহর মোকাবেলায় তারা কোন প্রমাণ পেশ করতে পারবে না। কুরআন মজীদের বহু জায়গায় একথা বলা হয়েছে। উদাহরণ ব্রহ্মপুর দেখুন সূরা আল বাকারা ২১৩-২৫৩ আয়াত, আলে ইমরান ১৯ আয়াত, আল মায়েদাহ ৪৪-৫০ আয়াত, ইউসুফ ৯৩ আয়াত, আশ শূরা ১৩-১৫ আয়াত, আল জাসিয়াহ ১৬-১৮ আয়াত। এই সাথে তাফহীমুল কুরআনে এসব আয়াতের আমি যে ব্যক্তিগুলো লিখেছি সেগুলোর ওপরও যদি একবার নজর বুলানো যায় তাহলে বক্তব্যটি অনুধাবন করা আরো সহজ হবে।

৭. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনটি পেশ করছেন। আহলি কিতাবদের কাছে যেসব কিতাব নাখিল করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে যেসব নবী এসেছিলেন তারাও তাদেরকে সেই একই দীনের তালীম দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে যেসব বাতিল আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ-কর্মের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধর্মগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল তার কোনটিরও হ্রস্ব তারা দেননি। সবসময় সত্য ও সঠিক দীন একটিই ছিল। আর সেটি হচ্ছে : একমাত্র আল্লাহর বন্দেগী করতে হবে। তাঁর

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ خَلِيلِينَ
 فِيمَا أُولَئِكَ هُرِّشُوا بِالْبَرِّيَّةِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أُولَئِكَ هُرِّشُوا بِالْبَرِّيَّةِ ۚ ۖ جَزَاؤُهُمْ عِنْ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَلَيْنِ تَجْرِي
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيمَا أَبْدَأُوا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ
 ذَلِكَ لِمَنْ خَسِرَ رَبَّهُ ۚ ۖ

আহলি কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে তারা নিশ্চিতভাবে জাহানামের আগনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। তারা সৃষ্টির অধম।^{১৯} যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তারা নিশ্চিতভাবে সৃষ্টির সেরা।^{২০} তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জানাত, যার নিম্নদেশে বরণাধারা প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আগ্নাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এসব সে ব্যক্তির জন্য যে তার রবকে ভয় করে।^{২১}

বদ্দেগীর সাথে আর কারো বদ্দেগীর মিশ্রণ ঘটানো যাবে না। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এনে একমাত্র আগ্নাহের পূজারী এবং তাঁর ফরমানের অনুগত হতে হবে। নামায কায়েম করতে হবে। যাকাত দিতে হবে। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য পড়ুন তাফহীমুল কুরআন আল আ'রাফ ১৯ টাকা, ইউনুস ১০০-১০৯ টাকা, আররুম ৪৩-৪৭ টাকা এবং আয যুমার ৩-৪ টাকা।

এই আয়াতে ‘দীনুল কাইয়েমা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন মুফাসিসির একে ‘بِيْنَ الْمُلْكِ وَالْقِيَمَةِ’ অর্থাৎ ‘সত্য-সঠিক পথাশ্রয়ী মিল্লাতের দীন’ অর্থে নিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে বিশেষের সাথে বিশেষণের সবক হিসেবে গণ্য করেছেন এবং ‘فَهَامَهُ’ এর মধ্যাহিতে ‘وَ عَلِمَهُ’ কে ‘فِيْ’ অর্থে গ্রহণ করেছেন। আমি এখানে অনুবাদে যে অর্থ গ্রহণ করেছি তাদের মতে এর অর্থও তাই।

৮. এখানে কুফরী মানে মুহাম্মাদ সান্নাহাহ আলাইহি ওয়া সান্নামকে মেনে নিতে অঙ্গীকার করা। অর্থাৎ মুশরিক ও আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা এই রসূলের নবুওয়াত লাভের পর তাঁকে মানেনি। অথচ তাঁর অস্তিত্বই একটি সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল নিপি সম্বলিত মত পবিত্র সহীফা পাঠ করে তাদেরকে শুনাচ্ছেন। এ ধরনের লোকদের পরিণাম তাই হবে যা সামনের দিকে বর্ণনা করা হচ্ছে।

৯. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি আর নেই। এমন কি তারা পশুরও অধম। কারণ পশুর বৃদ্ধি ও স্বাধীন চিত্তা ও কর্মশক্তি নেই। কিন্তু এরা বৃদ্ধি ও স্বাধীন চিত্তা ও কর্মশক্তি সত্ত্বেও সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১০. অর্থাৎ তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবার এমনকি ফেরেশতাদেরও সেরা। কারণ ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখে না। আর মানুষ এই নাফরমানি করার স্বাধীন ক্ষমতা রাখা সত্ত্বেও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে।

১১. অন্য কথায় যে ব্যক্তি আল্লাহর ব্যাপারে নিতীক এবং তাঁর মোকাবিলায় দুঃসাহসী ও বেগরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে না। বরং দুনিয়ায় প্রতি পদে পদে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে। প্রতি পদক্ষেপে যে ব্যক্তি মনে করে, কোথাও আমি এমন কোন কাজ তো করে বসিনি যার ফলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করে ফেলেন, তার জন্য আল্লাহর কাছে রয়েছে এই প্রতিদান ও পূরক্ষার।

আয় যিল্যাল

৯৯

নামকরণ

প্রথম আয়াতের যিল্যালাহ (رَبُّ الْأَنْعَمْ) শব্দ থেকে এই নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্ষী বা মাদানী হবার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে মাসউদ (রা), আতা, জাবের ও মুজাহিদ বলেন, এটি মক্ষী সূরা। ইবনে আবাসের (রা) একটি উক্তি এর সমর্থন করে। অন্যদিকে কাতাদাহ ও মুকাতিল বলেন, এটি মাদানী সূরা। এর মাদানী হবার সমর্থনে ইবনে আবাসেরও (রা) আর একটি উক্তি পাওয়া যায়। ইবনে আবী হাতেম হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে যে রেওয়ায়াতি উদ্ভৃত করেছেন তার থেকেও এর মাদানী হবার সমর্থনে প্রমাণ পেশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছে : যখন **فَمَنْ يَعْسِلْ مُثْقَلَ نَرَةً خَيْرًا يُرْهَ** আয়াতটি নাযিল হয় তখন আর্মি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম : হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার আমল দেখবো? তিনি জবাব দিলেন, হী। আমি বললাম, এই বড় বড় গোনাহগুলো দেখবো? জবাব দিলেন, হী। বললাম, আর এই ছেট ছেট গোনাহগুলোও? জবাব দিলেন হী। একথা শুনে আমি বললাম, তাহলে তো আমি মারা পড়েছি। তিনি বললেন, আনন্দিত হও, হে আবু সাঈদ করণ প্রত্যেক নেকী তার নিজের মতো দশটি নেকীর সমান হবে। এই হাদীস থেকে এই সূরাটির মাদানী হবার ভিত্তিমূলক প্রমাণ পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মদীনার অধিবাসী ছিলেন। ওহোদ যুদ্ধের পরে তিনি বালেগ হন। তাই যদি তাঁর উপস্থিতিতে নাযিল হয়ে থাকে তাহলে এর মাদানী হওয়া উচিত। কিন্তু আয়াত ও সূরার শানেন্দুয়ুল বর্ণনা সম্পর্কে সাহারী ও তাবেঙ্গাণের যে পদ্ধতি ছিল তা ইতিপূর্বে সূরা দাহর এর ভূমিকায় আমি বর্ণনা করে এসেছি। তা থেকে জানা যায়, কোন আয়াত সম্পর্কে সাহারীর একথা বলা যে, এ আয়াতটি উমুক ঘটনা প্রসংগে নাযিল হয়েছিল, সংশ্লিষ্ট আয়াতটির ঐ সময় নাযিল হওয়ার চূড়ান্ত প্রাপ্ত নয়। হতে পারে হযরত আবু সাঈদ জ্ঞান হবার পর যখন সর্বপ্রথম আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে শুনেন তখন তার শেষ অংশ তাঁর মনে ভীতির সংঘার করে থাকবে এবং তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওপরে বর্ণিত প্রশংসনে করে থাকবেন। আর এই ঘটনাটিকে তিনি এমনভাবে বর্ণনা করে থাকবেন যাতে মনে হবে এই আয়াতটি যখন নাযিল হয় তখন তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই প্রশংসনে করেন। যদি এই হাদীসটি সামনে না থাকে তাহলে কুরআনকে বুঝে অধ্যয়নকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করবেন এটি একটি

মক্কী সূরা। বরং এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে অনুভূত হবে, এটি মক্কায় প্রাথমিক যুগে এমন সময় নাযিল হয় যখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা-বিশ্বাস মানুষের সামনে পেশ করা হচ্ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং সেখানে দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের হিসেব মানুষের সামনে এসে যাওয়া। সর্বপ্রথম তিনটি ছোট ছোট বাক্যে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর মানুষের হিতীয় জীবনের সূত্রপাত কিভাবে হবে এবং মানুষের জন্য তা হবে কেমন বিশ্বাসুর। তারপর দু'টি বাক্যে বলা হয়েছে, মানুষ এই পৃথিবীর বৃক্তে অবস্থান করে নিশ্চিন্তে সব রকমের কাজ করে গেছে। সে কোনদিন কঞ্চাও করতে পারেনি যে, এই নিষ্পাণ জিনিস কোনদিন তার কাজকর্মের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহর হকুমে সেদিন সে কথা বলতে থাকবে। প্রত্যেকটি লোকের ব্যাপারে সে বলবে, কোন্ সময় কোথায় সে কি কাজ করেছিল। তারপর বলা হয়েছে, সেদিন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের নিজেদের কবর থেকে বের হয়ে দলে দলে আসতে থাকবে। তাদের কর্মকাণ্ড তাদেরকে দেখানো হবে। এমন পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিতভাবে এই কর্মকাণ্ড পেশ করা হবে যে, সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা পাপও সামনে এসে যাবে।

আয়াত ৮

সূরা আয় যিলযাল-মাদানী

কৃক্ত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আত্মাহর নামে

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَاٰ وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَاٰ
وَ قَالَ إِلَيْنَا سَانُ مَالَهَاٰ يَوْمَئِنِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَاٰ بِأَنَّ
رَبَّكَ أَوْحَى لَهَاٰ

যখন পৃথিবীকে প্রবলবেগে ঝাঁকুনি দেয়া হবে।^১ পৃথিবী তার তেতরের সমস্ত তার বাইরে বের করে দেবে।^২ আর মানুষ বলবে, এর কী হয়েছে?^৩ সেদিন সে তার নিজের (ওপর যা কিছু ঘটেছে সেই) সব অবস্থা বর্ণনা করবে।^৪ কারণ তোমার রব তাকে (এমনটি করার) হকুম দিয়ে থাকবেন।

১. মূল শব্দগুলো হচ্ছে, ‘রূলতِ الأرضِ زلزالُها’ মানে হচ্ছে, একাদিক্রমে পরপর জোরে জোরে ঝাড়া দেয়া। কাজেই ‘রূলতِ الأرضِ’ বলতে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে এবং ভূমিকশ্পের পর ভূমিকশ্পের মাধ্যমে পৃথিবীকে ভীষণভাবে কাঁপিয়ে দেয়া হবে। আর যেহেতু পৃথিবীকে নাড়া দেবার কথা বলা হয়েছে তাই এথেকে আপনা-আপনিই এই অর্থ বের হয়ে আসে যে, পৃথিবীর কোন একটি অংশ কোন একটি স্থান বা অঞ্চল নয় বরং সমগ্র পৃথিবীকে কম্পিত করে দেয়া হবে। তারপর এই নাড়া দেবার এই ভূক্ষণের ভয়াবহতা আরো বেশী করে প্রকাশ করার জন্য তার সাথে বাড়তি ‘زلزال’ শব্দটিও বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ শব্দটির শাব্দিক মানে হচ্ছে, “কম্পিত হওয়া।” অর্থাৎ তার মতো বিশাল ভূগোলককে যেভাবে ঝাঁকানি দিলে কাঁপে অথবা যেভাবে ঝাঁকানি দিলে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে ভীষণভাবে কাঁপে ঠিক সেভাবে তাকে ঝাঁকানি দেয়া হবে। কোন কোন মুফাস্সির এই কম্পনকে প্রথম কম্পন ধরে নিয়েছেন। তাদের মতে কিয়ামতের প্রথম পর্বের সূচনা হবে যে কম্পন থেকে এটি হচ্ছে সেই কম্পন। অর্থাৎ যে কম্পনের পর দুনিয়ার সব সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তার সমগ্র ব্যবস্থাপনা ওলট-পালট হয়ে যাবে। কিন্তু মুফাস্সিরগণের একটি বড় দলের মতে যে কম্পনের মাধ্যমে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে অর্থাৎ যখন আগের পিছের সমস্ত মানুষ পুনর্বার জীবিত হয়ে উঠবে, এটি সেই কম্পন। এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি বেশী নির্ভুল। কারণ পরবর্তী সমস্ত আলোচনায় এই বিষয়টির প্রকাশ ঘটেছে।

وَالْفَتْ مَا فِيْهَا
২. এই বিষয়টি সূরা ইনশিকাকের ৪ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে **وَأَلْفَتْ** “আর যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে তা বাইরে নিষ্কেপ করে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।” এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মরা মানুষ যাটির বুকে যেখানে যে অবস্থায় যে আকৃতিতে আছে তাদের সবাইকে বের করে এনে সে বাইরে ফেলে দেবে। আর পরবর্তী বাক্য থেকে একথা প্রকাশ হচ্ছে যে, সে সময় তাদের শরীরের সমস্ত চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অংশগুলো এক জায়গায় জমা হয়ে নতুন করে আবার সেই একই আকৃতি সহকারে জীবিত হয়ে উঠবে যেমন সে তার প্রথম জীবনের অবস্থায় ছিল। দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, কেবলমাত্র মরা মানুষদেরকে সে বাইরে নিষ্কেপ করে ক্ষ্যাতি হবে না বরং তাদের প্রথম জীবনের সমস্ত কথা ও কাজ এবং যাবতীয় আচার-আচরণের রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণের যে বিশাল স্তুপ তার গর্তে ঢাপা পড়ে আছে সেগুলোকেও বের করে বাইরে ফেলে দেবে। পরবর্তী বাক্যটিতে একথারই প্রকাশ ঘটেছে। তাতে বলা হয়েছে, যদীন তার ওপর যা কিছু ঘটেছে তা বর্ণনা করবে। তিন, কোন কোন মুফাস্সির এর তৃতীয় একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, সোনা, রূপা, হীরা, মণি-মাণিক্য এবং অন্যান্য যেসব মূল্যবান সম্পদ ভূ-গর্তে সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোর বিশাল বিশাল স্তুপও সেদিন যদীন উগড়ে দেবে। মানুষ দেখবে, এগুলোর জন্য তারা দুনিয়ায় প্রাণ দিতো। এগুলো কবজা করার জন্য তারা পরম্পর হানাহানি ও কাটাকাটি করতো। হকদারদের হক মেরে নিতো। চুরি-ডাকাতি করতো, জলে হলে দস্তুতা করতো। যুদ্ধ-বিগ্রহে লিঙ্গ হতো এবং এক একটি সম্পদায় ও জাতিকে ধ্বংস করে দিতো। আজ এসব কিছু তাদের সামনে উপস্থিত। অর্থে এগুলো এখন আর তাদের কোন কাজে লাগবে না বরং উলটো তাদের জন্য আয়াবের সরঞ্জাম হয়ে রয়েছে।

৩. মানুষ অর্থ প্রত্যেকটি মানুষ হতে পারে। কারণ পুনরায় জীবন লাভ করে চেতনা ফিরে পাবার সাথে সাথেই প্রত্যেক ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া এটিই হবে যে, এসব কি হচ্ছে? এটা যে হাশরের দিন একথা সে পরে বুঝতে পারবে। আবার মানুষ অর্থ আখেরাত অঙ্গীকারকারী মানুষও হতে পারে। কারণ যে বিষয়কে অসম্ভব মনে করতো তা তার সামনে ঘটে যেতে থাকবে এবং সে এসব দেখে অবাক ও পেরেশান হবে। তবে ঈমানদারদের মনে এ ধরনের বিশ্বাস ও পেরেশান থাকবে না। কারণ তখন তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও প্রত্যায় অনুযায়ীই সবকিছু হতে থাকবে। সূরা ইয়াসিনের ৫২ আয়াতটি এই দ্বিতীয় অর্থটি কতকটা সমর্থন করে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সে সময় আখেরাত অঙ্গীকারকারীরা বলবে : **مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مُرْقَدًا** “কে আমাদের শয়নাগার থেকে আমাদের উঠালো?” এর জবাব আসবে : **هُذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ** “এটি সেই জিনিস যার ওয়াদা করুণাময় করেছিলেন এবং আল্লাহর পাঠানো রসূলগণ সত্য বলেছিলেন।” ঈমানদাররাই যে কাফেরদেরকে এই জবাব দেবে, এ ব্যাপারে এ আয়াতটি সুস্পষ্ট নয়। কারণ আয়াতে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে ঈমানদারদের পক্ষ থেকে তারা এই জবাব পাবে, এ সম্ভাবনা অবশ্য এখানে আছে।

৪. হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি পড়ে জিজ্ঞেস করেন : “জানো তার সেই অবস্থা কি?” লোকেরা জবাব দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। রসূল (সা) বলেন : “সেই অবস্থা হচ্ছে,

যମীନେର ପିଠେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଯମୀନୀ ଯେ କାଜ କରିବେ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗ୍ୟ ଦେବେ । ସେ ବଲବେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉମ୍ବୁକ ଦିନ ଉମ୍ବୁକ କାଜ କରେଛି । ଏହି ହଚ୍ଛେ ମେଇ ଅବଶ୍ୟ, ଯା ଯମୀନ ବର୍ଣନ କରିବେ ।” (ମୁମ୍ବନାଦେ ଆହମାଦ, ତିରମିଯୀ, ନାସାଈ, ଇବନେ ଜାରିଆ, ଆବଦ ଇବନେ ହମାଇଦ, ଇବନୁଲ ମୁନ୍ୟିର, ହକେମ, ଇବନେ ମାରଦୁଇୟା ଏବଂ ବାଯହାକୀ ଫିଶ୍ଶୁ'ଆବ) ହ୍ୟରତ ରାବାଜାହ ଆଲ ଖାରାଶୀ ରେଓୟାଯାତ କରେଛେନ, ରମ୍ଜଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହ ଆଲାଇଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲେନ, “ଯମୀନ ଥେକେ ତୋମରା ନିଜେଦେରକେ ରଞ୍ଜ କରେ ଚଲବେ । କାରଣ ଏ ହଚ୍ଛେ ତୋମାଦେର ମୂଳ ଭିତ୍ତି । ଆର ଏମନ କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ନେଇ ଯେ ଏର ଉପର ତାଳୋ-ମନ୍ଦ କୋନ କାଜ କରେ ଏବଂ ସେ ତାର ଥିବର ଦେଇ ନା ।” (ମୁ'ଜାମୁତ ତାବରାନୀ) ହ୍ୟରତ ଆନାସ (ରା) ବର୍ଣନ କରେନ, ରମ୍ଜଲାହ ସାନ୍ତ୍ରାନ୍ତାହ ଆଲାଇଇହି ଓୟା ସାନ୍ତ୍ରାମ ବଲେଛେନ : “କିଯାମତେର ଦିନ ଯମୀନ ଏମନ ପ୍ରତିଟି କାଜ ନିଯେ ଆସିବେ ଯା ତାର ପିଠେର ଉପର କରା ହେଯେ ।” ତାରପର ତିନି ଏହି ଆୟାତଟି ତେଲାଓୟାତ କରେନ । (ଇବନେ ମାରଦୁଇୟା, ବାଯହାକୀ) ହ୍ୟରତ ଆଲୀ (ରା) ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଜୀବନୀଗ୍ରହେ ଲିଖିତ ହେଯେହେ : ବାଯତୁଲମାଲେର ସମୁଦ୍ର ସମ୍ପଦ ଯଥିନ ତିନି ହକ୍କଦାରଦେର ମଧ୍ୟେ ବନ୍ଦ କରେ ସବ ଖାଲି କରେ ଦିତେନ ତଥନ ସେଥାନେ ଦୁରାକାତ ନଫଳ ନାମାୟ ପଡ଼ିତେନ । ତାରପର ବଲତେନ : “ତୋକେ ସାଙ୍ଗ୍ୟ ଦିତେ ହବେ, ଆୟି ତୋକେ ସତ୍ୟ ସହକାରେ ଭରେଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହକାରେ ଖାଲି କରେଛି ।”

ଯମୀନେର ଉପର ଯା କିଛୁ ଘଟେ ଗେହେ ତାର ସବକିଛୁ ସେ କିଯାମତେର ଦିନ ବଲେ ଦେବେ, ଯମୀନ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଥାଟି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗେ ମାନୁଷକେ ଅବାକ କରେ ଦିଯେ ଥାକିବେ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନେଇ । କାରଣ ତାରା ମନେ କରେ ଥାକିବେ, ଯମୀନ ଆବାର କ୍ରେମ କରେ କଥା ବଲିବେ ? କିନ୍ତୁ ଆଜ ପଦାର୍ଥବିଦ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ନତୁନ ନତୁନ ଜ୍ଞାନ-ଗବେଷଣା, ଆବିକ୍ଷାର-ଉତ୍ସାବନ ଏବଂ ସିନେମା, ଲାଉଡ ସ୍ପୀକାର, ରେଡିଓ, ଟେଲିଭିଶନ, ଟେପରେକର୍ଡର ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିର ଆବିକ୍ଷାରେର ଏ ଯୁଗେ ଯମୀନ ତାର ନିଜେର ଅବଶ୍ୟ ଓ ନିଜେର ଉପର ଘଟେ ଯାଓୟା ଘଟନାବଳୀ କିଭାବେ ବର୍ଣନା କରିବେ ଏକଥା ଅନୁଧାବନ କରା ମୋଟେଇ କଠିନ ନଯ । ମାନୁଷ ତାର ମୁଖ ଥେକେ ଯା କିଛୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସାନ ବାତାମେ, ରେଡିଓ ତରଣେ, ଘରେର ଦେଇଲେ, ମେବେ ଓ ଛାଦେର ପ୍ରତି ଅଗ୍ନ-ପରମାଣୁତେ ଏବଂ କୋନ ପଥେ, ଯଯଦାନେ ବା କ୍ଷେତ୍ର କୋନ କଥା ବଲେ ଥାକଲେ ସେଖାନକାର ପ୍ରତିଟି ଅଗ୍ନ-କଣିକାଯ ତା ଗୋଟେ ଆଛେ । ଆନ୍ତାହ ଯଥିନି ଚାଇବେନ ଏକଥାଣ୍ଟୋକେ ଏସବ ଜିନିସେର ମାଧ୍ୟମେ ତଥନଇ ହ୍ୟବି ଠିକ ତେମନିଭାବେ ଶୁଣିଯେ ଦିତେ ପାରିବେ ଯେତାବେ ସେଗୁଲୋ ଏକଦିନ ମାନୁଷେର ମୁଖ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଯେଛି । ସେ ସମୟ ମାନୁଷ ନିଜେର କାନେଇ ନିଜେର ଏହି ଆଓୟାଜ ଶୁଣେ ନେବେ । ତାର ପରିଚିତ ଜନେରାଓ ତାର ଏହି ଆଓୟାଜ ଚିନେ ନେବେ ଏବଂ ତାରା ଏକେ ତାରଇ କଠିନନି ଓ ବାକଡଂଗୀଯା ବଲେ ସନାକ୍ତ କରିବେ । ତାରପର ମାନୁଷ ଯମୀନେର ଯେଥାନେଇ ଯେ ଅବସାନ ଯେ କୋନ କାଜ କରେଛେ ତାର ପ୍ରତିଟି ନଡ଼ାଚଡ଼ା ଓ ଅଂଗଭଂଗିର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ତାର ଚାରପାଶେର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତେ ପଡ଼େଛେ ଏବଂ ସେଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ସେବ ଚିତ୍ରାଯିତ ହେୟ ରହେଛେ । ଏକେବାରେ ନିକଷ କାଳୋ ଆୟାରେର ବୁକେ ମେ କୋନ କାଜ କରେ ଥାକଲେଓ ଆନ୍ତାହର ସାର୍ବଭୋଗ କର୍ତ୍ତୃତ୍ଵର ଅଧୀନ ଏମନସବ ରଶ୍ମି ରହେଛେ ଯେଗୁଲୋର କାହେ ଆଲୋ-ଆୟାର ସମାନ, ତାରା ସକଳ ଅବସାନ ତାର ଛବି ଭୁଲାତେ ପାରେ । ଏସବ ଛବି କିଯାମତେର ଦିନ ଏକଟି ସଚଳ ଫିଲେର ମତୋ ମାନୁଷେର ସାମନେ ଏସେ ଯାବେ ଏବଂ ସାରାଜୀବନ ମେ କୋଥାଯ କି କରେଛେ ତା ତାକେ ଦେଖିଯେ ଦେବେ ।

ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନୁଷେର କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆନ୍ତାହ ସରାସରି ଜାନଲେଓ ଆଖେରାତେ ଯଥିନ ତିନି ଆଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେନ ତଥନ ସେଥାନେ ଯାକେଇ ଶାନ୍ତି ଦେବେନ ଇନସାଫ ଓ ନ୍ୟାଯନିତିର ଦାବୀ

يَوْمَئِنِ يَصْلُرُ النَّاسُ أَشْتَأْنَاهُ لِبِرِّ وَأَعْمَالَهُمْ فِيمَا يَعْمَلُ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

সেদিন লোকেরা তিনি তিনি অবস্থায় ফিরে আসবে,^৫ যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে দেখানো যায়।^৬ তারপর যে অতি অল্প পরিমাণ তালো কাজ করবে সে তা দেখে নেবে এবং যে অতি অল্প পরিমাণ খারাপ কাজ করবে সে তা দেখে নেবে।^৭

পুরোপুরি পালন করেই শাস্তি দেবেন। তাঁর আদালতে প্রত্যেকটি অপরাধী মানুষের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করা হবে তার সপক্ষে এমনসব অকুটিল সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা হবে যার ফলে তার অপরাধী হবার ব্যাপারে কারো কোন কথা বলার অবকাশ থাকবে না। সর্বপ্রথম পেশ করা হবে তার আমলনামা। সবসময় তার সাথে লেগে থাকা কেরামান কাতেবীন ফেরেশতাদ্য তার প্রত্যেকটি কথা ও কাজ রেকর্ড করছেন। (সূরা কাফ-১৭ আয়াত, সূরা ইনফিতার ১০-১২ আয়াত) এ আমলনামা তার হাতে দিয়ে দেয়া হবে। তাকে বলা হবে, তোমার জীবনের এই কার্যবিবরণী পড়ো। নিজের হিসেব নেবার জন্য তুমি নিজেই যথেষ্ট। (বনি ইসরাইল ১৪) মানুষ তা পড়ে অবাক হয়ে যাবে। কারণ ছোট বড় এমন কোন বিষয় নেই যা তাতে যথাযথভাবে সংযোজিত হয়নি। (আল কাহাফ-৪৯) এরপর হচ্ছে মানুষের নিজের শরীর। দুনিয়ায় এই শরীরের সাহায্যে সে সমস্ত কাজ করেছে। আল্লাহর আদালতে তার জিহবা সাক্ষ দেবে, সে দুনিয়ায় কি কি কথা বলেছে। তার পিন্জের হাত-পা সাক্ষ দেবে, তাদেরকে দিয়ে সে কোন কোন কাজ করিয়েছে। (আল মুরাফ-২৪) তার চোখজোড়া সাক্ষ দেবে। তার কান সাক্ষ দেবে, তার সাহায্যে সে কি কি কথা শুনেছে। তার শরীরের গায়ে লেপ্টে থাকা চামড়া তার যাবতীয় কাজের সাক্ষ দেবে। সে পেরেশান হয়ে নিজের অংগ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, তোমরাও আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ দিছো? তার অংগ-প্রত্যঙ্গ জবাব দেবে, আজ যে আল্লাহর হকুমে সমস্ত জিনিস চলছে তাঁরই হকুমে আমরাও চলছি। (হা-মীম সাজদাহ ২০ থেকে ২২) এর পরে আছে আরো অতিরিক্ত সাক্ষ। এই সাক্ষগুলো পেশ করা হবে যথীন ও তার চারপাশের সমগ্র পরিবেশ থেকে। সেখানে নিজের আওয়াজ মানুষ নিজের কানে শুনবে। নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি নিজের চোখেই দেখবে। এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে দেখা যাবে, মানুষের মনে যেসব চিন্তা, ইচ্ছা, সংকলন ও উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল এবং যেসব নিয়তের মাধ্যমে সে নিজের সমস্ত কাজ করেছিল, তাও সব সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। যেমন সামনে সূরা আদিয়াতে এ বিষয়ে আলোচনা আসছে। এ কারণে এবং এ ধরনের চূড়ান্ত ও জুলজ্যান্ত প্রমাণ সামনে এসে যাবার পর মানুষ অবাক ও নির্বাক হয়ে যাবে। নিজের পক্ষ থেকে ওজর পেশ করার কোন সুযোগই তার থাকবে না। (আল মুরসালাত ৩৫-৩৬)।

৫. এর দু'টো অর্থ হতে পারে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি একাকী তার ব্যক্তিগত অবস্থায় অবস্থান করবে। পরিবার, গোষ্ঠী, জোট, দল, সম্প্রদায় ও জাতি সব ভেঙে চুরমার হয়ে

যাবে। কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানেও একথা বলা হয়েছে। যেমন সূরা আন'আমে রয়েছে, সেদিন যহান আল্লাহ লোকদের বলবেন : “নাও, এখন তুমি এমনিতেই একাকী আমার সমনে হাজির হয়ে গেছো, যেমন আমি প্রথমবার তোমাকে সৃষ্টি করেছিলাম।” (১৪ আয়াত) আর সূরা মারযামে বলা হয়েছে : “একাকী আমার কাছে আসবে।” (৮০ আয়াত) আরো বলা হয়েছে : “তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে একাকী হাযির হবে।” (১৫ আয়াত) দুই, এর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, বিগত হাজার হাজার বছরে সমস্ত মানুষ যে যেখানে মরেছিল সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে দলে দলে চলে আসতে থাকবে। যেমন সূরা নাবায় বলা হয়েছে : “যে দিন শিংগায় ফুক দেয়া হবে, তোমরা দলে দলে এসে যাবে। (১৮ আয়াত) এ ছাড়া বিভিন্ন তাফসীরকার এর যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তার অবকাশ এখানে উল্লেখিত “আশতাতান” (أَشْتَان) শব্দের মধ্যে নেই। তাই আমার মতে সেগুলো এই শব্দটির অর্থগত সীমাচৌহদীর বাইরে অবস্থান করছে। যদিও বক্তব্য হিসেবে সেগুলো সঠিক এবং কুরআন ও হাদীস বর্ণিত কিয়ামতের অবস্থা ও ঘটনাবলীর সাথে সামঝস্য রাখে।

৬. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, তাদের আমল তাদেরকে দেখানো হবে। অর্থাৎ প্রত্যেকে দুনিয়ায় কি কাজ করে এসেছে তা তাকে বলা হবে। দুই, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিফল দেখানো হবে। যদিও **لِيُرَأَ أَعْمَالُهُمْ** এই দ্বিতীয় অর্থটিও গ্রহণ করা যেতে পারে তবুও যেহেতু আল্লাহ এখানে **لِيُرَأَ جِزَاءً أَعْمَالُهُمْ** (তাদের কাজের প্রতিফল দেখাবার জন্য) না বলে বলেছেন তাই সংগতভাবেই প্রথম অর্থটি এখানে অধাধিকার পাবে। বিশেষ করে যখন কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কাফের ও মুমিন, সৎকর্মশীল ও ফানেক, আল্লাহর হকুমের অনুগত ও নাফরমান সবাইকে অবশ্য তাদের আমলনামা দেয়া হবে। (উদ্বাহণ স্বরূপ দেখুন সূরা আল হাকার ১৯ ও ২৫ এবং সূরা আল ইনশিকাকের ৭-১০ আয়াত) একথা সুস্পষ্ট, কাউকে তার কার্যাবলী দেখিয়ে দেয়া এবং তার আমলনামা তার নিজের হাতে সোপার্ন করার মধ্যে কোন তফাত নেই। তাছাড়া যদীন যখন তার ওপর অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী পেশ করবে তখন হক ও বাতিলের যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ শুরু থেকে চলে আসছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে, তার সম্পূর্ণ চিত্রণ স্বার সামনে এসে যাবে। সেখানে সবাই দেখবে, সত্যের জন্য যারা কাজ করেছিল তারা কি কি কাজ করেছে এবং যিথার সমর্থকরা তাদের মোকাবেলায় কি কি কাজ করেছে। হিদায়াতের পথে আহবানকারী ও গোমরাহী বিস্তারকারীদের সমস্ত শুনবে, এটা কোন অসম্ভব কথা নয়। উভয়পক্ষের সমঞ্চ রচনা ও সাহিত্যের রেকর্ড অবিকল স্বার সামনে এনে রেখে দেয়া হবে। হকপাইদের শুপর বাতিল পাহাড়ের জুলুম এবং উভয় পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বন্দ্ব ও সংঘাতসমূহের দৃশ্যাবলী হাশরের ময়দানে উপস্থিত শোকের নিজেদের চোখেই দেখে নেবে।

৭. এটি হচ্ছে এর একটি সহজ সরল অর্থ। আবার একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, মানুষের অনু পরিমাণ নেকী বা পাপ এমন হবে না যা তার আমলনামায় লিখিত হবে না। তাকে সে অবশ্য দেখে নেবে। কিন্তু দেখে নেবার মানে যদি এই হয় যে, তার পূরক্ষার ও শাস্তি দেখে নেবে, তাহলে এর এ অর্থ নেয়া ভুল হবে যে, আখেরাতে প্রত্যেকটি সামান্যতম নেকীর

পূরঙ্গার এবং প্রত্যেকটি সামান্যতম পাপের শাস্তি প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেয়া হবে। আর কোন ব্যক্তিও সেখানে নিজের কোন নেকীর পূরঙ্গার থেকে বক্ষিত এবং পাপের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। কারণ তাই যদি হয় তাহলে প্রথমত এর মানে হবে, প্রত্যেকটি খারাপ কাজের শাস্তি এবং প্রত্যেকটি ভালো কাজের পূরঙ্গার আলাদা আলাদা দেয়া হবে। দ্বিতীয়ত এর মানে এও হবে, কোন উচ্চ পর্যায়ের সৎ ও মু'মিন কোন ক্ষুদ্রতম গোনাহর শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না। আর কোন জয়ন্ত্য কাফের, জালেম এবং পাপীও কোন ক্ষুদ্রতম সংক্রান্তের পূরঙ্গার না পেয়ে যাবে না। এ দু'টি অর্থ কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য বিরোধী এবং বৃদ্ধিও একে ইনসাফের দাবী বলে মেনে নিতে পারে না। বৃদ্ধির দৃষ্টিতে বিচার করলে একথা কেমন করে বোধগ্য হতে পারে যে, আপনার একজন কর্মচারী আপনার একান্ত অনুগত, বিষ্ণু ও নিবেদিত প্রাণ কিন্তু তার কোন সামান্যতম ত্রুটিও আপনি মাফ করেন না? তার প্রতিটি সেবা-কর্মের পূরঙ্গার দেবার সাথে সাথে তার প্রতিটি ত্রুটির জন্যও আপনি শুণে শুণে তাকে শাস্তি দেবেন? ঠিক তেমনি বুদ্ধির দৃষ্টিতে একথাও দুর্বোধ্য যে, আপনার অর্থ ও সাহায্য-সহযোগিতায় লালিত পালিত কোন ব্যক্তি যার প্রতি রয়েছে আপনার অসংখ্য অনুগ্রহ, সে আপনার সাথে বেসৈমানী ও বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং অনুগ্রহের জবাবে হামেশা নিমকহারামী করতে থাকে। কিন্তু আপনি তার সামগ্রিক কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গী উপেক্ষা করে তার প্রতিটি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্য তাকে পৃথক শাস্তি এবং তার ছোট-খাটো কোন সেবামূলক কাজের জন্য হয়তো সে কখনো আপনাকে খাবার জন্য এক গ্লাস পানি এনে দিয়েছিল বা কখনো আপনাকে পাখা দিয়ে বাতাস করে ছিল—আপনি তাকে আলাদাভাবে পূরঙ্গৃত করবেন আর কুরআন ও হাদীসের ব্যাপারে বলা যেতে পারে, সেখানে সুস্পষ্টভাবে মুমিন, মোনাফেক, কাফের, সৎ মু'মিন, গোনাহগার মু'মিন, জালেম ও ফাসেক মু'মিন, নিছক কাফের এবং জালেম ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফের ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লোকদের পূরঙ্গার ও শাস্তির জন্য একটি বিস্তারিত আইন বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই পূরঙ্গার ও শাস্তি মানুষের সম্প্রৱীননের ওপর পরিব্যাপ্ত।

এ প্রসংগে কুরআন মজীদ নীতিগতভাবে কয়েকটি কথা দ্যর্থহীন কঢ়ে বর্ণনা করে :

এক : কাফের, মুশরিক ও মোনাফেকের কর্মকাণ্ড (অর্থাৎ এমনসব কর্মকাণ্ড যেগুলোকে নেকী মনে করা হয়) নষ্ট করে দেয়া হয়েছে। আখেরাতে তারা এর কোন প্রতিদান পাবে না। এগুলোর যা প্রতিদান, তা তারা দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে। এ জন্য উদ্দাহরণ স্বরূপ দেখুন আল আরাফ ১৪৭, আত তাওবা ১৭, ৬৭-৬৯, হুদ ১৫-১৬, ইবরাহীম ১৮, আল কাহফ ১০৪-১০৫, আন নূর ৩৯, আল ফুরকান ২৩, আল আহ্যাব ১৯, আয় যুমার ৬৫ এবং আল আহকাফ ২০ আয়াত।

দুই : পাপের শাস্তি ততটুকু দেয়া হবে যতটুকু পাপ করা হয়। কিন্তু নেকীর পূরঙ্গার মূল কাজের তুলনায় বেশী দেয়া হবে। বরং কোথাও বলা হয়েছে প্রত্যেক নেকীর প্রতিদান দেয়া হবে দশগুণ। আবার কোথাও বলা হয়েছে, আল্লাহ নিজের ইচ্ছেমতো নেকীর প্রতিদান বাড়িয়ে দেবেন। দেখুন আল বাকারাহ ২৬১, আল আনআম ১৬০, ইউনুস ২৬-২৭, আন নূর ৩৮, আল কাসাস ৮৪, সাবা ৩৭ এবং আল মু'মিন ৪০ আয়াত।

তিনি : মু'মিন যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে থাকে তাহলে তার ছোট গোনাহগুলো মাফ করে দেয়া হবে। দেখুন আন নিসা ৩১, আশ' শূরা ৩৭ এবং আন নাজম ৩২ আয়াত।

চার : সৎ মু'মিনের কাছ থেকে হালকা হিসেবে নেয়া হবে। তার গোনাহগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। তার ভালো ও উত্তম আমলগুলোর দৃষ্টিতে বিচার করে তাকে প্রতিদান দেয়া হবে। দেখুন আনকাবুত ৭, আয়যুমার ৩৫, আল আহকাফ ১৬ এবং আল ইনশিকাক ৮ আয়াত।

হাদীসের বক্তব্য এ বিষয়টিকে একেবারে পরিষ্কার করে দেয়। ইতিপূর্বে সূরা ইনশিকাকের ব্যাখ্যায় কিছু হাদীস উল্লেখ করেছি। কিয়ামতের দিন হালকা ও কড়া হিসেবের বিষয়টিকে বুঝাবার জন্য রসূলগ্রাহ (সা) এ ব্যাখ্যা করেছেন। (এ জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল ইনশিকাক ৬ টাকা) হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার হ্যরত আবু বকর সিন্দীক (রা) রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আহার করছিলেন এমন সময় এই আয়াতটি নাফিল হয়। হ্যরত আবু বকর (রা) খাবার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। তিনি বলেন : “হে আল্লাহর রসূল! যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ আমি করেছি তার ফলও কি আমি দেখে নেবো?” জবাব দেন : “হে আবু বকর! দুনিয়ায় যেসব বিষয়েরই তুমি সম্মুখীন হও তার মধ্যে যেগুলো তোমার কাছে অপছন্দনীয় ও অপ্রীতিকর ঠিকে সেগুলোই তুমি যেসব অণু পরিমাণ অসৎকাজ করেছে তার বদলা এবং যেসব অণু পরিমাণ নেকীর কাজই তুমি করো সেগুলো আল্লাহ আখেরাতে তোমার জন্য সংরক্ষণ করে রাখছেন।” (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, বাইহাকী ফিশ শু'আব, ইবনুল মুন্দির, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও আবদ ইবনে হমাইদ) এই আয়াতটি সম্পর্কে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু আইউব আনসারীকেও বলেছিলেন : “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই নেকী করবে তার পুরস্কার সে পাবে আখেরাতে। আর যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ করবে বিপদ-আপদ ও রোগের আকারে এই দুনিয়ায় তার শাস্তি পেয়ে যাবে।” (ইবনে মারদুইয়া)। কাতাদাহ হ্যরত আনসারীর (রা) বরাত দিয়ে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি উচ্ছৃত করেছেন : “আল্লাহ মু'মিনের প্রতি জ্ঞান করেন না। দুনিয়ায় তার নেকীর প্রতিদানে তাকে রিয়িক দান করেন এবং আখেরাতে আবার এর পুরস্কার দেবেন। আর কাফেরের ব্যাপারে দুনিয়ায় তার সৎকাজের প্রতিদান দিয়ে দেন, তারপর যখন কিয়ামত হবে তখন তার খাতায় কোন নেকী লেখা থাকবে না।” (ইবনে জারীর) মাসরুক হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন : তিনি রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, “আবদুল্লাহ ইবনে জুদ'আন জাহেলী যুগে আত্মীয়দের সাথে সংঘবহার করতো, যিসকিনকে আহার করাতো, মেহমানদের আপ্যায়ন করতো, বন্দিদের মুক্তিদান করতো। আখেরাতে এগুলো কি তার জন্য উপকারী হবে?” রসূলগ্রাহ (সা) জবাব দেন, “না, সে মরার সময় পর্যন্ত একবারও বলেনি, **رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطَّيْتِي يَوْمَ الدِّينِ**।” (ইবনে জারীর) অন্যান্য আরো কিছু লোকের ব্যাপারেও রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই একই জাবাব দেন। তারাও জাহেলী যুগে সৎকাজ করতো কিন্তু কাফের ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কোন বাণী থেকে জানা

যায়, কাফেরের সৎকাজ তাকে জাহানামের আয়াব থেকে রক্ষা করতে পারবে না ঠিকই তবে জালেম, ফাসেক ব্যতিচারী কাফেরকে জাহানামে যে ধরনের কঠিন শাস্তি দেয়া হবে তার শাস্তি তেমনি পর্যায়ের হবে না। যেমন হাদীসে বলা হয়েছে : হাতেম তাই-এর দানশীলতার কারণে তাকে হালকা আয়াব দেয়া হবে। (রহল মা'আনী)।

তবুও এ আয়াতটি মানুষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের ব্যাপারে সজ্ঞাগ করে দেয়। সেটি হচ্ছে, প্রত্যেকটি সামান্যতম ও নগণ্যতম সৎকাজেরও একটি ওজন ও মূল্য রয়েছে এবং অনুরূপ অবস্থা অসৎকাজেরও। অর্থাৎ অসৎকাজ যত ছোটই হোক না কেন অবশ্যি তার হিসেব হবে এবং তা কোনক্রমেই উপেক্ষা করার মতো নয়। তাই কোন ছোট সৎকাজকে ছেট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ এই ধরনের অনেক সৎকাজ মিলে আল্লাহর কাছে একটি অনেক বড় সৎকাজ গণ্য হতে পারে। অনুরূপভাবে কোন ছোট ও নগণ্য অসৎকাজও না করা উচিত। কারণ এই ধরনের অনেকগুলো ছোট গোনাহ একত্র হয়ে একটি বিরাট গোনাহের স্থূল জমে উঠতে পারে। একথাটিই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাদীসে ব্যক্ত করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে হ্যরত আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “জাহানামের আশুন থেকে বৌচো—তা এক টুকরা খেজুর দান করার বা একটি ভালো কথা বলার বিনিময়েই হোক না কেন” হ্যরত আদী ইবনে হাতেম থেকে সহীহ রেওয়ায়াতের মাধ্যমে আরো বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “কোন সৎকাজকেও সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, যদিও তা কোন পানি পানেছু ব্যক্তির পাত্রে এক মগ পানি ঢেলে দেয়াই হয় অথবা তোমার কোন ডাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করাই হয়।” বুখারী শরীফে হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেয়েদেরকে সংশোধন করে বলেছেন : “হে মুসলিম মেয়েরা! কোন প্রতিবেশী তার প্রতিবেশনীর বাড়িতে কোন জিনিস পাঠানোকে সামান্য ও নগণ্য মনে করো না, তা ছাগলের পায়ের একটি খুর হলেও।” মুসলাদে আহমাদ, নাসাই ও ইবনে মাজাহ-এ হ্যরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত উদ্ভৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “হে আয়েশা! যেসব গোনাহকে ছোট মনে করা হয় সেগুলো থেকে দূরে থাকো। কারণ আল্লাহর দরবারে সেগুলো সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।” মুসলাদে আহমাদে হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) বর্ণনা উদ্ভৃত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : “সাবধান, ছোট গোনাহসমূহ থেকে নিজেকে রক্ষা করো। কারণ সেগুলো সব মানুষের ওপর একত্র হয়ে তাকে ধ্বংস করে দেবে।” (গোনাহ কবীরা ও গোনাহ সগীরার পার্থক্য বুধার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আননিসা ৫৩ টিকা ও আন নাজম ৩২ টিকা)।

আল আদিয়াত

১০০

নামকরণ

প্রথম শব্দ আল আদিয়াতকে (الْعَدِيَّاتِ) এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

এই সূরাটির মক্কী বা মাদানী ইওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। ইয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), জাবের (রা), হাসান বসরী, ইকবারা ও আতা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হয়রত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও কাতাদাহ একে মাদানী সূরা বলেন। অন্যদিকে হয়রত ইবনে আবাস (রা) থেকে দুই ধরনের মত উক্ত হয়েছে। তাঁর একটি মত হচ্ছে এটি মক্কী সূরা এবং অন্য একটি বক্তব্যে তিনি একে মাদানী সূরা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সূরার বক্তব্য ও বর্ণনাভঙ্গী পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি কেবল মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী যুগেরও প্রথম দিকে নামিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মানুষ আখেরাতকে অধীকার করে অথবা তা থেকে গাফেল হয়ে কেমন নৈতিক অধিপাতে যায় একথা লোকদের বুঝানোই এই সূরাটির উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে আখেরাতে কেবল মানুষের বাইরের কাজকর্মই নয়, তাদের মনের গোপন কথাগুলোও যাচাই-বাচাই করা হবে, এ সম্পর্কেও এই সূরায় তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

এ উদ্দেশ্যে আরবে সাধারণভাবে যে বিশ্বখনা ছড়িয়ে ছিল এবং যার ফলে সমগ্র দেশবাসীর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তাকে যুক্তি ও ধৰ্মাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সারা দেশের চতুর্দিকে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চলছিল। শৃষ্টন, রাহজানী, এক গোত্রের প্রপর অন্য গোত্রের আকর্ষিক আক্রমণের মাধ্যমে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। রাতে কোন ব্যক্তিও নিষিদ্ধে চলাক্ষেত্র করতে পারতো না। কারণ সবসময় আঁশঁকা থাকতো, এই বুবি কোন দুশ্মন অতি প্রত্যুষে তাদের জনপদ আক্রমণ করে বসলো। দেশের এই অবস্থার কথা আরবের সবাই জানতো। তারা এর ক্ষতি ও অনিষ্ট সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ছিল। যার সবকিছু শুষ্ঠিত হতো, সে এ অবস্থার জন্য মাত্রম করতো এবং যে শৃষ্টন করতো সে আনন্দে উৎসুক হতো। কিন্তু এই শৃষ্টনকারী আবার যখন শুষ্ঠিত হতো, তখন সেও অনুভব করতো, এ কেমন খারাপ অবস্থার মধ্যে কেমন দুর্বিসহ জীবন আমরা যাপন করে চলেছি।

এ পরিস্থিতির ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং সেখানে আল্লাহর সামনে জবাদিহি করার ব্যাপারে অঙ্গতার কারণে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছে। সে আল্লাহর দেয়া ক্ষমতাগুলোকে জ্ঞান-নিশ্চীড়নের কাজে ব্যবহার করছে। সে ধন-সম্পদের প্রেমে অন্ধ হয়ে তা অর্জন করার জন্য যে কোন অন্যায়, অসৎ ও গার্হিত পছ্টা অবলম্বন করতে কৃষ্ণিত হয় না। তা অবশ্য নিজেই সাক্ষ দিচ্ছে, সে নিজের রবের দেয়া শক্তিগুলোর অপব্যবহার করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাইনতার প্রকাশ করছে। যদি সে সেই সময়ের কথা জানতো যখন কবর থেকে জীবিত হয়ে আবার উঠতে হবে এবং যেসব ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও স্বার্থপ্রবণাতায় উদ্ভুদ্ধ হয়ে সে দুনিয়ায় নানান ধরনের কাজ করেছিল সেগুলোকে তার মনের গভীর তলদেশ থেকে বের করে এনে সামনে রেখে দেয়া হবে, তাহলে সে এই দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মনীতি কখনই অবলম্বন করতে পারতো না। দুনিয়ায় কে কি করে এসেছে এবং কার সাথে কোন ধরনের ব্যবহার করা উচিত মানুষের রব সে সময় সেকথা খুব ভালোভাবেই জানবেন।

আয়াত ১১

সুরা আল আদিয়াত-মৰী

রক' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রম করশামৰ মেহেবান আল্লাহর নামে

وَالْعَلِيُّ بِإِصْبَاحٍ فَالْمُوْرِبٌ قَلْحًا فَالْمُغِيرٌ صَبَاحًا
 فَأَثْرَنَ بِهِ نَقْعًا فَوْسَطَنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ
 وَإِنَّهُ عَلَى ذِلْكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِكُبِّ الْخَيْرِ لَشَرِّيْنَ

কসম সেই (ঘোড়া) শুলোর যারা হেষারব সহকারে দৌড়ায়।^১ তারপর (খুরের আঘাতে) আগুনের ফুলকি বরায়।^২ তারপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় প্রভাতকালে।^৩ তারপর এ সময় ধূলা উড়ায় এবং এ অবস্থায় কোন জনপদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আসলে মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ।^৪ আর সে নিজেই এর সাক্ষী।^৫ অবশ্য সে ধন-দোলতের মোহে খুব বেশী মন্ত।^৬

১. দৌড়ায় শব্দের মাধ্যমে যে এখানে ঘোড়া বুঝানো হয়েছে আয়াতের শব্দগুলো থেকে একথা মোটেই স্পষ্ট নয়। বরং এখানে শুধু বলা হয়েছে অর্থাৎ “কসম তাদের যারা দৌড়ায়।” এ কারণে কারা দৌড়ায় এ ব্যাপারে মুফারিসিরগণের মধ্যে বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে। সাহাবী ও তাবেঙ্গণের একটি দল বলেছেন, ঘোড়া এবং অন্য একটি দল বলেছেন উট। কিন্তু যেহেতু দৌড়াবার সময় বিশেষ আওয়াজ, যাকে প্রস্তুত (হেষারব) বলা হয়, একমাত্র ঘোড়ার মুখ দিয়েই দ্রুত শাস-প্রশাস চলার কারণে বের হয় এবং পরের আয়াতগুলোতে অযি ফুলিণ ঝরাবার, খুব সকালে কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ চালাবার এবং সেখানে ধূলা উড়াবার কথা বলা হয়েছে, আর এগুলো একমাত্র ঘোড়ার সাথেই খাপ খায়, তাই অধিকাংশ গবেষক একে ঘোড়ার সাথেই সংশ্লিষ্ট করেছেন। ইবনে জায়ির বলেন, “এ ব্যাপারে যে দু’টি বক্তব্য পাওয়া যায় তার মধ্যে ঘোড়া দৌড়ায় এই বক্তব্যটি অগাধিকার লাভের যোগ্য। কারণ উট হেষারব করে না, ঘোড়া হেষারব করে। আর আল্লাহ বলেছেন, যারা হেষারব করে দৌড়ায় তাদের কসম।” ইমাম রাজী বলেন, “এই আয়াতগুলোর বিভিন্ন শব্দ টিক্কার করে চলছে, এখানে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে। কারণ ঘোড়া ছাড়া আর কেউ হেষারব করে না! আর আগুনের ফুলিণ ঝরাবার কাজটিও পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আঘাতেই সম্পর্ক হয়। এ ছাড়া অন্য কোন জবেই তা হতে পারে না। অন্য দিকে খুব সকালে আক্রমণ চালাবার কাজটিও অন্য কোন প্রাণীর তুলনায় ঘোড়ার সাহায্যে সম্পর্ক করাই সহজতর হয়।”

২. আগনের ফুলকি ঝরায় ইত্যাকার শব্দগুলো একথাই প্রকাশ করে যে, রাত্রিকালে ঘোড়া দৌড়ায়। কারণ তাদের পায়ের খুর থেকে যে আগনের ফুলকি ঝরে তা রাতের বেলায়ই দেখতে পাওয়া যায়।

৩. আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন জনপদে অতর্কিত আক্রমণ করতে হলে তারা রাতের আঁধারে বের হয়ে পড়তো। এর ফলে শক্রপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্ক হতে পারতো না। এভাবে একেবারে খুব সকালে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। প্রভাতে আলো যেটুকু ছড়িয়ে পড়তো তাতে তারা সবকিছু দেখতে পেতো। আবার দিনের আলো খুব বেশী উজ্জ্বল না হবার কারণে প্রতিপক্ষ দূর থেকে তাদের আগমন দেখতে পেতো না। ফলে তারা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করতে পারতো না।

৪. রাতের বেলা হেষারব করে আগনের ফুলকি ঝরাতে যেসব ঘোড়া দৌড়ায়, তারপর খুব সকালে ধূলি উড়িয়ে কোন জনপদে ঢ়াও হয় এবং প্রতিরোধকারীদের ভীড়ের মধ্যে চুকে পড়ে, সেসব ঘোড়ার কসম খাওয়া হয়েছে যে কথাটি বলার জন্য এটিই সেই কথা। অধিকাখ্য তফসীরকার এই ঘোড়া বলতে যে ঘোড়া বুঝিয়েছেন তা দেখে অবাক হতে হয়। জিহাদকারী গায়ীদের ঘোড়াকে তারা এই ঘোড়া বলে চিহ্নিত করেছেন এবং যে ভীড়ের মধ্যে এই ঘোড়া প্রবেশ করে তাকে তারা কাফেরদের সমাবেশ মনে করেছেন। অর্থাৎ “মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ” এ কথাটির ওপরই কসম খাওয়া হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট, আল্লাহর পথে জিহাদকারী গায়ীদের ঘোড়ার দৌড়াদৌড়ি এবং কাফেরদের কোন দলের ওপর তাদের ঝাঁপিয়ে পড়ায় একথা বুঝায় না যে মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আর মানুষ নিজেই তার এই অকৃতজ্ঞতার সাক্ষী এবং সে ধন-দৌলতের মোহে বিগুলভাবে আক্রান্ত—এই গরবতী বাক্যগুলোও এমন সব লোকদের সাথে খাপ খায় না যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বের হয়। তাই নিশ্চিতভাবে একথা মনে নিতে হবে যে, এই সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াতে যে কসম খাওয়া হয়েছে তা সে সময়ের আরবে সাধারণভাবে যে লুটরাজ, ইত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত চলছিল সেদিকেই ইংগিত করছে। জাহেলী যুগে রাতগুলো হতো বড়ই ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র ও জনপদের লোকেরা আশংকা করতো, না জানি রাতের আঁধারে তাদের ওপর কোন দুশ্মন ঢ়াও হবার জন্য ছুটে আসছে। আর দিনের আলো প্রকাশিত হবার সাথে সাথে তারা নিশ্চিত হতো। কারণ রাতটা নির্বন্ধনাটে ও ভালোয় ভালোয় কেটে গেছে। সেখানে গোত্রে গোত্রে কেবলমাত্র প্রতিশোধমূলক লড়াই হতো না। বরং এক গোত্র আর এক গোত্রের ওপর আক্রমণ চালাতো তার ধন-দৌলত লুটে নেবার, তার উট, ডেড়া ইত্যাদি পশু কেড়ে নেবার এবং তার মেয়েদের ও শিশুদের গোলাম বানাবার জন্য। এসব লুটরাজ ও জুলুম নিপীড়ন করা হতো সাধারণত ঘোড়ায় চড়ে। মানুষ যে তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ এই বক্তব্যের সপক্ষে এ বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। অর্থাৎ যে শক্তিকে তারা ব্যয় করছে লুটরাজ, হানাহানি, খুন-খারাবি ও যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য সে শক্তি তো আল্লাহ তাদেরকে মৃত এ কাজে ব্যয় করার জন্য দেননি। কাজেই আল্লাহর দেয়া এ উপকরণ ও শক্তিগুলোকে আল্লাহর সবচেয়ে বেশী অঙ্গিয় যে দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করা তার পিছনে ব্যয় করা তাঁর প্রতি সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بَعْثَرَ مَا فِي الْقُبُورِ^١ وَ حَصَلَ مَا فِي الصُّورِ^٢
 إِنَّ رَبَّهُمْ يَهْرِبُونَ^٣ لِحَبْرٍ^٤

তবে কি সে সেই সময়ের কথা জানে না যখন কবরের মধ্যে যা কিছু (দাফন করা) আছে সেসব বের করে আনা হবে^১ এবং বুকের মধ্যে যা কিছু (লুকানো) আছে সব বের করে এনে যাচাই করা হবে^২ অবশ্য সেদিন তাদের রব তাদের সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত থাকবেন।^৩

৫. অর্থাৎ তার বিবেক এর সাক্ষী। আবার অনেক কাফের নিজ মুখেই প্রকাশ্যে এই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কারণ তাদের মতে আদতে আল্লাহর কোন অস্তিত্বই নেই। সে ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতি তাঁর কোন অনুগ্রহের স্বীকৃতি দেয়া এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অপরিহার্য করার কোন প্রয়োজন ওঠে না।

৬. কুরআনের মূল শব্দগুলো হচ্ছে : **وَإِنَّهُ لِحَبْرٌ لَشَدِيدٌ** : এর শাস্তিক তরজমা হচ্ছে, “সে তালোর প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।” কিন্তু আরবী ভাষায় ‘খাইর’ শব্দটি কেবলমাত্র ভালো ও নেকীর প্রতিশব্দ হিসেবেই ব্যবহৃত হয় না বরং ধন-দোলত অর্থেও এর ব্যবহার প্রচলিত। সূরা আল বাকারার ১৮০ আয়াতে “খাইর” শব্দটি ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বক্তব্যের প্রেক্ষাপট ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে কোথায় এ শব্দটি নেকী অর্থে এবং কোথায় ধন-সম্পদ অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তা অনুধাবন করা যায়। এই আয়াতটির পূর্বাপর আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে যে, এখানে “খাইর” বলতে ধন-সম্পদ বুঝানো হয়েছে, নেকী বুঝানো হয়নি। কারণ যে ব্যক্তি নিজের রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজের অকৃতজ্ঞতার সমক্ষে সাক্ষ পেশ করছে তার ব্যাপারে কখনো একথা বলা যেতে পারে না যে, সে নেকী ও সৎবৃত্তির প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করে।

৭. অর্থাৎ মরা মানুষ যেখানে যে অবস্থায় আছে সেখান থেকে তাকে বের করে এনে জীবিত মানুষের আকারে দৌড় করানো হবে।

৮. অর্থাৎ বুকের মধ্যে যেমন ইচ্ছা ও নিয়ত, স্বার্থ ও উদ্দেশ্য, চিন্তা, তাৎক্ষণ্য এবং বাহ্যিক কাজের পেছনে যেসব গোপন অভিপ্রায় (Molives) লুকিয়ে আছে সেসব খুলে সামনে রেখে দেয়া হবে। সেগুলো যাচাই বাছাই করে ভালো ও খারাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে দেয়া হবে। অন্য কথায় শুধুমাত্র বাইরের চেহারা দেখে মানুষ প্রতিবে যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দেয়া হবে না। বরং মনের মধ্যে লুকানো রহস্যগুলোকে বাইরে বের করে এনে দেখা হবে যে, মানুষ যেসব কাজ করেছে তার পেছনে কি উদ্দেশ্য ও স্বার্থ-প্রেরণা লুকিয়েছিল। এ বিষয়টি চিন্তা করলে মানুষ একথা স্বীকার না করে পারে না যে, আসল ও পূর্ণাঙ্গ ইনসাফ একমাত্র আল্লাহর আদালত ছাড়া আর কোথাও কায়েম হতে পারে না। নিছক বাইরের কাজকর্ম দেখে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়া যায় না বরং কি উদ্দেশ্যে সে এ কাজ করেছে তাও দেখতে হবে। দুনিয়ার ধর্মহীন

অইন ব্যবস্থাগুলোও নীতিগতভাবে একথা জরুরী মনে করে। তবে নিয়ত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে তার সঠিক চেহারা সনাত্ত করার মতো উপকরণ দুনিয়ার কোন আদালতেরও নেই। একমাত্র আগ্নাহই এ কাজ করতে পারেন। একমাত্র তিনিই মানুষের প্রত্যেকটি কাজের বাইরের চেহারার পেছনে যে গোপন প্রেরণা ও উদ্বীপনা সক্রিয় থাকে তা যাচাই করে সে কোন্ত ধরনের পুরুষের বা শাস্তির অধিকারী হতে পারে তা নির্ধারণ করতে পারেন। তাছাড়া আয়াতের শব্দাবলী থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মনের তেতরে, ইচ্ছা, সংকল্প ও নিয়ত সম্পর্কে আগ্নাহ পূর্বাহ্নেই যে জ্ঞান রাখেন নিছক তার ভিত্তিতে এ ফায়সালা হবে না। বরং কিয়ামতের দিন এ রহস্যগুলো উন্মুক্ত করে সবার সামনে রেখে দেয়া হবে এবং প্রকাশ্য আদালতে যাচাই ও পর্যালোচনা করে এর কৃতটুকু **حَصْلَ مَا فِي** ভাস্তু ও কৃতটুকু খারাপ ছিল তা দেখিয়ে দেয়া হবে। এজন্য এখানে **الصَّدَرُ** বলা হয়েছে। কোন জিনিসকে বের করে বাইরে নিয়ে আসাকে ‘হস্রিলা’ বা ‘তাহসীল’ বলে। যেমন, বাইরের ছাল বা খোসা ছাড়িয়ে তেতরের মগজ বের করা। এভাবে বিভিন্ন ধরনের জিনিসকে ছেটে পরম্পর থেকে আলাদা করার জন্যও এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কাজেই মনের মধ্যে দুকানো রহস্যসমূহের ‘তাহসীল’ বা বের করে আনার মধ্যে এ দু’টি অর্থই শামিল হবে। সেগুলোকে খুলে বাইরে বের করে দেয়াও হবে আবার সেগুলো ছেটে ভালো ও মন্ত্র আলাদা করে দেয়াও হবে। এ বক্তব্যাটিই সূরা আত তারিকে এভাবে বলা হয়েছে : “যেদিন গোপন রহস্য যাচাই বাছাই করা হবে।” (৯ আয়াত)।

৯. অর্থাৎ কে কি এবং কে কোন্ত ধরনের শাস্তি বা পুরুষারের অধিকারী তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানবেন।

আল কারিংআহ

১০১

নামকরণ

প্রথম শব্দ **الْقَارِئُ**-কে এর নাম গণ্য করা হয়েছে। এটা কেবল নামই নয় বরং এর বক্তব্য বিষয়ের শিরোনামও। কারণ এর মধ্যে শুধু কিয়ামতের কথাই বলা হয়েছে।

নামিসের সময়-কাল

‘এর মক্কী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। বরং এর বক্তব্য বিষয় থেকে প্রকাশ হয়, এটিও যক্কা মু’আয়মার প্রথম ঘূঢ়ে নামিল হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এর বিষয়বস্তু হচ্ছে কিয়ামত ও আখেরাত। সর্বপ্রথম লোকদেরকে একটি মহাদুর্ঘটনা। বলে আতঙ্কিত করে দেয়া হয়েছে, কি সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহাদুর্ঘটনাটি কী? এভাবে শ্রোতাদেরকে একটি ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হবার খবর শোনার জন্য প্রস্তুত করার পর দু’টি বাক্যে তাদের সামনে কিয়ামতের নকশা এঁকে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সেদিন লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এমনভাবে চারদিকে দৌড়ানোড়ি করতে থাকবে যেমন প্রদীপের আলোর চারদিকে পতংগরা নির্ণিতভাবে ছুটাছুটি করতে থাকে। পাহাড়গুলো সমূলে উৎপাটিত হয়ে স্থানচ্ছত্র হবে। তাদের বৌধন থাকবে না। তারা তখন হয়ে যাবে ধূনা পশমের মতো। তারপর বলা হয়েছে, আখেরাতে লোকদের কাজের হিসেব নিকেশ করার জন্য যখন আল্লাহর আদালত কার্যম হবে তখন কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে ভারী এবং কার সৎকাজ তার অসৎকাজের চাইতে ওজনে হালকা, এরি ভিত্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম ধরনের লোকেরা আরামের ও সুন্দর জীবন সাড় করে আনন্দিত হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের লোকদেরকে এমন গভীর গর্জের মধ্যে ফেলে দেয়া হবে যেগুলো থাকবে শুধু আগুনে ভরা।

আয়াত ১১

সূরা আল কারি'আহ-মক্কী

৩-৪

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرِكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمٌ يَكُونُ
 النَّاسُ كَالْفَرَائِسِ الْمَبْتُوْثِ ۝ وَتَكُونُ الْجِبَائُلُ كَالْعِهْمِ
 الْمَنْفُوشِ ۝ فَآمَانَ تَقْلِيْتُ مَوَازِيْنَهُ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَاضِيَةٍ ۝ وَأَمَا مَنْ خَفَتْ مَوَازِيْنَهُ ۝ فَأَمَّا هَاوِيَةٌ ۝ وَمَا
 أَدْرِكَ مَا هَيَّهُ ۝ نَارَ حَامِيَةٍ ۝

মহাদুর্ঘটনা^১ কী সেই মহাদুর্ঘটনা? তুমি কী জানো সেই মহাদুর্ঘটনাটি কি? সেদিন যখন লোকেরা ছড়িয়ে থাকা পতঙ্গের মতো এবং পাহাড়গুলো রং বেরঙের ধূনা পশ্চের মতো হবে।^২ তারপর^৩ যার পাত্রা ভারী হবে সে মনের মতো সুখী জীবন লাভ করবে আর যার পাত্রা হালকা হবে^৪ তার আবাস হবে গভীর খাদ।^৫ আর তুমি কী জানো সেটি কি? (সেটি) জ্বলন্ত আগুন।^৬

১. কুরআনের মূল শব্দ হচ্ছে "কা-রিঞ্চাহ" এর শাদিক অর্থ হচ্ছে, "যে ঠোকে"। কারা'আ' মানে কোন জিনিসকে কোন জিনিসের ওপর এমন জোরে মারা যাব ফলে তা থেকে প্রচণ্ড আওয়াজ হয়। এই শাদিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ত্যাবহ দুর্ঘটনা ও বড় রকমের মারাত্মক বিপদের ক্ষেত্রে "কারি'আহ" শব্দ বলা হয়ে থাকে। যেমন আরবরা বলে, ধরনের মুসিবত নায়িল হ্ববার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা রা�'আদে বলা হয়েছে: "وَلَا يَرَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصْبِبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً" "যারা কুফরী করেছে তাদের ওপর তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে কোন না কোন বিপদ নায়িল হতে থাকে।" (৩১ আয়াত) কিন্তু এখানে "আল কারি'আহ" শব্দটি কিয়ামতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আবার সূরা আল হা-কায় কিয়ামতকে এই শব্দটি দিয়েই চিহ্নিত করা

হয়েছে। (আয়াত ৪) এখানে একথাটিও সামনে রাখতে হবে যে, এখানে কিয়ামতের প্রথম পর্যায় থেকে নিয়ে শেষ পর্যায় পর্যন্ত পুরো আখেরাতের আলোচনা একসাথে করা হচ্ছে।

২. এ পর্যন্ত কিয়ামতের প্রথম পর্যায়ের আলোচনা চলেছে। অর্থাৎ যখন মহাদুর্ঘটনা ঘটে যাবে। আর এর ফলে সারা দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে যেমন আলোর উপর বাঁশিয়ে পড়া পতংগরা চারদিকে বিস্কঙ্গভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। পাহাড়গুলো রং বেরভের ঝুনা পশ্চমের মতো উড়তে থাকবে। পাহাড়গুলোর রং বিভিন্ন ইওয়ার কারণে আসলে তাদেরকে রং বেরভের পশ্চমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

৩. এখান থেকে কিয়ামতের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। লোকেরা পুনর্বার জীবিত হয়ে আল্লাহর আদালতে হায়ির হবার পর থেকে এই পর্যায়টির শুরু।

৪. মূলে মাওয়ায়ীন (مَوْلَىْنِ) ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটি মাওয়ুন (مَوْلَانِ) এর বহুবচন হতে পারে। আবার মীয়ান (مَيْرَانِ) এরও বহুবচন হতে পারে। যদি এটি মাওয়ুনের বহুবচন হয় তাহলে “মাওয়ায়ীন” অর্থ হবে এমন ধরনের কর্মকাণ্ড, আল্লাহর দৃষ্টিতে যার কোন উজ্জন আছে এবং যা তার কাছে কোন ধরনের মর্যাদালাভের যোগ্যতা রাখে। আর যদি একে মীয়ানের বহুবচন গণ্য করা হয় তাহলে মাওয়ায়ীন অর্থ হবে দৌড়িগাল্লার পাঞ্চ। প্রথম অবস্থায় মাওয়ায়ীনের ভারী বা হালকা হবার মানে হবে অসংকর্মের মোকাবেলায় সংকর্মের ভারী বা হালকা হওয়া। কারণ আল্লাহর দৃষ্টিতে কেবলমাত্র সংক্রান্ত ভারী ও মূল্যবান। দ্বিতীয় অবস্থায় মাওয়ায়ীনের ভারী হবার মানে হয় মহান আল্লাহর আদালতে নেকীর পাঞ্চ পাপের পাঞ্চার তুলনায় বেশী ভারী হওয়া। আর এর হালকা হবার মানে হয় নেকীর পাঞ্চ পাপের পাঞ্চার তুলনায় হালকা হওয়া। এছাড়া আরবী ভাষায় মীয়ান শব্দ উজ্জন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আর এই অর্থের দৃষ্টিতে উজ্জনের ভারী ও হালকা হবার মানে হয় নেকীর উজ্জন ভারী বা হালকা হওয়া। যাহোক মাওয়ায়ীন শব্দটি মাওয়ুন, মীয়ান বা উজ্জন যে কোন অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন সব অবস্থায়ই প্রতিপাদ্য একই থাকে এবং সেটি হচ্ছে : মানুষ আমলের যে পূজি নিয়ে আল্লাহর আদালতে আসবে তা ভারী না হালকা, অথবা মানুষের নেকী তার পাপের চেয়ে উজ্জনে বেশী না কর—এরি ভিস্তিতে সেখানে ফায়সালা অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়টি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সেগুলো সব সামনে রাখলে এর অর্থ পুরোপূরি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। সূরা আরাফে বলা হয়েছে : “আর উজ্জন হবে সেদিন সত্য। তারপর যাদের পাঞ্চ ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের পাঞ্চ হালকা হবে তারাই নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।” (৮-৯ আয়াত) সূরা কাহাফে বলা হয়েছে : “হে নবী! এই লোকদেরকে বলে দাও, আমি কি তোমাদের জানাবো নিজেদের আমলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ করার? তারাই ব্যর্থ যাদের দুনিয়ার জীবনে সমস্ত কর্মকাণ্ড সত্য-সঠিক পথ থেকে বিচুত থেকেছে এবং যারা মনে করতে থেকেছে, তারা সবকিছু ঠিক করে যাচ্ছে। এই লোকেরাই তাদের রবের আয়াত মানতে অশ্বিকার করেছে এবং তাঁর সামনে হায়ির হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের সমস্ত আশল নষ্ট হয়ে গেছে। কিয়ামতের দিন আমি তাদের কোন উজ্জন দেবো না।” (১০৪-১০৫ আয়াত) সূরা আরিয়ায় বলা হয়েছে : “কিয়ামতের দিন আমি যথাযথ

ওজন করার দাঁড়িপাত্রা রেখে দেবো। তারপর কারো ওপর অণু পরিমাণও জুলুম হবে না। যার সরিয়ার দানার পরিমাণও কোন কাজ থাকবে তাও আমি সামনে আনবো এবং হিসেব করার জন্য আমি যথেষ্ট।” (৪৭ আয়াত) এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায়, কুফরী করা এবং সত্যকে অঙ্গীকার করা বৃহত্তম অসৎকাজের অন্তরভুক্ত। গুনাহের পাত্রা তাতে অনিবার্যভাবে তারী হয়ে যায়। আর কাফেরের এমন কোন নেকী হবে না নেকীর পাত্রায় যার কোন ওজন ধরা পড়ে এবং তার ফলে পাত্রা ঝুকে পড়তে পারে। তবে মু’মিনের পাত্রায় ইমানের ওজনও হবে এবং এই সংগে সে দুনিয়ায় যেসব নেকী করেছে সেগুলোর ওজনও হবে। অন্যদিকে তার সমস্ত গোনাহ গোনাহের পাত্রায় রেখে দেয়া হবে। তারপর নেকীর পাত্রা ঝুকে আছে না গোনাহের পাত্রা ঝুকে আছে, তা দেখা হবে।

৫. মূল শব্দ হচ্ছে “তার মা হবে হাবিয়া।” হাবিয়া (هَابِيَّةً) শব্দটি এসেছে হাওয়া (هواء) থেকে। এর অর্থ হচ্ছে উচ্চ জায়গা থেকে নীচুতে পড়ে যাওয়া। আর যে গভীর গর্তে কোন জিনিস পড়ে যায় তাকে হাবিয়া বলে। জাহানামকে হাবিয়া বলার কারণ হচ্ছে এই যে, জাহানাম হবে অত্যন্ত গভীর এবং জাহানামবাসীদেরকে তার মধ্যে ওপর থেকে নিষ্কেপ করা হবে। আর তার মা হবে জাহানাম একথা বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের কোল যেমন শিশুর অবস্থান হয় তেমনি জাহানামবাসীদের জন্য জাহানাম ছাড়া আর কোন অবস্থান হবে না।

৬. অর্থাৎ সেটি শুধুমাত্র একটি গভীর খাদ হবে না বরং জুলত আণন্দেও পরিপূর্ণ হবে।

আত তাকাসুর

১০২

নামকরণ

প্রথম শব্দ আততাকাসুরকে (الْتَّكَاثُرُ) এই সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

আবু হাইয়ান ও শওকানী বলেন, সকল তাফসীরকার একে মক্কী সূরা গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম সুযুতির বক্তব্য হচ্ছে, মক্কী সূরা হিসেবেই এটি বেশী খাতি অর্জন করেছে। কিন্তু কিছু বর্ণনায় একে মাদানী সূরা বলা হয়েছে। যেমন :

ইবনে আবু হাতেম আবু বুরাইদার (রা) রেওয়ায়াত উন্নত করেছেন। তাতে বলা হয়েছেঃ বনী হারেসা ও বনিল হারস নামক আনসারদের দু'টি গোত্রের ব্যাপারে এ সূরাটি নাযিল হয়। উভয় গোত্র প্রস্তরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রথমে নিজেদের জীবিত লোকদের গৌরব গীথা বর্ণনা করে। তারপর কবরস্তানে গিয়ে মৃত লোকদের গৌরবগীথা বর্ণনা করে। তাদের এই আচরণের ফলে আল্লাহর এই বাণী **الْكِفْلُ لِلْكَاثِرِ** নাযিলহয়। কিন্তু শানেন্দুল বা নাযিল হওয়ার কারণ ও উপলক্ষ বর্ণনার ব্যাপারে সাহাবায়ে ক্রেতাম ও তাবেইগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা সামনে রাখলে এই রেওয়ায়াত যে উপলক্ষে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে এই সূরা নাযিলের উপলক্ষ বলে মেনে নেবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। বরং এ থেকে এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, এই দু'টি গোত্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সূরাটি খাগ খেয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইবনে জানীর হয়রত উবাই ইবনে কাবের (রা) একটি উক্তি উন্নত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : “আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণীটিকে **لَوْ أَنْ لَا يَنْبُتْ أَدَمُ وَأَبِيَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ لَتَمِنْيَ وَادِيَّاً إِلَيْهِ وَلَا يَمْلأُهُ جُوفُ ابْنِ إِنْ** (বৈনি আদমের কাছে যদি দুই উপত্যকা সমান সম্পদ থাকে তারপরও সে তৃতীয় একটি উপত্যকা আকাঙ্ক্ষা করবে। আদম সত্তানের পেট মাটি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ভরে না) — কুরআনের মধ্যে মনে করতাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত আলহাকুমুত তাকাসুর সূরাটি নাযিল হয়।” হয়রত উবাই মদীনায় মুসলমান হয়েছিলেন বলে এই হাদীসটিকে সূরা আত তাকাসুরের মদীনায় অবতীর্ণ হবার সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু হয়রত উবাইর এই বক্তব্য থেকে সাহাবায়ে ক্রেতাম কোনু অর্থে রসূলের এই বাণীটিকে কুরআনের মধ্যে মনে করতেন তা সম্পৃষ্ঠ হয় না। যদি এর অর্থ এই হয়ে থাকে যে, তারা একে কুরআনের একটি আয়াত মনে করতেন তাহলে একথা মেনে নেয়া যেতে পারে না। কারণ সাহাবীগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কুরআনের প্রতিটি হরফ সম্পর্কে অবহিত

ছিলেন। এই হাদীসটিকে কুরআনের আয়াত মনে করার মতো ভূল ধারণা তৌরা কেমন করে পোষণ করতে পারতেন। আর কুরআনের মধ্যে হবার মানে যদি কুরআন থেকে গৃহীত ইঙ্গো মনে করা হয় তাহলে এই হাদীসটির এ অর্থও হতে পারে যে, মদীনা তাইয়েবায় যৌরা মুসলমান হয়েছিলেন তৌরা প্রথমবার নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পৰিক্রমা কর্তৃ কঠে এই সূরা উচ্চারিত হতে শুনে মনে করেন, সূরাটি এই মাত্র নাযিল হয়েছে এবং রসূলের উপরোক্ষিতিত বাণী সম্পর্কে তৌরা মনে করতে থাকেন এটি এই সূরা থেকেই গৃহীত।

ইবনে জারীর, তিরমিয়ী ও ইবনুল মুনয়ির প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হয়রত আলীর (রা) একটি উক্তি উচ্ছৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : “কবরের আধাব সম্পর্কে আমরা সব সময় সন্দেহের মধ্যে ছিলাম। এমন কি শেষ পর্যন্ত ‘আলহা-কুমুত তাকাসুর’ নাযিল হলো।” হয়রত আলীর (রা) এই বক্তব্যটিকে এই সূরার মাদানী হবার প্রমাণ হিসেবে গণ্য করার কারণ হচ্ছে এই যে, কবরের আধাবের আলোচনা মদীনায় শুরু হয়। মক্কা এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হয়নি। কিন্তু একথাটি আসলে ঠিক নয়। কুরআনের মক্কী সূরাগুলোর বিভিন্ন স্থানে এমন ঘৃণ্যহীন ভাষায় কবরের আধাবের কথা বলা হয়েছে যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই সেখানে নেই। উদাহরণ ব্রহ্ম দেখুন সূরা আন'আম ১৩ আয়াত, আন নামল ২৮ আয়াত, আল মু'মিনূন ১৯-১০০ আয়াত, আল মু'মিন ৪৫-৪৬ আয়াত। এগুলো সবই মক্কী সূরা। তাই হয়রত আলীর (রা) উক্তি থেকে যদি কোন জিনিস প্রমাণ হয় তাহলে তা হচ্ছে এই যে, উপরোক্ষিত মক্কী সূরাগুলো নাযিলের পূর্বে সূরা আত তাকাসুর নাযিল হয় এবং এই সূরাটি নাযিল হবার ফলে সাহাবীগণের মধ্যে বিরাজিত কবরের আধাব সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট দুর্ভ্যে যায়।

এ কারণে এই হাদীসগুলো সন্তোষ মুফাস্সিরগণের অধিকাংশই এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। আধাব মতে এটি শুধু মক্কী সূরাই নয় বরং মক্কী জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম।

বিশ্ববস্তু ও মূল বস্তুস্ব

এই সূরায় মানুষকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা ও বৈষম্যিক স্বার্থ পূজার অঙ্গত পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই ভালোবাসা ও স্বার্থ পূজার কারণে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বেশী ধন-সম্পদ আহরণ, পার্থিব লাভ, স্বার্থ উচ্ছার, ভোগ, প্রতিপাপ্তি, ক্ষমতা ও কর্তৃত লাভ এবং তার মধ্যে প্রতিযোগিতামূলকভাবে একজন আর একজনকে টপকে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব অর্জন করার ব্যাপারে অহংকারে মেতে থাকে। এই একটি মাত্র চিঠ্ঠা তাদেরকে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যার ফলে এর চেয়ে উন্নততর কোন জিনিসের প্রতি নজর দেবার মানসিকতাই তাদের নেই। এর অঙ্গত পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এই যেসব নিয়ামত তোমরা নিচিতে সঞ্চাহ করতে ব্যতু, এগুলো শুধুমাত্র নিয়ামত নয় বরং এগুলো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তুও। এগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের আখেরাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

আয়াত ৮

সূরা আত তাকাসুর-মঙ্গী

কৃক্তঃ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

الْمَكْرُ التَّكَاثِرُ^١ حَتَّىٰ زَرَرَ الْمَقَايِرِ^٢ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ^٣
 ثُمَّ كَلَاسَوْفَ تَعْلَمُونَ^٤ كَلَالَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ^٥
 لَتَرَوْنَ الْجَحِيرَ^٦ ثُمَّ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ^٧ ثُمَّ
 لَعْتَسْئَلُنَ يَوْمَئِلِ عَنِ النَّعِيمِ^٨

বেশী বেশী এবং একে অপরের থেকে বেশী দুনিয়ার স্বার্থ লাভ করার মোহ তোমাদের গাফলতির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।^১ এমনকি (এই চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে) তোমরা কবর পর্যন্ত পৌছে যাও।^২ কথ্যনো না, শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে।^৩ আবার (শুনে নাও) কথ্যনো না, শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে। কথ্যনো না, যদি তোমরা নিচিত জ্ঞানের ভিত্তিতে (এই আচরণের পরিণাম) জানতে (তাইলে তোমরা এ ধরনের কাজ করতে না)। তোমরা জাহানাম দেখবেই। আবার (শুনে নাও) তোমরা একেবারে স্থির নিচিতভাবে তা দেখবেই। তারপর অবশ্যই সেদিন তোমাদের এই নিয়ামতগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।^৪

১. মূলে বলা হয়েছে **الْمَكْرُ التَّكَاثِرُ** এখানে মাত্র দু'টি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এই দু'টি শব্দের অর্থের মধ্যে এত বেশী ব্যাপকতা রয়েছে যা মাত্র একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

‘আলহাকুম’ (**الْهُكْمُ**) শব্দটির মূলে রয়েছে লাহউন। **لَهُ** এর আসল অর্থ গাফলতি। কিন্তু যেসব কাজের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ এত বেশী বেড়ে যায় যে সে তার মধ্যে যথে অন্য অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল হয়ে পড়ে সেই ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্য আরবী ভাষায় এ শব্দটি বলা হয়ে থাকে। আলহাকুম শব্দটিকে যখন এর মূল অর্থে বলা হবে তখন এর অর্থ হবে কোন ‘লাহওয়া’ তোমাকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে রেখেছে যে, তার চাইতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসের প্রতি আর তোমার আকর্ষণ ও আগ্রহ থাকেনি। তার মোহ তোমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

তারি চিন্তায় ভূমি নিমগ্ন। আর এই মোহ ও নিমগ্নতা তোমাকে একেবারে গাফেল করে দিয়েছে।

তাকাসুর (**تَكَبْرٌ**) এর মূল কাসরাত (**كَثْرَةٌ**)। এর তিনটি অর্থ হয়। এক, মানুষের বেশী বেশী প্রাচুর্য লাভ করার চেষ্টা করা। দুই, প্রাচুর্য লাভ করার জন্য মানুষের পরম্পরের অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা। তিনি, লোকদের অন্যের ত্লনায় বেশী প্রাচুর্য লাভ করার কথা নিয়ে পরম্পরের মোকাবেলায় বড়াই করে বেড়ানো।

কাজেই “আলহাকুমুত তাকাসুরে” অর্থ দাঁড়ায় তাকাসুর বা প্রাচুর্য তোমাদেরকে তার নিজের মধ্যে এমনভাবে শশগুল করে নিয়েছে, যার ফলে তার প্রতি মোহাছন্নতা তোমাদের তার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। ‘তাকাসুরের মধ্যে কোন জিনিসের প্রাচুর্য রয়েছে, ‘আলহাকুম’-এ কোন জিনিস থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং আলহাকুম-এ কাদেরকে সংশোধন করা হয়েছে- এ বাক্যে সে কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। অর্থের এই অস্পষ্টতার কারণে এই শব্দগুলো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহারের দ্যুমার খুলে গেছে। এ ক্ষেত্রে ‘তাকাসুর’ বা প্রাচুর্যের অর্থ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং দুনিয়ার সমস্ত সুবিধা ও লাভ, বিলাস দ্রব্য, তোগের সামগ্ৰী, শক্তি ও কৰ্তৃত্বের উপকরণ বেশী বেশী অর্জন করার প্রচেষ্টা চালানো, এগুলো অর্জন করার জন্য একে অন্যের থেকে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করা এবং এগুলোর প্রাচুর্যের কারণে পরম্পরের মোকাবেলায় বড়াই করা এর অর্থের অন্তরভুক্ত হয়ে গেছে। অনুরূপভাবে ‘আলহাকুম’-এ যাদেরকে সংশোধন করা হয়েছে তারাও সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি। বরং প্রত্যেক ঘুঁটের লোকেরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সামগ্ৰিকভাবে এর সংশোধনের আওতাভুক্ত হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, বেশী বেশী বৈষয়িক স্বার্থ অর্জন করা, তার মধ্যে একে অন্যের অগ্রবর্তী হওয়া এবং অন্যের মোকাবেলায় তা নিয়ে গব করার মোহ যেমন ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তেমনি আচ্ছন্ন করে গোত্র ও জাতিকেও। অনুরূপভাবে ‘আলহাকুমুত তাকাসুর’-এ যেহেতু একথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি যে, প্রাচুর্য লোকদেরকে নিজের মধ্যে নিমগ্ন করে কোন জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে, তাই এর অর্থের মধ্যেও ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এই প্রাচুর্যের মোহ লোকদেরকে এর চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি জিনিস থেকে গাফেল করে দিয়েছে। তারা আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে গেছে। আধিকারীর অধিকার এবং তা আদায় করার ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল হয়ে গেছে। তারা নিজেদের জীবন যাপনের মান উন্নয়নের চিন্তায় ব্যাকুল। মানবতার মান কত নেমে যাচ্ছে সে চিন্তা তাদেরকে একটুও ব্যতিবস্ত করে না। তাদের চাই বেশী বেশী অর্থ। কোন পথে এ অর্থ অর্জিত হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তাদের নেই। তারা বিলাস দ্রব্য ও তোগের সামগ্ৰী বেশী বেশী চায়। এই প্রবৃত্তি পৃজায় লিঙ্গ হয়ে তারা এহেন আচরণের পরিণাম থেকে সম্পূর্ণ গাফেল হয়ে গেছে। তারা বেশী বেশী শক্তি, সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চাহের চিন্তায় মশগুল। এ প্রশ্নে তারা একে অপরকে ডিপ্পিয়ে যাবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এ চিন্তা করছেনা যে, এগুলো আল্লাহর দুনিয়াকে জুলুমে পরিপূর্ণ করার এবং মানবতাকে ধূংস ও বরবাদ করার সরঞ্জাম মাত্র। মোটকথা, এভাবে অসংখ্য ধরনের ‘তাকাসুর’ ব্যক্তি ও জাতিদেরকে তার মধ্যে এমনভাবে মশগুল করে

০"

"০"

রেখেছে যে, দুনিয়া এবং বৈষয়িক স্বার্থ ও ভোগের চাইতে বড় কোন জিনিসের কথা তারা মুহূর্তকালের জন্যও চিন্তা করে না।

২. অর্থাৎ সারাটা জীবন তোমরা এই প্রচেষ্টায় নিয়েজিত রয়েছে। মরার এক মৃদুর্ত আগেও এ চিন্তা থেকে তোমাদের রেহাই নেই।

৩. অর্থাৎ তোমরা ভুল ধারণার শিকার হয়েছে। বৈষয়িক সম্পদের এ প্রাচুর্য এবং এর মধ্যে পরম্পর থেকে অগ্রবর্তী হয়ে যাওয়াকেই তোমরা উন্নতি ও সাফল্য মনে করে নিয়েছে। অথচ এটা মোটেই উন্নতি ও সাফল্য নয়। শীঘ্ৰই তোমরা এর অন্তত পরিণতি জানতে পারবে। সারাটা জীবন যে তুলের মধ্যে তোমার লিঙ্গ ছিলে সেটা যে কত বড় তুল ছিল তা তোমরা শীঘ্ৰই জানতে পারবে। শীঘ্ৰই অর্থ আখেরাতও হতে পারে। কারণ আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্রকাল ব্যাপী যে সত্ত্বার দৃষ্টি প্রসারিত তাঁর কাছে কয়েক হাজার বা কয়েক লাখ বছরও কালের সামান্য একটি অংশ মাত্র। কিন্তু এর অর্থ মৃত্যুও হতে পারে। কারণ কোন মানুষ থেকে তার অবস্থান বেশী দূরে নয়। আর মানুষ তার সারা জীবন যে সব কাজের মধ্যে কাটিয়ে এসেছে সে মরে যাবার সাথে সাথেই সেগুলো তার জন্য সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ও অন্তত পরিণামের বাহন ছিল কিনা তা তার কাছে একেবারে সুপ্রস্ত হয়ে যাবে।

৪. এই বাক্যে জাহানামে নিষ্কেপ করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই অর্থে 'তারপর' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হচ্ছে : তারপর এ খবরটিও আমি তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি যে, এসব নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আর একথা সুপ্রস্ত, আল্লাহর আদালতে হিসেব নেবার সময় এ জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, মহান আল্লাহ বাদাদেরকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন সে সম্পর্কে মু'মিন ও কাফের সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে। এটা আলাদা ব্যাপার, যারা নিয়ামত অঙ্গীকার করেনি এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করেছে তারা এই জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হবে। আর যারা আল্লাহর নিয়ামতের হক আদায় করেনি এবং নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে অথবা উভয়ের সাহায্যে তাঁর নাফরমানি করেছে তারা ব্যর্থ হবে।

হ্যরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের এখানে এলেন। আমরা তাঁকে তাজা খেজুর খাওয়ালাম এবং ঠাণ্ডা পানি পান করালাম। তিনি বললেন : "এগুলো এমন সব নিয়ামতের অন্তরভুক্ত যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।" (মুসলাদে আহমাদ, নাসাই, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনয়ির, ইবনে মারদুইয়া, আবদ ইবনে হুমাইদ ও বাইহাকী ফিল্শ ঔ'আব)

হ্যরত আবু হুরাইরাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আবু বক্র (রা) ও হ্যরত উমরকে (রা) বললেন, চলো আবুল হাইসাম ইবনুত তাইহান আনসারীর ওখানে যাই। কাজেই তাদেরকে নিয়ে তিনি ইবনুত তাইহানের খেজুর বাগানে গেলেন। তিনি এক কাঁদি খেজুর এনে মেহমানদের সামনে রাখলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি নিজে খেজুর ছিড়ে আনলে না কেন?

তিনি বললেন, আমি চাহিলাম আপনারা নিজেরা বেছে বেছে খেজুর খাবেন। কাজেই তারা খেজুর খেলেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ করে রসূলুল্লাহ (স) বলেন, “সেই সভার কসম যার হাতে আমার প্রাণ সমর্পিত, কিয়ামতের দিন যেসব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই ঠাণ্ডা ছায়া, ঠাণ্ডা খেজুর ও ঠাণ্ডা পানি— এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত।” (এই ঘটনা মুসলিম, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী, ইবনে জারীর ও আবুল ইয়ালা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন সূত্রে আবু হুরাইরাহ থেকে উন্মৃত করেছেন। এদের কেউ কেউ উক্ত আনসার সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন আবার কেউ কেউ শুধুমাত্র একজন আনসারী বলেই ক্ষ্যাতি হয়েছেন। এ ঘটনাটি বিভিন্ন সূত্রে এবং বিজ্ঞানিত আকারে ইবনে আবু হাতেম হ্যরত উমর থেকে এবং ইমাম আহমাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবু আসী নামক একজন মুক্তি প্রাপ্ত গোলাম থেকে উন্মৃত করেছেন। ইবনে হাইয়ান ও ইবনে মারদুইয়া হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে একটি রেওয়ায়াত উন্মৃত করেছেন। তা থেকে জানা যায়, প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা হ্যরত আবু আইউব আনসারীর ওখানেও ঘটেছিল।)

এই হাদীসগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, জিজ্ঞাসাবাদ কেবল কাফেরদেরকে করা হবে না, সৎ মুমিনদেরকেও করা হবে। আর আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামতগুলো দান করেছেন সেগুলো সীমা সংযোগী। সেগুলো গণনা করা সম্ভব নয়। বরং এমন অনেক নিয়ামতও আছে যেগুলোর মানুষ কোন খবরই রাখে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে **وَإِنْ تَعْلَمُوا نَعْمَلُ اللّهُ لَا تَحْصُلُونَ** অর্থাৎ “যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতগুলো গণনা করতে থাকো তাহলে সেগুলো পুরোপুরি গণনা করতেও পারবে না।” (ইবরাহীম ৩৪ আয়াত) এই নিয়ামতগুলোর মধ্য থেকে অসংখ্য নিয়ামত মহান আল্লাহ সরাসরি মানুষকে দিয়েছেন। আবার বিপুল সংখ্যক নিয়ামত মানুষকে দান করা হয় তার নিজের উপর্যন্তের মাধ্যমে। নিজের উপর্যুক্ত নিয়ামতগুলো মানুষ কিভাবে উপর্যুক্ত ও ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে তাকে জ্ঞানদিহি করতে হবে। আল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি যে নিয়ামতগুলো সে সাত করেছে সেগুলোকে সে কিভাবে ব্যবহার করেছে তার হিসেব তাকে দিতে হবে। আর সামগ্রিকভাবে সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তাকে বলতে হবে যে, সেগুলো যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এর স্থীরতা সে দিয়েছিল কিনা এবং নিজের ইচ্ছা, মনোভাব ও কর্মের সাহায্যে সেগুলোর জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল কি না? অথবা সে কি একথা মনে করতো, এ সবকিছু হঠাতে ঘটনাক্রমেই সে পেয়ে গেছে? অথবা সে কি একথা মনে করেছিল যে, অনেকগুলো খোদা তাকে এগুলো দিয়েছেন? অথবা সে এই বিশাস পোষণ করতো যে, এগুলো একজন আল্লাহরই নিয়ামত ঠিকই কিন্তু এগুলো দান করার ব্যাপারে আরো অনেক সভার হাত রয়েছে? এ কারণে তাদেরকে মাবুদ গণ্য করেছিল এবং তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিল?

আল আসর

১০৩

নামকরণ

প্রথম আয়াতের “আল আসর” (الْفَصَر) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য বরা হয়েছে।

নাযিল হ্বার সময়-কাল

মুজাহিদ, কাতাদাহ ও মুকাতিল একে মাদানী বলেছেন। কিন্তু মুফাস্সিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একে মক্কী সূরা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর এই সূরার বিষয়বস্তু সাক্ষ দেয়, এটি মক্কী যুগেরও প্রাথমিক পর্যায়ে নাযিল হয়ে থাকবে। সে সময় ইসলামের শিক্ষাকে সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী বাক্যের সাহায্যে বর্ণনা করা হতো। এভাবে শোতা একবার শুনার পর ভুলে যেতে চাইলেও তা আর ভুলতে পারতো না এবং আপনা আপনি লোকদের মুখে মুখেও তা উচ্চারিত হতে থাকতো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরাটি ব্যাপক অর্থবোধক সংক্ষিপ্ত বাক্য সমবিত বাণীর একটি অঙ্গুলীয় নমুনা। কয়েকটা মাপাজোকা শব্দের মধ্যে গভীর অর্থের এমন এক ভাণ্ডার বেঁধে দেয়া হয়েছে যা বর্ণনা করার জন্য একটি বিরাট গ্রন্থও যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে সম্পূর্ণ ঘ্যার্থহীন ভাষায় মানুষের সাফল্য ও কল্যাণের এবং তার ধৰ্ম ও সর্বনাশের পথ বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম শাফেই যথার্থই বলেছেন, লোকেরা যদি এই সূরাটি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে এই একটি সূরাই তাদের হেদয়াতের জন্য যথেষ্ট। সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূরা। হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে হিস্ন দারেমী আবু মাদীনার বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি যখন পরম্পর মিলিত হতেন তখন তারা একজন অপরজনকে সূরা আসর না শুনানো পর্যন্ত পরম্পর থেকে বিদায় নিতেন না। (তাবারানী)।

আয়াত ৩

সূরা আল 'আসর-মঙ্গী

কৃত ।

لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মশাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالْعَصْرِ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خَسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۝ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ ۝

সময়ের কসম / মানুষ আসলে বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে / তবে তারা ছাড়া যান্না ইমান এনেছে ও সৎকাজ করতে থেকেছে এবং একজন অন্যজনকে ইক কথার ও সবর করার উপদেশ দিতে থেকেছে ।

১. এ সূরায় একথার ওপর সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে যে, মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এবং এই ক্ষতি থেকে একমাত্র তারাই রক্ষা পেয়েছে যারা চারটি শুণাবলীর অধিকারী : (১) ইমান, (২) সৎকাজ, (৩) পরম্পরাকে হকের উপদেশ দেয়া এবং (৪) একে অন্যকে সবর করার উপদেশ দেয়া। আল্লাহর এই বাণীর অর্থ সুশ্পষ্টভাবে জানার জন্য এখন এখানে প্রতিটি অংশের ওপর পৃথকভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।

কসম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি বহুবার সুশ্পষ্টভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ সৃষ্টিকুলের কোন বস্তুর প্রের্তৃত, অভিনবত্ব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য কখনো তার কসম খাননি ।। বরং যে বিষয়টি প্রমাণ করা উদ্দেশ্য এই বস্তুটি তার সত্যতা প্রমাণ করে বলেই তার কসম থেয়েছেন। কাজেই সময়ের কসমের অর্থ হচ্ছে, যাদের মধ্যে উল্লেখিত চারটি শুণাবলী রয়েছে তারা ছাড়া বাকি সমস্ত মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে, সময় এর সাক্ষী ।

সময় মানে বিগত সময়—অতীত কালও হতে পারে আবার চলতি সময়ও। এই চলতি বা বর্তমান কাল আসলে কোন দীর্ঘ-সময়ের নাম নয়। বর্তমান কাল প্রতি মুহূর্তে বিগত হচ্ছে এবং অতীতে পরিণত হচ্ছে। আবার ভবিষ্যতের গত থেকে প্রতিটি মুহূর্ত বের হয়ে এসে বর্তমানে পরিণত হচ্ছে এবং বর্তমান থেকে আবার তা অতীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখানে যেহেতু কোন বিশেষত্ব ছাড়াই শুধু সময়ের কসম খাওয়া হয়েছে, তাই দুই ধরনের সময় বা কাল এর অন্তর্ভুক্ত হয়। অতীতকালের কসম খাওয়ার মানে হচ্ছে : মানুষের ইতিহাস এর সাক্ষ দিচ্ছে, যারাই এই শুণাবলী বিবর্জিত ছিল তারাই পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আর বর্তমানকালের কসম খাওয়ার অর্থ বুঝতে হলে প্রথমে একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, বর্তমানে যে সময়টি অতিবাহিত হচ্ছে সেটি আসলে এমন একটি সময় যা প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতিকে দুনিয়ায় কাজ করার জন্য দেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হণ্ডে একজন ছাত্রকে প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার জন্য যে সময় দেয়া হয়ে থাকে তার সাথে এর তুলনা করা যেতে পারে। নিজের ঘড়িতে কিছুক্ষণের জন্য সেকেতের কাটাটির চলার গতি লক্ষ করলে এই সময়ের দ্রুত গতিতে অতিবাহিত হবার বিষয়টি উপরাকি করা যাবে। অথচ একটি সেকেও সময়ের একটি বিরাট অংশ। একমাত্র একটি সেকেতে আলো এক লাখ ছিয়াশী হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করে। এখনো আমরা না জানতে পারলেও আধ্যাত্ম রাজ্যে এমন অনেক জিনিসও ধাকতে পারে যা এর চাইতেও দ্রুত গতি সম্ভব। তবুও ঘড়ির সেকেতের কাটার চলার যে গতি আমরা দেখি সময়ের চলার গতি যদি তাই ধরে নেয়া হয় এবং যা কিছু ভালো-মন্দ কাজ আমরা করি আর যেসব কাজেও আমরা ব্যক্ত ধাকি সবকিছুই দুনিয়ায় আমাদের কাজ করার জন্য যে সীমিত জীবন কাল দেয়া হয়েছে তার মধ্যেই সংঘটিত হয়, এ ব্যাপারটি নিয়ে যদি আমরা চিন্তা-ভাবনা করি তাহলে আমরা অনুভব করতে পারি যে, এই দ্রুত অতিবাহিত সময়ই হচ্ছে আমাদের আসল মূলধন। ইমাম রায়ী এই পর্যায়ে একজন মনীষীর উক্তি উচ্চৃত করেছেন। তিনি বলেছেন : “একজন বরফওয়ালার কাছ থেকে আমি সূরা আসুন্নের অর্থ বুঝেছি। সে বাজারে জোর গোয়া হেঁকে চলছিল— দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। দয়া করো এমন এক ব্যক্তির প্রতি যার পুঁজি গলে যাচ্ছে। তার একথা শুনে আমি বললাম, এটিই হচ্ছে আসলে লৈশ্ব খস্ত অর্থ; মানুষকে যে আয়ুকাম দেয়া হয়েছে তা বরফ গলে যাবার মতো দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একে যদি নষ্ট করে ফেলা হয় অথবা ভুল কাজে ব্যয় করা হয় তাহলে সেটিই মানুষের জন্য ক্ষতি।” কাজেই চলমান সময়ের কসম থেয়ে এই সূরায় যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ এই যে, এই দ্রুত গতিশীল সময় সাক্ষ দিচ্ছে, এই চারটি গুণাবলী শুন্য হয়ে মানুষ যে কাজেই নিজের জীবন কাস অতিবাহিত করে তার সবচেয়ে ক্ষতির সওদা বৈ কিছুই নয়। এই চারটি গুণে গুণাবলী হয়ে যারা দুনিয়ায় কাজ করে একমাত্র তারাই লাভবান হয়। এটি ঠিক তেমনি ধরনের একটি কথা যেমন একজন ছাত্র পরিবর্তে অন্য কাজে সময় নষ্ট করছে, তাকে আমরা হণ্ডের দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে অঙ্গলি নির্দেশ করে বলি : এই দ্রুত গতিশীল সময় বলে দিচ্ছে, তুমি নিজের ক্ষতি করছো। যে ছাত্র এই সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত নিজের প্রশ্নপত্রের জবাব দেবার কাজে ব্যয় করছে একমাত্র সেই লাভবান।

মানুষ শব্দটি একবচন। কিন্তু পরের বাক্যে চারটি গুণ সম্পর্ক গোকদেরকে তার থেকে আলাদা করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে একথাটি অবশ্যি মানতে হবে যে, এখনে মানুষ শব্দটি জাতি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি ও সমগ্র মানব সম্প্রদায় এর মধ্যে সমানভাবে শামিল। কাজেই উপরোক্তিশীল চারটি গুণাবলী কোন ব্যক্তি, জাতি বা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যার-ই মধ্যে ধাকবে না সে-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই বিধানটি সর্বাবস্থায় সত্য প্রমাণিত হবে। এটি ঠিক তেমনি ধরনের ব্যাপার যেমন আমরা বলি, বিষ মানুষের জন্য ক্ষসকর। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, বিষ সর্বাবস্থায় ক্ষসকর হবে, এক ব্যক্তি থেকেও, একটি জাতি থেকেও বা সারা দুনিয়ার মানুষেরা সবাই মিলে থেকেও বিষের ক্ষসকর ও সংহারক গুণ অপরিবর্ত্যীয়। এক ব্যক্তি বিষ থেয়েছে বা একটি জাতি বিষ থেয়েছে অথবা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ বিষ খাবার ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে, এ দৃষ্টিতে তার মধ্যে গুণগত কোন ফারাক দেখা যাবে না। অনুরূপতাবে মানুষের জন্য সূরায়

উল্লেখিত চারটি গুণাবলী শূন্য হওয়া যে ক্ষতির কারণ, এটিও একটি অকাট্য সত্য। এক ব্যক্তি এই গুণাবলী শূন্য হোক অথবা কোন জাতি বা সান্ন দুনিয়ার মানুষেরা কুফরী করা, অস্ত্রাঞ্জ করা এবং প্রস্তরকে বাতিল কাজে উৎসাহিত করা ও নকশের বদেগী করার উপর্যুক্ত দেবার ব্যাপারে একমত হয়ে যাক তাতে এই সার্বজনীন মূলনীতিতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয় না।

এখন দেখা যাক 'ক্ষতি' শব্দটি কুরআন মজীদে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আভিধানিক অর্থে ক্ষতি হচ্ছে লাভের বিপরীত শব্দ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এ শব্দটির ব্যবহার এমন সময় হয় যখন কোন একটি সওদায় লোকসান হয়। পুরা ব্যবসাটায় যখন লোকসান হতে থাকে তখনো এর ব্যবহার হয়। আবার সমস্ত পুঁজি লোকসান দিয়ে যখন কোন ব্যবসায়ি দেউলিয়া হয়ে যায় তখনো এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কুরআন মজীদ এই একই শব্দকে নিজের বিশেষ পরিভাষায় পরিণত করে কল্যাণ ও সফলতার বিপরীত অর্থে ব্যবহার করছে। কুরআনের সাফল্যের ধারণা যেমন নিছক পার্থিব সম্পদের সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আথেরাত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃত ও যথার্থ সাফল্য এর অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপতাবে তার ক্ষতির ধারণাও নিছক পার্থিব ব্যর্থতা ও দুরবস্থার সমার্থক নয় বরং দুনিয়া থেকে নিয়ে আথেরাত পর্যন্ত মানুষের সমস্ত যথার্থ ব্যর্থতা ও অসাফল্য এর আওতাভুক্ত হয়ে যায়। সাফল্য ও ক্ষতির কুরআনী ধারণার ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমি বিভিন্ন স্থানে করে এসেছি। তাই এখানে আবার তার পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন দেখি না। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল 'আরাফ ৯ টীকা, আল আনফাল ৩০ টীকা, ইউনুস ২৩ টীকা, বনি ইসরাইল ১০২ টীকা, আল হাজ্জ ১৭ টীকা, আল মু'মিনুন ১, ২, ১১ ও ৫০ টীকা এবং লোকমান ৪ টীকা, আয় যুমার ৩৪ টীকা।) এই সংগে একথাটিও তালোতাবে বুঝে নিতে হবে যে, যদিও কুরআনের দৃষ্টিতে আথেরাতে মানুষের সাফল্যই তার আসল সাফল্য এবং আথেরাতে তার ব্যর্থতাই আসল ব্যর্থতা তবুও এই দুনিয়ায় মানুষ যেসব জিনিসকে সাফল্য নামে অভিহিত করেছে তা আসলে সাফল্য নয় বরং এই দুনিয়াতেই তার পরিগাম ক্ষতির আকারে দেখা দিয়েছে এবং যে জিনিসকে মানুষ ক্ষতি মনে করেছে তা আসলে ক্ষতি নয় বরং এই দুনিয়াতেই তা সাফল্যে পরিণত হয়েছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এই সত্যটি বর্ণনা করা হয়েছে। যথার্থ স্থানে আমি এর ব্যাখ্যা করে এসেছি। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন আন নামল ১৯ টীকা, মারয়াম ৫৩ টীকা, ত্বা-হা ১০৫ টীকা) কাজেই কুরআন যখন পূর্ণ বলিষ্ঠতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ে ঘোষণা দিচ্ছে, "আসলে মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করছে," তখন এর অর্থ হয় দুনিয়া ও আথেরাত উভয় স্থানের ক্ষতি। আর যখন সে বলে, এই ক্ষতির হাত থেকে একমাত্র তারাই রেহাই পেয়েছে যাদের মধ্যে নিম্নোক্ত চারটি গুণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে, তখন এর অর্থ হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া এবং সাফল্য লাভ করা।

এখন এই সূরার দৃষ্টিতে যে চারটি গুণাবলীর উপস্থিতিতে মানুষ ক্ষতিমুক্ত অবস্থায় থাকতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনায় আসা যাক।

এর প্রথম গুণটি হচ্ছে ইমান। যদিও এ শব্দটি কুরআন মজীদের কোন কোন স্থানে নিছক মৌখিক বীকারোভিল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন আন নিসা ১৩৭ আয়াত, আল মায়েদাহ ৫৪ আয়াত, আল আনফাল ২০ ও ২৭ আয়াত, আত তাওবা ৩৮ আয়াত এবং

আসসাফ ২ আয়াত) তবুও আসল ব্যবহার হয়েছে সাক্ষা দিলে মেনে নেয়া ও বিশ্বাস করা অর্থে। আরবী ভাষায়ও এই শব্দটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক দৃষ্টিতে (صَدِقٌ وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ) তার অর্থ হয় (তাকে সত্য বলেছে ও তার প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে) আর (أَمْنٌ بِهِ) এর অর্থ হয় (তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে)। কুরআন যে ইমানকে প্রকৃত ইমান বলে গণ্য করে নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে তাকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে :

إِنَّ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَبُوا

“মু’মিন তো আসলে তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান আনে আর তারপর সশ্যে দিতে হয় না।” (আল হজুরাত ১৫)

إِنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوا رَبِّنَا اللَّهَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

“যারা বলেছে, আল্লাহ আমাদের রব আর তারপর তার উপর অবিচল হয়ে গেছে।”

(হা-মীম আস সাজদাহ ৩০)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

“আসলে তারাই মু’মিন, আল্লাহর কথা উচারিত হলে যাদের দিল কেঁপে ওঠে।”

(আনফাল ২)

وَالَّذِينَ أَمْنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ - (البقرة : ١٦٥)

“যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহকে সর্বাধিক ও অত্যন্ত মজবুতির সাথে তালোবাসে।”

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فَيَعْلَمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا -

“কাজেই, না (হে নবী!) তোমার রবের কসম, তারা কখনোই মু’মিন নয়, যতক্ষণ না তাদের পারম্পরিক বিরোধে তোমাকে ফায়সালাকারী হিসেবে না মেনে নেয়। তারপর যা কিছু তুমি ফায়সালা করো সে ব্যাপারে তারা মনে কোন প্রকার সংকীর্ণতা অনুভব করে না বরং মনে প্রাণে মেনে নেয়।” (আন নিসা ৬৫)

নিম্নোক্ত আয়াতটিতে ইমানের মৌখিক ঝীকারোক্তি ও প্রকৃত ইমানের মধ্যে পার্থক্য আরো বেশী করে প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে, বলা হয়েছে, আসল লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃত ইমান, মৌখিক ঝীকারোক্তি নয় : يَابِّا الَّذِينَ أَمْنُوا أَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ “হে ইমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ইমান আনো।” (আন নিসা ১৩৬)

এখন প্রশ্ন দেখা দেয়, ইমান আনা বলতে কিসের উপর ইমান আনা বুবাছে? এর জবাবে বলা যায়, কুরআন মজীদে একথাটি একেবারে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমত আল্লাহকে মানা। নিছক তাঁর অঙ্গিত্ব মেনে নেয়া নয়। বরং তাঁকে এমনভাবে মানা

যাতে বুবা যায় যে, তিনি একমাত্র প্রভু ও ইলাহ। তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বে কোন অংশীদার নেই। একমাত্র তিনিই মানুষের ইবাদাত, বদ্দেগী ও আনুগত্য লাভের অধিকারী। তিনিই ভাগ্য গড়েন ও ভাণেন। বাদ্দার একমাত্র তাঁরই কাছে প্রার্থনা এবং তাঁরই উপর নির্ভর করা উচিত। তিনিই হকুম দেন ও তিনিই নিষেধ করেন। তিনি যে কাজের হকুম দেন তা করা ও যে কাজ থেকে বিরত রাখতে চান তা না করা বাদ্দার উপর ফরয। তিনি সবকিছু দেখেন ও শোনেন। মানুষের কোন কাজ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে থাকা তো দুরের কথা, যে উদ্দেশ্য ও নিয়তের ভিত্তিতে মানুষ কাজটি করে তাও তাঁর, অগোচরে থাকে না। দ্বিতীয়ত রসূলকে মানা। তাঁকে আল্লাহর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতৃত্বদানকারী হিসেবে মানা। তিনি যা কিছু শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে দিয়েছেন, তা সবই সত্য এবং অবশ্য গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নেয়। ফেরেশতা, অন্যান্য নবীগণ, আল্লাহর কিভাবসমূহ এবং কুরআনের প্রতি ইমান আনাও এই রসূলের প্রতি ইমান আনার অন্তরভুক্ত। কারণ আল্লাহর রসূলই এই শিক্ষাগুলো দিয়েছেন। তৃতীয়ত আখেরাতকে মানা। মানুষের এই বর্তমান জীবনটিই প্রথম ও শেষ নয়, বরং মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠতে হবে, নিজের এই দুনিয়ার জীবনে সে যা কিছু কাজ করেছে আল্লাহর সামনে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং হিসেব-নিকেশে যেসব লোক সৎ গণ্য হবে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে এবং যারা অসৎ গণ্য হবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, এই অর্থে আখেরাতকে মেনে নেয়। ইমান, নৈতিক চরিত্র ও জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ডের জন্য এটি একটি মজবুত বুনিয়াদ সরবরাহ করে। এর উপর একটি পাক-পবিত্র জীবনের ইমারত গড়ে উঠতে পারে। নয়তো যেখানে আদতে ইমানের অস্তিত্বই নেই সেখানে মানুষের জীবন যতই সৌন্দর্য বিভূষিত হোক না কেন তার অবস্থা একটি নোঙ্র বিহীন জাহাজের মতো। এই জাহাজ ঢেউয়ের সাথে ভেসে যেতে থাকে এবং কোথাও স্থায়িভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

ইমানের পরে মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচাবার জন্য দ্বিতীয় যে গুণটি অপরিহার্য সেটি হচ্ছে সৎকাজ। কুরআনের পরিভাষায় একে বলা হয় সালেহাত। (صالحات) সমস্ত সৎকাজ এর অন্তরভুক্ত। কোন ধরনের সৎকাজ ও সৎবৃত্তি এর বাইরে থাকে না। কিন্তু কুরআনের দৃষ্টিতে যে কাজের মূলে ইমান নেই এবং যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল প্রদত্ত হেদায়াতের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়নি তা কখনো ‘সালেহাত’ তথা সৎকাজের অন্তরভুক্ত হতে পারে না। তাই কুরআন মজীদের সর্বত্র সৎকাজের আগে ইমানের কথা বলা হয়েছে এবং এই স্মরায়ও ইমানের পরেই এর কথা বলা হয়েছে। কুরআনের কোন এক জায়গায়ও ইমান ছাড়া সৎকাজের কথা বলা হয়নি এবং কোথাও ইমান বিহীন কোন কাজের পুরস্কার দেবার ‘আশাসও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে মানুষ নিজের কাজের সাহায্যে যে ইমানের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে সেটিই হয় নির্ভরযোগ্য ও কল্যাণকর ইমান। অন্যথায় সৎকাজ বিহীন ইমান একটি দাবী ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ এই দাবী সন্তোষ যখন আল্লাহ ও তাঁর রসূল নির্দেশিত পথ ছেড়ে অন্য পথে চলে তখন আসলে সে নিজেই তার এই দাবীর প্রতিবাদ করে। ইমান ও সৎকাজের সম্পর্ক বীজ ও বৃক্ষের মতো। বীজ মাটির মধ্যে না থাকা পর্যন্ত কোন বৃক্ষ জন্মাতে পারে না। কিন্তু যদি বীজ মাটির মধ্যে থাকে এবং কোন বৃক্ষ না জন্মায় তাহলে এর অর্থ দাঁড়ায় মাটির বুকে বীজের সমাধি রচিত হয়ে গেছে। এজন্য কুরআন মজীদে যতগুলো সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা এমন সব লোকদেরকে দেয়া

হয়েছে যারা ইমান এনে সৎকাজ করে। এই সুরায়ও একথাটিই বদা হয়েছে। এখানে বগা হয়েছে, মানুষকে খৎসের হাত থেকে বৌচাবার জন্য দিতীয় যে গুণটির অপরিহার্য প্রয়োজন পেটি হচ্ছে ইমান আনার পর সৎকাজ করা। অন্য কথায়, সৎকাজ ছাড়া নিষ্ক ইমান মানুষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না।

উপরোক্ত গুণগুলো তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে থাকতে হবে। এরপর এ সুরাটি আরো দু'টি বাড়তি গুণের কথা বলে। ক্ষতি থেকে বৌচার জন্য এ শুণ দু'টি থাকা জরুরী। এ শুণ দু'টি হচ্ছে, যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে তাদের পরম্পরাকে হক কথা বলার ও হক কাজ করার এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করার উপদেশ দিতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথমত ইমানদার ও সৎকর্মশীলদের পৃথক পৃথক ব্যক্তি হিসেবে অবস্থান না করা উচিত। বরং তাদের সমিলনে একটি মু'মিন ও সৎসমাজদেহ গড়ে উঠতে হবে। দিতীয়ত এই সমাজ যাতে বিকৃত না হয়ে যায় সে দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে উপলক্ষ করতে হবে। এ জন্য এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবে, এটা তাদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

হক শব্দটি বাতিলের বিপরীত। সাধারণত এ শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একঃ সঠিক, নির্ভূল, সত্য, ন্যায় ও ইনসাফ অনুসারী এবং আকীদা ও ইমান বা পার্থিব বিষয়াদির সাথে সম্পর্কিত প্রকৃত সত্য অনুসারী কথা। দুইঃ আত্মাহর, বাস্তার বা নিজের যে হকটি আদায় করা মানুষের জন্য ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই পরম্পরাকে হকের উপদেশ দেবার অর্থ হচ্ছে, ইমানদারদের এই সমাজটি এমনি অনুভূতিহীন নয় যে, এখানে বাতিল মাথা উচু করতে এবং হকের বিরুদ্ধে কাজ করে যেতে থাকলেও লোকেরা তার নিরব দর্শক হয় মাত্র। বরং যখন ও যেখানেই বাতিল মাথা উচু করে তখনই সেখানে হকের আওয়াজ বুদ্ধিকারীরা তার মোকাবেলায় এগিয়ে আসে, এই সমাজে এই প্রাণশক্তি সর্বক্ষণ প্রবাহিত থাকে। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই কেবল সত্যপ্রীতি, সত্য নীতি ও ন্যায় নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না এবং হকদারদের হক আদায় করেই ক্ষম্ত হয় না বরং অন্যদেরকে এই কর্মপছতি অবলম্বন করার উপদেশ দেয়। এই জিনিসটিই সমাজকে নৈতিক পতন ও অবস্থায় থেকে রক্ষা করার জামানত দেয়। যদি কোন সমাজে এই প্রাণ শক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষতির হাত থেকে বৌচতে পারবে না। যারা নিজেদের জায়গায় হবের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু নিজেদের সমাজে হককে বিধ্বস্ত হতে দেখে নিরব থাকবে তারাও একদিন এই ক্ষতিতে নিষ্ঠ হবে। একথাটিই সূরা মাঝেদায় বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : হয়রত দাউদ ও হয়রত ইসমা ইবনে মারয়ামের মুখ দিয়ে বনি ইসরাইলদের ওপর গানত করা হয়েছে! আর এই গানতের কারণ ছিল এই যে, তাদের সমাজে গোনাহ ও জুনুম ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে পড়েছিল এবং গোকেরা পরম্পরাকে খারাপ কাজে বাধা দেয়া থেকে বিরত থেকেছিল (৭৮-৭৯ আয়াত) আবার একথাটি সূরা আরাফে এভাবে বলা বলা হয়েছে : বনী ইসরাইলরা যখন প্রকাশ্যে শনিবারের বিধান অমান্য করে মাছ ধরতে শুরু করে তখন তাদের ওপর আয়াব নাফিল করা হয় এবং সেই আয়াব থেকে একমাত্র তাদেরকেই বৌচানো হয় যারা লোকদেরকে এই গোনাহর কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করতো। (১৬৩-১৬৬ আয়াত) সূরা আনফালে আবার একথাটি এভাবে বলা হয়েছে : সেই ফিত্নাটি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করো যার ক্ষতিকর প্রভাব

বিশেষভাবে শুধুমাত্র মেসব লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা তোমাদের মধ্যে গোনাই করেছে। (২৫ আয়াত)-এ জন্যই সৎকাজের আদেশ করা এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখাকে উচ্চাতে মুসলিমার দায়িত্ব ও কর্তব্য গণ্য করা হয়েছে। (আলে ইমরান ১০৪) সেই উচ্চাতকে সর্বোন্মত উচ্চাত বলা হয়েছে, যারা এই দায়িত্ব পালন করে।

(আলে ইমরান ১১০)

হকের নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে দ্বিতীয় যে জিনিসটিকে ইমানদারগণকে ও তাদের সমাজকে ক্ষতি থেকে বৌচার জন্য অপরিহার্য শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই সমাজের ব্যক্তিবর্গ পরম্পরাকে সবর করার উপদেশ দিতে থাকবে। অর্থাৎ হককে সমর্থন করতে ও তার অনুসারী হতে গিয়ে যেসব সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় এবং এপথে যেসব কষ্ট, পরিশ্রম, বিপদ-আপদ, ক্ষতি ও বঞ্চনা মানুষকে নিরতর পীড়িত করে তার মোকাবেলায় তারা পরম্পরাকে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকার উপদেশ দিতে থাকবে। সবরের সাথে এসব কিছু বরদাশৃঙ্খল করার জন্য তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে সাহস যোগাতে থাকবে। (দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আদ দাহর ১৬ টীকা এবং আল বালাদ ১৪ টীকা)।

আল হুমায়াহ

১০৪

নামকরণ

প্রথম আয়াতের হমায়াহ (مُهَمَّة) শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মুক্তি হবার ব্যাপারে সকল মুফাস্সির একমত পোষণ করেছেন। এর বক্তব্য বিষয় ও বর্ণনাভঙ্গী বিশ্লেষণ করলে এটিও রস্মৈর নবুওয়াত পাওয়ার পর মকায় প্রথমদিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই সূরায় এমন কিছু নৈতিক অস্ত্রবৃত্তির নিদা করা হয়েছে যেগুলো জাহেলী সমাজে অর্থলোকে ধনীদের মধ্যে পাওয়া যেতো। প্রত্যেক আরববাসী জানতো, এই অসৎ-প্রবণতাগুলো যথার্থই তাদের সমাজে সক্রিয় রয়েছে। সবাই এগুলোকে খারাপ মনে করতো। একজনও এগুলোকে সৎশুণ মনে করতো না এবং প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতো না। এই জঘন্য প্রবণতাগুলো পেশ করার পর আখেরাতে এই ধরনের চরিত্রের অধিকারী লোকদের পরিণাম কি হবে তা বলা হয়েছে। এই দু'টি বিষয় (অর্থাৎ একদিকে এই চরিত্র এবং অন্যদিকে আখেরাতে তার এই পরিণাম) এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যার ফলে শোতা নিজে নিজেই এই সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারেন যে, এই ধরনের কাজের ও চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পরিণাম এটিই হয়ে থাকে। আর যেহেতু দুনিয়ায় এই ধরনের চরিত্রের লোকেরা কোন শাস্তি পায় না বরং উলটো তাদের আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে দেখা যায়, তাই আখেরাত অনিবার্যভাবে অনুষ্ঠিত হবেই।

সূরা যিলযাল থেকে এ পর্যন্ত যতগুলো সূরা চলে এসেছে এই সূরাটিকে সেই ধারাবাহিকতায় রেখে বিচার করলে মুক্তি মু'আয়্যমার প্রথম যুগে ইসলামী আকীদা- বিশ্বাস ও তার নৈতিক শিক্ষাবলী মানুষের হৃদয়পটে অঞ্চিত করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা মানুষ খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারে। সূরা যিলযালে বলা হয়েছে, আখেরাতে মানুষের সমগ্র আমলনামা তার সামনে রেখে দেয়া হবে। সে দুনিয়ায় যে সামান্য বালুকণা পরিমাণ নেকী বা গোনাহ করেছিল তা সেখানে তার সামনে আসবে না এমনটি হবে না। সূরা আদিয়াত-এ আরবের চতুর্দিকে যেসব লুটতরাজ, হানাহানি, খুনাখুনি ও দস্যুতা জারী ছিল সেদিকে ইঁথিত করা হয়েছে। তারপর আল্লাহ প্রদত্ত শক্তিগুলোর এহেন অপব্যবহার তাঁর প্রতি বিরাট অকৃতজ্ঞতা ছাড়ি আর কিছুই নয়, এ

অনুভূতি জাগ্রত করার পর লোকদেরকে বলা হয়েছে, এ ব্যাপারটি এই দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যাবে না বরং মৃত্যুর পর আর একটি জীবন শুরু হচ্ছে, সেখানে কেবল তোমাদের সমস্ত কাজেরই নয় বরং নিয়তও যাচাই বা পর্যালোচনা করা হবে। আর কোন ব্যক্তি কোন ধরনের ব্যবহার লাভের যোগ্য তা তোমাদের রব খুব তালোভাবেই জানে। সূরা আল কারিয়াহতে কিয়ামতের নকশা পেশ করার পর লোকদেরকে এই মর্মে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের নেকীর পাল্লা ভারী না গোলাহর পাল্লা ভারী হচ্ছে এরি ওপর নির্ভর করবে আখেরাতে তার ভালো বা মন্দ পরিণাম। যে বস্তুবাদী মানসিকতায় আচ্ছর হয়ে মানুষ মৃত্যুর পূর্ব মৃহূর্ত পর্যন্ত দুনিয়ার লাভ, স্বার্থ, আয়েশ-আরাম, তোগ ও মর্যাদা বেশী বেশী করে অর্জন করার ও পরম্পর থেকে অগ্রবর্তী হবার প্রতিমোগিতায় মেতে ওঠে সূরা তাকাসুরে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। তারপর এই গাফলতির অশুভ পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ করে বলা হয়েছে—এ দুনিয়া কোন সূচীর মাল নয় যে, তার ওপর তোমরা ইচ্ছামতো হাত সাফাই করতে থাকবে। বরং এখানে তুমি এর যেসব নিয়মামত পাচ্ছে তার প্রত্যেকটি কিভাবে অর্জন করেছো এবং কিভাবে ব্যবহার করেছো তার জন্য তোমার রবের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সূরা আসূ-এ একেবারে দ্ব্যাধীনভাবে বলা হয়েছে, যদি মানবজাতির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ইমান ও সৎকাজ না থাকে এবং তার সমাজ ব্যবস্থায় হক পথ অবলম্বন ও সবর করার উপদেশ দেবার গ্রীতি ব্যাপকতা লাভ না করে, তাহলে তার প্রত্যেক ব্যক্তি, দেশ, জাতি এমনকি সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ক্ষতির মধ্যে অবস্থান করবে। এর পরপরই আসছে সূরা ‘আল হ্মায়াহ।’ এখানে জাহেলী যুগের নেতৃত্বের একটি নমুনা পেশ করে লোকদের সামনে যেন এ প্রশ্ন রাখা হয়েছে যে, এই ধরনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডের অধিকারী ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কেন?

আয়াত ৯

সূরা আল হমায়াহ-মকী

রুক্ত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَبِلِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَرَّةٍ ۝ ۱ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعْدَ لَهُ ۝
 بِحَسْبِ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَقَ ۝ ۲ ۝ كَلَّا لَيَنْبَذِنَ فِي الْحَطَمَةِ ۝ ۳
 وَمَا أَدْرِكَ مَا الْحَطَمَةُ ۝ ۴ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ۝ ۵ ۝ الَّتِي تَطْلَعُ
 إِلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ ۶ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَلَةٌ ۝ ۷ ۝ فِي عَمَلٍ مُمْلَدَةٍ ۝ ۸

ধৰ্মস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা সামনি) লোকদের ধিক্কার দেয় এবং (পেছনে) নিন্দা করতে অভ্যন্ত।^১ যে অর্থ জমায় এবং তা শুণে শুণে রাখে।^২ সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ চিরকাল তার কাছে থাকবে।^৩ কখনো নয়, তাকে তো চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জ্ঞানগায়^৪ ফেলে দেয়া হবে।^৫ আর তুমি কি জানো সেই চূর্ণ-বিচূর্ণকারী জ্ঞানগাটি কি? আল্লাহর আশুন,^৬ প্রচণ্ডভাবে উৎক্ষিত, যা হৃদয় অভ্যন্তরে পৌছে যাবে।^৭ তা তাদের ওপর ঢেকে দিয়ে বন্ধ করা হবে^৮ (এমন অবস্থায় যে তা) উচু উচু থামে (ঘেরাও হয়ে থাকবে)।^৯

১. এখানে মূল শব্দ হচ্ছে **فُمْزَةٌ لَمَرَّةٌ**। আরবী ভাষায় এই শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে অনেক বেশী কাছাকাছি অবস্থান করছে। এমন কি কখনো শব্দ দু'টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হয়। কিন্তু সে পার্থক্যটা এমন পর্যায়ের যাই ফলে একদল লোক “হমায়াহ”র যে অর্থ করে, অন্য একদল লোক “নুমায়া”রও সেই একই অর্থ করে। আবার এর বিপরীত পক্ষে কিছু লোক “নুমায়াহ”র যে অর্থ বর্ণনা করে, অন্য কিছু লোকের কাছে “হমায়াহ”র ও অর্থ তাই। এখানে যেহেতু দু'টি শব্দ এক সাথে এসেছে এবং “হমায়াহ” ও “নুমায়াহ” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাই উভয় মিলে এখানে যে অর্থ দোড়ায় তা হচ্ছে : সে কাউকে লালিত ও তুচ্ছ তাছিল্য করে। কাঠোর প্রতি তাছিল্য ভরে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কাঠো বংশের নিন্দা করে। কাঠো ব্যক্তি সন্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কাঠো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করে। কাঠো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়। কোথাও চোখলখুরী করে এবং এর কথা ওর কানে লাগিয়ে বন্ধুদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে

১। দেয়। কোথাও ভাইদের পারস্পরিক ঐক্যে ফাটল ধরায়। কোথাও লোকদের নাম বিকৃত করে খারাপ নামে অভিহিত করে। কোথাও কথার ঘোচায় কাউকে আহত করে এবং কাউকে দোষাত্ত্বাপ করে। এসব তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

২. প্রথম বাক্যটির পর এই দ্বিতীয় বাক্যটির থেকে স্বতন্ত্রভাবে এ অর্থই প্রকাশিত হয় যে, নিজের অগাধ ধনদৌলতের অহঙ্কারে সে মানুষকে এভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে। অর্থ জমা করার জন্য **لِمَ جُمْدُ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে অর্থ প্রাচুর্য বুঝা যায়। তারপর 'গুণে গুণে রাখা' থেকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কার্পণ্য ও অর্থ লালসার ছবি চোখের সামনে তেমনে ওঠে।

৩. এর আর একটি অর্থ হতে পারে। তা হচ্ছে এই যে, সে মনে করে তার অর্থ-সম্পদ তাকে চিরন্তন জীবন দান করবে। অর্থাৎ অর্থ জমা করার এবং তা গুণে রেখে দেবার কাজে সে এত বেশী মশগুল যে নিজের মৃত্যুর কথা তার মনে নেই। তার মনে কখনো এ চিন্তার উদয় হয় না যে, এক সময় তাকে এসব কিছু ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে।

৪. মূলে হতামা (**حَطَّمَ**) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হাত্ম (**حَاطِمَ**)। হাত্ম মানে তেজে ফেলা, পিষে ফেলা ও টুকরা টুকরা করে ফেলা। জাহানামকে হাত্ম নামে অভিহিত করার কারণ হচ্ছে এই যে, তার মধ্যে যা কিছু ফেলে দেয়া হবে তাকে সে নিজের গভীরতা ও আগুনের কারণে তেজে গুড়িয়ে রেখে দেবে।

৫. আসলে বলা হয়েছে **لَيْبَنَدْ**। আরবী ভাষায় কোন জিনিসকে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া অর্থে **لَيْبَنَدْ** শব্দটি ব্যবহার করা হয়। এ থেকে আপনা আপনি এই ইঁশিত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নিজের ধনশালী হওয়ার কারণে সে দুনিয়ায় নিজেকে অনেক বড় কিছু মনে করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে সৃণাত্মে ছুঁড়ে দেয়া হবে।

৬. কুরআন মজীদের একমাত্র এখানে ছাড়া আর কোথাও জাহানামের আগুনকে আল্লাহর আগুন বলা হয়নি। এখানে এই আগুনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করার মাধ্যমে কেবলমাত্র এর প্রচণ্ডতা ও তয়াবহতারই প্রকাশ হচ্ছে না। বরং এই সংগে এও জানা যাচ্ছে যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ লাভ করে যাবা অহংকার ও আভাসরিতায় মেঠে ওঠে তাদেরকে আল্লাহ কেমন প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেবে থাকেন। এ কারণেই তিনি জাহানামের এই আগুনকে নিজের বিশেষ আগুন বলেছেন এবং এই আগুনেই তাকে নিক্ষেপ করা হবে।

৭. আসল বাক্যটি হচ্ছে, 'أَتَطْلَعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ' এখানে তাভালিউ (**تَطْلِعُ**) শব্দটির মূলে হচ্ছে 'ইভিলা' এর 'আল্লাহ' (**اَللَّهُ**) একটি অর্থ হচ্ছে চড়া, আঁকোহণ করা ও ওপরে পৌছে যাওয়া। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, অবগত হওয়া ও খবর পাওয়া। আফ্রিদাহ (**أَفْرَدَهُ**) হচ্ছে বহবচন। এর একবচন ফুওয়াদ (**فَوَادَ**) এর মানে হ্রদয়। কিন্তু বুকের মধ্যে যে হৃদপিণ্ডটি সবসময় ধূক ধূক করে তার জন্যও ফুওয়াদ শব্দটি ব্যবহার করা হয় না। বরং মানুষের চেতনা, জ্ঞান, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা, বিশ্বাস, সংকলন ও নিয়ন্ত্রের কেন্দ্রস্থলকেই এই শব্দটি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। হ্রদয় পর্যন্ত এই আগুন পৌছবার একটি

অর্থ হচ্ছে এই যে, এই আগুন এমন জায়গায় পৌছে যাবে যেখানে মানুষের অসৎচিত্তা, ভুল আকীদা-বিশ্বাস, অপবিত্র ইচ্ছা, বাসনা, প্রবৃত্তি, আবেগ এবং দুষ্ট সংকল্প ও নিয়তের কেন্দ্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর এই আগুন দুনিয়ার আগুনের মতো অস্ত হবে না। সে দোষী ও নির্দোষ সবাইকে জ্বালিয়ে দেবে না। বরং প্রত্যেক অপরাধীর হন্দয় অভ্যন্তরে পৌছে সে তার অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে এবং প্রত্যেককে তার দোষ ও অপরাধ অনুযায়ী আয়াব দেবে।

৮. অর্থাৎ অপরাধীদেরকে জাহানামের মধ্যে নিক্ষেপ করে ওপর থেকে তা বন্ধ করে দেয়া হবে। কোন দরজা তো দূরের কথা তার কোন একটি ছিদ্রও খোদা থাকবে না।

৯. ফি আযাদিম মুমান্দাদাহ (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) এর একাধিক মানে হতে পারে। যেমন এর একটি মানে হচ্ছে, জাহানামের দরজাগুলো বন্ধ করে দিয়ে তার ওপর উচু উচু থাম গেড়ে দেয়া হবে। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এই অপরাধীরা উচু উচু থামের গায়ে বৈধা থাকবে। এর তৃতীয় অর্থ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন, এই আগুনের শিখাগুলো জয়া লয়া থামের আকারে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে।

আল ফীল

১০৫

নামকরণ

প্রথম আয়তের আসহাবিল ফীল (أَصْحَابُ الْفِيلِ) শব্দ থেকে এর নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটির মক্ষী হবার ব্যাপারে সবাই একমত। এর ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রাখলে মক্ষা মু'আয়য়ায় ইসলামের প্রথম যুগে এটি নাযিল হয় বলে মনে হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এর আগে সূরা বুরুজের ৪ টিকায় উল্লেখ করে এসেছি, ইয়ামনের ইহদী শাসক যুনুওয়াস নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের ওপর যে জুনুম করেছিল তার প্রতিশোধ নেবার জন্য হাবশার (বর্তমান ইথিয়োপিয়া) খৃষ্টীয় শাসনকর্তা ইয়ামন আক্রমণ করে হিমইয়ারী শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। ৫২৫ খৃষ্টাব্দে এই সমগ্র এলাকাটিতে হাবশার শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আসলে কলষ্টানিনোপলের রোমীয় শাসনকর্তা ও হাবশার শাসকের পারস্পরিক সহযোগিতায় এই সমগ্র অভিযান পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ সে সময় হাবশার শাসকদের কাছে কোন উল্লেখযোগ্য নৌবহর ছিল না। রোমীয়রা এ নৌবহর সরবরাহ করে। এর মাধ্যমে হাবশা তার ৭০ হাজার সৈন্য ইয়ামন উপকূলে নামিয়ে দেয়। পরবর্তী বিষয়গুলো অনুধাবন করার জন্য শুরুতেই জেনে নেয়া উচিত যে, নিচের ধর্মীয় আবেগ তাড়িত হয়ে এসব কিছু করা হয়নি। বরং এসবের পেছনে অথনেতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থও সক্রিয় ছিল। বরং সম্ভবত সেগুলোই এর মূল প্রেরণা: সূষ্টি করেছিল এবং খৃষ্টান মজলুমদের খনের বদলা নেবার ব্যাপারটি একটি বাহানাবাজী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আসলে সেকালে পূর্ব আফ্রিকা, তারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ও রোম অধিকৃত এলাকার মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তার ওপর আরবরা শত শত বছর থেকে একচ্ছত্র আধিগত্য বিস্তার করে চলে আসছিল। রোমান শাসকরা মিসর ও সিরিয়া দখল করার পর থেকেই এই ব্যবসার ওপর থেকে আরবদের আধিগত্য বিস্তৃত করে একে পুরোপুরি নিজেদের কর্তৃত্বাধীন করতে চাইছিল। কেননা মাঝখান থেকে আরব ব্যবসায়ীদেরকে হটিয়ে দিতে পারলে এর পুরো মুনাফা তারা সরাসরি নিজেরা লাভ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে খৃষ্টপূর্ব ২৪ বা ২৫ অদ্বৈ কাইজার আগাষ্টাস রোমান জেনারেল ইলিয়াস গালুসের (Aelius Gallus) নেতৃত্বে একটি বিরাট সেনাদল আরবের পশ্চিম

উপকূলে নামিয়ে দেয়। দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত সমুদ্রপথ অধিকার করে নেয়াই ছিল এর লক্ষ। (তাফহীমুল কুরআনের সূরা আনফালের আলোচনা প্রসঙ্গে আমি এ বাণিজ্য পথের নকশা পেশ করেছি।) কিন্তু আরবের চরম প্রতিকূল তৌগলিক অবস্থা ও পরিবেশ এ অভিযানকে ব্যর্থ করে দেয়। এরপর রোমানরা সোহিত সাগরে তাদের নৌবহর স্থাপন করে। এর ফলে সমুদ্র পথে আরবদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। তাদের ব্যবসার জন্য কেবলমাত্র হৃষ্টান উন্মুক্ত থেকে যায়। এই হৃষ্টপথটি দখল করে নেবার জন্য তারা হাবশার খৃষ্টান সরকারের সাথে চক্রান্ত করে এবং সামুদ্রিক নৌবহরের সহায়তায় তাকে ইয়ামনের ওপর কর্তৃত দান করে।

ইয়ামন আক্রমণকারী হাবশী সেনাদল সম্পর্কে আরব ঐতিহাসিকগণ যে বিবরণ পেশ করেছেন তাতে বেশ মতপার্থক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাসীর লিখেছেন, এ সেনাদল পরিচালিত হয়েছিল দু'জন সেনাপতির অধীনে। তাদের একজন ছিল আরইয়াত এবং অন্যজন আবরাহা। অন্যদিকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে আরইয়াত ছিল এই সেনাবাহিনীর সেনাপতি এবং আবরাহা ছিল এর একজন সদস্য। এরপর এ দু'জন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, পরে আরইয়াত ও আবরাহার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধে আরইয়াতের মৃত্যু হয়। আবরাহা ইয়ামন দখল করে। তারপর তাকে হাবশার অধীনে ইয়ামনের গভর্নর নিযুক্ত করার ব্যাপারে সে হাবশা সম্ভাটকে সম্মত করতে সক্ষম হয়। বিপরীত পক্ষে গ্রীক ও সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে ডি঱ বিবরণ পেশ করেছেন। তাদের বর্ণনা মতে, ইয়ামন জয় করার পরে হাবশী সৈন্যরা যখন প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ইয়ামনী সরদারদেরকে একের পর এক হত্যা করে চলছিল তখন তাদের “আসু সুমাইফি আশওয়া” যাকে গ্রীক ঐতিহাসিকরা বলেছেন Esymphaeus নামক একজন সরদার হাবশীদের আনুগত্য ঝীকার করে জিজিয়া দেবার অংশীকার করে এবং হাবশা সম্ভাটের কাছ থেকে ইয়ামনের গভর্নর হবার পরোয়ানা হাসিল করে কিন্তু হাবশী সৈন্যরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। তারা আবরাহাকে তার জায়গায় গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত করে। আবরাহা ছিল হাবশার আদুলিস বন্দরের একজন গ্রীক ব্যবসায়ীর ত্রীতদাস। নিজের বৃদ্ধিমত্তার জোরে সে ইয়ামন দখলকারী হাবশী সেনাদলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। হাবশা সম্ভাট তাকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী পাঠায়। কিন্তু এই সেনাদল হয় তার পক্ষে যোগ দেয় অথবা সে এই সেনাদলকে পরাজিত করে। অবশেষে হাবশা সম্ভাটের মৃত্যুর পর তার উস্তুরাধিকারী তাকে ইয়ামনে নিজের গভর্নর হিসেবে ঝীকার করে নেয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ তার নাম বলেছেন আবরামিস (Abrahimes) এবং সুরিয়ানী ঐতিহাসিকগণ তাকে আবরাহাম (Abraham) নামে উল্লেখ করেছেন। আবরাহা সম্ভবত এরই হাবশী উচ্চারণ। কারণ আরবীতে তো এর উচ্চারণ ইবরাহীম।)

এ ব্যক্তি ধীরে ইয়ামনের স্বাধীন বাদশাহ হয়ে বসে। তবে নামকাওয়াত্তে হাবশা সম্ভাটের প্রাধান্যের ঝীকৃতি দিয়ে রেখেছিল এবং নিজের নামের সাথে সম্ভাট প্রতিনিধি লিখতো। তার প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেশী বেড়ে গিয়েছিল। একটি ব্যাপার থেকে এ সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে সন্দে মাজারিব-এর সংস্কার কাজ শেষ করে সে একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবে রোমের কাইজার,

ইরানের বাদশাহ, ইরার বাদশাহ এবং গাসুসানের বাদশাহর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। সদ্বে মাঝারিবে আবরাহা স্থাপিত শিলালিপিতে এ সম্পর্কিত পূর্ণ আলোচনা সম্পর্কিত রয়েছে। এই শিলালিপি আজো অক্ষুণ্ণ রয়েছে। গ্লেসার (Glaser) তার গবেষণাটি উদ্ভৃত করেছেন। (আরো বেশী জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা ৩৭ টিকা)।

এই অভিযান প্রেরণ গোড়াতেই রোমান সাম্রাজ্য ও তার মিত্র হাবশী খ্রিস্টানদের সামনে যে উদ্দেশ্য বর্তমান ছিল ইয়ামনে নিজের কর্তৃত পুরোপুরি ঘূর্ণবৃত্ত করার পর আবরাহা সেই উদ্দেশ্য সফল করার কাজে আত্মনির্যোগ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, একদিকে আরবে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা এবং অন্যদিকে আরবদের মাধ্যমে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে যে ব্যবসা চলতো তাকে পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে আসা। ইরানের সাসানী সাম্রাজ্যের সাথে রোমানদের কর্তৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে প্রাচ্য দেশে রোমানদের ব্যবসার অন্যান্য সমস্ত পথ বক্ষ হয়ে যায়। এ কারণে এর প্রয়োজন আরো বেশী বেড়ে যায়।

এ উদ্দেশ্যে আবরাহা ইয়ামনের রাজধানী 'সান্নাম'য় একটি বিশাল গীর্জা নির্মাণ করে। আরব ঐতিহাসিকগণ একে 'আল কালীস' বা 'আল কুলীস' অথবা 'আল কুন্নাইস' নামে উল্লেখ করেছেন। এটি গ্রীক Ekklesia শব্দের আরবীকরণ। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, একাজটি সম্পূর্ণ করার পর সে হাবশার বাদশাহকে লিখে জানায়, আমি আরবদের হজ্জকে মক্কার কা'বার পরিবর্তে সানামার এ গীর্জার দিকে ফিরিয়ে না দিয়ে ক্ষান্ত হবো না।* ইবনে কাসীর লিখেছেন, সে ইয়ামনে প্রকাশ্যে নিজের এই সংকলনের কথা প্রকাশ করে এবং চতুর্দিকে ঘোষণা করে দেয়। আমাদের মতে তার এ ধরনের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এর ফলে আরবরা কুন্ন হয়ে এমন কোন কাজ করে বসবে যাকে বাহানা বানিয়ে সে মক্কা আক্রমণ করে কাবাঘর ধ্বনি করে দেবার সুযোগ লাভ করবে। মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, তার এ ধরনের ঘোষণায় কুন্ন হয়ে জনৈক আরব কোন প্রকারে তার গীর্জার মধ্যে প্রবেশ করে সেখানে মল ত্যাগ করে। ইবনে কাসীর বলেন, এ কাজটি করেছিল একজন কুরাইশী। অন্যদিকে মুকাতিল ইবনে সুলাইমানের বর্ণনা মতে, কয়েকজন কুরাইশ যুবক গিয়ে সেই গীর্জায় আগুন লাগিয়ে দেয়। এর মধ্য থেকে যে কোন একটি ঘটনাই যদি সত্যি সত্যিই ঘটে থাকে তাহলে এতে বিশ্বরের কিছু নেই। কারণ আবরাহার এ ঘোষণাটি ছিল নিচিতভাবে অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী। এ কারণে প্রাচীন জাহেলী যুগের কোন আরব বা কুরাইশীর অথবা কয়েকজন কুরাইশী যুবকের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে গীর্জাকে নাপাক করা অথবা তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়া কোন অব্যাক্তিক বা দুর্বোধ্য ব্যাপার ছিল না। কিন্তু আবরাহার নিজের পক্ষেও নিজের কোন লোক লাগিয়ে গোপনে গোপনে এই ধরনের কোন কাণ্ড করে ফেলাটাও অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয় না। কারণ সে এভাবে মক্কা আক্রমণ করার বাহানা সৃষ্টি

* ইয়ামনের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত লাভ করার পর খ্রিস্টান মক্কার কা'বাঘরের মোকাবিলায় বিভিন্ন একটি কা'বা তৈরি করার এবং সমগ্র আরবে তাকে কেন্দ্রীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা নাজরানেও একটি কা'বা নির্মাণ করেছিল। সূরা বুরজের ৪ টিকায় এর আলোচনা এসেছে।

করতে এবং কুরাইশদেরকে ধ্বংস ও সমগ্র আরববাসীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়ে নিজের উভয় উদ্দেশ্যে সফলকাম হতে পারবে বলে মনে করছিল। মোটকথা দু'টি অবস্থার মধ্য থেকে যেকোন একটিই সঠিক হোক না কেন, আবরাহার কাছে যখন এ রিপোর্ট পৌছল যে, কাবার ভক্ত অনুরক্তরা তার গীর্জার অবমাননা করেছে তখন সে কসম খেয়ে বসে, ক'বাকে শুভ্রিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে না দেয়া পর্যন্ত আমি হির হয়ে বসবো না।

তারপর ৫৭০ বা ৫৭১ খৃষ্টাব্দে সে ৬০ হাজার পদাতিক, ১৩টি হাতি (অন্য বর্ণনা মতে ১৮টি হাতি) সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হয়। পথে প্রথমে যু-নফর নামক ইয়ামনের একজন সরদার আরবদের একটি সেনাদল সংগ্রহ করে তাকে বাধা দেয়। কিন্তু যুদ্ধে সে পরাজিত ও ধৃত হয়। তারপর খাশ'আম এলাকায় নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমী তার গোত্রের লোকদের নিয়ে তার পথ রোধ করে। কিন্তু সেও পরাজিত ও প্রেফতার হয়ে যায়। সে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আবরাহার সেনাদলের পথপ্রদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ সেনাদল তায়েফের নিকটবর্তী হলে বনু সকীফ অনুভব করে এত বড় শক্তির মোকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের নেই এবং এই সংগে তারা এ আশক্তোষ করতে থাকে যে, হয়তো তাদের লাত দেবতার মন্দিরও তারা তেঙ্গে ফেলবে। ফলে তাদের সরদার মাসউদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে আবরাহার সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাকে বলে, আপনি যে উপাসনালয়টি তাঙ্গতে এসেছেন আমাদের এ মন্দিরটি সে উপাসনালয় নয়। সেটি মক্কায় অবস্থিত। কাজেই আপনি আমাদেরটায় হাত দেবেন না। আমরা মক্কার পথ দেখাবার জন্য আপনাকে পথপ্রদর্শক সংগ্রহ করে দিচ্ছি। আবরাহ তাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফলে বনু সকীফ আবু রিগাল নামক এক ব্যক্তিকে তার সাথে দিয়ে দেয়। মক্কা পৌছতে যখন আর মাত্র তিনি ক্রোশ পথ বাকি তখন আল মাগান্দাস বা আল মুগামিস নামক হানে পৌছে আবু রিগাল মারা যায়। আবরাহ দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার কবরে পাথর মেরে এসেছে। বনী সাকীফকেও তারা বছরের পর বছর ধরে এই বলে ধিক্কার দিয়ে এসেছে। —তোমরা লাতের মন্দির বাঁচাতে গিয়ে আল্লাহর ঘরের উপর আক্রমণকারীদের সাথে সহযোগিতা করেছো।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মতে, আল মাগামেস থেকে আবরাহ তার অঘবাহিনীকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। তারা তিহামার অধিবাসীদের ও কুরাইশদের উট, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বহু পালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে রসমুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাদা আবদুল মুস্তালিবেরও দু'শো উট ছিল। এরপর সে মক্কাবাসীদের কাছে নিজের একজন দৃতকে পাঠায়। তার মাধ্যমে মক্কাবাসীদের কাছে এই মর্মে বাণী পাঠায় : আমি তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমি এসেছি শুধুমাত্র এই ঘরটি (কাবা) তেজে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। যদি তোমরা যুদ্ধ না করো তাহলে তোমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পত্তির কোন ক্ষতি আমি করবো না। তাছাড়া তার এক দৃতকেও মক্কাবাসীদের কাছে পাঠায়। মক্কাবাসীরা যদি তার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তাদের সরদারকে তার কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। আবদুল মুস্তালিব তখন ছিলেন মক্কার সবচেয়ে বড় সরদার। দৃত তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আবরাহার পয়গাম তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তিনি বলেন, আবরাহার সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। এটা আল্লাহর ঘর তিনি চাইলে তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। দৃত বলে, আপনি আমার সাথে

আবরাহার কাছে চলুন। তিনি সম্মত হন এবং দূতের সাথে আবরাহার কাছে যান। তিনি এতই সুন্দী, আকর্ষণীয় ও প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, আবরাহা তাকে দেখে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে পড়ে। সে সিংহাসন থেকে নেমে এসে নিজে তাঁর কাছে বসে পড়ে। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কি চান? তিনি বলেন, আমার যে উটগুলো ধরে নেয়া হয়েছে সেগুলো আমাকে ফেরত দেয়া হোক। আবরাহা বলল, আপনাকে দেখে তো আমি বড়ই প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু আপনি নিজের উটের দাবী জানাচ্ছেন, অথচ এই যে ঘরটা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষদের ধর্মের কেন্দ্র সে সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, আপনার এ বক্তব্য আপনাকে আমার দৃষ্টিতে মর্যাদাহীন করে দিয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো কেবল আমার উটের মালিক এবং সেগুলোর জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আর এই ঘর। এর একজন রব, মালিক ও প্রভু আছেন। তিনি নিজেই এর হেফাজত করবেন। আবরাহা জবাব দেয়, তিনি একে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এ ব্যাপারে আপনি জানেন ও তিনি জানেন। একথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে পড়েন। আবরাহা তাঁকে তাঁর উটগুলো ফিরিয়ে দেয়।

ইবনে আবুস (রা) তিনি ধরনের বর্ণনা পেশ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় উট দাবীর কোন কথা নেই। আবদ ইবনে হমাইদ, ইবনুল মুন্যির, ইবনে মারদুইয়া, হাকেম, আবু নুঁ'আইম ও বাইহাকী তাঁর থেকে যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেন, আবরাহা আসিফাই (আরাফাত ও তায়েফের পাহাড়গুলোর মধ্যে হারম শরীফের সীমানার কাছাকাছি একটি স্থান) পৌছে গেলে আবদুল মুত্তালিব নিজেই তার কাছে যান এবং তাকে বলেন, আপনার এখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? আপনার কোন জিনিসের প্রয়োজন থাকলে আমাদের কাছে বলে পাঠাতেন। আমরা নিজেরাই সে জিনিস নিয়ে আপনার কাছে পৌছে যেতাম। জবাবে সে বলে, আমি শুনেছি, এটি শাস্তি ও নিরাপত্তার ঘর। আমি এর শাস্তি ও নিরাপত্তা খতম করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব বলেন, এটি আল্লাহর ঘর। আজ পর্যন্ত তিনি কাউকে এর উপর চেপে বসতে দেননি। আবরাহা জবাব দেয়, আমি একে বিদ্ধস্ত না করে এখান থেকে সরে যাবো না। আবদুল মুত্তালিব বলেন, আপনি যা কিছু চান আমাদের কাছ থেকে নিয়ে চলে যান। কিন্তু আবরাহা অবীকার করে। আবদুল মুত্তালিবকে পেছনে রেখে নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে সে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

উভয় বর্ণনার এ বিভিন্নতাকে যদি আমরা যথাস্থানে রেখে দিই এবং এদের মধ্য থেকে একটিকে অন্যটির উপর প্রাধান্য না দিই তাহলে যে ঘটনাটিই ঘটুক না কেন আমাদের কাছে একটি জিনিস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেটি হচ্ছে, মক্কা ও তার চারপাশের গোত্রগুলো এতবড় সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করে কাবাকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখতো না। কাজেই একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, কুরাইশরা তাদেরকে বাধা দেবার চেষ্টাই করেনি। কুরাইশরা তো আহ্যাবের যুদ্ধের সময় মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে বড় জোর দশ বারো হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল। কাজেই তারা ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করতো কিভাবে?

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, আবরাহার সেনাদলের কাছ থেকে ফিরে এসে আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদেরকে বলেন, নিজেদের পরিবার পরিজনদের নিয়ে পাহাড়ের উপর চলে যাও, এভাবে তারা ব্যাপক গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। তারপর তিনি ও কুরাইশদের কয়েকজন সরদার হারম শরীফে হায়ির হয়ে যান। তারা কাবার দরজার কড়া

ধরে আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করতে থাকেন যে, তিনি যেন তাঁর ঘর ও তাঁর খাদেমদের হেফাজত করেন। সে সময় কাবা ঘরে ৩৬০টি মূর্তি ছিল। কিন্তু এই সংকটকালে তারা সবাই এই মূর্তিগুলোর কথা ভুলে যায়। তারা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার জন্য হাত উঠায়। ইতিহাসের বইগুলোতে তাদের প্রার্থনা বাণী উদ্ধৃত হয়েছে তার মধ্যে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম পর্যন্ত পাওয়া যায় না। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে আবদুল মুস্তালিবের নিম্নোক্ত কবিতাসমূহ উদ্ধৃত করেছেন :

لَا هُمْ أَنَّ الْعَبْدَ يَمْنَعُ رَحْلَهُ فَامْنَعْ حَلَالَكَ

“হে আল্লাহ! বান্দা নিজের ঘর রক্ষা করে
তুমিও তোমার ঘর রক্ষা করো।”

وَمَحَالَهُمْ غَدْوًا مَحَالٍ لَكَ

“আগামীকাল তাদের ক্রুশ ও তাদের কৌশল যেন
তোমার কৌশলের ওপর বিজয় লাভ না করে।”

إِنْ كُنْتَ تَارِكَهُمْ وَقَبْلَتَنَا فَامْرُ مَابِدَالِكَ

“যদি তুমি ছেড়ে দিতে চাও তাদেরকে ও আমাদের কিবলাহকে
তাহলে তাই করো যা তুমি চাও।”

সুহাইলী ‘রওয়ুল উনুফ’ গ্রন্থে এ প্রসংগে নিম্নোক্ত কবিতাও উদ্ধৃত করেছেন :

وَانصَرْنَا عَلَى الْصَّلِيبِ وَعَابِدِيَ الْيَوْمِ الْكَ

“ক্রুশের পরিজন ও তার পূজারীদের মোকাবিলায়
আজ নিজের পরিজনদেরকে সাহায্য করো।”

আবদুল মুস্তালিব দোয়া করতে করতে যে, কবিতাটি পড়েছিলেন ইবনে জারীর সেটিও উদ্ধৃত করেছেন। সেটি হচ্ছে :

يَارَبِ لَا ارْجُو لَهُمْ سَوْاكَا يَارَبِ فَامْنَعْ مِنْهُمْ حَمَاكَا

إِنْ عَدُوَ الْبَيْتِ مِنْ عَادِكَا إِنْ نَعْهُمْ أَنْ يَخْرِبُوا قَرَاكَا

“হে আমার রব! তাদের মোকাবিলায়
তুমি ছাড়া কারো প্রতি আমার আশা নেই,
হে আমার রব! তাদের হাত থেকে
তোমার হারমের হেফাজত করো।
এই ঘরের শক্র তোমার শক্র,
তোমার জনপদ ধ্বংস করা থেকে
তাদেরকে বিরত রাখো।”

এ দোয়া করার পর আবদুল মুস্তালিব ও তার সাথিরাও পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। পরের দিন আবরাহা মকায় প্রবেশ করার জন্য এগিয়ে যায়। কিন্তু তার বিশেষ হাতী মাহমুদ ছিল

সবার আগে, সে হঠাৎ বসে পড়ে। কুড়ালের বাটি দিয়ে তার গায়ে অনেকক্ষণ আঘাত করা হয়। তারপর বারবার অঙ্কুশাঘাত করতে করতে তাকে আহত করে ফেলা হয়। কিন্তু এত বেশী মারপিট ও নির্যাতনের পরেও সে একটুও নড়ে না। তাকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে মুখ করে চালাবার চেষ্টা করলে সে ছুটতে থাকে কিন্তু মুক্তির দিকে মুখ ফিরিয়ে দিলে সংগে সংগেই গ্যাট হয়ে বসে পড়ে। কোন রকমে তাকে আর একটুও নড়ানো যায় না।

এ সময় ঝৌকে ঝৌকে পাখিরা ঠোটে ও পাঞ্জায় পাথর কণা নিয়ে উড়ে আসে। তারা এ সেনাদলের ওপর পাথর বর্ষণ করতে থাকে। যার ওপর পাথর কণা পড়তো তার দেহ সংগে সংগে গলে যেতে থাকতো। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইকরামার বর্ণনা মতে, এটা ছিল বসন্ত ঝোগ এবং আরব দেশে সর্বপ্রথম এ বছরই বসন্ত দেখা যায়। ইবনে আবাসের (রা) বর্ণনা মতে, যার ওপরই পাথর কণা পড়তো তার সারা গায়ে ভীষণ চুলকানি শুরু হতো এবং চুলকাতে চুলকাতে চামড়া ছিঁড়ে গোশত ঝরে পড়তে থাকতো। ইবনে আবাস (রা) আর একটি বর্ণনায় বলেছেন, গোশত ও রজু পানির মতো ঝরতে থাকতো এবং হাড় বের হয়ে পড়তো। আবরাহা নিজেও এই অবস্থার সম্মুখীন হয়। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তো এবং সেখান থেকে এক টুকরো গোশত খসে পড়তো সেখান থেকে রজু ও পুর্জ ঝরে পড়তে থাকতো। বিশ্বখ্লা ও হড়োহড়ি ছুটাছুটির মধ্যে তারা ইয়ামনের দিকে পালাতে শুরু করে। খাশ'আম এলাকা থেকে যে নুফাইল ইবনে হাবীব খাশ'আমীকে তারা পথপ্রদর্শক হিসেবে নিয়ে আসে তাকে খুঁজে পেয়ে সামনে নিয়ে আসা হয় এবং তাকে ফিরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতে বলা হয়। কিন্তু সে সরাসরি অস্বীকার করে বসে। সে বলে :

أين المفرو أللهم الطالب ولا شرم المغلوب ليس الغالب

“এখন পালাবার জায়গা কোথায়
যখন আল্লাহ নিজেই করছেন পঞ্চান্তরন?
আর নাককাটা আবরাহা পরাজিত
সে বিজয়ী নয়।”

এই পলায়ন তৎপরতার মধ্যে লোকেরা পথে ঘাটে এখানে সেখানে পড়ে মরতে থাকে। আতা ইবনে ইয়ামন বর্ণনা করেছেন তখনই এক সাথে সবাই মারা যায়নি। বরং কিছু লোক সেখানে মারা পড়ে আর দৌড়াতে দৌড়াতে কিছু লোক পথের ওপর পড়ে যেতে থাকে। এভাবে সারাটা পথে তাদের লাশ বিছিয়ে থাকে। আবরাহা ও খাশ'আম এলাকায় পোছে মারা যায়।*

* মহান আল্লাহ হাবশীদেরকে শুধুমাত্র শাস্তি দিয়েই ক্ষতি থাকেননি বরং তিন চার বছরের মধ্যে ইয়ামনের ওপর থেকে হাবশী কর্তৃত পুরোপুরি খতম করে দেন। ইতিহাস থেকে জানা যায়, হাতির ঘটনার পর ইয়ামনে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে ইয়ামনী সরদাররা বিদ্রোহের কাণ্ড থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ করে। ছয়টি জাহাজে চড়ে ইরানের এক হাজার সৈন্য ইয়ামনে অবতরণ করে। হাবশী শাসনের অবসান ঘটাবার জন্য এ এক হাজার সৈন্য যথেষ্ট প্রয়োগিত হয়। এটা ৫৭৫ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

মুয়দালিফা ও মিনার মধ্যে অবস্থিত মহাসাব উপত্যকার সরিকটে মুহাস্সির নামক স্থানে এ ঘটনাটি ঘটে। ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলগ্রাহ সাপ্তাহাত আলাইহি ওয়া সালামের বিদায় হজ্জের যে ঘটনা ইমাম জাফর সাদেক তৌর পিতা ইমাম বাকের থেকে এবং তিনি হযরত জাবের ইবনে আবদগ্রাহ থেকে উদ্ভৃত করেছেন, তাতে তিনি বলেন : রসূলগ্রাহ সাপ্তাহাত আলাইহি ওয়া সালাম যখন মুয়দালিফা থেকে মিনার দিকে চলেন তখন মুহাস্সির উপত্যকায় তিনি চলার গতি দ্রুত করে দেন। ইমাম নববী এর ব্যাখ্যায় নিখেছেন, আসহাবে ফীলের ঘটনা এখানেই অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ জায়গাটা দ্রুত অভিক্রম করে যাওয়াটাই সুন্নাত। মুআভায় ইমাম মালিক রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলগ্রাহ সাপ্তাহাত আলাইহি ওয়া সালাম বলেন, মুয়দালিফার সমগ্র এলাকাটাই অবহান স্থল। তবে মুহাস্সির উপত্যকায় অবস্থান না করা উচিত। ইবনে ইসহাক নুফাইল ইবনে হাবীবের যেসব কবিতা উদ্ভৃত করেছেন তাতে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছে :

رَدِّيْنَةُ لَوْرِ أَيْتٍ وَلَا تَرِيْهِ
لَدِيْ جَنْبِ الْمَحَصِّبِ مَارَأِيْنَا
حَمْدَتِ اللَّهِ اذَا بَصَرْتَ طَيْرًا وَخَفْتَ حَجَرَةً تَلْقَى عَلَيْنَا
وَكُلَّ الْقَوْمِ يَسْئَالُونَ نَفِيلَ كَائِنَ عَلَى لِلْجَشَانِ دَيْنَا
”হায়, যদি তুমি দেখতে হে রুদাইনা!
তবে তুমি দেখতে পাবে না যা কিছু দেখেছি আমি
মুহাস্সাব উপত্যকার কাছে।
আল্লাহর শোকর করেছি আমি
যখন দেখেছি পাখিদেরকে
শৃঙ্কিত হচ্ছিলাম বুঝিবা পাথর ফেলে আমাদের ওপরও।
নুফাইলের সঙ্গানে ফিরছিল তাদের সবাই
আমি যেন হাবশীদের কাছে ঝণের দায়ে বাঁধা।”

এটা একটা মন্তব্ধ ঘটনা ছিল। সমগ্র আরবে এ ঘটনার কথা ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কবি এ নিয়ে কবিতা লেখেন। এ সমস্ত কবিতার একক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, সবখানেই একে আল্লাহর অলৌকিক ক্ষমতা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। কোন একটি কবিতাতেই ইশারা-ইঁগিতেও একথা বলা হয়নি যে, কা’বার অভ্যন্তরে রাক্ষিত যেসব মূর্তির পূজা করা হতো তাদের কারো এতে সামান্যতম হাত ছিল। উদাহরণ ব্রহ্মপুর অবদগ্রাহ ইবনে যিবা’রা বলেন :

سَتْوَنَ الْفَالِمَ يَؤْبُوا أَرْضَهُمْ وَلَمْ يَعْشُ بَعْدَ الْأَيَابِ سَقِيمَهَا
كَانَتْ بِهَا عَادٌ وَجَرَهمْ قَبْلَهُمْ وَاللَّهُ مِنْ فَوْقِ الْعِبَادِ يَقِيمَهَا

“ষাট হাজার ছিল তারা
 ফিরতে পারেনি নিজেদের ব্রদেশ ভূমিতে,
 আর ফেরার পরে তাদের রঞ্চ বাকি (আবরাহা) জীবিত থাকেনি।
 এখানে তাদের পূর্বে ছিল আদ ও জুরহম,
 আর আল্লাহ বান্দাদের উপর রয়েছেন,
 তাদেরকে রেখেছেন তিনি প্রতিষ্ঠিত করে।”

আবু কায়েস ইবনে আস্মাত তার কবিতায় বলেন :

فَقُومُوا فَصْلُوا رِبْكَمْ وَتَمْسَحُوا بَارِكَانْ هَذَا الْبَيْتُ بَيْنَ الْأَخَشْبِ
 فَلَمَّا أَتَكُمْ نَصْرَنِي الْعَرْشِي رَدْهَمْ جَنُودُ الْمَلِكِ بَيْنَ سَافِ وَحَاصِبِ

“ওঠো, তোমার রবের ইবাদাত করো,
 এবং মক্কা ও মিনার পাহাড়গুলোর মাঝখানে
 বাইতুল্লাহর কোণগুলো স্পর্শ করো।
 আরশবাসীদের সাহায্য যখন পৌছুল তোমাদের কাছে
 তখন সেই বাদশাহৰ সেনাবাহিনী
 তাদেরকে ফিরিয়ে দিল এমন অবস্থায়—
 তাদের কেউ পড়ে ছিল মৃত্যুকার পরে
 আর কেউ ছিল প্রস্তরাঘাতে হিম্মতিৱ।”

শুধু এখানেই শেষ নয় বরং হয়রত উম্মে হানী (রা) ও যুবাইর ইবনুল আওয়ামের (র) বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : কুরাইশরা ১০ বছর
 (অন্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী ৭ বছর) পর্যন্ত এক ও লাশরীক আল্লাহ ছাড়া আর কারো
 ইবাদাত করেনি। উম্মে হানীর রেওয়ায়াতটি ইমাম বুখারী তাঁর ‘তারীখ’ গ্রন্থে এবং
 তাবারানী, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী তাদের হাদীস গ্রন্থে উন্নত করেছেন।
 আর তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আসাকির হয়রত যুবাইরের (রা) বর্ণনাটি উন্নত
 করেছেন। খৃতীব বাগদাদী তার ইতিহাস গ্রন্থে হয়রত সান্দ ইবনুল মুসাইয়েবের যে
 মুরসাল রেওয়ায়াতটি উন্নত করেছেন তা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়।

যে বছর এ ঘটনাটি ঘটে, আরববাসীরা সে বছরটিকে ‘আমুল ফীল’ (হাতির বছর) বলে
 আখ্যায়িত করে। সেই বছরেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম হয়।
 আসছাবে ফীলের ঘটনাটি ঘটে মহররম মাসে। এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
 সাল্লামের জন্ম হয় রবিউল আউয়াল মাসে। এ বিষয়ে সকল মুহাদিস ও ঐতিহাসিক
 একমত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে, রসূলের (সা) জন্ম হয় হাতির ঘটনার ৫০ দিন
 পরে।

শুল্ক বক্তব্য

ওপরের যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংযোজন করা হয়েছে সেগুলো সামনে রেখে চিন্তা করলে এ সূরায় কেন শুধুমাত্র আসহাবে ফীলের ওপর মহান আল্লাহর আযাবের কথা বর্ণনা করেই শেষ করে দেয়া হয়েছে তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ঘটনা খুব বেশী পূরানো ছিল না। মুক্তির সবাই এ ঘটনা জানতো। আরবের সোকেরা সাধারণভাবে এ সম্পর্কে অবহিত ছিল। সমগ্র আরববাসী স্বীকার করতো আবরাহার এ আক্রমণ থেকে কোন দেবতা বা দেবী নয় বরং আল্লাহ ক'বার হেফাজত করেছেন। কুরাইশ সরদাররা আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করেছিল। আবার এ ঘটনা কুরাইশদেরকে কয়েক বছর পর্যন্ত এত বেশী প্রভাবিত করে রেখেছিল যে, তারা সে সময় একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করেনি। তাই সূরা ফীলে এসব বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল না। বরং শুধুমাত্র এ ঘটনাটি খরণ করিয়ে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। এভাবে খরণ করিয়ে দেবার ফলে বিশেষ করে কুরাইশরা এবং সাধারণভাবে সমগ্র আরববাসী মনে মনে এ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে পারে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের দিকে আহবান জানাচ্ছেন সেটি অন্যান্য মাবুদদেরকে ত্যাগ করে একমাত্র লাশরীক আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া তারা একথাংশে ভেবে দেখার সুযোগ পাবে যে, এ হকের দাওয়াত যদি তারা বল প্রয়োগ করে দমন করতে চায় তাহলে যে আল্লাহ আসহাবে ফীলকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন তারা তাঁরই ক্ষেত্রে শিকার হবে।

আয়াত ৫

সূরা আল ফীল-মক্কী

রুক্মি ১

لِسْمَرَ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করমাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَلَّا تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْبَحِ الْفِيلَ ۝ أَلَّا يَجْعَلَ
 كَيْنَ هَمْ رِفِيْ تَفْلِيلٍ ۝ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَا بَيْلَ ۝
 تَرَمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِيلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعْصِ
 مَا كُوْلٍ ۝

তুমি কি দেখনি^১ তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কি করেছেন?^২ তিনি কি তাদের কৌশল^৩ ব্যৰ্থ করে দেননি?^৪ আর তাদের ওপর ঝৌকে ঝৌকে পাখি পাঠান,^৫ যারা তাদের ওপর নিষ্কেপ করছিল পোড়া মাটির পাথর।^৬ তারপর তাদের অবস্থা করে দেন পশুর খাওয়া ভূষির মতো।^৭

১. বাহত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামকে সংবোধন করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু মূলত এখানে শুধু কুরাইশদেরকেই নয় বরং সমগ্র আরববাসীকেই সংবোধন করা হয়েছে। তারা এই সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে ভালোভাবেই অবগত ছিল। কুরআন মজীদের বহু স্থানে ‘আলাম তারা’ (তুমি কি দেখনি?) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামকে নয় বরং সাধারণ লোকদেরকে সংবোধন করাই উদ্দেশ্য। (উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতগুলো দেখুন : ইবরাহীম ১৯ আয়াত, আল হাজ্জ ১৮ ও ৬৫ আয়াত, আন নূর ৪৩ আয়াত, লোকমান ২৯ ও ৩১ আয়াত, ফাতের ২৭ আয়াত এবং আয় যুমার ২১ আয়াত) তাছাড়া দেখা শব্দটি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই যে, মকায় ও তার আশেপাশে এবং আরবের বিস্তৃত এলাকায় এ আসছাবে ফীলের ঘটনাটি স্বচকে প্রত্যক্ষ করেছে এ ধরনের বহু লোক সে সময় জীবিত ছিল। কারণ তখনো এই ঘটনার পর চলিশ পঁয়তালিশ বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে যায়নি। লোক মুখে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ সরাসরি এত বেশী বেশী সূত্রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে এটা প্রায় সব লোকেরই চোখে দেখা ঘটনার পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল।

২. এই হাতিওয়ালা কারা ছিল, কোথায় থেকে এসেছিল, কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এসব কথা আল্লাহ এখানে বলছেন না। কারণ এগুলো সবাই জানতো।

৩. মূলে কাইদা (কিন্দ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে ক্ষতি করবার জন্য গোপন কৌশল অর্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। প্রথম হচ্ছে, এখানে গোপন কি ছিল? যাট হাজার লোকের একটি সেনাবাহিনী কয়েকটি হাতি নিয়ে প্রকাশ্যে ইয়ামন থেকে মকায় আসে। তারা যে কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলতে এসেছে, একথাও তারা গোপন করেনি। কাজেই এ কৌশলটি গোপন ছিল না। তবে হাবশীরা কা'বা ভেঙ্গে ফেলে কুরাইশদেরকে বিখ্যন্ত ও পর্যন্ত করে এবং এভাবে সমগ্র আরববাসীকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে দক্ষিণ আরব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথ আরবদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। এটা ছিল তাদের মক্কা আক্রমণের উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটিকে তারা গোপন করে রাখে। অন্যদিকে তারা প্রকাশ করতে থাকে কয়েকজন আরব তাদের গীর্জার যে অবমাননা করেছে, কা'বা শরীফ ভেঙ্গে ফেলে তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়।

৪. মূলে বলা হয়েছে **فِي تَضْلِيلٍ** অর্থাৎ তাদের কৌশলকে তিনি ভুঁটার মধ্যে নিষ্কেপ করেছেন। কিন্তু প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী কৌশলকে ভুঁটার মধ্যে নিষ্কেপ করার মানে হয় তাকে নষ্ট ও বিখ্যন্ত করে দেয়া অথবা নিজের উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ করে দেয়া। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তির তীর লক্ষ ভষ্ট ভষ্ট হয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা ও কুলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। কুরআন মজীদের এক জায়গায় বলা হয়েছে, **مَا كُنْدَ الْكَفَرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ** “কিন্তু কাফেরদের কুলাকৌশল ব্যর্থ হয়েছে।” (আল মু’মিন ২৫) অন্য জায়গায় বলা হয়েছে : **وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي كُبُدَ الْخَائِبِينَ** “আর আল্লাহ যেয়ান্তকুরীদের কৌশলকে সফর্তার দ্বারে পৌঁছিয়ে দেন না।” (ইউসূফ ৫২) আরববাসীরা ইমরাউল কায়েসকে **الْمَلِكُ الضَّلِيلُ** “বিনষ্টকারী বাদশাহ” বলতো। কারণ সে তার বাপের কাছ থেকে পাওয়া বাদশাহী হারিয়ে ফেলেছিল।

৫. মূলে বলা হয়েছে **طَيْرًا أَبَابِيلُ** আরবীতে আবাবীল মানে হচ্ছে, বহু ও বিভিন্ন দল যারা একের পর এক বিভিন্ন দিক থেকে আসে। তারা মানুষও হতে পারে আবাবীল পশুও হতে পারে। ইকরামা ও কাতাদাহ বলেন, গোহিত সাগরের দিক থেকে এ পাখিরা দলে দলে আসে। সাইদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামা বলেন, এ ধরনের পাখি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং এর পরেও দেখা যায়নি। এগুলো নজদ, হেজায়, তেহামা বা গোহিত সাগরের মধ্যবর্তী উপকূল এলাকার পাখি ছিল না। ইবনে আবাস বলেন, তাদের চেজু ছিল পাখিদের মতো এবং পাঞ্জা কুকুরের মতো। ইকরামার বর্ণনা মতে তাদের মাথা ছিল শিকারী পাখীর মাথার মত। প্রায় সকল বর্ণনাকারীর সর্বসমত বর্ণনা হচ্ছে, প্রত্যেকটি পাখির ঠোটে ছিল একটি করে পাথরের কুটি এবং পায়ে ছিল দুটি করে পাথরের কুটি। মক্কার অনেক লোকের কাছে এই পাথর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংরক্ষিত ছিল। আবু নু’আইম নওফাল ইবনে আবী মু’আবীয়ার বর্ণনা উচ্চৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, আসহাবে ফীলের উপর যে পাথর নিষ্কেপ করা হয়েছিল আমি তা দেখেছি। সেগুলোর এক একটি ছিল ছোট মটর দানার সমান। গায়ের রং ছিল লাল কালচে। আবু নু’আইম ইবনে আবাসের যে রওয়ায়াত উচ্চৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল চিলগুজার* সমান। অন্যদিকে ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা মতে, সেগুলো ছিল ছাগলের লেদীর সমান। মোটকথা, এসবগুলো পাথর সমান যাপের ছিল না। অবশ্য কিছু না কিছু পার্থক্য ছিল।

* চিলগুজা চীনাবাদাম জাতীয় এক ধরনের শুকনা ফল। শব্দায় ও চওড়ায় একটি চীনাবাদামের প্রায় সমান।

৬. مُلْ شَدِّعَلَوْهُ هَذِهِ، بِحِجَارَةٍ مَنْ سَجَيْلٌ أَرْثَأْتْ سِبْজِيَلْ খরনের পাথর। ইবনে আব্রাস বলেন, এ শদ্দাটি মূলত ফারসীর “সংগ” ও “গীল” শব্দ দু’টির আরবী করণ।* এর অর্থ এমন পাথর যা কাদা মাটি থেকে তৈরি এবং তাকে আগনে পুড়িয়ে শক্ত করা হয়েছে। কুরআন মজীদ থেকেও এই অর্থের সত্যতা প্রমাণ হয়। সূরা হৃদের ৮২ ও সূরা হজুরাতের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে, সূত জাতির উপর সিজ়জীল খরনের পাথর বর্ণন করা হয়েছিল এবং এই পাথর সম্পর্কে সূরা যারিয়াতের ৩৩ আয়াতে বলা হয়েছে, সেগুলো ছিল মাটির পাথর অর্থাৎ কাদামাটি থেকে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল।

মাওলানা হামীদুন্দিন ফারাহী মরহম ও মগফুর বর্তমান যুগে কুরআনের অর্থ বর্ণনা ও গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি এ আয়াতে “তারমীহিম” (তাদের উপর নিষ্কেপ করছিল) শব্দের কর্তা হিসেবে মক্কাবাসী ও অন্যান্য আরববাসীদেরকে চিহ্নিত করেছেন। “আলাম তারা” (ভূমি কি দেখনি) বাক্যাশেও তাঁর মতে এদেরকেই সরোধন করা হয়েছে। পাখিদের সম্পর্কে তিনি বলেন, তারা পাথর নিষ্কেপ করছিল না বরং তারা এসেছিল আসহাবে ফীলের লাশগুলি থেঁয়ে ফেলতে। এই ব্যাখ্যার সমক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন তার নির্যাস হচ্ছে এই যে, আবদুল মুত্তালিবের আবরাহার কাছে গিয়ে কা’বার পরিবর্তে নিজে উট ফেরত নেবার জন্য দাবী জানানোর ব্যাপারটি কোনক্রিমেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে কুরাইশরা এবং অন্যান্য যেসব লোকেরা ইজ্জের জন্য এসেছিল তারা হানাদার সেনাদলের কোন মোকাবেলা না করে কাবাঘরকে তাদের করশ্মা ও মেহেরবানির উপর ছেড়ে দিয়ে নিজেরা পাহাড়ের উপর গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করবে, একথাও দুর্বোধ্য মনে হয়। তাই তাঁর মতে আসল ঘটনা হচ্ছে, আরবরা আবরাহার সেনাদলের প্রতি পাথর নিষ্কেপ করে এবং আল্লাহ পাথর বর্ষণকারী ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত করে এই সেনাদলকে বিদ্রুল করেন। তারপর তাদের লাশ থেঁয়ে ফেলার জন্য পাখি পাঠান। কিন্তু ভূমিকায় আমরা বলেছি, আবদুল মুত্তালিব তার উট দাবী করতে গিয়েছিলেন, রেওয়ায়াতে কেবল একথাই বলা হয়নি। বরং রেওয়ায়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, আবদুল মুত্তালিব তাঁর উটের দাবীই জানাননি এবং আবরাহাকে তিনি কাবা আক্রমণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টাও করেছিলেন। আমরা একথাও বলেছি, সমস্ত নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত অনুযায়ী আবরাহা মহররম মাসে এসেছিল। তখন হাজীরা ফিরে যাচ্ছিল আর একথাও আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে, ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করা কুরাইশদের ও তাদের আশেপাশের গোত্রগুলোর সামর্থের বাইরে ছিল। আহ্যাব যুদ্ধের সময় বিরাট ঢাক ঢোল পিটিয়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে আরব মুশরিক ও ইহুদি গোত্রগুলোর যে সেনাদল তারা এনেছিল তার সংখ্যা দশ বারো হাজারের বেশী ছিল না। কাজেই ৬০ হাজার সৈন্যের মোকাবেলা করার সাহস তারা কেমন করে করতে পারতো? তবুও এ সমস্ত যুক্তি বাদ দিয়ে যদি শুধু মাত্র সূরা ফীলের বাক্য বিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে এ ব্যাখ্যা তার বিরোধী প্রমাণিত হয়। আরবরা পাথর মারে এবং তাতে আসহাবে ফীল মরে ছাতু হয়ে যায় আর তারপর পাখিরা আসে তাদের লাশ খাবার জন্য, ঘটনা যদি এমনি ধরা হতো তাহলে বাক্য বিন্যাস হতো নিম্নরূপভাবে :

* সংগ মানে পাথর এবং গীল মানে কাদা।—অনুবাদক

تَرْمِيْهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ - فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ - وَ ارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ -

(তোমരা তাদেরকে মারছিলে পোড়া মাটির পাথর। তারপর আল্লাহ তাদেরকে করে দিলেন ভৃক্ত ভূষির মতো। আর আল্লাহ তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন) কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, অথবে আল্লাহ পাখির ঝাঁক পাঠাবার কথা জানালেন তারপর তার সাথে সাথেই বললেন : অর্থাৎ যারা তাদেরকে পোড়া মাটির তৈরী পাথরের কুঠি দিয়ে মারছিল। সবশেষে বললেন, তারপর আল্লাহ তাদেরকে ভৃক্ত ভূষির মতো করে দিলেন।

৭. আসল শব্দ হচ্ছে আসফ শব্দ সূরা আর রহমানের ১২ আয়াতে এসেছে : "شَسْيٌّ تُوَالْعَصْفِ وَالرِّيحَانُ" এ থেকে জানা যায়, আসফ মানে হচ্ছে খোসা, যা শস্য দানার গায়ে লাগানো থাকে এবং কৃষক শস্য দানা বের করে নেবার পর যাকে ফেলে দেয় তারপর পশ্চ তা খেয়েও ফেলে। আবার পশ্চর চিবানোর সময় কিছু পড়েও যায় এবং তার পায়ের তলায় কিছু পিণ্ডও যায়।

কুরাইশ

১০৬

নামকরণ

প্রথম আয়াতের কুরাইশ (قُرَيْشٌ) শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

যাহুক ও কাল্বী একে মাদানী বললেও মুফাসিরগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এর মক্কী হবার ব্যাপারে একমত। তাছাড়া এ সরার শব্দাবলীর মধ্যেও এর মক্কী হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। যেমন رَبَّهُ هُذَا الْبَتْ^۱ (এ ঘরের রব)। এ সূরাটি মদীনায় নাযিল হলে কাবাদরের-জন্য “এ ঘর” শব্দ দু’টি কেমন করে উপযোগী হতে পারে? বরং সূরা আল ফীলের বিষয়বস্তুর সাথে এর এত গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, সংভবত আল ফীল নাযিল হবার পর পরই এ সূরাটি নাযিল হয়ে থাকবে বলে মনে হয়। উভয় সূরার মধ্যে এই গভীর সম্পর্ক ও সামংজস্যের কারণে প্রথম যুগের কোন কোন মনীষী এ দু’টি সূরাকে মূলত একটি সূরা হবার মত পোষণ করতেন। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাঁর সংকলিত কুরআনের অনুলিপিতে এ দু’টি সূরাকে একসাথে লিখেছেন এবং সেখানে এ দু’য়ের মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল না। এ ধরনের রেওয়ায়াত পূর্বোক্ত চিন্তাকে আরো শক্তিশালী করেছে। তাছাড়া হযরত উমর (রা) একবার কোন তেদ চিহ্ন ছাড়াই এই সূরা দু’টি এক সাথে নামাযে পড়েছিলেন। কিন্তু এ রায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সাইয়েদুনা হযরত উসমান রাদিয়াত্তাহ আনহ বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কেরামের সহযোগিতায় সরকারীভাবে কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করে ইসলামী দুনিয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ উভয় সূরার মাঝখানে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা ছিল। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সারা দুনিয়ার সমস্ত কুরআন মজীদ এ দু’টি আলাদা আলাদা সূরা হিসেবেই লিখিত হয়ে আসছে। এ ছাড়াও এ সূরা দু’টির বর্ণনা ভঙ্গী পরম্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন যে, এ দু’টির ভিন্ন ভিন্ন সূরা হবার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামের প্রপিতামহ কুসাই ইবনে কিলাবের সময় পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র হিজায়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করছিল। কুসাই সর্বপ্রথম তাদেরকে মক্কায় একত্র করে। এভাবে বাইতুল্লাহর মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব তাদের হাতে আসে। এ জন্য কুসাইকে “মুজাফ্ফে” বা একত্রকারী উপাধি দান করা হয়। এ ব্যক্তি নিজের উরত পর্যায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক কুশলতা ও ব্যবস্থাপনার সাহায্যে মক্কায় একটি নগর রাষ্ট্রের বুনিয়াদ স্থাপন করে। আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত হাজীদের খেদমতের উত্তম ব্যবস্থা করে। এর ফলে ধীরে ধীরে আরবের সকল গোত্রের মধ্যে এবং সমস্ত এলাকায় কুরাইশদের প্রভাব প্রতিপন্থি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কুসাইয়ের পর তার পুত্র আবদে মানাফ ও আবদুদ্দারের

মধ্যে মক্কা রাষ্ট্রের শাসন কর্তৃত বিভক্ত হয়ে যায়। কিন্তু দুই ভাইয়ের মধ্যে পিতার আমলেই আবদে মালাফ অধিকতর খ্যাতি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে তার মর্যাদা স্বীকৃতি লাভ করতে থাকে। আবদে মালাফের ছিল চার ছেলে : হাশেম, আবদে শামস, মুভালিব ও নওফাল। এদের মধ্য থেকে আবদুল মুভালিবের পিতা ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রপিতামহ হাশেমের মনে সর্বপ্রথম আরবের পথে প্রাচ্য এলাকার দেশসমূহ এবং সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তাতে অংশগ্রহণ করার এবং এই সংগে আরববাসীদের জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও কিনে আনার চিন্তা জাগে। তার ধারণামতে এভাবে বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গোত্রের তাদের কাছ থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কিনবে এবং মক্কার বাজারসমূহে দেশের অভ্যন্তরের ব্যবসায়ীরা সামগ্রী কেনার জন্য ভিড় জমাবে। এটা এমন এক সময়ের কথা যখন উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ ও পারস্য উপসাগরের পথে রোম সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য দেশসমূহের মধ্যে যে আন্তরজাতিক বাণিজ্য চলতো তার ওপর ইরানের সাসানীয় সম্রাটোরা পুরোপুরি কর্তৃত প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এ কারণে দক্ষিণ আরব থেকে গোত্রে সাগরের উপকূল ঘৈসে সিরিয়া ও মিসরের দিকে প্রসারিত বাণিজ্য পথে ব্যবসা বিপুলভাবে জমে উঠেছিল। আরবের অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার তুলনায় কুরাইশদের বাড়িত সুবিধা ছিল। কাবার খাদেম হবার কারণে পথের সমস্ত গোত্র তাদেরকে মর্যাদার চোখে দেখতো। হজ্জের সময় কুরাইশ বংশীয় লোকেরা যে আন্তরিকতা, উদারতা ও বদান্যতা সহকারে হাজীদের খেদমত করতো সে জন্য সবাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল। কাজেই কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার ওপর পথে ডাকাতদের আক্রমণ হবে এ আশংকা ছিল না। পথের বিভিন্ন গোত্র অন্যান্য বাণিজ্য কাফেলার কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ পথকর আদায় করতো তাও তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতো না। এসব দিক বিবেচনা করে হাশেম একটি বাণিজ্য পরিকল্পনা তৈরি করে এবং এই পরিকল্পনায় তার অন্য তিনি তাইকেও শামিল করে। হাশেম সিরিয়ার গাস্সানী বাদশাহ থেকে, আবদে শামস হাবশার বাদশাহর থেকে, মুভালিব ইয়ামনের গভর্নরদের থেকে এবং নওফল ইরাক ও পারস্যের সরকারদের থেকে বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এভাবে তাদের ব্যবসা দ্রুত উন্নতি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা চার তাই “মুভাজিনীন” বা সওদাগর নামে খ্যাত হয়। আর এই সংগে তারা আশপাশে গোত্রদের ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে যে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল সে জন্য তাদেরকে “স্বাসহাবুল ইলাফ” তথা প্রাতির সম্পর্ক সৃষ্টিকারী বলা হতো।

এ ব্যবসার কারণে কুরাইশবংশীয় লোকেরা সিরিয়া, মিসর, ইরান, ইয়ামন ও হাবশার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করে। সরাসরি বিভিন্ন দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের দেখার, জানার ও উপলব্ধি করার মান অনেক উন্নত হতে থাকে। ফলে আরবের দ্বিতীয় কোন গোত্র তাদের সম্পর্যায়ে পৌছতে পারেনি। ধন-সম্পদের দিক দিয়েও তারা আরবের সবচেয়ে উচু পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। মক্কা পরিগত হয়েছিল সমগ্র আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্রে। এ আন্তরজাতিক সম্পর্কের একটি বড় সুফল হিসেবে তারা ইরাক থেকে বর্ণমালাও আমদানী করে। পরবর্তী কালে কুরআন মজীদ লেখার জন্য এ বর্ণমালাই ব্যবহৃত হয়। আরবের কোন গোত্রে কুরাইশদের মতো এত বেশী লেখাপড়া জান্নু লোক ছিল না। এসব কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন : قریش قادة الناس

অর্থাৎ কুরাইশরা হচ্ছে জনগণের নেতা। (মুসনাদে আহমাদ : আমর ইবনুল আস (রা) বর্ষিত হাদীস সমষ্টি) বাইহাকী হয়েরত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্বৃত্ত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লাম বলেছেন :

كَانَ هَذَا الْأَمْرُ فِي حِمَرَ فَنَزَّ عَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَجَعَلَهُ فِي قُرْيَشٍ

“প্রথমে আরবদের নেতৃত্ব ছিল হিময়ারী গোত্রের দখলে তারপর মহান আল্লাহ তা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কুরাইশদেরকে দান করেন।”

কুরাইশরা এভাবে একের পর এক উন্নতির মন্থিল অতিক্রম করে চলছিল। এমন সময় আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদি সে সময় আবরাহা কাঁ'বা তেজে ফেলতে সক্ষম হতো তাহলে আরবদেশে শুধু মাত্র কুরাইশদেরই নয়, কাঁ'বা শরীফের মর্যাদাও খতম হয়ে যেতো। এটি যে সত্যিই বাইতুল্লাহ বা আল্লাহর ঘর, জাহেলী যুগের আরবদের এই বিশাসের ভিত্তি নড়ে উঠতো। এ ঘরের খাদেম হিসেবে সারা দেশে কুরাইশদের যে মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপন্থি ছিল তাও মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসার্দ হয়ে যেতো। হাবলীদের মক্কা দখল করার পর ঝোম সংঘাট সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিরিয়া ও মক্কার মাঝখানের বাণিজ্য পথও দখল করে নিতো। ফলে কুসাই ইবনে কিলাবের আগে কুরাইশরা যে দুর্গত অবস্থার শিকার ছিল তার চাইতেও মারাত্তক দুরবস্থার মধ্যে তারা পড়তো। কিন্তু মহান আল্লাহ তাঁর অসীম কুদরতের খেলা দেখান। পক্ষীবাহিনী পাথর মেরে মেরে আবরাহার ৬০ হাজারের বিশাল হাবশীবাহিনীকে ধ্বনি করে দেয়। মক্কা থেকে ইয়ামন পর্যন্ত সারাটা পথে বিশ্বস্ত সেনাবাহিনীর লোকেরা পড়ে মরে যেতে থাকে। এ সময় কাঁ'বা শরীফের আল্লাহর ঘর হবার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসীর ঈমান আগের চাইতে কয়েকগুণ বেশী মজবুত হয়ে যায়। এই সংগে সারা দেশে কুরাইশদের প্রতিপন্থি আগের চাইতেও আরো অনেক বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন আরবদের মনে বিশ্বাস জন্মে, এদের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষিত হয়। ফলে এরা নিবিষ্টে আরবের যে কোন অংশে যেতো এবং নিজেদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যে কোন এলাকা অতিক্রম করতো। এদের গায়ে হাত দেবার সাহস কারো হতো না। এদের গায়ে হাত দেয়া তো দূরের কথা এদের নিরাপত্তার ছত্রছায়ায় কোন অকুরাইশী থাকলেও তাকে কেউ বিরক্ত করতো না।

মূল বক্তব্য

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামের আবির্ত্তবকালে যেহেতু এ অবস্থা সবার জানা ছিল তাই এসব কথা আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণে এ ছোট সূরাটিতে চারটি বাক্যের মধ্য দিয়ে কুরাইশদেরকে কেবলমাত্র এতটুকু কথা বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেরাই এ ঘটটিকে (কাবা ঘর) দেবমূর্তির মন্দির নয় বরং আল্লাহর ঘর বলে মনে করো এবং যখন তোমরা তালোভাবেই জানো যে, আল্লাহই তোমাদেরকে এ ঘরের বদৌলতে এ পর্যায়ের শাস্তি ও নিরাপত্তা দান করেছেন, তোমাদের ব্যবসায় এহেন উন্নতি দান করেছেন এবং অভাব-অনাহার থেকে রক্ষা করে তোমাদেরকে এ ধরনের সমৃদ্ধি দান করেছেন তখন তোমাদের তো আসলে তাঁরই ইবাদাত করা উচিত।

আয়াত ৪

সূরা কুরাইশ-মদ্দা

কক্ষ ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

لَا يُلْفِ قُرْيَشٌ ۝ إِلَّا فِمَرْ حَلَةَ الشَّتَاءِ وَالصِّيفِ ۝ فَلَيَعْبُلْ وَارْبَعَ ۝ هَنَّ الْبَيْتُ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جَوَعٍ ۝ وَأَمْنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝

যেহেতু কুরাইশরা অভ্যন্ত হয়েছে,^১ (অর্থাৎ) শীতের ও গ্রীষ্মের সফরে অভ্যন্ত।^২ কাজেই তাদের এই ঘরের রবের ইবাদাত করা উচিত,^৩ যিনি তাদেরকে ক্ষুধা থেকে রেহাই দিয়ে খাবার দিয়েছেন^৪ এবং ভীতি থেকে নিরাপত্তা দান করেছেন।^৫

১. মূল শব্দ হচ্ছে । । لَيْلَفْ قُرْيَشٌ (اللاف) শব্দটি এসেছে উল্ফাত (الفت) শব্দ থেকে। এর অর্থ হয় অভ্যন্ত হওয়া, পরিচিত হওয়া, বিছেদের পর মিলিত হওয়া এবং কোন জিনিসের অভ্যাস গড়ে তোলা। ইলাফ শব্দের পূর্বে যে 'লাম'টি ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে অনেক আরবী ভাষাবিদ পণ্ডিত এ মত প্রকাশ করেছেন যে, আরবী প্রচলন ও বাকরীতি অনুযায়ী এর মাধ্যমে বিশ্ব প্রকাশ করা বুঝায়। যেমন আরবরা বলে, لَزِيدٌ وَمَا صَنَعْنَا بِإِلَيْلِفْ قُرْيَشٍ এই যায়েদের ব্যাপারটা দেখো, আমরা তার সাথে ভালো ব্যবহার করলাম কিন্তু সে আমাদের সাথে কেমন ব্যবহারটা করলো! কাজেই লালিফ কুরাইশ মানে হচ্ছে, কুরাইশদের ব্যবহারে বড়ই অবাক হতে হয়। কেননা আল্লাহর অনুগ্রহে তারা বিছির ও বিষিণু হবার পর একত্র হয়েছে এবং এমন ধরনের বাণিজ্য সফরে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে যা তাদের প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। অথচ তারা সেই আল্লাহর বদ্দেগী করতে অবীকার করছে! তাষাতত্ববিদ আখ্ফশ, কিসাই ও ফাররা এ মত ব্যক্ত করেছেন। ইবনে জারীর এ মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিখেছেন, আরবরা যখন এ 'লাম' ব্যবহার করে কোন কথা বলে তখন সেই কথাটি এ বিষয়টি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, একথার পরও যে ব্যক্তি কোন আচরণ করে তা বিশ্বয়কর। বিপরীতগক্ষে খলীল ইবনে আহমদ, সিবওয়াইহে ও যামাখশারী প্রমুখ তাষাতত্ব ও অলংকার শাস্ত্রবিদগণ, বলেন, এখানে 'লাম' অব্যয় সূচক এবং এর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে আগের বাক্য প্রতি আল্লাহর নিয়ামত সীমা-সংখ্যাইন, কিন্তু অন্য কোন নিয়ামতের ভিত্তিতে না হলেও আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে তারা এই বাণিজ্য সফরে অভ্যন্ত হয়ে উঠেছে, অন্তত এই একটি নিয়ামতের কারণে তাদের আল্লাহর বদ্দেগী করা উচিত। কারণ এটা মূলত তাদের প্রতি একটা বিরাট অনুগ্রহ।

২. শীত ও গ্রীষ্মের সফরের মানে হচ্ছে গ্রীষ্মকালে কুরাইশরা সিরিয়া ও ফিলিস্তিনের দিকে বাণিজ্য সফর করতো। কারণ এ দু'টি শীত প্রধান দেশ। আর শীতকালে সফর করতো দক্ষিণ আরবের দিকে। কারণ সেটি গ্রীষ্ম প্রধান এলাকা।

৩. এ ঘর মানে কা'বা শরীফ। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, এ ঘরের বদৌলতেই কুরাইশরা এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে। তারা নিজেরাই একথা মেনে নিয়েছে যে, এই যে ৩৬০টি মুর্তিকে তারা পূজা করে এরা এ ঘরের রব নয়। বরং একমাত্র আল্লাহই এর রব। তিনিই আস্মাবে ফীলের আক্রমণ থেকে তাদেরকে বীচিয়েছেন। আবরাহার সেনাবাহিনীর মোকাবিলায় সাহায্য করার জন্য তাঁর কাছেই তারা আবেদন জানিয়েছিল। তাঁর ঘরের আশ্রম লাভ করার আগে যখন তারা আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তাদের কোন মর্যাদাই ছিল না। আরবের অন্যান্য গোত্রের ন্যায় তারাও একটি বৎস্থারার বিক্ষিণ্ড দল ছিল মাত্র। কিন্তু মক্কায় এই ঘরের চারদিকে একত্র হবার এবং এর সেবকের দায়িত্ব পালন করতে থাকার পর সমগ্র আরবে তারা মর্যাদাশালী হয়ে উঠেছে। সবদিকে তাদের বাণিজ্য কাফেলা নির্ভয়ে যাওয়া আসা করছে। কাজেই তারা যা কিছুই লাভ করেছে এ ঘরের রবের বদৌলতেই লাভ করেছে। কাজেই তাদের একমাত্র সেই রবেরই ইবাদাত করা উচিত।

৪. মক্কায় আসার পূর্বে কুরাইশরা যখন আরবের চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তখন তারা অনাহারে মরতে বসেছিল। এখানে আসার পর তাদের জন্য রিয়াকের দরজাগুলো খুলে যেতে থাকে। তাদের সপক্ষে হয়রত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই বলে দোয়া করেছিলেন—‘হে আল্লাহ! আমি তোমার মর্যাদাশালী ঘরের কাছে, একটি পানি ও শস্যহীন উপত্যকায় আমার স্তনান্দের একটি অশের বসতি স্থাপন করিয়েছি, যাতে তারা নামায কায়েম করতে পারে। কাজেই তুমি লোকদের হৃদয়কে তাদের অনুরাগী করে দিয়ো, তাদের খাবার জন্য ফলমূল দান করো।’ (সূরা ইবরাহীম ৩৭) তাঁর এই দোয়া অক্ষরে পূর্ণ হয়।

৫. অর্থাৎ যে ভীতি থেকে আরব দেশে কেউ নিরাপদ নয়, তা থেকে তারা নিরাপদ রয়েছে। সে যুগে আরবের অবস্থা এমন ছিল যে, সারা দেশে এমন কোন জনপদ ছিল না যেখানে লোকেরা রাতে নিচিতে ঘুমাতে পারতো। কারণ সবসময় তারা আশংকা করতো, এই বুঝি কোন লুটেরা দল রাতের অবকাশে হঠাত তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লো এবং তাদের সবকিছু লুট করে নিয়ে গেলো নিজের গোত্রের সীমানার বাইরে পা রাখার সাহস কোন ব্যক্তির ছিল না। কারণ একাকী কোন ব্যক্তির জীবিত ফিরে আসা অথবা গ্রেফতার হয়ে গোলামে পরিণত হবার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া যেন অসম্ভব ব্যাপার ছিল। কোন কাফেলা নিচিতে সফর করতে পারতো না। কারণ পথে বিভিন্ন স্থানে তার ওপর ছিল দস্ত দলের আক্রমণের তরয়। ফলে পথ-পার্শ্বের প্রতাবশালী গোত্র সরদারদেরকে ঘূর্ণ দিয়ে দিয়ে বাণিজ্য কাফেলাগুলো দস্তু ও সূটেরাদের হাত থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ রেখে এগিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কুরাইশরা মক্কায় সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল। তাদের নিজেদের ওপর কোন শক্তির আক্রমণের ভয় ছিল না। তাদের ছোট বড় সব রকমের কাফেলা দেশের প্রত্যেক এলাকায় যাওয়া আসা করতো। হারাম শরীফের খাদেমদের কাফেলা, একথা জানারপর কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করার সাহস করতো না। এমন কি একজন কুরাইশী একাই যদি কখনো কোন জায়গায় যেতো এবং স্থানে, কেউ তার ক্ষতি করতে যেতো তাহলে তার পক্ষে শুধুমাত্র হারামী (حَرَمَي) বা **أَنَا مِنْ حَرَمَ اللّٰهِ** আমি হারাম শরীফের লোক বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিল। একথা শুনার সাথে সাথেই আক্রমণকারীর হাত নিচের দিকে নেমে আসতো।

আল মাউন

১০৭

নামকরণ

শেষ আয়াতের শেষ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া ইবনে আবাস (রা) ও ইবনে যুবাইরের (রা) উকি উদ্ভৃত করেছেন। তাতে তৌরা এ সূরাকে মক্কী হিসেবে গণ্য করেছেন। আতা ও জাবেরও এ একই উকি করেছেন। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহরুল মুহীত গ্রন্থে ইবনে আবাস, কাতাদাহ ও যাহহাকের এ উকি উদ্ভৃত করেছেন যে, এটি মাদানী সূরা। আমাদের মতে, এই সূরার মধ্যে এমন একটি আত্মত্রীণ সাক্ষ রয়েছে যা এর মাদানী হবার প্রমাণ পেশ করে। সেটি হচ্ছে, এ সূরায় এমন সব নামায়ীদেরকে ধর্মসের বার্তা শুনানো হয়েছে যারা নিজেদের নামায়ে গাফলতি করে এবং লোক দেখানো নামায পড়ে। এ ধরনের মুনাফিক খদীনায় পাওয়া যেতো। কারণ ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীরা সেখানে এমন পর্যায়ের শক্তি অর্জন করেছিল, যার ফলে বহু লোককে পরিস্থিতির তাগিদে ঈমান আনতে হয়েছিল এবং তাদের বাধ্য হয়ে মসজিদে আসতে হতো। তারা নামাযের জামায়াতে শরীক হতো এবং লোক দেখানো নামায পড়তো। এভাবে তারা মুসলমানদের মধ্যে গণ্য হতে চাইতো। বিপরীতপক্ষে মক্কায় লোক দেখাবার জন্য নামায পড়ার মতো কোন পরিবেশই ছিল না। সেখানে তো ঈমানদারদের জন্য জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থা করাই দুর্ক ছিল। গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের নামায পড়তে হতো। কেউ প্রকাশ্যে নামায পড়লে ডয়ানক সাহসিকতার পরিচয় দিতো। তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকতো। সেখানে যে ধরনের মুনাফিক পাওয়া যেতে তারা লোক দেখানো ঈমান আনা বা লোক দেখানো নামায পড়ার দলভূক্ত ছিল না। বরং তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য নবী হবার ব্যাপারটি জেনে নিয়েছিল এবং মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তাদের কেউ কেউ নিজের শাসন ক্ষমতা, প্রভাব প্রতিপন্থি ও নেতৃত্ব বহাল রাখার জন্য ইসলাম গ্রহণ করতে পিছপাও হচ্ছিল। আবার কেউ কেউ নিজেদের চোখের সামনে মুসলমানদেরকে যেসব বিপদ-মুসিবতের মধ্যে যেরাও দেখছিল ইসলাম গ্রহণ করে নিজেরও তার মধ্যে যেরাও হবার বিপদ কিনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। সূরা আনকাবুতের ১০-১১ আয়াতে মক্কী যুগের মুনাফিকদের এ অবস্থাটি বর্ণিত হয়েছে। (আরো জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন আল আনকাবুত ১৩-১৬ টাকা)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

আখেরাতের প্রতি ইমান না আনলে মানুষের মধ্যে কোন ধরনের নৈতিকতা জন্ম নেয় তা বর্ণনা করাই এর মূল বিষয়বস্তু। ২ ও ৩ আয়াতে এমনসব কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যারা প্রকাশে আখেরাতকে মিথ্যা বলে। আর শেষ চার আয়াতে যেসব মুনাফিক আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান মনে হয় কিন্তু যাদের মনে আখেরাত এবং তার শাস্তি-পূরক্ষার ও পাপ-পূণ্যের কোন ধারণা নেই, তাদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। আখেরাত বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মধ্যে একটি মজবুত শক্তিশালী ও পবিত্র-পরিচ্ছন্ন চরিত্র গড়ে তোলা কোনক্রিয়েই সম্ভবপর নয়, এ সত্যটি মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়াই হচ্ছে সামগ্রিকভাবে উভয় ধরনের দলের কার্যধারা বর্ণনা করার মূল উদ্দেশ্য।

আয়াত ৭

সূরা আল মাউন-মতী

কৃক্ত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করশাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

أَرَيْتَ الَّذِي يُكَلِّبُ بِاللَّيْلِ^① فَلِلَّهِ الَّذِي يَلْعَبُ
 الْيَتِيمَ^② وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ^③ فَوَيْلٌ لِلْمُصْلِمِينَ^④
 الَّذِينَ هُرِّبُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ^⑤ الَّذِينَ هُرِّبُوا مِنْ
 وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ^⑥

তুমি কি তাকে দেখেছো^১ যে আখেরাতের পুরকার ও শাস্তিকে^২ মিথ্যা
বলছে^৩ সে-ই তে^৪ এতিমকে ধাক্কা দেয়^৫ এবং মিসকিনকে খাবার দিতে^৬
উচুন্দ করে না।^৭ তারপর সেই নামাযীদের জন্য ধৰ্মস,^৮ যারা নিজেদের নামাযের
ব্যাপারে গাফলতি করে,^৯ যারা লোক দেখানো কাজ করে^{১০} এবং মামুলি
প্রয়োজনের জিনিসপাতি^{১১} (লোকদেরকে) দিতে বিরত থাকে।

১. ‘তুমি কি দেখেছো’ বাক্যে এখানে বাহ্যত সরোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহ
আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনাতংগী অন্যায়ী দেখা যায়, এসব ক্ষেত্রে
সাধারণত প্রত্যেক জ্ঞান-বৃদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা সম্পর্কে লোকদেরকেই এ সরোধন করা
হয়ে থাকে। আর দেখা মানে চোখ দিয়ে দেখাও হয়। কারণ সামনের দিকে লোকদের যে
অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা প্রত্যেক প্রত্যক্ষকারী স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে। আবার এর
মানে জানা, বুঝা ও চিন্তা-ভাবনা করাও হতে পারে। আরবী ছাড়া অন্যান্য ভাষায়ও এ
শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলি, “আচ্ছা, ব্যাপারটা আমাকে দেখতে হবে।”
অর্থাৎ আমাকে জানতে হবে। অথবা আমরা বলি, “এ দিকটাও তো একবার দেখো।” এর
অর্থ হয়, “এ দিকটা সম্পর্কে একটু চিন্তা করো।” কাজেই “আরাআইতা” (أَرَيْتَ)
শব্দটিকে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করলে আয়াতের অর্থ হবে, “তুমি কি জানো সে ক্ষেত্র
লোক যে শাস্তি ও পুরকারকে মিথ্যা বলে?” অথবা “তুমি কি তোবে দেখেছো সেই ব্যক্তির
অবস্থা যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে?”

২. আসলে বলা হয়েছে : । يُكَذِّبُ بِاللَّيْلِ : । কুরআনের পরিভাষায় ‘আদু দীন’
শব্দটি থেকে আখেরাতে কর্মফল দান বুঝায়। দীন ইসলাম অর্থেও এটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু

সামনের দিকে যে বিষয়ের আলোচনা হয়েছে তার সাথে প্রথম অর্থটিই বেশি খাপ খায় যদিও বক্তব্যের ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে দ্বিতীয় অর্থটিও খাপছাড়া নয়। ইবনে আরাস (রা) দ্বিতীয় অর্থটিকে প্রধান্য দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ তাফসীরকার প্রথম অর্থটিকেই অগাধিকার দিয়েছেন। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে সমগ্র সূরার বক্তব্যের অর্থ হবে, আখেরাতে অঙ্গীকারের আকীদা মানুষের মধ্যে এ ধরনের চরিত্র ও আচরণের জন্য দেয়। আর দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে দীন ইসলামের নৈতিক গুরুত্ব সৃষ্টি করাটাই সমগ্র সূরাটির মূল বক্তব্যে পরিণত হবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বক্তব্যের অর্থ হবে, এ দীন অঙ্গীকারকারীদের মধ্যে যে চরিত্র ও আচরণ বিধি পাওয়া যায় ইসলাম তার বিপরীত চরিত্র সৃষ্টি করতে চায়।

৩. বক্তব্য যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তাতে মনে হয়, এখানে এ প্রশ্ন দিয়ে কথা শুরু করার উদ্দেশ্য একথা জিজ্ঞেস করা নয় যে, তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো কি না। বরং আখেরাতের শাস্তি ও পুরুষার অঙ্গীকার করার মনোবৃত্তি মানুষের মধ্যে কোন ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করে থোতাকে সে সম্পর্কে চিত্তা-ভাবনা করার দায়ওয়াত দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এই সংগে কোন ধরনের লোকেরা এ আকীদাকে মিথ্যা বলে সে কথা জ্ঞানার আগ্রহ তার মধ্যে সৃষ্টি করাই এর লক্ষ। এভাবে সে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার নৈতিক গুরুত্ব বুঝার চেষ্টা করবে।

৪. আসলে **فَذَلِكَ فِي الْبَيْتِمَ** বলা হয়েছে। এ বাক্যে "ফ" অক্ষরটি একটি সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ পেশ করছে। এর মানে হচ্ছে, "যদি তুমি না জেনে থাকো তাহলে তুমি জেনে নাও," "সে-ই তো সেই ব্যক্তি" অথবা এটি এ অর্থে যে, "নিজের এ আখেরাতে অঙ্গীকারের কারণে সে এমন এক ব্যক্তি যে

৫. মূলে **يَدْعُ** বলা হয়েছে এর কয়েকটি অর্থ হয়। এক, সে এতিমের হক মেরে খায় এবং তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে বেদখল করে তাকে সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। দুই, এতিম যদি তার কাছে সাহায্য চাইতে আসে তাহলে দয়া করার পরিবর্তে সে তাকে ধিক্কার দেয়। তারপরও যদি সে নিজের অসহায় ও কষ্টকর অবস্থার জন্য অনুগ্রহ লাভের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। তিনি, সে এতিমের ওপর জুলুম করে। যেমন তার ঘরেই যদি তার কোন আজ্ঞায় এতিম থাকে তাহলে সারাটা বাড়ির ও বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এবং কথায় কথায় গালমন্দ ও লাথি ঝাটা খাওয়া ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটে না। তাছাড়া এ বাক্যের মধ্যে এ অর্থও নিহিত রয়েছে যে, সেই ব্যক্তি মাঝে মাঝে কখনো কখনো এ ধরনের জুলুম করে না বরং এটা তার অভ্যাস ও চিরাচরিত রীতি সে যে এটা একটা খারাপ কাজ করছে, এ অনুভূতিও তার থাকে না। বরং বড়ই নিচিতে সে এ নীতি অবস্থন করে যেতে থাকে। সে মনে করে, এতিম একটা অক্ষম ও অসহায় জীব। কাজেই তার হক মেরে নিলে, তার ওপর জুলুম-নির্যাতন চালালে অথবা সে সাহায্য চাইতে এলে তাকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলে কোন ক্ষতি নেই।

এ প্রসংগে কাজী আবুল হাসান আল মাওয়ারদী তাঁর "আলামুন নুবওয়াহ" কিতাবে একটি অন্ত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে : আবু জেহেল ছিল একটি এতিম ছেলের অভিভাবক। ছেলেটি একদিন তার কাছে এলো। তার গায়ে একটুকুরা কাপড়ও ছিল না। সে কাকুতি মিনতি করে তার বাপের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে

বললো। কিন্তু জালেম আবু জেহেল তার কথায় কানই দিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলো। কুরাইশ সরদাররা দুষ্টুমি করে বললো, “যা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে চলে যা। সেখানে গিয়ে তার কাছে নালিশ কর। সে আবু জেহেলের কাছে সুপারিশ করে তোর সম্পদ তোকে দেবার ব্যবস্থা করবে।” ছেলেটি জানতো না আবু জেহেলের সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি সম্পর্ক এবং এ শয়তানরা তাকে কেন এ পরামর্শ দিচ্ছে। সে সোজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌছে গেলো এবং নিজের অবস্থা তাঁর কাছে বর্ণনা করলো। তার ঘটনা শুনে নবী (সা) তখনই দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তাকে সংগে নিয়ে নিজের নিকৃষ্টতম শক্তি আবু জেহেলের কাছে চলে গেলেন। তাঁকে দেখে আবু জেহেল তাঁকে অত্যর্থনা জানলো। তারপর যখন তিনি বললেন, এ ছেলেটির হক একে ফিরিয়ে দাও তখন সে সংগে সংগেই তাঁর কথা মেনে নিল এবং তার ধন-সম্পদ এনে তার সামনে রেখে দিল। ঘটনার পরিণতি কি হয় এবং পানি কোন দিকে গড়ায় তা দেখার জন্য কুরাইশ সরদাররা উৎ পেতে বসেছিল। তারা আশা করছিল দু'জনের মধ্যে বেশ একটা যজ্ঞার কলহ জমে উঠবে। কিন্তু এ অবস্থা দেখে তারা অবাক হয়ে গেলো। তারা আবু জেহেলের কাছে এসে তাকে ধিক্কার দিতে লাগলো, তুমিও নিজের ধর্ম ত্যাগ করিনি। কিন্তু আমি অনুভব করলাম, মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডাইনে ও বাঁয়ে এক একটি অঙ্গ রয়েছে। আমি তার ইচ্ছার সামান্যতম বিরলম্বাচরণ করলে সেগুলো সাজা আমার শরীরের মধ্যে চুকে যাবে। এ ঘটনাটি থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় না যে, সে যুগে আরবের সবচেয়ে বেশী উন্নত ও মর্যাদাশালী গোত্রের বড় বড় সরদাররা পর্যন্ত এতিম ও সহায়-সম্বলহীন লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতো বরং এই সংগে একথাও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কত উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর নিকৃষ্টতম শক্তিদের উপরও তাঁর এ চারিত্রিক প্রভাব কতটুকু কার্যকর হয়েছিল। ইতিপূর্বে তাফহীমুল কুরআন সূরা আল আবিয়া ৫ টাকায় আমি এ ধরনের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে জ্বরদণ্ড নৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে কুরাইশরা তাঁকে যাদুকর বলতো এ ঘটনাটি তারই মৃত্যু প্রকাশ।

٦- **طَعَامُ الْمُسْكِينِ** নয় বরং বলা হয়েছে “ইত'আমুল মিসকিন” বললে অর্থ হতো,” সে মিসকিনকে খানা খাওয়ার ব্যাপারে উসাহিত করে না। কিন্তু “তাআমুল মিসকিন” বলায় এর অর্থ দাঁড়িয়েছে, “সে মিসকিনকে খানা দিতে উৎসাহিত করে না।” অন্য কথায়, মিসকিনকে যে খাবার দেয়া হয় তা দাতার খাবার নয় বরং ঐ মিসকিনেরই খাবার। তা এই মিসকিনের হক এবং দাতার উপর এ হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তায়। কাজেই দাতা এটা মিসকিনকে দান করছে না। বরং তার হক আদায় করছে। সূরা আয় যারিয়াতের ১৯ আয়াতে একথাটিই বলা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِّلْسَائِنِ وَالْمَحْرُومِ بَشِّيرَتِهِمْ** বলক্ষণের হক।”

٧. يَحْضُرْ لِلْمُدْعَى شব্দের মানে হচ্ছে, সে নিজেকে উদ্বৃক্ত করে না, নিজের পরিবারের লোকদেরকেও মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বৃক্ত করে না এবং অন্যদেরকেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে না যে, সমাজে যেসব গরীব ও অভাবী লোক অনাহারে যারা যাচ্ছে তাদের হক আদায় করো এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কিছু করো।

এখানে মহান আল্লাহ শুধুমাত্র দু'টি সুস্পষ্ট উদাহরণ দিয়ে আসলে আখেরাত অঙ্গীকার প্রবণতা মানুষের মধ্যে কোন ধরনের বৈতিক অসংবৃতির জন্য দেয় তা বর্ণনা করেছেন। আখেরাত না মানলে এতিমকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া এবং মিসকিনকে খাবার দিতে উদ্বৃক্ত না করার মতো দু'টো দোষ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে যায় বলে শুধুমাত্র এ দু'টি ব্যাপারে যানুষকে পাকড়াও ও সমালোচনা করাই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। বরং এই গোমরাহীর ফলে যে অসংখ্য দোষ ও ত্রুটির জন্ম হয় তার মধ্য থেকে নমুনা ব্রহ্মপুর এমন দু'টি দোষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রত্যেক সুস্থ বিবেক ও সংবিচার-বৃক্ষ সম্পর্ক ব্যক্তি যেগুলোকে নিকৃষ্টতম দোষ বলে মেনে নেবে। এই সংগে একথাও হন্দয়পটে অংকিত করে দেয়াই উদ্দেশ্য যে, এ ব্যক্তিটিই যদি আল্লাহর সামনে নিজের উপস্থিতি ও নিজের কৃতকর্মের জবাবদিহির ঝীকৃতি দিতো, তাহলে এতিমের হক মেরে নেবার, তার ওপর জুন্ম-নিয়াতন করার, তাকে ধিক্কার দেবার এবং মিসকিনকে নিজে খাবার না দেবার ও অন্যকে দিতে উদ্বৃক্ত না করার মতো নিকৃষ্টতম কাজ সে করতো না। আখেরাত বিশ্বাসীদের শুণাবলী সূরা আসল ও সূরা বালাদে বয়ান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে : وَقَوْصُوا بِالْحُقْرِ تَوَاصَوْا بِالْحُقْرِ এবং তারা পরম্পরকে সত্যপ্রীতি ও অধিকার আদায়ের উপদেশ দেয়।

৮. এখানে শব্দ فَوَلَّ تَلْمِصَلِينَ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে “ফা” (f) ব্যবহার করার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, প্রকাণ্যে যারা আখেরাত অঙ্গীকার করে তাদের অবস্থা ত্রুমি এখনই শুনলে, এখন যারা নামায পড়ে অর্থাৎ মুসলমানদের সাথে শাখিল মুনাফিকদের অবস্থাটা একবার দেখো। তারা যেহেতু বাহ্যত মুসলমান ইওয়া সম্প্রদেশ আখেরাতকে যিন্ধা মনে করে, তাই দেখো তারা নিজেদের জন্য কেমন ধরণের সরঞ্জাম তৈরি করছে।

“মুসাল্লীন” মানে নামায পাঠকারীগণ। কিন্তু যে আলোচনা প্রসংগে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সামনের দিকে তাদের যে শুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর প্রেক্ষিতে এ শব্দটির মানে আসলে নামাযী নয় বরং নামায আদায়কারী দল অর্থাৎ মুসলমানদের দলের অন্তরভুক্ত হওয়া।

٩. سَاهُونَ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে, যদি বলা হতো “কৰ্মী সালাতির্হিম” তাহলে এর মানে হতো, নিজের নামাযে ভুলে যায়। কিন্তু নামায পড়তে পড়তে ভুলে যাওয়া ইসলামী শরীয়াতে নিফাক তো দূরের কথা গোনাহের পর্যায়েও পড়ে না। বরং এটা আদতে কোন দোষ বা পাকড়াও যোগ্য কোন অপরাধও নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজেরও নামাযের মধ্যে কখনো ভুল হয়েছে। তিনি এই ভুল সংশোধনের জন্য পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন। এর বিপরীতে

عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ مানে হচ্ছে, তারা নিজেদের নামাযের থেকে গাফেল। নামায পড়া ও না পড়া উভয়টিরই তাদের দৃষ্টিতে কোন গরুত্ব নেই। কখনো তারা নামায পড়ে আবার কখনো পড়ে না। যখন পড়ে, নামাযের আসল সময় থেকে পিছিয়ে যায় এবং সময় যখন একেবারে শেষ হয়ে আসে তখন উঠে গিয়ে চারটে ঠোকর দিয়ে আসে। অথবা নামাযের জন্য ওঠে ঠিকই কিন্তু একেবারে যেন উঠতে মন চায়না এমনভাবে ওঠে এবং নামায পড়ে নেয় কিন্তু মনের দিক থেকে কোন সাড়া পায় না। যেন কোন আপদ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। নামায পড়তে পড়তে কাপড় নিয়ে খেলা করতে থাকে। হাই ভুলতে থাকে। আল্লাহর ঘরণ সামান্যতম তাদের মধ্যে থাকে না। সারাটা নামাযের মধ্যে তাদের এ অনুভূতি থাকে না যে, তারা নামায পড়ছে। নামাযের মধ্যে কি পড়ছে তাও তাদের খেয়াল থাকে না নামায পড়তে থাকে এবং মন অন্যত্র পড়ে থাকে। তাড়াহড়া করে এমনভাবে নামাযটা পড়ে নেয় যাতে কিয়াম, রূক্ত ও সিজদা কোনটাই ঠিক হয় না। কোননা কোন প্রকারে নামায পড়ার ভান করে দ্রুত শেষ করার চেষ্টা করে। আবার এমন অনেক লোক আছে, যারা কোন জায়গায় আটকা পড়ে যাবার কারণে বেকায়দায় পড়ে নামাযটা পড়ে নেয় কিন্তু আসলে তাদের জীবনে এ ইবাদাতটার কোন মর্যাদা নেই। নামাযের সময় এসে গেলে এটা যে নামাযের সময় এ অনুভূতিটাও তাদের থাকে না। মুহায়িনের আওয়াজ কানে এলে তিনি কিসের আহবান জানাচ্ছেন, কাকে এবং কেন জানাচ্ছেন একথাটা একবারও তারা চিন্তা করে না। এটাই আবেরাতের প্রতি ইমান না থাকার আলামত। কারণ ইসলামের এ তথ্যকথিত দাবীদাররা নামায পড়লে কোন পুরঙ্কার পাবে বলে মনে করে না এবং না পড়লে তাদের কপালে শাস্তি ভোগ আছে একথা বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা এ কর্মপক্ষতি অবলম্বন করে। এ জন্য হ্যরত আনাস ইবনে মালিক (রা) ও হ্যরত আতা ইবনে দীনার বলেন : “আল্লাহর শোকর তিনি ‘স্ফী সালাতিহিম সাহন’ বলেননি বরং বলেছেন, ‘আন সালাতিহিম সাহন।’” অর্থাৎ আমরা নামাযে ভুল করি ঠিকই কিন্তু নামায থেকে গাফেল হই না। এ জন্য আমরা মুনাফিকদের অন্তরভুক্ত হবো না।

কুরআন মজীদের অন্যত্র মুনাফিকদের এ অবস্থাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে :

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرْمَوْنَ

“তারা যখনই নামাযে আসে অবসাদগ্রস্তের মতো আসে এবং যখনই (আল্লাহর পথে) খরচ করে অনিচ্ছাকৃতভাবে করে।” (তাওবা ৫৪)

রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লাম বলেন :

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ ، تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقَبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ بِعِلْمِ لَا يَذْكُرُ اللَّهُ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا -

“এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে আসরের সময় বসে সূর্য দেখতে থাকে। এমনকি সেটা শয়তানের দু'টো শিয়ের

মাবখানে পৌছে যায়। (অর্থাৎ সূর্যাস্তের সময় নিকটবর্তী হয়) তখন সে উঠে চারটে ঠোকর মেরে নেয়। তাতে আল্লাহকে খুব কমই শ্রণ করা হয়।” বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ)

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াকাস (রা) থেকে তাঁর পুত্র মুসআব ইবনে সা'দ রেওয়ায়াত করেন, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফলতি করে তাদের সম্পর্কে আমি রসূলগুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, যারা গড়িমসি করতে করতে নামাযের সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় নামায পড়ে তারাই হচ্ছে এসব লোক। (ইবনে জারীর, আবু ইয়ালা, ইবনুল মুনফির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান। এ রেওয়ায়াতটি হযরত সা'দের নিজের উক্তি হিসেবেও উপ্লব্ধিত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে এর সনদ বেশী শক্তিশালী। আবার রসূলগুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসেবে এ রেওয়ায়াতটির সনদ বাইহাকী ও হাকেমের দৃষ্টিতে দুর্বল। হযরত মুস'আবের দ্বিতীয় রেওয়ায়াতটি হচ্ছে, তিনি নিজের মহান পিতাকে জিজ্ঞেস করেন, এ আয়াতটি নিয়ে কি আপনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন? এর অর্থ কি নামায ত্যাগ করা? অথবা এর অর্থ নামায পড়তে পড়তে মানুষের চিন্তা অন্য কোনদিকে চলে যাওয়া? আমাদের মধ্যে কে এমন আছে নামাযের মধ্যে যার চিন্তা অন্য দিকে যায় না? তিনি জবাব দেন, না এর মানে হচ্ছে নামাযের সময়টা নষ্ট করে দেয়া এবং গড়িমসি করে সময় শেষ হয় হয় এমন অবস্থায় তা পড়া। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, ইবনুল মুনফির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, নামাযের মধ্যে অন্য চিন্তা এসে যাওয়া এক কথা এবং নামাযের প্রতি কথনো দৃষ্টি না দেয়া এবং নামায পড়তে পড়তে সবসময় অন্য বিষয় চিন্তা করতে থাকা সম্পূর্ণ তিনি কথা। প্রথম অবস্থাটি মানবিক দুর্বলতার ব্যাতিক্রিক দাবি। ইচ্ছা ও সংকল্প ছাড়াই অন্যান্য চিন্তা এসে যায় এবং মুমিন যখনই অনুভব করে, তার মন নামায থেকে অন্যদিকে চলে গেছে তখনই সে চেষ্টা করে আবার নামাযে মনেনিবেশ করে। দ্বিতীয় অবস্থাটি নামাযে গাফলতি করার পর্যায়কৃত। কেননা এ অবস্থায় মানুষ শুধুমাত্র নামাযের ব্যায়াম করে। আল্লাহকে শ্রণ করার কোন ইচ্ছা তার মনে জাগে না। নামায শুরু করা থেকে নিয়ে সালাম ফেরা পর্যন্ত একটা মুহূর্তও তার মন আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। যেসব চিন্তা মাথায় পুরে সে নামাযে প্রবেশ করে তার মধ্যেই সবসময় ঝুঁকে থাকে।

১০. এটি একটি স্বতন্ত্র বাক্যও হতে পারে আবার পূর্বের বাক্যের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। একে স্বতন্ত্র বাক্য গণ্য করলে এর অর্থ হবে, কেননা সৎকাজেও তারা আন্তরিক সংকল্প সহকারে আল্লাহর জন্য করে না। বরং যা কিছু করে অন্যদের দেখাবার জন্য করে। এভাবে তারা নিজেদের প্রশংসা শুনাতে চায়। তারা চায়, লোকেরা তাদের সৎ লোক মনে করে তাদের সৎকাজের ডেকা বাজাবে। এর মাধ্যমে তারা কোন ক্ষা কোনভাবে দুনিয়ার বার্ধ উদ্ভাব করবে। আর আগের বাক্যের সাথে একে সম্পর্কিত মনে করলে এর অর্থ হবে তারা লোক দেখানো কাজ করে। সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ দ্বিতীয় অর্থটিকেই অগাধিকার দিয়েছেন। কারণ প্রথম নজরেই টের পাওয়া যায়, আগের বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। ইবনে আবাস (রা) বলেন : “এখানে মোনাফিকদের কথা বলা হয়েছে,

যারা লোক দেখানো নামায পড়তো। অন্য লোক সামনে থাকলে নামায পড়তো এবং অন্য লোক না থাকলে পড়তো না।” অন্য একটি রেওয়ায়াতে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, “একাকী থাকলে পড়তো না। আর সর্ব সমক্ষে পড়ে নিতো।” (ইবনে জারীর, ইবনুল মুনফির, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিশ শু’আব) কুরআন মজীদেও মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ «يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَنْكُرُونَ
اللَّهُ أَلَا قَلِيلًا۔

“আর যখন তারা নামাযের জন্য ওঠে অবসান্তান্তের ন্যায় ওঠে। লোকদের দেখায় এবং আল্লাহকে অরণ করে খুব কমই।” (আন নিসা ১৪২)

১১. মূলে মাউন (ماعون) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হ্যরত আলী (রা), ইবনে উমর (রা), সাইদ ইবনে জুবাইর, কাতাদাহ, হাসান বসরী, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া, যাহুক, ইবনে যায়েদ, ইকরামা, মুজাহিদ আতা ও যুহুরী রাহেমাহমুদ্বাহ বলেন, এখানে এই শব্দটি থেকে যাকাত বুঝানো হয়েছে। ইবনে আবুস রামান (রা) ইবনে মাসউদ (র) ইবনাহীম নাথীয়ী (র) আবু মালেক (র) এবং অন্যান্য লোকদের উক্তি হচ্ছে, এখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র যেমন, হাড়ী-পাতিল, বালতী, দা,-কুড়াল, দাঢ়িপাত্রা, সবগ, পানি, আগুন, চকমাকি(বর্তমানে এর স্থান দখল করেছে দেয়াশলাই) ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। কারণ লোকেরা সাধারণত এগুলো দৈনন্দিন কাজের জন্য পরম্পরারের কাছ থেকে চেয়ে নেয়। সাইদ ইবনে জুবাইর ও মুজাহিদের একটি উক্তিও এর সমর্থনে পাওয়া যায়। হ্যরত আলীর (রা) এক উক্তিতেও বলা হয়েছে, এর অর্থ যাকাত হয় আবার ছোট ছোট নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রও হয়। ইবনে আবী হাতেম ইকরামা, থেকে উদ্ভৃত করে বলেন, মাউনের সর্বোচ্চ পর্যায় হচ্ছে যাকাত এবং সর্বনিম্ন পর্যায় হচ্ছে কাউকে চালুনী, বালতী বা দেয়াশলাই ধার দেয়া। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহিসসাল্লামের সাথীরা বলতাম (কোন কোন হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক জামানায় বলতাম) : মাউন বলতে হীড়ি, কুড়াল, বালতি, দাঢ়িপাত্রা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস অন্যকে ধার দেয়া বুঝায়। (ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, আবু দাউদ, নাসারী, বায়ুর, ইবনুল মুনফির, ইবনে আবী হাতেম, তাবারানী ফিল আওসাত, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ফিস সুনান) সাইদ ইবনে ইয়ায় স্পষ্ট নাম উল্লেখ না করেই প্রায় এ একই বক্তব্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের থেকে উদ্ভৃত করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, তিনি বিভিন্ন সাহাবী থেকে একধা গুনেছেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা) দাইলামী, ইবনে আসাকির ও আবু নু’আইম হ্যরত আবু হুরাইরার একটি হাদীস উদ্ভৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এ আয়াতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন, এ থেকে কুড়াল, বালতি এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস বুঝানো হয়েছে। এ হাদীসটি যদি সহীহ হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এটি অন্য লোকেরা জানতেন না। জানলে এরপর কখনো তারা এর অন্য কোন ব্যাখ্যা করতেন না।

ମୂଳତ ମାଉନ ଛୋଟ ଓ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ଜିନିସକେ ବଲା ହ୍ୟ। ଏମନ ଧରନେର ଜିନିସ ଯା ଲୋକଦେର କୋନ କାଜେ ଲାଗେ ବା ଏଇ ଥେକେ ତାରା ଫାଯଦା ଅର୍ଜନ କରତେ ପାରେ। ଏ ଅର୍ଥେ ଯାକାତ୍ତ୍ୱ ମାଉନ। କାରଣ ବିପ୍ଳମ ପରିମାଣ ସମ୍ପଦେର ମଧ୍ୟ ଥେକେ ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ସମ୍ପଦ ଯାକାତ୍ତ୍ୱ ହିସେବେ ଗରୀବଦେର ସାହାଯ୍ୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଦେଯା ହ୍ୟ। ଆର ଏହି ସଂଗେ ହ୍ୟରତ ଆବଦୁଲ୍‌ଗ୍��ାହ ଇବନେ ମାସଉଦ (ରା) ଏବଂ ତୌର ସମମନୀ ଲୋକେରୋ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେସବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଦ୍ୱୟାଦିର କଥା ଉତ୍ୟେ କରିଛେ ସେଣ୍ଟଲୋଓ ମାଉନ। ଅଧିକାଳେ ତାଫ୍‌ସୀରକାରେର ମତେ, ସାଧାରଣତ ପ୍ରତିବେଶୀରୀ ଏକଜନ ଆର ଏକଜନେର କାହିଁ ଥେକେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେସବ ଜିନିସ ଚେଯେ ନିତେ ଥାକେ ସେଣ୍ଟଲୋଇ ମାଉନେର ଅନ୍ତରଭୂତ। ଏ ଜିନିସଗୁଲୋ ଅନ୍ୟେର କାହିଁ ଥେକେ ଚେଯେ ନେଯା କୋନ ଆପମାନଜନକ ବିଷୟ ନ୍ୟ। କାରଣ ଧନୀ-ଗରୀବ ସବାର ଏ ଜିନିସଗୁଲୋ କୋନ ନା କୋନ ସମୟ ଦରକାର ହ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ଏ ଧରନେର ଜିନିସ ଅନ୍ୟକେ ଦେବାର ବ୍ୟାପାରେ କାର୍ଗଣ୍ୟ କରା ହୀନ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚାୟକ। ସାଧାରଣତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ଜିନିସଗୁଲୋ ଅପରିବର୍ତ୍ତି ଥେକେ ଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିବେଶୀରୀ ନିଜେଦେର କାଜେ ସେଣ୍ଟଲୋ ବ୍ୟବହାର କରେ, କାଜ ଶେଷ ହ୍ୟେ ଗେଲେ ଅବିକୃତ ଅବଶ୍ୟାୟଇ ତା ଫେରତ ଦେଯ। କାରୋ ବାଡ଼ିତେ ମେହମାନ ଏଲେ ପ୍ରତିବେଶୀର କାହିଁ ଖାଟିଆ ବା ବିଛାନା-ବାଲିଶ ଚାଓୟାଓ ଏ ମାଉନେର ଅନ୍ତରଭୂତ। ଅଥବା ନିଜେର ପ୍ରତିବେଶୀର ଚାଲାଯ ଏକଟୁ ରାନ୍ଧାବାରା କରେ ନେଯାର ଅନ୍ୟତି ଚାଓୟା କିଂବା କେଉ କିଛିଦିନେର ଜନ୍ୟ ବାଇରେ ଯାଛେ ଏବଂ ନିଜେର କୋନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିସ ଅନ୍ୟେର କାହିଁ ହେଫାଜତ ସହକାରେ ରାଖିତେ ଚାଓୟାଓ ମାଉନେର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୂତ। କାଜେଇ ଏଥାନେ ଆୟାତେର ମୂଳ ବକ୍ତବ୍ୟ ହଞ୍ଚେ, ଆଖେରାତ ଅସ୍ତ୍ରିକୃତି ମାନୁଷକେ ଏତବେଶୀ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣମନୀ କରେ ଦେଯ ଯେ, ସେ ଅନ୍ୟେର ଜନ୍ୟେ ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ୟାଗ ସ୍ଥିକାର କରତେଓ ରାଙ୍ଗି ହ୍ୟ ନା।

আল কাউসার

১০৮

নামকরণ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْرْ এ বাক্যের মধ্য থেকে 'আল কাউসার' শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নামিলের সময়-কাল

ইবনে মারদুইয়া, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবাইর (রা) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মক্কী সূরা। কাল্বী ও মুকাতিল একে মক্কী বলেন। অধিকাংশ তাফসীরকারণও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু হযরত হাসান বসরী, ইকরামা, মুজাহিদ ও কাতাদাহ একে মাদানী বলেন। ইমাম সুযৃতী তাঁর ইতিকাস গ্রন্থে এ বক্তব্যকেই সঠিক গণ্য করেছেন। ইমাম মুসলিমও তাঁর শারহে মুসলিম গ্রন্থে এটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এর কারণ হচ্ছে ইমাম আহমাদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনয়ির, ইবনে মারদুইয়া ও বাইহাকী ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসটি। এ হাদীসে বলা হয়েছে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এ সময় তিনি তন্ত্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি মুচকি হাসতে হাসতে তাঁর মাথা উঠালেন। কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, শোকের জিজ্ঞেস করলো, আপনি মুচকি হাসছেন কেন? আবার কোন কোন রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, তিনি নিজেই শোকদের বললেন : এখনি আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তারপর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে তিনি সূরা আল কাউসারটি পড়লেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, জানো কাউসার কি? সাহাবীরা বললেন : আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। বললেন : সেটি একটি নহর। আমার রব আমাকে জানাতে সেটি দান করেছেন। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আসছে সামনের দিকে আল কাউসারের ব্যাখ্যা প্রসংগে।) এ হাদীসটির ভিত্তিতে এ সূরাটিকে মাদানী বলার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আনাস (রা) মক্কায় নয় বরং মদীনায় ছিলেন। এ সূরাটির মাদানী হবার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তিনি বলেছেন, তাঁর উপস্থিতিতেই এ সূরাটি নাযিল হয়।

কিন্তু প্রথমত এটা হযরত আনাস (রা) থেকেই ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিয় ও ইবনে জারীর রেওয়ায়াত করেছেন যে, জানাতের এ নহরটি (কাউসার), রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মি'রাজে দেখানো হয়েছিল। আবার সবাই জানেন মি'রাজ মক্কায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল হিজরাতের আগে। দ্বিতীয়ত মি'রাজে যেখানে মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে কেবলমাত্র এটি দান করারই খবর দেননি বরং এটিকে তাঁকে দেখিয়েও দিয়েছিলেন সেখানে আবার তাঁকে এর সুসংবাদ দেবার জন্য মদীনা তাইয়েবায় সূরা কাউসার নাযিল করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তৃতীয়ত

যদি হযরত আনাসের উপরোক্তিখিত বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সাহাবীগণের একটি সমাবেশে সূরা কাওসার নাযিল হবার থবর দিয়ে থাকেন এবং তার অর্থ এ হয়ে থাকে যে, প্রথমবার এ সূরাটি নাযিল হলো, তাহলে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের মতো সতর্ক সাহাবীগণের পক্ষে কিভাবে এ সূরাটিকে মক্কী গণ্য করা সম্ভব? অন্যদিকে মুফাসিসিরগণের অধিকাংশই বা কেমন করে একে মক্কী বলেন? এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে হযরত আনাসের রেওয়ায়াতের মধ্যে একটি ফাঁক রয়েছে বলে পরিষ্কার মনে হয়। যে মজলিসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা বলেছিলেন সেখানে আগে থেকে কি কথাবার্তা চলছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ তাতে নেই। সম্ভবত সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন। এমন সময় অহীর মাধ্যমে তাঁকে জানানো হলো, সূরা কাওসারে সংশ্লিষ্ট ব্যাপারটির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। আর তখন তিনি একথাটি এভাবে বলেছেন : আমার প্রতি এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। এ ধরনের ঘটনা কয়েকবার ঘটেছে। তাই মুফাসিসিরগণ কোন কোন আয়াত সম্পর্কে বলেছেন, সেগুলো দু'বার নাযিল হয়েছে। এ দ্বিতীয়বার নাযিল হবার অর্থ হচ্ছে, আয়াত তো আগেই নাযিল হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয়বার কোন সময় অহীর মাধ্যমে নবীর (সা) দৃষ্টি এ আয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়ে থাকবে। এ ধরনের রেওয়ায়াতে কোন আয়াতের নাযিল হবার কথা উল্লেখ থাকাটা তার মক্কী বা মাদানী হবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

হযরত আনাসের এ রেওয়ায়াতটি যদি সলেহ সৃষ্টি করার কারণ না হয় তাহলে সূরা কাওসারের সমগ্র বক্তব্যই তার মক্কা মু'আয্যমায় নাযিল হবার সাক্ষ পেশ করে। এমন এক সময় নাযিল হওয়ার সাক্ষ পেশ করে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত কঠিন হতাশা ব্যক্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিপূর্বে সূরা দুহা ও সূরা আলাম নাশরাহ-এ দেখা গেছে, নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সবচেয়ে কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তার সাথে শক্রতা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, বাধার বিরাট পাহাড়গুলো তাঁর পথে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, চতুর্দিকে প্রবল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ও তাঁর মুঠিমেয় কয়েকজন সাথী বহুদূর পর্যন্ত কোথাও সাফল্যের কোন আলামত দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার ও তাঁর মনে সাহস সংঘরের জন্য মহান আগ্রাহ বহ আয়াত নাযিল করেন এর মধ্যে সূরা দুহায় তিনি বলেন :

وَلِلَاخِرَةِ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضِي

“আর অবশ্যি তোমার জন্য পরবর্তী যুগ (অর্থাৎ প্রত্যেক যুগের পরের যুগ) পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে তালো এবং শীঘ্রই তোমার রব তোমাকে এমনসব কিছু দেবেন যাতে তুমি খুশী হয়ে যাবে।”

“**وَرَفِعْنَا لَكَ ذُكْرَكَ** س্থার আমি তোমার অপয়াজ বুলল করে দিয়েছি।” অর্থাৎ শক্র সারা দেশে তোমার দুর্নাম ছড়িয়ে বেড়াছে কিন্তু তাদের ইহার বিরুদ্ধে আমি তোমার নাম উচ্চল কুরার এবং তোমাকে সুখ্যাতি দান ফান মু উস্র বিস্তা - অন সাথে আরো বলেন : **مَعَ الْعَسْرِ يُسْرًا** - স্কাজেই, প্রকৃতপক্ষে সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্তাও আছে। নিচিতভাবেই **সংকীর্ণতার সাথে প্রশংস্তাও আছে।**” অর্থাৎ বর্তমানে কঠিন অবস্থা দেখে পেরেশান হয়ো না। শীঘ্ৰই এ দুখের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সাফল্যের যুগ এই তো শুন হয়ে যাচ্ছে।

এমনি এক অবস্থা ও পরিস্থিতিতে সূরা কাওসার নায়িল করে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাল্লানা দান করেন এবং তাঁর শক্রদেরকে খৃণ্স করে দেবার ভবিষ্যতাগানিও শুনিয়ে দেন। কুরাইশ বংশীয় কাফেররা বলতো, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সমগ্র জাতি থেকে বিছির হয়ে গেছে। তার অবস্থা হয়ে গেছে একজন সহায় ও বাস্কবহীন ব্যক্তির মতো। ইকরামা (রা) বর্ণনা করেছেন : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন নবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং তিনি কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন তখন কুরাইশরা বলতে থাকে **بَقْرٌ مُحَمَّدٌ مَنْ** অর্থাৎ **মুহাম্মদ নিজের জাতি থেকে বিছির হয়ে এমন অবস্থায় পৌছে গেছে যেমন কোন গাছের শিকড় কেটে দেয়া হলে তার অবস্থা হয়।** কিছুদিনের মধ্যে সেটি শুকিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়।” (ইবনে জারীর) মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন, মক্কার সরদার আস ইবনে ওয়ায়েল সাহমির সামনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা উঠলেই সে বলতো : “**সে তো একজন আবতার অর্থাৎ শিকড় কাটা।** কোন ছেলে সন্তান নেই। মরে গেলে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকবে না।” শিমার ইবনে আতীয়ার বর্ণনা মতে উকবা ইবনে আবু মু'আইতও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমনি ধরনের কথা বলতো। (ইবনে জারীর) ইবনে আবাসের (রা) বর্ণনা মতে, একবার কাব ইবনে আশরাফ (মদীনার ইহুদি সরদার) মক্কায় আসে। কুরাইশ সরদাররা তাকে বলে :

أَلَا تَرَى إِلَى هَذَا الصَّبَرِيُّ الْمُنْبَتِرِ مِنْ قَوْمٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنَّا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَجْرِيْجِ وَأَهْلُ السَّدَّانَةِ وَأَهْلُ السَّقَابَيَةِ -

“এ ছেলেটির ব্যাপার-স্যাপার দেখো। সে তার জাতি থেকে বিছির হয়ে গেছে। সে মনে করে, সে আমাদের থেকে ভালো। অথচ আমরা হজ্জের ব্যবস্থাপনা করি, হাজীদের সেবা করি ও তাদের পানি পান করাই।” (বায়ুয়ার)

এ ঘটনাটি সম্পর্কে ইকরামা বলেন, কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে **الصَّبَرِيُّ الْمُنْبَتِرِ** নিবৰ্ত্তন করতো। অর্থাৎ **তিনি এক অসহায়, বক্সু-বাস্কবহীন, দুর্বল ও নিস্তান ব্যক্তি এবং নিজের জাতি থেকেও তিনি বিছির হয়ে পড়েছেন।**” (ইবনে জারীর) ইবনে সাদ ও ইবনে আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী ইহরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বলেছেন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম (রা) তার ছেট ছিলেন হ্যরত যহুনব(রা)। তার

ছেট ছিলেন হয়রত আবদুল্লাহ (রা)। তারপর জন্ম নেয় যথাক্রমে তিনি কন্যা; হয়রত উম্মে কুলসূম (রা), হয়রত ফাতেমা (রা) ও হয়রত রম্মাইয়া (রা)। এদের মধ্যে সর্ব প্রথম মারা যান হয়রত কাসেম। তারপর মারা যান হয়রত আবদুল্লাহ। এ অবস্থা দেখে আস ইবনে ওয়ায়েল বলে, “তার বৎসই খতম হয়ে গেছে। এখন সে আবতার (অর্থাৎ তার শিকড় কেটে গেছে)। কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো একটু বাড়িয়ে আসের এই বজ্র্য এসেছে : ”

اَنْ مُحَمَّدًا اَبْتَرُ لَا اِبْنَ لَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ فَإِذَا مَاتَ اِنْقَطَعَ ذِكْرُهُ
وَاسْتَرْحَتْ مِنْهُ -

“মুহাম্মাদ একজন শিকড় কাটা। তার কোন ছেলে নেই, যে তার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। সে মরে গেলে দুনিয়া থেকে তার নাম মিটে যাবে। আর তখন তোমরা তার হাত থেকে নিষ্ঠার পাবে।”

আবদ ইবনে হমাইদ ইবনে আবাসের যে রেওয়ায়াত উদ্ভৃত করেছেন, তা থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর আবু জেহেলও এই ধরনের কথা বলেছিল। ইবনে আবী হাতেম শিমার ইবনে আতীয়াহ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শোকে আনন্দ প্রকাশ করতে গিয়ে উকবা ইবনে আবী মু'আইতও এই ধরনের ইহুন মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। আতা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিতীয় পুত্রের ইতিকালের পর তাঁর চাচা আবু লাহাব (তাঁর ঘর ছিল রসূলের ঘরের সাথে লাগোয়া), দৌড়ে মুশরিকদের কাছে চলে যায় এবং তাদের এই “সুখবর” দেয় : بَلْ مُحَمَّدٌ الْبَلِيلُ । অর্থাৎ রাতে মুহাম্মাদ স্তানহারা হয়ে গেছে অথবা তাঁর শিকড় কেটে গেছে।”

এ ধরনের চরম হতাশাব্যাঙ্কক পরিস্থিতিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা কাউসার নাফিল করা হয়। তিনি কেবল আল্লাহর বন্দেগী করতেন এবং আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরীক করাকে প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ কারণে কুরাইশেরা ছিল তাঁর প্রতি বিলম্ব। এ জন্যই নবুওয়াতলাভের আগে সমগ্র জাতির মধ্যে তাঁর যে যর্যাদা ছিল নবুওয়াতলাভের পর তা ছিলিয়ে নেয়া হয়েছিল। তাঁকে এক রঞ্জম জ্ঞাতি-গোত্র থেকে বিছির করে দেয়া হয়েছিল। তাঁর সংগী-সাথী ছিলেন মাত্র মৃষ্টিময় কয়েকজন লোক। তাঁরাও ছিলেন বন্ধু-বান্ধব ও সহায়-সঞ্চলহীন। তাঁরাও ঝূলুম-নিপীড়ন সহ্য করে চলছিলেন। এই সাথে তাঁর একের পর এক স্তানের মৃত্যুতে তাঁর উপর যেন দৃঢ় ও শোকের পাহাড় তেজে পড়েছিল। এ সময় আতীয়-স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের গক্ষ থেকে সহানুভূতি প্রকাশ ও সাত্ত্বনাবাণী শুনাবার পরিবর্তে আনন্দ উচ্ছ্বাস করা হচ্ছিল। এমন একজন লোক যিনি শুধু আপন লোকদের সাথেই নয়, অপরিচিত ও অনাতীয়দের সাথেও সবসময় পরম প্রীতিপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল ব্যবহার করছিলেন তাঁর বিরলদের এ ধরনের বিভিন্ন অপ্রীতিকর কথা ও আচরণ তাঁর মন ভেঙ্গে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল। এ অবস্থায় এ ছেট সূরাটির একটি বাক্যে আল্লাহ তাঁকে এমন একটি সুখবর দিয়েছেন যার চাইতে বড় সুখবর দুনিয়ার কোন মানুষকে কোন দিন দেয়া হয়নি। এই সংগে তাঁকে এ সিদ্ধান্তও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তাঁর বিরোধিতাকারীদেরই শিকড় কেটে যাবে।

আয়াত ৩

সূরা আল কাউসার-মঙ্গী

রুক্মি ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ^① إِنْ شَاءْنَكَ
هُوَ الْأَبْتَرُ^②

(হে নবী!!) আমি তোমাকে কাউসার দান করেছি।^১ কাজেই তুমি নিজের রবেরই
জন্য নামায পড়ো ও কুরবানী করো।^২ তোমার দুশমনই^৩ শিকড় কাট।^৪

১. কাউসার শব্দটি এখানে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে আমাদের ভাষায় তো দূরের
কথা দুনিয়ার কোন ভাষায়ও এক শব্দে এর পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এ শব্দটি
মূলে কাসরাত কৰ্ত্তা থেকে বিপুর ও অত্যধিক পরিমাণ বুবাবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে, সীমাহীন আধিক্য। কিন্তু যে অবস্থায় ও পরিবেশে শব্দটি
ব্যবহার করা হয়েছে। তাতে শুধুমাত্র আধিক্য নয় বরং কল্যাণ ও নিয়ামতের আধিক্য এবং
এমন ধরনের আধিক্যের ধারণা পাওয়া যায় যা বাহ্য ও প্রাচুর্যের সীমান্তে পৌছে গেছে।
আর এর অর্থ কোন একটি কল্যাণ বা নিয়ামত নয় বরং অসংখ্য কল্যাণ ও নিয়ামতের
আধিক্য। ভূমিকায় আমি এ সূরার যে প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছি তার ওপর আর একবার
দৃষ্টি বুলানো প্রয়োজন। তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। শত্রু মনে করছিল,
যুদ্ধায়াদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবদিক দিয়ে ধূঃৎস হয়ে গেছেন। জাতি থেকে
বিচ্ছিন্ন হয়ে বন্ধু-বন্ধব ও সহায়-সহলহীন হয়ে পড়েছেন। ব্যবসা ধূঃৎস হয়ে গেছে।
বৎসে বাতি জ্বালাবার জন্য যে ছেলে সন্তান ছিল, সেও মারা গেছে। আবার তিনি এমন
দীর্ঘয়াত নিয়ে ময়দানে নেমেছেন যার ফলে হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া মঙ্গা তো দূরের
কথা সারা আরব দেশের কোন একটি লোকও তাঁর কথায় কান দিতে প্রস্তুত নয়। কাজেই
তীর ভাগ্যের লিখন হচ্ছে জীবিত অবস্থায় ব্যর্থতা এবং মারা যাবার পরে দুনিয়ায় তাঁর নাম
উচ্চারণ করার মতো একজন লোকও থাকবে না। এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন
বলা হলো, তোমাকে কাউসার দান করেছি তখন স্বাভাবিকভাবে এর মানে দাঁড়ালোঃ
তোমার শক্রপঙ্কীয় নির্বোধরা মনে করছে তুমি ধূঃৎস হয়ে গেছো এবং নবুওয়াত শান্তের
পূর্বে তুমি যে নিয়ামত অর্জন করেছিলে তা তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু
প্রকৃতপক্ষে আগি তোমাকে সীমাহীন কল্যাণ ও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছি। নবী
সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নজিরবিহীন উন্নত নৈতিক গুণাবলী দান করা
হয়েছিল সেগুলোও এর অন্তরভুক্ত। তাকে যে নবুওয়াত, কুরআন এবং জ্ঞান ও তা প্রয়োগ

করার মতো বৃদ্ধিবৃত্তির নিয়ামত দান করা হয়েছিল তাও এর মধ্যে শামিল। তাওহীদ ও এমন ধরনের একটি জীবন ব্যবহার নিয়ামত এর অন্তরভুক্ত যার সহজ, সরল, সহজবোধ্য, বৃদ্ধি ও প্রকৃতির অনুসারী এবং পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন মূলনীতি সমগ্র বিষ্ণে ছড়িয়ে পড়ার এবং হামেশা ছড়িয়ে পড়তে থাকার ক্ষমতা রাখে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা ব্যাপকভাবে করার নিয়ামতও এর অন্তরভুক্ত যার বদৌলতে তাঁর নাম চৌদশ্পো বছর থেকে দুনিয়ার সর্বত্র বুলবুল হচ্ছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বুলবুল হতে থাকবে। তাঁর আহবানে অবশ্যে এমন একটি বিশ্বব্যাপী উন্নাতের উজ্জ্বল হয়েছে, যারা দুনিয়ায় চিরকালের জন্যে আল্লাহর সত্য দীনের ধারক হয়েছে, যাদের চাইতে বেশী সৎ, নিষ্কুল ও উন্নত চরিত্রের মানুষ দুনিয়ার কোন উন্নাতের মধ্যে কখনো জন্ম লাভ করেনি এবং বিকৃতির অবস্থায় পৌছেও যারা নিজেদের মধ্যে দুনিয়ার সব জাতির চাইতেও বেশী কল্যাণ ও নেকীর গুণবল্গী বহন করে চলছে। এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত।

রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের ঢেখে নিজের জীবন্দশায় নিজের দাওয়াতকে সাফল্যের স্বর্ণশিখারে উঠতে দেখেছেন এবং তাঁর হাতে এমন জামায়াত তৈরি হয়েছে যারা সারা দুনিয়ার উপর হেয়ে যাবার ক্ষমতা রাখতো, এ নিয়ামতটিও এর অন্তরভুক্ত। ছেলে সন্তান থেকে বধিত হবার পর শক্রমা মনে করতো তাঁর নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে ঘিটে যাবে। কিন্তু আল্লাহ শুধু মূসলমানদের আকারে তাঁকে এমন ধরনের আধ্যাত্মিক সন্তান দিয়েই ক্ষত হননি যারা কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় তাঁর নাম বুলবুল করতে থাকবে বরং তাঁকে শুধুমাত্র একটি কল্যাণ হয়ে রফতানির মাধ্যমে এত বিপুল পরিমাণ রক্তমাখসের সন্তান দান করেছেন যারা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং মহান নবীর সাথে সম্পর্কই যাদের সবচেয়ে বড় অহংকার। এটিও এ নিয়ামতের অন্তরভুক্ত।

নিয়ামতগুলো আল্লাহ তাঁর নবীকে এ মরজগতেই দান করেছেন। কৃত বিপুল পরিমাণে দান করেছেন তা লোকেরা দেখেছে। এগুলো ছাড়াও কাউসার বলতে আরো দু'টো মহান ও বিশাল নিয়ামত বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তাঁকে আখেরাতে দান করবেন। সেগুলো সম্পর্কে জানার কোন মাধ্যম আমাদের কাছে ছিল না। তাই রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সেগুলো সম্পর্কে জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন : কাউসার বলতে দু'টি জিনিস বুঝানো হয়েছে। একটি হচ্ছে “হাউজে কাউসার” এটি কিয়ামতের ময়দানে তাঁকে দান করা হবে। আর দ্বিতীয়টি “কাউসার বরগাধরা।” এটি জারাতে তাঁকে দান করা হবে। এ দু'টির ব্যাপারে রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এত বেশী হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এত বিপুল সংখ্যক রাবী এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন যার ফলে এগুলোর নির্ভুল হবার ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহেরও অবকাশ নেই।

হাউজে কাউসার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ তথ্য পরিবেশন করেছেন :

এক : এ হাউজটি কিয়ামতের দিন তাঁকে দেয়া হবে। এমন এক কঠিন সময়ে এটি তাঁকে দেয়া হবে যখন সবাই ‘আল আতশ’ ‘আল আতশ’ অর্থাৎ পিপাসা, পিপাসা বলে চিন্তকার করতে থাকবে সে সময় তাঁর উন্নাত তাঁর কাছে এ হাউজের চারদিকে সমবেত হবে এবং এর পানি পান করবে। তিনি সবার আগে সেখানে পৌছবেন এবং তাঁর মাঝে বরাবর জায়গায় বসে থাকবেন। তাঁর উক্তি : **هُوَ حَسْنٌ تَرَدْ حَلِيَّهُ أَمْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ**

“সেটি একটি হাউজ। আমার উদ্যাত কিয়ামতের দিন তার কাছে থাকবে।” (মুসলিম, কিতাবুস সালাত এবং আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) “আমি ফরতক্ম উপর হাউজের সবার আগে সেখানে পৌছে যাবো।” (বুখারী, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম, কিতাবুল ফায়ায়েল ও কিতাবুত তাহারাত, ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মানাসিক ও কিতাবুয় যুহুদ এবং মুসলাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) ও আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

إِنِّيْ فَرُطْ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَأَتَىٰ وَاللَّهُ لَأَنْظُرَ إِلَى حَوْضِي الْآنَ

“আমি তোমাদের আগে পৌছে যাবো, তোমাদের জন্য সাক্ষ দেবো এবং আগ্নাহের কসম, আমি এ মুহূর্তে আমার হাউজ দেখতে পাচিছ। (বুখারী, কিতাবুল জানায়ে, কিতাবুল মাগায়ী ও কিতাবুর রিকাক)।

আনসারদেরকে সর্বোধন করে একবার তিনি বলেন :

النَّكْمَ سَتُّلَقُونَ بَعْدَى أَكْرَةً فَاضْبِرُوا حَقَّ تَلْقُونِي عَلَى الْحَوْضِ

“আমার পরে তোমরা স্বার্থাদিতা ও স্বজনপ্রীতির পাত্রায় পড়বে। তখন তার ওপর সবর করবে, আমার সাথে হাউজে কাউসারে এসে মিলিত হওয়া পর্যন্ত।” (বুখারী, কিতাবুল মানাকিবিল আনসার ও কিতাবুল মাগায়ী, মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ এবং তিরমিয়ী কিতাবুল ফিতান।

“**إِنَّ يَوْمَ الْقِيمَةِ عِنْدَ عَقْرِ الْحَوْضِ**” কিয়ামতের দিন আমি হাউজের মাঝে বরাবর থাকবো।” (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) হযরত আবু বারযাহ আসলামীকে (রা) জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি হাউজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কিছু শুনেছেন? তিনি বলেন, “একবার নয়, দু’বার নয়, তিনবার নয়, চারবার নয়, পাঁচবার নয়, বারবার শুনেছি। যে ব্যক্তি একে মিথ্যা বলবে আগ্নাহ তাকে যেন তার পানি পান না করান।” (আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ) উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ হাউজ সম্পর্কিত রেওয়ায়াত মিথ্যা মনে করতো। এমন কি সে হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রা), বারআ ইবনে আযেব (রা) ও আয়েদ ইবনে আমর (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতগুলো অঙ্গীকার করলো। শেষে আবু সাবরাহ একটি লিপি বের করে আনলেন। এ লিপিটি তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের (রা) মুখে শুনে লিখে রেখেছিলেন। তাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের এ বাণী লেখা ছিল : **إِنَّ مَوْعِدَكُمْ حَوْضِي** **إِنَّ جَنَّةَ رَاخِيَّ** আমার ও তোমাদের সাক্ষাতের স্থান হচ্ছে আমার হাউজ।” (মুসলাদে আহমাদ, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়াতসমূহ)।

দুই : এ হাউজের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার বর্ণনা এসেছে। তবে অধিকাংশ রেওয়ায়াতে বলা হয়েছেঃ এটি আইলা (ইসরাইলের বর্তমান বন্দর আইলাত) থেকে ইয়ামনের সান’আ পর্যন্ত অথবা আইলা থেকে এডেন পর্যন্ত কিংবা আশ্মান থেকে এডেন পর্যন্ত দীর্ঘ হবে। আর এটি চতুর্ভা হবে আইলা থেকে হঞ্জকাহ (জেলা ও রাবণেগের মাঝখানে একটি স্থান) পর্যন্ত জায়গার সম্পরিমাণ। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, আবু দাউদ

তায়ালাসী ১৯৫ হাদীস, মুসনাদে আহমাদ, আবু বকর সিদ্দীক ও আবদুগ্রাহ ইবনে ওমর বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ, মুসলিম-কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, তিরমিয়ি—আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ এবং ইবনে মাজাহ-কিতাবুয় যুহোদ।)। এ থেকে অনুমান করা যায়, বর্তমান গোহিত সাগরটিকেই কিয়ামতের দিন হাউজে কাউসারে পরিবর্তিত করে দেয়া হবে। তবে আসল ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই ভালো জানে।

তিনি : এ হাউজটি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জারাতের কাউসার বরণাধারা (সামনে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) থেকে পানি এনে এতে ঢালা হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে : **يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانٌ مِنَ الْجَنَّةِ إِذْ أَنْتَ بِهِ مِيزَابَانٌ يَمْدَانُ** بعث فيه ميزابان من الجنة إِذْ أَنْتَ بِهِ ميزابان يَمْدَانُ
এবং অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : **يَفْتَحُ نَهْرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى الْحَوْضِ** অর্থাৎ জারাতের কাউসার বরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসলিম কিতাবুল ফাজায়েল) অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : **يَفْتَحُ نَهْرٌ مِنَ الْكَوْثَرِ إِلَى الْحَوْضِ** অর্থাৎ জারাতের কাউসার বরণাধারা থেকে একটি নহর এ হাউজের দিকে খুলে দেয়া হবে এবং তার সাহায্যে এতে পানি সরবরাহ জারী থাকবে (মুসনাদে আহমাদ, আবদুগ্রাহ ইবনে মাসউদ বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহ)।

চার : হাউজে কাউসারের অবস্থা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, তার পানি হবে দুধের চাইতে (কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী রূপার চাইতে আবার কোন কোন রেওয়ায়াত অনুযায়ী বরফের চাইতে) বেশী সাদা, বরফের চাইতে বেশী ঠাণ্ডা এবং মধুর চাইতে বেশী মিষ্টি। তার তলদেশের ঘাটি হবে মিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিকৃত। আকাশে যত তারা আছে ততটি সোনালী তার পাশে রাখা থাকবে। তার পানি একবার পান করার পর দ্বিতীয়বার কারো পিপাসা লাগবে না। আর তার পানি যে একবার পান করেনি তার পিপাসা কোনদিন ঘটিবে না। সামান্য শান্তিক হেরফেরসহ একথাণ্ডোই অসংখ্য হাদীসে উল্লিখ হয়েছে। (বুখারী-কিতাবুর রিকাক, মুসলিম-কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ-ইবনে মাসউদ, ইবনে উমর ও আবদুগ্রাহ ইবনে আমর ইবনুল ‘আস বর্ণিত রেওয়ায়াত সমূহ, তিরমিয়ি-আবওয়াবু সিফাতিল কিয়ামাহ, ইবনে মাজাহ-কিতাবুয় যুহোদ এবং আবু দাউদ আত তায়ালাসী, ১৯৫ ও ২১৩৫ হাদীস।

পাঁচ : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার তাঁর সময়ের লোকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমার পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার তরিকা পদ্ধতি পরিবর্তন করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে এবং এর পানির কাছে তাদের আসতে দেয়া হবে না। আমি বলবো, এরা আমার লোক। জ্বাবে আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে এরা কি করেছে। তখন আমিও তাদেরকে তাড়িয়ে দেবো। আমি বলবো, দূর হয়ে যাও। এ বক্তব্যটিও অসংখ্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। (বুখারী-কিতাবুল ফিতান ও কিতাবুর রিকাক, মুসলিম-কিতাবুত তাহারাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, মুসনাদে আহমাদ-ইবনে মাসউদ ও আবু হুরাইরা বর্ণিত হাদীসসমূহ, ইবনে মাজাহ-কিতাবুল মানাসিক।) ইবনে মাজাহ এ ব্যাপারে যে

হাদীস উভূত করেছেন তার শব্দগুলো বড়ই স্বদয়স্পর্শী। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَلَا وَإِنِّي فُرْطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَكَاثِرُ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَسْتَوْنَا وَجْهِنَّمَ
أَلَا وَإِنِّي مُسْتَنْقِدُ أَنَّاسًا وَمُسْتَنْقِدُ أَنَّاسًا مِنِّي فَاقْوُلْ يَارَبَ أَصْحَابِي
فَيَقُولُ إِنَّكَ لَأَتَدْرِي مَا أَحْدَثَنَا بَعْدَكَ -

“সাবধান হয়ে যাও। আমি তোমাদের আগে হাউজে উপস্থিত থাকবো। তোমাদের মাধ্যমে অন্য উচ্চাতদের মোকাবিলায় আমি নিজের উচ্চাতের বিপুল সংখ্যার জন্য গর্ব করতে থাকবো। সে সময় আমার মুখে কালিমা লেপন করো না। সাবধান হয়ে যাও। কিছু লোককে আমি ছাড়িয়ে নেবো আর কিছু লোককে আমার কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হবে। আমি বলবো, হে আমার রব! এরা তো আমার সাহাবী। তিনি বলবেন, তুমি জানো না, তোমার পরে এরা কী অভিনব কাজ কারবার করেছে।” ইবনে মাজার বক্তব্য হচ্ছে, এ শব্দগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর আরাফাত ময়দানের ভাষণে বলেছিলেন।

ছয় : এতাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পর থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময় কালের সমগ্র মুসলিম মিলাতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন : তোমাদের মধ্য থেকে যারাই আমার পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য পথে চলবে এবং তার মধ্যে রদবদল করবে তাদেরকে এ হাউজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। আমি বলবো : হে আমার রব! এরা তো আমার উচ্চাতের লোক। জবাবে বলা হবে : আপনি জানেন না, আপনার পরে এরা কি কি পরিবর্তন করেছিল এবং আপনার পথের উটোদিকে চলে গিয়েছিল। তখন আমিও তাদেরকে দূর করে দেবো। এবং তাদেরকে হাউজের ধারে কাছে ঘেসতে দেবো না। হাদীস গ্রন্থগুলোতে এ বিষয়কস্থ সম্পর্ক অসংখ্য হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। বুখারী—কিতাবুল মুসাকাত, কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল ফিতান, মুসলিম—কিতাবুত তাহারাত, কিতাবুস সালাত ও কিতাবুল ফাজায়েল, ইবনে মাজার—কিতাবুয় যুদ্ধ, মুসনাদে আহমাদ—আবদুল্লাহ ইবনে আবুস বর্ণিত হাদীসমযুক্ত।

পঞ্চাশ জনেরও বেশী সাহাবী এ হাউজ সংক্রান্ত হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। প্রথম যুগের আলেমগণ সাধারণতাবে এটিকে হাউজে কাউসার বলেছেন। ইমাম বুখারী কিতাবুর রিকাকের শেষ অনুচ্ছেদের শিরোনাম রাখেন নিম্নোক্তভাবে : بَابِ فِي الْحَوْضِ وَقُوْلُ اللَّهِ أَنَا أَعْطَيْنِكَ الْكَوْنَرَ (হাউজ অনুচ্ছেদ, আর আল্লাহ বলেছেন : আমি তোমাকে কাউসার দিয়েছি)। অন্য দিকে ইয়রত আনাসের রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার সম্পর্কে বলেছেন : هُوَ حَوْضٌ تَرَدَ عَلَيْهِ أَمْتِي হে হুস্তি একটি হাউজ। আমার উচ্চাত সেখানে উপস্থিত হবে।”

জারাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাউসার নামে যে নহরটি দেয়া হবে সেটির উল্লেখও অসংখ্য হাদীসে পাওয়া যায়। ইয়রত আনাস (রা) থেকে এ সংক্রান্ত

বহু হাদীস উদ্ভৃত হয়েছে। সেগুলোতে তিনি বলেন (আবার কোন কোনটিতে তিনি স্পষ্টভাবে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের উকি হিসেবেই বর্ণনা করেন) : মি'রাজে রসূলগ্রাহকে (সা) জানাতে সফর করানো হয়। এ সময় তিনি একটি নহর দেখেন। এ নহরের তীরদেশে ভিতর থেকে হীরা বা মুকার কারুকার্য করা গোলাকৃতির মেহরাবসমূহ ছিল। তার তলদেশের মাটি ছিল খাটি শিশকের সুগন্ধিযুক্ত। রসূলগ্রাহ (সা) জিরীলকে বা যে ফেরেশতা তাকে অর্থণ করিয়েছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ফেরেশতা জবাব দেন, এটা কাউসার নহর। আল্লাহ আপনাকে এ নহরটি দিয়েছেন। মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিয়ী, আবু দাউদ তায়ালাসী ও ইবনে জারীর। হ্যারত আনাস এক রেওয়ায়াতে বলেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, অথবা এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন : কাউসার কি? তিনি জবাব দিলেন : একটি নহর যা আল্লাহ আমাকে জানাতে দান করেছেন। এর মাটি শিশকের। এর পানি দুধের চাইতেও সাদা এবং মধুর চাইতে মিষ্ঠি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে জারীর)। মুসনাদে আহমাদের অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রসূলগ্রাহ (সা) নহরে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : তার তলদেশে কাঁকরের পরিবর্তে মণিমুক্তা পড়ে আছে। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রসূলগ্রাহ (সা) বলেছেন : কাউসার জানাতের একটি নহর। এর তীরদেশ সোনার তৈরি এবং মণিমুক্তা ও হীরার ওপর প্রবাহিত হচ্ছে। (অর্থাৎ তার তলায় কাঁকরের পরিবর্তে মৃল্যবান পাথর বিছানো আছে)। এর মাটি শিশকের চাইতে বেশী সুগন্ধিযুক্ত। পানি দুধের চাইতে বেশী সাদা। বরফের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা ও মধুর চেয়ে বেশী মিষ্ঠি। (মুসনাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে আবী হাতেম, দারামী, আবু দাউদ, ইবনুল মুনয়ির, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে আবী শাইবা)। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, রসূলগ্রাহ (সা) একবার হ্যারত হাময়ার (রা) বাড়িতে যান। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেহমানদারী করেন। আগাম আলোচনা করতে করতে এক সময় তিনি বলেন, আমার স্ত্রী আমাকে বলেছেন, আপনাকে জানাতে একটি নহর দেয়া হবে। তার নাম কাউসার। তিনি বলেন : “হা, তার যথীন ইয়াকুত, মারজান, যবরযদ ও মতির সমবয়ে গঠিত। (ইবনে জারীর ও ইবনে মারদুইয়া)। এ হাদীসটির সূত্র দুর্বল হলেও এ বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক হাদীস পাওয়া যাওয়ার কারণে এর শক্তি বেড়ে গেছে)। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উকি এবং সাহাবা ও তাবেদেগণের অসংখ্য বক্তব্য হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। এ সবগুলোতে কাউসার বলতে জানাতের এ নহরই বুবানো হয়েছে। ওপরে এ নহরের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণিত হয়েছে এ হাদীসগুলোতেও তাই বলা হয়েছে। উদাহরণ ব্রহ্ম হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হ্যারত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা), হ্যারত আনাস ইবনে মালিক (রা), হ্যারত আয়েশা (রা), মুজাহিদ ও আবুল আলীয়ার উকিসমূহ মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, তিরমিয়ী, নাসাই, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শাইবা ইত্যাদি মুহাদ্দিসগণের ক্ষিতাবে উল্লেখিত হয়েছে।

২. বিভিন্ন মনীষী এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ নামায বলতে পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায ধরেছেন। কেউ ইদুল আযহার নামায মনে করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, এখানে নিছক নামাযের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে “ওয়ানহার” অর্থাৎ “নহর কর” শব্দেরও কোন কোন বিপুল মর্যাদার অধিকারী মনীষী অর্থ করেছেন, নামাযে বাম হাতের

ওপর ডান হাত রেখে তা বুকে বাঁধা। কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, নামায শুরু করার সময় দুই হাত ওপরে উঠিয়ে তাকবীর বলা কেউ কেউ বলেছেন, এর মাধ্যমে নামায শুরু করার সময় রুক্ত'তে যাবার সময় এবং রুক্ত' থেকে উঠে রাফে ইয়াদায়েন করা বুঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে, ঈদুল আযহার নামায পড়া এবং কুরবানী করা। কিন্তু যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ হকুম দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে চিন্তা করলে এর সূপ্রাপ্তি অর্থ এই মনে হয় : "হে নবী! তোমার রব যখন তোমাকে এত বিপুল কল্যাণ দান করেছেন তখন তুমি তাঁরই জন্য নামায পড় এবং তাঁরই জন্য কুরবানী দাও।" এ হকুমটি এমন এক পরিবেশে দেয়া হয়েছিল যখন কেবল কুরাইশ বংশীয় মুশরিকরাই নয় সমগ্র আরব দেশের মুশরিকবৃদ্ধি নিজেদের মনগড়া মাবুদের পূজা করতো এবং তাদের আস্তানায় পশু বলী দিতো। কাজেই এখানে এ হকুমের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুশরিকদের বিপরীতে তোমরা নিজেদের কর্মনীতির ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো। অর্থাৎ তোমাদের নামায হবে আগ্নাহরই জন্য, কুরবানীও হবে তাঁরই জন্য। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ «لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ -

"হে নবী! বলে দাও, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার যত্ন বিশ-জাহানের রব আগ্নাহরই জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই। আমাকে এরই হকুম দেয়া হয়েছে এবং আমি সর্বপ্রথম আনুগত্যের শির নত করি।" (আল আন'আম, ১৬২-১৬৩)।

ইবনে আব্রাস, আতা, মুজাহিদ, ইকরামা, হাসান বসরী, কাতাদাহ, মুহাম্মাদ ইবনে কাব আল কুরায়ী, যাহাক, রাবী' ইবনে আনাস, আতাউল খোরাসানী এবং আরো অন্যান্য অনেক নেতৃস্থানীয় মুফাস্সির এর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন (ইবনে কাসীর)। তবে একথা যথাস্থানে পুরোপুরি সত্য যে, রসূলগ্রাহ (সা) যখন মদীনা তাইয়েবায় আগ্নাহর হকুমে ঈদুল আযহার নামায পড়েন ও কুরবানীর প্রচলন করেন তখন যেহেতু অন স্লান্স ওন্সকু আয়াতে এবং ফস্ল লরিক ও অন্ধ্র আয়াতে নামাযকে প্রথমে ও কুরবানীকে পরে রাখা হয়েছে তাই তিনি নিজেও এভাবেই করেন এবং মুসলমানদের এভাবে করার হকুম দেন। অর্থাৎ এদিন প্রথমে নামায পড়বে এবং তারপর কুরবানী দেবে। এটি এ আয়াতের ব্যাখ্যা বা এর শানেন্যুগ্ম নয়। বরং সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো থেকে রসূলগ্রাহ সাগ্রাগ্রাহ আগাইহি ওয়া সাগ্রাম এ বিধানটি ইসতেমবাত তথা উদ্ভাবন করেছিলেন। আর রসূলের (সা) ইসতেমবাতও এক ধরনের শুই।

৩. এখানে شَانِبِك (শা-নিউকা) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে "শন" (শানাউন)। এর মানে এমন ধরনের বিদ্যুত ও শক্তি যে কারণে একজন অন্য অন্যের বিরুদ্ধে অসম্ভবহার করতে থাকে। কুরআন মজীদের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে :

وَلَا يَجْرِي مِنْكُمْ شَنَانٌ قَوْمٌ عَلَى الْأَتَعْدِلِوا

“আর হে মুসলমানরা! কোন দলের প্রতি শক্রতা তোমাদের যেন কোন বাড়াবাড়ি করতে উদ্বৃষ্ট না করে যার ফলে তোমরা ইনসাফ করতে সক্ষম না হও।”

কাজেই এখানে “শানিয়াকা” বলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্রতায় অঙ্গ হয়ে তাঁর প্রতি দোষাত্ত্বে করে, তাঁকে গালিগাছ করে, তাঁকে অবমাননা করে এবং তাঁর বিরণ্দে নানান ধরনের অপবাদ দিয়ে নিজের মনের বাল ঘটায়।

৪. **“সেই আবতার”** বলা হয়েছে। অর্থাৎ সে তোমাকে আবতার বলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই আবতার। আমি ইতিপূর্বে এ স্বার ভূমিকায় “আবতার” শব্দের কিছু ব্যাখ্যা দিয়েছি। এই শব্দের মূলে রয়েছে বাতারা (بَنْر) এর মানে কাটা। কিন্তু এর পারিভাষিক অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হাদীসে নামাযের যে রাকাতের সাথে অন্য কোন রাকাত পড়া হয় না তাকে বুতাইরা (بَتِيراء) বলা হয়। অর্থাৎ একক রাকাত। অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يَبْدأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ

“যে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর প্রসংশাবাণী উচ্চারণ না করে শুরু করাটা আবতার।”

অর্থাৎ তার শিকড় কাটা গেছে। সে কোন প্রতিষ্ঠা ও শক্তিমন্ত্র লাভ করতে পারে না। অথবা তার পরিণাম ভালো নয়। ব্যর্থকাম ব্যক্তিকেও আবতার বলা হয়। যে ব্যক্তির কোন উপকার ও কল্যাণের আশা নেই এবং যার সাফল্যের সব আশা নির্মূল হয়ে গেছে তাকেও আবতার বলে। যার কোন ছেলে সন্তান নেই অথবা হয়ে মারা গেছে তার ব্যাপারেও আবতার শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কারণ তার অবর্তমানে তার নাম নেবার মতো কেউ থাকে না এবং মারা যাবার পর তার নাম-নিশানা মুছে যায়। প্রায় সমস্ত অধেই কুরাইশ কাফেরেরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার বলতো। তার জবাবে আল্লাহ বলেন, হে নবী। তুমি আবতার নও বরং তোমার এ শত্রুই আবতার। এটা নিছক কোন জবাবী আক্রমণ ছিল না। বরং এটা ছিল আসলে কুরআনের বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যতবাণীর মধ্য থেকে একটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী। এটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। যখন এ ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবতার মনে করতো। তখন কেউ ধারণা করতে পারতো না যে, কুরাইশদের এ বড় বড় সরদাররা আবার কেমন করে আবতার হয়ে যাবে? তারা কেবল মুক্তাই নয় সমগ্র দেশে খ্যাতিমান ছিল। তারা সফলকাম ছিল। তারা কেবল ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী ছিল না বরং সারা দেশে বিভিন্ন জায়গায় ছিল তাদের সহযোগী ও সাহায্যকারী দল। ব্যবসার ইজারাদার ও ইজ্জের ব্যবস্থাপক হবার কারণে আরবের সকল গোত্রের সাথে ছিল তাদের সম্পর্ক। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে গেলো। হিজরী ৫ সনে আহ্যাব যুদ্ধের সময় কুরাইশরা বহু আরব ও ইহুদি গোত্র নিয়ে মদীনা আক্রমণ করলো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবরুদ্ধ অবস্থায় শহরের চারদিক পরিষ্কা খনন করে প্রতিরক্ষার লড়াইয়ে লিপ্ত হতে হলো। কিন্তু এর মাত্র তিন বছর পরে ৮ হিজরীতে রসূলুল্লাহ (সা) যখন মুক্ত আক্রমণ করলেন

তখন কুরাইশদের কোন সাহায্য-সহযোগিতা দানকারী ছিল না। নিতাত অসহায়ের মতো তাদেরকে অন্ত সংবরণ করতে হলো। এরপর এক বছরের মধ্যে সমগ্র আরব দেশ ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করতলগত। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল এসে তাঁর হাতে বাই'আত হচ্ছিল। ওদিকে তাঁর শক্রুমা সম্পূর্ণরূপে বকু-বাকুব ও সাহায্য-সহায়হীন হয়ে পড়েছিল। তারপর তাদের নাম-নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে এমনভাবে মুছে গোলো যে, তাদের সন্তানদের কেউ আজ বেঁচে থাকলেও তাদের কেউই আজ জানে না সে আবু জেহেল আর আবু লাহাব, আস ইবনে ওয়ায়েল বা উকবা ইবনে আবী মু'আইত ইত্যাদি ইসলামের শক্রুদের সন্তান। আর কেউ জানলেও সে নিজেকে এদের সন্তান বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত নয়। বিপরীত পক্ষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবারবর্গের ওপর আজ সারা দুনিয়ায় দরদ পড়া হচ্ছে। কোটি কোটি মুসলমান তাঁর সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে গর্ব করে। শাখো দাখো লোক তাঁর সাথেই নয় বরং তাঁর পরিবার-পরিজন এমন কি তাঁর সাথীদের পরিবার পরিজনের সাথেও সম্পর্কিত হওয়াকে গৌরবজনক মনে করে। এখানে কেউ সাইয়েদ, কেউ উল্যুবী, কেউ আব্রাসী, কেউ হাশেমী, কেউ সিন্দিকী, কেউ ফারুকী, কেউ উসমানী, কেউ যুবাইরী এবং কেউ আনসারী। কিন্তু নামমাত্রও কোন আবু জেহেলী বা আবু লাহাবী পাওয়া যায় না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবতার নন বরং তাঁর শক্রুমাই আবতার।

আল কাফিরুন

১০৯

নামকরণ

قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُونَ আয়াতের "আল কাফিরুন" শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হয়রত হাসান বসরী ও ইকরামা বলেন, এটি মক্কী সূরা। হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইর বলেন, মাদানী। অন্যদিকে হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস ও কাতাদাহ থেকে উভয় মতই উদ্বৃত্ত হয়েছে। অর্থাৎ তারা একে মক্কী ও মাদানী উভয়ই বলেন। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে এটি মক্কী সূরা। তাছাড়া এর বিষয়বস্তুই এর মক্কী হবার কথা প্রমাণ করে।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মক্কায় এমন এক মুগ ছিল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে কুরাইশদের মুশরিক সমাজে প্রচল বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহকে (সা) কোন না কোন প্রকারে আপোস করতে উদ্বৃত্ত করা যাবে বলে কুরাইশ সরদাররা মনে করতো। এ ব্যাপারে তারা তখনো নিরাশ হয়নি। এ জন্য তারা যাবে মধ্যে তাঁর কাছে আপোসের ফরযুলা নিয়ে হায়ির হতো। তিনি তার মধ্য থেকে কোন একটি প্রস্তাৱ মেনে নিলেই তাঁর ও তাদের মধ্যকার ঝগড়া মিটে যাবে বলে তারা মনে করতো। হাদীসে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস বর্ণনা করেছেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি শুয়া সাল্লামকে বললো : আমরা আপনাকে এত বেশী পরিমাণ ধন-সম্পদ দেবো যার ফলে আপনি মক্কার সবচেয়ে ধনাঢ় ব্যক্তি হয়ে যাবেন। যে মেয়েটিকে আপনি পছন্দ করবেন তার সাথে আপনার বিয়ে দিয়ে দেবো। আমরা আপনার পিছনে চলতে প্রস্তুত। আপনি শুধু আমাদের একটি কথা মেনে নেবেন—আমাদের উপাস্যদের নিম্না করা থেকে বিরত থাকবেন। এ প্রস্তাবটি আপনার পছন্দ না হলে আমরা আর একটি প্রস্তাব পেশ করছি। এ প্রস্তাবে আপনার লাভ এবং আমাদেরও লাভ। রসূলুল্লাহ (সা) জিজেস করেন, সেটি কি? এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের ইবাদাত করবেন এবং আমরাও এক বছর আপনার উপাস্যদের ইবাদাত করবো। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, থামো! আমি দেখি

أَلْيَابِهَا : أَمْرُنِي : أَكْفَرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْفَرُنِي : أَبْدُ أَيْهَا الْجَهَنَّمَ

আমার রবের পক্ষ থেকে কি হকুম আসে।* এর ফলে অহী নাযিল হয় এবং এই সংগে নাযিল হয় এবং এই সংগে নাযিল হয় এবং এই সংগে নাযিল হয়।

“মুন্দের বলে দাও, হে মূর্খের দল। তোমরা কি আমাকে বলছো, আল্লাহ ছাড়া আমি আর কারো ইবাদাত করবো?” ইবনে আবাসের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো : “হে মুহাম্মদ! যদি তুমি আমাদের উপাস্য মৃত্যুগুলোকে চুন্বন করো তাহলে আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করবো।” একথায় এই সূরাটি নাযিল হয়। (আবদ ইবনে হমাইদ)

আবুল বখতরীর আখাদকৃত গোলাম সাঈদ ইবনে মীনা রেওয়ায়াত করেন, অলীদ ইবনে মুগীরাহ, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুভালিব ও উমাইয়া ইবনে খালফ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে বলে : “হে মুহাম্মদ! এসো আমরা তোমার মাবুদের ইবাদাত করি এবং তুমি আমাদের মাবুদের ইবাদাত করো। আর আমাদের সমস্ত কাছে আমরা তোমাকে শরীক করে নিই। তুমি যা এনেছো তা যদি আমাদের কাছে যা আছে তার চেয়ে তালো হয় তাহলে আমরা তোমার সাথে তাতে শরীক হবো এবং তার মধ্য থেকে নিজেদের অংশ নিয়ে নেবো। আর আমাদের কাছে যা আছে তা যদি তোমার কাছে যা আছে তার চাইতে তালো হয়, তাহলে তুমি আমাদের সাথে তাতে শরীক হবে এবং তা থেকে নিজের অংশ নেবে।” একথায় মহান আল্লাহ এ আল কাফিরুল সূরাটি নাযিল করেন। (ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতেম। ইবনে হিশামও সীরাতে এ ঘটনাটি উল্লিখ করেছেন।)

ওহাব ইবনে মুনাব্বাহ রেওয়ায়াত করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে এই বছর আমরা আপনার দীনে প্রবেশ করবো এবং এক বছর আপনি আমাদের দীনে প্রবেশ করবেন। (আবদ ইবনে হমাইদ ও ইবনে আবী হাতেম।)

এসব রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, একবার একই মজলিসে নয় বরং বহুবার বহু মজলিসে কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেছিল। এ কারণে একবার সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন জবাব দিয়ে তাদের এ আশাকে চিরতরে

* এর মানে এ নয় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাবটিকে কোন পর্যাপ্ত গ্রহণযোগ্য তো দ্রুরে কথা প্রতিধানযোগ্য মনে করেছিলেন। এবং (নায়ুবিল্লাহ) কাফেরদেরকে এ আশায় এ জবাব দিয়েছিলেন যে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে এটি গৃহীত হয়ে যাবে। বরং একথাটি আসলে ঠিক এমন পর্যাপ্ত হিল যেমন কোন অধীনস্থ অফিসারের সামনে কোন অবাকতব দাবী পেশ করা হয় এবং তিনি জানেন সরকারের পক্ষে এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু এ সম্মত তিনি নিজে শপ্ট ভাষায় অবীকার করার পরিবর্তে দাবী পেশকারীদেরকে বলেন, অফি আপনাদের আবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দিছি, সেখান থেকে যা কিন্তু জবাব আসবে তা আপনাদের জানিয়ে দেবো। এর ফলে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেটা হচ্ছে এই যে, অধীনস্থ অফিসার নিজে অবীকার করলে লোকেরা বরাবর শীড়গীড়ি করতে ও চাপ দিতেই থাকবে, কিন্তু যদি তিনি জানিয়ে দেন, তগুর থেকে কর্তৃপক্ষের যে জবাব এসেছে তা তোমাদের দাবীর বিদ্রোহী তাহলে লোকেরা হতাশ হবে পড়বে।

নির্মূল করে দেয়ার প্রয়োজন ছিল। কিছু দাও আর কিছু নাও—এ নীতির ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন চুক্তি ও আপোশ করবেন না, একথা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া একান্ত জরুরী ছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সূরাটি উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করলে জানা যাবে, আসলে ধর্মীয় উদারতার উপরে দেবার জন্য সূরাটি নাখিল হয়নি। যেমন আজকাল কেউ কেউ মনে করে থাকেন বরং কাফেরদের ধর্ম, পূজা অনুষ্ঠান ও তাদের উপাস্যদের থেকে পুরোপুরি দায়িত্ব মুক্তি এবং তার প্রতি অনীহা, অস্তুষ্টি ও সম্পর্কহীনতার ঘোষণা দেয়া আর এই সাথে কুফরী ধর্ম ও দীন ইসলাম পরম্পর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের উভয়ের মিলে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই, একথা ঘোষণা করে দেয়ার জন্যই এ সূরাটি নাখিল হয়েছিল। যদিও শুরুতে একথাটি কুরাইশ বংশীয় কাফেরদেরকে সহোধন করে তাদের আপোস ফরমূলার জবাবে বলা হয়েছিল কিন্তু এটি কেবল এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং একথাগুলোকে কুরআনের অন্তর্ভুক্ত করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কুফরী ধর্ম দুনিয়ার যেখানেই যে আকৃতিতে আছে তার সাথে সম্পর্কহীনতা ও দায়িত্ব মুক্তির ঘোষণা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে প্রকাশ করা উচিত। কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই তাদের একথা জানিয়ে দেয়া উচিত যে, দীনের ব্যাপারে তারা কাফেরদের সাথে কোন প্রকার আপোস বা উদারনীতির আশ্বয় গহণ করতে প্রস্তুত নয়। এ কারণেই যাদের কথার জবাবে এ সূরাটি নাখিল করা হয়েছিল তারা মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পরও এটি পঠিত হতে থেকেছে। যারা এর নাখিলের সময় কাফের ও মুশারিক ছিল তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার পরও এটি পড়তে থেকেছে। আবার তাদের দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবার শত শত বছর পর আজো মুসলমানরা এটি পড়ে চলেছে। কারণ কুফরী ও কাফেরের কার্যকলাপ থেকে সম্পর্কহীনতা ও অস্তুষ্টি দ্বিমানের চিরস্তন দাবী ও চাহিদা।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরার কি গুরুত্ব ছিল, নিচে উল্লেখিত কয়েকটি হাদীস থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে :

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের দৃষ্টিতে করেছেন, আমি বহবার রসূলুল্লাহকে (সা) ফজরের নামাযের আগে ও মাগরিবের নামাযের পরে দুই রাকাতে পূজ্ঞ হুলু এবং **فُلٌ مَوْلَى اللَّهِ أَحَدٌ** এবং **فُلٌ يَابِيَّا الْكَفَرِينَ** পড়তে দেখিছি। (এই বিষয়বস্তু সরলিত বহ হাদীস সামান্য শান্তিক হেরফের সহকারে ইমাম আহমাদ, তিরিয়ী, নাসাই, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিবান ও ইবনে মারদুইয়া ইবনে ওমর (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন)।

হযরত খাবাব (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন : যখন তুম ঘূমবার জন্য নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ো তখন **فُلٌ يَابِيَّا الْكَفَرِينَ** পড়ে নিতেন। আর রসূল (সা) নিজেও যখন বিছানায় ঘূমবার জন্য শুয়ে পড়তেন তখন এ সূরাটি পড়ে নিতেন। এটি ছিল তাঁর রীতি। (বায়হাকী, তাবারানি ও ইবনে মারদুইয়া)।

ইবনে আব্রাম (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলেন, আমি কি তোমাদের এমন একটি কালেমার কথা বলবো যা তোমাদের শিরক থেকে হেফায়ত করবে? সেটি হচ্ছে, তোমরা শোবার সময় قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُنَ পড়ে নাও (আবুল ইয়ালা ও তাবারানী)।

হযরত আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয ইবনে জাবালকে বলেন, শুধুবার সময় قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُنَ পড়ো। কারণ এর মাধ্যমে শিরক থেকে সম্পর্কহীনতা সৃষ্টি হয়।

ফারওয়াহ ইবনে নওফাল ও আবদুর রহমান ইবনে নওফাল উভয়ে বর্ণনা করেছেন, তাদের পিতা নওফাল ইবনে মু'আবিয়া আল আশজায়ী (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমি শোবার সময় পড়তে পারি এমন একটি জিনিস আমাকে বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন, قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفَّارُنَ শেষ পর্যন্ত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ো। কারণ এটি শিরক থেকে সম্পর্কহীন করে— (মুসনাদে আহমাদ, নাসাই, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, ইবনে মারদুইয়া ও বায়হাকী ফিল শু'আব)। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার (রা) ভাই হযরত জাবালাহ ইবনে হারেসা (রা) এ ধরনের আবেদন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে করেছিলেন এবং তাকেও তিনি এ একই জবাব দিয়েছিলেন— (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)।

আয়াত ৬

সূরা আল কাফিরুন-মঙ্গী

রুক্মি ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ يَا يَاهَا الْكَفِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَا أَنْتُر
 عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ۝ وَلَا أَنْتُر
 عِبْدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِي ۝

বলে দাও, হে কাফেররা!^১ আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।^২ আর না তোমরা তার ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করি।^৩ আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।^৪ তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য।^৫

১. এ আয়াতে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে ভেবে দেখার মতো :

(ক) যদিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হকুম দেয়া হয়েছে, তুমি কাফেরদের পরিকার বলে দাও। তবুও সামনের আলোচনা জানিয়ে দিচ্ছে, পরবর্তী আয়াতগুলোতে যেসব কথা বলা হয়েছে প্রত্যেক মু'মিনের সে কথাগুলোই কাফেরদেরকে জানিয়ে দিতে হবে। এমনকি যে ব্যক্তি কুফরী থেকে তাওবা করে ইমান এনেছে তার জন্যও কুফরী ধর্ম, তার পৃজ্ঞ-উপাসনা ও উপাস্যদের থেকে নিজের সম্পর্কইন্তা ও দায়মুক্তির কথা প্রকাশ করতে হবে। কাজেই 'কুল' (বলে দাও) শব্দটির মাধ্যমে প্রধানত ও প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরোধন করা হয়েছে। কিন্তু এ হকুমটি বিশেষভাবে শুধু তাঁকেই করা হয়নি বরং তাঁর মাধ্যমে প্রত্যেক মু'মিনকে করা হয়েছে।

(খ) এ আয়াতে প্রতিপক্ষকে যে "কাফের" বলে সরোধন করা হয়েছে, এটা তাদের জন্য কোন গালি নয়। বরং আরবী ভাষায় কাফের মানে অবীকারকারী ও অমান্যকারী (Unbeliever)। এর মোকাবিলায় 'মু'মিন' শব্দটি বলা হয়, মেনে নেয়া ও স্থীকার করে নেয়া অর্থে (Beliver)। কাজেই আল্লাহর নির্দেশক্রমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের (হে কাফেররা!) বলার অর্থই হচ্ছে এই যে, "হে লোকেরা! তোমরা যারা আমার রিসালাত ও আমার প্রদত্ত শিক্ষা মেনে নিতে অবীকার করছো।" অনুরূপভাবে একজন মু'মিন যখন একথা বলবে অর্থাৎ যখন সে বলবে, "হে কাফেররা!" তখন কাফের বলতে তাদেরকে বুঝানো হবে যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইমান আনেনি।

০

০

(গ) “হে কাফেররা!” বলা হয়েছে, “হে মুশরিকরা” বলা হয়নি। কাজেই এখনে কেবল মুশরিকদের উদ্দেশ্যেই বক্তব্য পেশ করা হয়নি বরং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যারা আল্লাহর রসূল এবং তিনি যে শিক্ষা ও হিদায়াত দিয়েছেন তাকে আল্লাহর শিক্ষা ও হিদায়াত বলে মেনে নেয় না, তারা ইহুদী, খৃষ্টান ও অপি উপাসক বা সারা দুনিয়ার কাফের, মুশরিক ও নাস্তিক যেই হোক না কেন, তাদের সবাইকে এখানে সর্বোধন করা হয়েছে। এ সর্বোধনকে শুধুমাত্র কুরাইশ বা আরবের মুশরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোন কারণ নেই।

(ঘ) অবীকারকারীদেরকে ‘হে কাফেররা’ বলে সর্বোধন করা ঠিক তেমনি যেমন আমরা কিছু লোককে সর্বোধন করি “ওহে শক্রুরা” বা “ওহে বিরোধীরা” বলে। এ ধরনের সর্বোধনের ক্ষেত্রে আসলে বিরোধী ব্যক্তিরা লক্ষ্য হয় না, লক্ষ হয় তাদের বিরোধিতা ও শক্রতা। আর এ সর্বোধন ততক্ষণের জন্য হয় যতক্ষণ তাদের মধ্যে এ গুণগুলো থাকে। যখন তাদের কেউ এ শক্রতা ও বিরোধিতা পরিহার করে অথবা বন্ধু ও সহযোগী হয়ে যায় তখন সে আর এ সর্বোধনের লক্ষ থাকে না। অনুরূপভাবে যাদেরকে “হে কাফেররা” বলে সর্বোধন করা হয়েছে তারাও তাদের কুফরীর কারণে এ সর্বোধনের লক্ষস্থলে পরিণত হয়েছে, তাদের ব্যক্তি সত্ত্বার কারণে নয়। তাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমৃত কাফের থাকে তার জন্য এ সর্বোধন হবে চিরস্তন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমান আনবে তার প্রতি আর এ সর্বোধন আরোপিত হবে না।

(ঙ) অনেক মুফাসিসেরের মতে এ সূরায় “হে কাফেররা” সর্বোধন কেবলমাত্র কুরাইশদের এমন কিছু লোককে করা হয়েছে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দীনের ব্যাপারে সমবোতার প্রত্যাব নিয়ে এসেছিল এবং যাদের সম্পর্কে যথান আল্লাহ তাঁর রসূলকে (সা) বলে দিয়েছিলেন, এরা ইমান আনবে না। দু'টি কারণে তারা এ মত অবলম্বন করেছেন।

প্রথমত, সামনের দিকে বলা হয়েছে ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَغْبِيُونَ﴾ (যার বা যাদের ইবাদাত তোমরা করো আমি তার বা তাদের ইবাদাত করি না)। তাদের মতে এ উক্তি ইহুদি ও খৃষ্টানদের জন্য সঠিক নয়। কেন্দ্রীয় তারা আল্লাহর ইবাদাত করে। দ্বিতীয়ত, সামনের দিকে একথাও বলা হয়েছে : ﴿وَلَا أَنْتَ عَبْدُنَا مَا أَعْبُدُ﴾ (আর না তোমরা তাঁর ইবাদাত করো যার ইবাদাত আমি করছি)। এ ব্যাপারে তাদের যুক্তি হচ্ছে, এ সূরা নায়িলের সময় যারা কাফের ছিল এবং পরে ইমান আনে তাদের ব্যাপারে এ উক্তি সত্য নয়। কিন্তু এ উভয় যুক্তির কোন সারবত্তা নেই। অবশ্য এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আমি পরে করবো। তা থেকে জানা যাবে, এগুলোর যে অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে তা সঠিক নয়। তবে এখানে এ যুক্তির গুলাদ স্পষ্ট করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট মনে করি, যদি শুধুমাত্র উল্লেখিত লোকদেরকেই এ সূরায় সর্বোধন করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের মরে শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ সূরার তেজাওয়াজ জারী থাকার কি কারণ থাকতে পারে? কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের পড়ার জন্য স্থায়ীভাবে কুরআনে এটি লিখিত থাকারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

২. সারা দুনিয়ার কাফের মুশরিকরা যেসব উপাস্যের উপাসনা, আরাধনা ও পূজা করে, ফেরেশতা, জিন, নবী, আউলিয়া, জীবিত ও মৃত মানুষের আত্মা তথা ভূত-প্রেত, চৌদ, স্রষ্ট, তারা, জীব-জন্ম, গাচপালা, মাটির ঘৃত বা কার্বনিক দেব-দেবী সবই এর

অন্তরভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রশ্ন কৰা যেতে পাৰে; আৱেৰে মুশৰিকৰা মহান আল্লাহকেও তো মাবুদ ও উপাস্য বলে মানতো এবং দুনিয়াৰ অন্যান্য মুশৰিকৰাও প্ৰাচীন যুগ থেকে নিয়ে আজ পৰ্যন্তও আল্লাহৰ উপাস্য হৰাৰ ব্যাপারটি অস্বীকাৰ কৰেনি। আৱ আহলি কিতাবৰা তো আল্লাহকেই আসল মাবুদ বলে মানতো। এ ক্ষেত্ৰে কোন প্ৰকাৰ ব্যতিক্ৰিমেৰ উল্লেখ না কৰেই এদেৱ সমষ্ট মাবুদেৱ ইবাদাত কৰা থেকে সম্পকহীনতা^১ ও দায়মুণ্ডিৰ কথা ঘোষণা কৰা, যেখানে আল্লাহও তাৰ অন্তৰভুক্ত, কিভাৱে সঠিক হতে পাৰে? এৱ জ্বাৰে বলা যায়, আল্লাহকে অন্য মাবুদেৱ সাথে মিশিয়ে মাবুদ সমষ্টিৰ একজন হিসেবে যদি অন্যদেৱ সাথে তাৰ ইবাদাত কৰা হয় তাহলে তাওহীদ বিশ্বাসী প্ৰতিটি ব্যক্তি অবশ্য নিজেকে এ ইবাদাত থেকে দায়মুণ্ডি ও সম্পকহীন ঘোষণা কৰবে। কাৱণ তাৰ দৃষ্টিতে আল্লাহ মাবুদ সমষ্টিৰ একজন মাবুদ নন। বৰং তিনি একাই এবং একক মাবুদ। আৱ এ সমষ্টিৰ ইবাদাত আসলে আল্লাহৰ ইবাদাত নহ। যদিও আল্লাহৰ ইবাদাত এৱ অন্তৰভুক্ত। কুৱান মজীদে পৱিকাৰ বলে দেয়া হয়েছে একমাত্ৰ সেটিই আল্লাহৰ ইবাদাত যাৱ মধ্যে অন্যেৱ ইবাদাতেৱ কোন গন্ধও নেই এবং যাৱ মধ্যে মানুষ নিজেৱ বন্দেগীকে পুৱোপুৰি আল্লাহৰ জন্য নিৰ্ধাৰিত কৰে।

وَمَا أُمِرْتُ اَلْيَقْبَدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءَ (البِيْتَ : ৫)

“লোকদেৱকে এ ছাড়া আৱ কোন হকুম দেয়া হয়নি যে, তাৱ পুৱোপুৰি একমুখী হয়ে নিজেদেৱ দীনকে একমাত্ৰ আল্লাহৰ জন্য নিৰ্ধাৰিত কৰে তাৰ ইবাদাত কৰবে।

কুৱানেৱ বহু জ্বায়গায় সুম্পষ্ট ও দ্যুৰ্থহীনভাৱে এবং অত্যন্ত জোৱালো ভাষায় এ বক্তব্য উপস্থাপন কৰা হয়েছে। যেমন সূরা আন নিসা ১৪৫ ও ১৪৬, আল আ'রাফ ২৯, আয বুমার ২, ৩, ১১, ১৪ ও ১৫ এবং আল মু'মিন ১৪ ও ৬৪-৬৬ আয়াতসমূহ। এ বক্তব্য একটি হাদীসে কুদসীতেও উপস্থাপিত হয়েছে। তাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, প্ৰত্যেক শৰীকেৱ অৎশীদারিত্ব থেকে আমি সবচেয়ে বেশী মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ কৰেছে যাৱ মধ্যে আমাৰ সাথে অন্য কাউকেও শৰীক কৰেছে, তা থেকে আমি সম্পূৰ্ণৱপে মুক্ত এবং আমাৰ সাথে যাকে সে ঐ কাজে শৰীক কৰেছে, ঐ সম্পূৰ্ণ কাজটি তাৱই জন্য (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ ও ইবনে মাজাহ)। কাজেই আল্লাহকে দুই, তিন বা বহু ইলাহেৱ একজন গণ্য কৰা এবং তাৰ সাথে অন্যদেৱ বন্দেগী, উপাসনা ও পূজা কৰাই হচ্ছে আসল কুফৰী এবং এ ধৰনেৱ কুফৰীৰ সাথে পুৱোপুৰি সম্পকহীনতাৰ কথা ঘোষণা কৰাই এ সূৱার উদ্দেশ্য।

৩. এখানে মূলে **مَا أَعْبُدَ** বলা হয়েছে। আৱৰী ভাষায় **মা** শব্দটি সাধাৱণত নিষ্পাণ বা বুদ্ধি-বিবেচনাহীন বস্তু বিষয়েৱ জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি-বিবেচনা সুম্পূৰ্ণ জীবেৱ জন্য **مِنْ** (মান) শব্দ ব্যবহাৰ কৰা হয়। এ কাৱণে প্ৰশ্ন দেখা দেয়, এখানে **مَا أَعْبُدَ** **مِنْ** **أَعْبُدَ** না বলে বলা হলো কেন? মুফাসিসৱগণ সাধাৱণত এৱ চাৱটি জ্বাৰ দিয়ে থাকেন। এক, এখানে **مَا** শব্দটি **مِنْ** অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে। দুই, এখানে **مَا** শব্দটি **الدُّخْنُ** (আলালায়ী) অৰ্থাৎ যে বা যাকে অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি, উভয়, বাক্যেই **مَا** শব্দটি মূল শব্দ অৰ্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ক্ষেত্ৰে এখানে এৱ অৰ্থ হয়: আমি সেই ইবাদাত কৰি না যা তোমৱা কৰো। অৰ্থাৎ মুশৰিকী ইবাদাত। আৱ

তোমরা সেই ইবাদাত করো না যা আমি করি অর্থাৎ তাওয়াদবাদী ইবাদাত। চার, প্রথম বাক্যে যেহেতু মَا تَعْبُلُونَ বলা হয়েছে তাই বিতীয় বাক্যে বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার খাতিরে মَا أَعْبُدُ বলা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একই শব্দ বলা হয়েছে কিন্তু এর মানে এক নয়। কুরআন মজীদে এর উদাহরণ রয়েছে। যেমন সূরা আল বাকারার ১৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

“যে ব্যক্তি তোমার উপর বাড়াবাড়ি করে তুমিও তার উপর তেমনি বাড়াবাড়ি করো যেমন সে তোমার উপর করেছে।”

একথা সুন্পট যে, কারো বাড়াবাড়ির জবাবে ঠিক তেমনি বাড়াবাড়িমূলক আচরণকে আসলে বাড়াবাড়ি বলে না। কিন্তু নিছক বক্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যেই জবাবী কার্যকলাপকে বাড়াবাড়ি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সূরা তাওবার ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে **نَسْوَا اللَّهُ فَنَسِيْهُمْ** স্তরা আল্লাহকে ভূলে গেলো কাজেই আল্লাহ তাদেরকে ভূলে গেলেন।” অর্থ আল্লাহ ভোগেন না। এখানে আল্লাহর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করলেন। কিন্তু তাদের ভূলে যাওয়ার জবাবে আল্লাহ ভূলে যাওয়া শব্দটি নিছক বক্তব্যের মধ্যে মিল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

এ চারটি অর্থ যদিও এক এক দৃষ্টিতে যথার্থ এবং আরবী ভাষায় এসব অর্থ গ্রহণ করার, অবকাশও রয়েছে তবুও যে মূল বক্তব্যটিকে সুন্পট করে তোলার জন্য এর মানে এর মানে এর জায়গায় মানে এর মানে এর মধ্য থেকে কোন একটি অর্থের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। আসলে আরবী ভাষায় কোন ব্যক্তির জন্য মানে শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিসম্ভাৱ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয় এবং মানে শব্দটি ব্যবহার করে তার মাধ্যমে তার গুণগত স্বত্ত্বা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়। যেমন আমাদের ভাষায় কারো সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞেস করি, ইনি কে? তখন তার ব্যক্তি স্বত্ত্বার পরিচিতি লাভ করাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করি, ইনি কি? তখন আসলে আমরা চাই তার গুণগত পরিচিতি। যেমন তিনি যদি সেনাবাহিনীর লোক হল তাহলে সেখানে তার পদমর্যাদা কি? তিনি যদি কোন বিশ্বিদ্যালয়ে পড়ান, তাহলে সেখানে তিনি রীড়ার, লেকচারার না প্রফেসর কোন পদে অধিষ্ঠিত আছেন? তিনি কোন বিষয়টি পড়ান? তার ডিগ্রী কি ইত্যাদি বিষয় জানাই হয় আমাদের উদ্দেশ্য। কাজেই যদি এ আয়াতে বলা হতো তাহলে এর অর্থ হতো, তোমরা সেই স্বত্ত্বার ইবাদাত করবে না যাই ইবাদাত আমি করছি। এর জবাবে মুশারিক ও কাফেরদের বলতে পারতো : আল্লাহর স্বত্ত্বাকে তো আমরা মানি এবং তার ইবাদাতও করি। কিন্তু যখন বলা হলো : তখন অর্থ দোড়ালো : যেসব গুণের অধিকারী মাঝের ইবাদাত আমি করি সেইসব গুণের অধিকারী মাঝের ইবাদাত তোমরা করবে না। এখানে মূল বক্তব্য এটিই। এরি ভিত্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন সব ধরনের কাফেরদের দীন থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। কারণ সব ধরনের কাফেরদের খোদা থেকে তার খোদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের কারো খোদার ছয় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করার পর সঙ্গে দিনে বিশ্বাম নেবার প্রয়োজন হয়েছে। সে বিশ্ব-জগতের প্রতু

নয় বরং ইসরাইলের প্রভু। একটি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে তার এমন বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যা অন্যদের সাথে নেই। সে হযরত ইয়াকুবের সাথে কৃতি লড়ে কিন্তু তাকে আছাড় দিতে পারে না। তার উয়াইর নামক একটি ছেলেও আছে। আবার কারো খোদা হযরত ঈসা মসিহ নামক একমাত্র পুত্রের পিতা। সে অন্যদের শুণাহের কাফ্ফারা দেবার জন্য নিজের পুত্রকে দ্রু বিদ্ধ করায়। কারোর খোদার জ্ঞানী-সন্তান আছে। কিন্তু সে বেচারার শুধু কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। আবার কারো খোদা মানুষের জীবন ধারণ করে অবতার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে এবং মানুষের দেহ পিণ্ডের আবদ্ধ হয়ে পৃথিবীর বৃক্ষে এবং মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। কারো খোদা নিছক অনিবার্য অস্তিত্ব অথবা সকল কার্যকারণের কারণ কিংবা প্রথম কার্যকারণ (First Cause)। বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনাকে একবার সচল করে দিয়ে সে আলাদা হয়ে গেছে। তারপর বিশ্ব-জাহান ধরাবাধা আইন মুভাবেক স্বয়ং চলছে। অতপর মানুষের সাথে তার ও তার সাথে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। মোটকথা, খোদাকে মানে এমন সব কাফেরও আসলে ঐ আল্লাহ মানে না যিনি সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একক সুষ্ঠা, মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক ও শাসক। তিনি বিশ্ব-জাহানের এ ব্যবস্থাপনার শুধু সুষ্ঠাই নন বরং তার সার্বক্ষণিক পরিচালক। তাঁর হকুম এখানে প্রতি মুহূর্তেই চলছে। তিনি সকল প্রকার দোষ, দ্রুটি, দুর্বলতা ও ভাস্তি থেকে মুক্ত। তিনি সব রকমের উপমা ও সাকার সন্তা থেকে পরিত্র, নজীর, সাদৃশ্য ও সামঝজস্য মুক্ত এবং কোন সাধী, সহকারী ও অংশীদারের মুখাপেক্ষী নন। তাঁর সন্তা, শুণাবলী, ক্ষমতা, ইবতিয়ার ও মাবুদ হবার অধিকারে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তাঁর সন্তানাদি থাকা, কাউকে বিয়ে করে জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করার এবং কোন পরিবার বা গোষ্ঠীর সাথে কোন বিশেষ সম্পর্ক থাকার কোন প্রশংসন ওঠে না। প্রতিটি সন্তার সাথে রিজিকদাতা, পালনকর্তা, অনুগ্রহকারী ও ব্যবস্থাপক হিসেবে তাঁর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তিনি প্রার্থনা শোনেন ও তার জবাব দেন। জীবন-মৃত্যু, লাভ-ক্ষতি এবং তাগের ভাঙ্গা-গড়ার পূর্ণ ক্ষমতার তিনিই একচ্ছত্র মালিক। তিনি নিজের সৃষ্টির কেবল পালনকর্তাই নন বরং প্রত্যেককে তার মর্যাদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী হিদায়াতও দান করেন। তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক কেবল এতটুকুই নয় যে, তিনি আমাদের মাবুদ এবং আমরা তাঁর পূজা অর্চনাকারী বরং তিনি নিজের নবী ও কিতাবের সাহায্যে আমাদের আদেশ নিষেধের বিধান দান করেন এবং তাঁর বিধানের আনুগত্য করাই আমাদের কাজ। নিজেদের কাজের জন্য তাঁর কাছে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। মূত্যুর পর তিনি পুনর্বার আমাদের ওঠাবেন এবং আমাদের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে পুরুষার ও শাস্তি দেবেন। এসব শুণাবলী সম্পর্ক মাবুদের ইবাদাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারীরা ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ করছে না। অন্যেরা খোদার ইবাদাত করলেও আসল ও প্রকৃত খোদার ইবাদাত করছে।

৪. একদল তাফসীরকারের মতে এ বাক্য দু'টিতে প্রথম বাক্য দু'টির বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যা কিছু বলা হয়েছে তাকে অত্যধিক শক্তিশালী ও বেশী জ্ঞেয়দার করার জন্য এটা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক মুফাস্সির একে পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন না। তারা বলেন, এর মধ্যে অন্য একটি কথা বলা হয়েছে। প্রথম বাক্য দু'টিতে যে কথা বলা হয়েছে তা থেকে একথার বক্তব্যই আলাদা। আমার মতে, এ বাক্য দু'টিতে আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি নেই, এতটুকু কথা সঠিক বলে মনে নেয়া যায়।

কারণ এখানে শুধুমাত্র “আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি” একথাটুকুর পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আর আগের বক্তব্যে একথাটি যে অর্থে বলা হয়েছিল এখানে সে অর্থে এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। কিন্তু পুনরাবৃত্তি অঙ্গীকার করার পর মুফাস্সিরগণের এ দলটি এ দু’টি বাক্যের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা পরম্পর অনেক ডিনধর্মী। এখানে তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত অর্থ উল্লেখ করে তার ওপর আলোচনা করার সুযোগ নেই। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশংকায় শুধুমাত্র আমার মতে যে অর্থটি সঠিক সেটিই এখানে বর্ণনা করলাম।

প্রথম বাক্যে বলা হয়েছে : “আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করে আসছো।” এর বক্তব্য বিষয় দ্বিতীয় আয়াতের বক্তব্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হয়েছে : “আর আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।” এ দু’টি বক্তব্যে দু’টি দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এক, আমি অমুক কাজ করি না বা করবো না বলার মধ্যে যদিও অঙ্গীকৃতি ও শক্তিশালী অঙ্গীকৃতি রয়েছে কিন্তু আমি উমুক কাজটি করবো না একথার ওপর অনেক বেশী জোর দেয়া হয়েছে। কারণ এর অর্থ হচ্ছে, সেটা এত বেশী খারাপ কাজ যে, সেটা করা তো দূরের কথা সেটা করার ইচ্ছা পোষণ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুই, “যাদের ইবাদাত তোমরা করো” একথা বলতে কাফেররা বর্তমানে যেসব মাবুদের ইবাদাত করে শুধুমাত্র তাদেরকে বুঝায়। বিপরীত পক্ষে “যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো” বললে এমনসব মাবুদের কথা বুঝায় যাদের ইবাদাত কাফেররা ও তাদের পূর্বপুরুষরা অতীতে করেছে। একথা সবাই জানে, মুশারিক ও কাফেরদের মাবুদের মধ্যে হামেশা রদবদল ও কমবেশী হতে থেকেছে। বিভিন্ন ধুগে কাফেরদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন মাবুদের পূজা করেছে। সবসময় ও সব জায়গায় সব কাফেরের মাবুদ কখনো এক থাকেনি। কাজেই এখানে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের শুধু আজকের মাবুদের থেকে নয়, তোমাদের পিতৃপুরুষদের মাবুদের থেকেও দ্যায়মুক্ত। এ ধরনের মাবুদের ইবাদাত করার চিন্তাও মনের মধ্যে ঠাই দেয়া আমার কাজ নয়।

আর দ্বিতীয় বাক্যটির ব্যাপারে বলা যায়, যদিও ৫ নংর আয়াতে উল্লেখিত এ বাক্যটির শব্দাবলী ও ৩ নংর আয়াতের শব্দাবলী একই ধরনের তবুও এদের উভয়ের মধ্যে অর্থের বিভিন্নতা রয়েছে। তিন নংর আয়াত সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে : “আমি তাদের ইবাদাত করি না যাদের ইবাদাত তোমরা করো।” তাই এর অর্থ হয়, “আর না তোমরা সেই ধরনের গুণাবলী সম্পর একক মাবুদের ইবাদাত করবে যার ইবাদাত আমি করি।” আর পাঁচ নংর আয়াতে এই সংশ্লিষ্ট বাক্যটি নিম্নোক্ত বাক্যটির পরে এসেছে : “আর না আমি তাদের ইবাদাত করবো যাদের ইবাদাত তোমরা করেছো।” তাই এর মানে হয়, “আর না তোমরা সেই একক মাবুদের ইবাদাত করবে বলে মনে হচ্ছে যার ইবাদাত আমি করি।” অন্য কথায়, তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা-উপাসনা করেছো তাদের পূজারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর বহু মাবুদের বন্দেগী পরিহার করে একক মাবুদের ইবাদাত করার ব্যাপারে তোমাদের যে বিক্ষণ সে কারণে তোমরা নিজেদের এ তুল ইবাদাত-বন্দেগীর পথ ছেড়ে দিয়ে আমি যাঁর ইবাদাত করি তাঁর ইবাদাত করার পথ অবলম্বন করবে, এ আশাও করি না।

৫. অর্থাৎ আমার দীন আলাদা এবং তোমাদের দীন আলাদা। আমি তোমাদের মাবুদদের পৃজা-উপাসনা-বন্দেগী করি না এবং তোমরাও আমার মাবুদের পৃজা-উপাসনা করো না। আমি তোমাদের মাবুদদের বন্দেগী করতে পারি না এবং তোমরা আমার মাবুদের বন্দেগী করতে প্রস্তুত নও। তাই আমার ও তোমার পথ কখনো এক হতে পারে না। এটা কাফেরদের প্রতি উদারনীতি নয় বরং তারা কাফের থাকা অবস্থায় চিরকালের জন্য তাদের ব্যাপারে দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষের ঘোষণাবাণী। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ইমান এনেছে তারা দীনের ব্যাপারে কখনো তাদের সাথে সমঝোতা করবে না—এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্বশেষ ও ছড়াত্ত্বাবে নিরাশ করে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। এ সূরার পরে নাখিল হওয়া কয়েকটি মুক্তি সূরাতে পর পর এ দায়মুক্তি, সম্পর্কহীনতা ও অসন্তোষ প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে : “এরা যদি তোমাকে যিথ্যা বলে তাহলে বলে দাও, আমার কাজ আমার জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমি যা কিছু করি তার দায়-দায়িত্ব থেকে তোমরা মুক্ত।” (৪১ আয়াত) এ সূরাতেই তারপর সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলা হয়েছে : “হে নবী! বলে দাও, হে লোকেরা, যদি তোমরা আমার দীনের ব্যাপারে (খ্যানে) কোন রকম সন্দেহের মধ্যে থাকো তাহলে (শুনে রাখো), আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের বন্দেগী করছো আমি তাদের বন্দেগী করি না বরং আমি শুধুমাত্র সেই আল্লাহর বন্দেগী করি যার কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে তোমাদের মৃত্যু।” (১০৪ আয়াত) সূরা আশ শু’আরায় বলেছেন : “হে নবী! যদি এরা এখন তোমার কথা না মানে তাহলে বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছো তা থেকে আমি দায়মুক্তি।” (২১৬ আয়াত) সূরা সাবায় বলেছেন : “এদেরকে বলো, আমাদের ক্রটির জন্য তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না এবং তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছো সে জন্য আমাদের জবাবদিহি করতে হবে না। বলো, আমাদের রব একই সময় আমাদের ও তোমাদের একক্র করবেন এবং আমাদের মধ্যে ঠিকমতো ফায়সালা করবেন।” (২৫-২৬ আয়াত) সূরা যুমার-এ বলেছেন : “এদেরকে বলো, হে আমার জাতির লোকেরা। তোমরা নিজেদের জায়গায় কাজ করে যাও। আমি আমার কাজ করে যেতে থাকবো। শীঘ্ৰই তোমরা জানতে পারবে কার ওপর আসছে লালুনাকুর আঘাব এবং কে এমন শাস্তি লাভ করছে যা অটেল।” (৩৯-৪০ আয়াত) আবার মদীনা তাইমেবার সমস্ত মুসলমানকেও এই একই শিক্ষা দেয়া হয়। তাদেরকে বলা হয় : “তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে রয়েছে একটি ভালো আদর্শ। (সেটি হচ্ছে :) তারা নিজেদের জাতিকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদদের পৃজা করো তাদের থেকে পুরোপুরি সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের কুফরী করি ও অবীকৃতি জানাই এবং যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ইমান না আনো ততক্ষণ আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালীন শক্তি সৃষ্টি হয়ে গেছে।” (আল মুমতাহিনা ৪ আয়াত) কুরআন মজীদের একের পর এক এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পর তোমরা তোমাদের ধর্ম মেনে চলো এবং আমাকে আমার ধর্ম মেনে চলতে দাও—“লাকুম দীনুকুম ওয়ালিয়া দীন”—এর এ ধরনের কোন অর্থের অবকাশই থাকে না। বরং সূরা যুমার-এ যে কথা বলা হয়েছে, একে ঠিক সেই পর্যায়ে রাখা যায় যেখানে বলা হয়েছে : “হে নবী! এদেরকে বলে দাও, আমি তো আমার দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে তাঁরই ইবাদাত করবো, তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে যার যার বন্দেগী করতে চাও করতে থাক না কেন।” (১৪ আয়াত)।

এ আয়াতের ভিত্তিতে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ী এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, কাফেরদের ধর্ম পরম্পর যতই বিভিন্ন হোক না কেন সামগ্রিকভাবে সমস্ত কাফেররা মৃত্যু একই গোষ্ঠীভূক্ত। কাজেই তাদের মধ্যে যদি বশ বা বিবাহের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোন কারণে এমন কোন সম্পর্ক থাকে যা একের সম্পত্তিতে অন্যের উত্তরাধিকারী ব্যতু দাবী করে তাহলে একজন খৃষ্টান একজন ইহুদীর, একজন ইহুদী একজন খৃষ্টানের এক ধর্মের কাফের অন্য ধর্মের কাফেরের উত্তরাধিকারী হতে পারে। বিপরীত পক্ষে ইমাম মালিক, ইমাম আওয়ায়ী ও ইমাম আহমাদের মতে এক ধর্মের পোকেরা অন্য ধর্মের লোকদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না। তারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মত পোষণ করেন। এ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ৪. প্রতিক্রিয়া হাদীসের মতীন শিল্পী দুই তিনির ধর্মের লোক পরম্পরের ওয়ারিশ হতে পারে না।” (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, দারে কুতুবী)। প্রায় একই ধরনের বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি হাদীস ইমাম তিরমিয়ী হযরত জাবের (রা) থেকে, ইবনে হিয়ান হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে এবং বায়হার আবু হরাইরা (রা) থেকে উদ্ভৃত করেছেন। এ বিষয়টি আগোচনা প্রসঙ্গে হানাফী মায়হাবের প্রক্ষাত ইমাম শামসুল আয়েমা সারাখসী দিখেছেনঃ যে সমস্ত কারণে মুসলমানরা পরম্পরের ওয়ারিশ হয় সে সমস্ত কারণে কাফেররাও পরম্পরের ওয়ারিশ হতে পারে। আবার তাদের মধ্যে এমন কোন কোন অবস্থায়ও উত্তরাধিকার ব্যতু দাবী হতে পারে যে অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে হয় না।..... প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কাছে দীন হচ্ছে দু'টি একটি সত্য দীন এবং অন্যটি মিথ্যা দীন। তাই তিনি বলেছেনঃ ৫. এই সাথে তিনি মানুষদেরও দু'দলে বিভক্ত করেছেন। একদল জাহান্তি এবং তারা হচ্ছে মু'মিন। আর একদল জাহান্মী এবং সামগ্রিকভাবে তারা হচ্ছে কাফের সম্মাজ। এ দু'দলকে তিনি পরম্পরের বিরোধী গণ্য করেছেন তাই তিনি বলেছেনঃ ৬. مَنْ خَصَّمَنِيْ أَخْتَصِّمُهُ فِي رَبِّهِمْ (এই দু'টি পরম্পর বিরোধী দল। এদের মধ্যে রয়েছে নিজেদের রবের ব্যাপারে বিরোধ।—আল ইজ্জ ১৯ আয়াত) অর্থাৎ সমস্ত কাফেররা মিলে একটি দল। তাদের বিরোধ ইমানদার বা মু'মিনদের সাথে।..... তাদেরকে নিজেদের আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে আলাদা আলাদা মিলাতে তথা মানব গোষ্ঠীর অন্তরভূত বলে আমরা মনে করি না। বরং মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা সবাই একটি মিলাতের অন্তরভূত। কারণ মুসলমানরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসাদাত ও কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে স্বীকার করে। অন্যদিকে তারা এসব অঙ্গীকার করে। এ জন্য তাদেরকে কাফের বলা হয়। মুসলমানদের মোকাবিলায় তারা একই গোষ্ঠীভূক্ত হয় ৪. প্রতিক্রিয়া হাদীসটি আমি ইতিপূর্বে যে কথার উল্লেখ করেছি সেদিকেই ইঞ্জিত করে। কারণ, “মিলাতাইল” (দুই মিলাত তথা দুই গোষ্ঠী) শব্দের ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে করে দিয়েছেনঃ ৫. يَرِثُ الْمُسْلِمُونَ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ يَرِثُ الْمُسْلِمَونَ

কাফেরের ওয়ারিশ হতে পারে না এবং কাফের হতে পারে না মুসলমানের ওয়ারিশ।” আল মাবসূত ও খও, ৩০-৩২ পৃষ্ঠা। ইমাম সারাখসী এখানে যে হাদীসটির বরাত দিয়েছেন সেটি বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও আবু দউদ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন।]

আন নসর

১১০

নামকরণ

পথম আয়াত - إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ - এর মধ্যে উল্লেখিত নসর (نصر) শব্দকে এর নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাখিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) একে কুরআন মজীদের শেষ সূরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আর কোন পূর্ণাঙ্গ সূরা নাখিল হয়নি।* (মুসলিম, নাসায়ী, তাবরানী, ইবনে আবী শাইবা ও ইবনে মারদুইয়া)।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, এ সূরাটি বিদায় হজ্জের সময় আইয়ামে তাশীরীকের মাঝামাবি সময় মিনায় নাখিল হয়। এ সূরাটি নাখিল হবার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উট্টের পিঠে সওয়ার হয়ে বিখ্যাত ভাষণটি দেন। (তিরিমিয়ী, বায়বাবী, বাইহাকী, ইবনে শাইবা, আবদ ইবনে হমাইদ, আবু ইয়ালা ও ইবনে মারদুইয়া)। বাইহাকী কিতাবুল হজ অধ্যায়ে হযরত সারাআ বিনতে নাবহানের রেওয়ায়াতের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ সময়ের অদ্বিতীয় ভাষণ উচ্চৃত করেছেন। তিনি বলেন :

* বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এরপর কিছু বিছিন্ন আয়াত নাখিল হয়। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সবশেষে কুরআনের কোন আয়াতটি নাখিল হয় সেটি চিহ্নিত করার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে হযরত বাবাসা ইবনে আব্দেবের (রা) রেওয়ায়াতে উচ্চৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : সেটি হচ্ছে সূরা নিসার শেষ আয়াত **يَسْتَعْلَمُونَكُلَّ فِي الْكَلَّ** ইয়াম বুখারী ইবনে আবাসের (রা) উক্তি উচ্চৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : সেই সর্বশেষ আয়াতটি হচ্ছে রিবা সম্পর্কিত আয়াত। অর্থাৎ যে আয়াতের মাধ্যমে সুদকে হারাম গণ্য করা হয়েছে। ইয়াম আহমাদ, ইবনে মাঝাহ ও ইবনে মারদুইয়া হযরত উমর (রা) থেকে যে হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন তা থেকেও ইবনে আবাসের এ উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এ হাদীসগুলোতে এটিকে শেষ আয়াত বলা হয়নি। বরং হযরত উমরের উক্তি হচ্ছে : এটি সর্বশেষে নাখিল হওয়া আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আবু উবাইদ তাঁর ফাদায়েলুল কুরআন শেষে ইয়াম যুহুরীর এবং ইবনে জারীর তাঁর তাফসীর শেষে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের উক্তি উচ্চৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : রিবার আয়াত এবং দাইনের আয়াত (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮-৩৯ সূর্ক্ষ) কুরআনের নাখিলকৃত সর্বশেষ আয়াত। নাসায়ী, ইবনে মারদুইয়া ও ইবনে জারীর হযরত কুরআনে আবাসের অন্য একটি উক্তি উচ্চৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে : **وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِي** সূরা বাকারার এ ২৮। নবর আয়াতটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ আয়াত। আল ফিরহিয়াবী তাঁর তাফসীর শেষে ইবনে আবাসের উক্তি উচ্চৃত করেছেন। তাতে এতটুকু বাড়ানো হয়েছে : এ আয়াতটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইঞ্জিকালের ৮। দিন আগে নাখিল হয়। অন্তিমেকে ইবনে আবী হাতেম এ সম্পর্কিত সাঈদ ইবনে যুবাইরের উক্তি উচ্চৃত করেছেন। তাতে এ আয়াতটি নাখিল হওয়া ও রসূলের (সা) উফাতের মধ্যে মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানের কথা বলা হয়েছে। ইয়াম আহমাদের মুসলিম ও হাকেমের মুসতাদীরাকে হযরত উবাই ইবনে কাব'বের (রা) রেওয়ায়াত উচ্চৃত করা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : সূরা তাওবার ১২৮-১২৯ আয়াত দুটি সবশেষে নাখিল হয়।

বিদ্যায় হজ্জের সময় আমি রসূলগ্রাহ (সা)-কে একথা বলতে শুনেছি : হে লোকেরা ! তোমরা জানো আজ কোন দিন ? লোকেরা জবাব দিল, আগ্রাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন। তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, জানো এটা কোন জায়গা ? লোকেরা জবাব দিল, আগ্রাহ ও তাঁর রসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে মাশ'আরে হারাম। এরপর তিনি বললেন, আমি জানি না, সম্ভবত এরপর আমি আর তোমাদের সাথে যিলতে পারবো না। সাবধান হয়ে যাও, তোমাদের রক্ত ও তোমাদের মান-সম্মান পরস্পরের ওপর ঠিক তেমনি হারাম যেমন আজকের দিনটি ও এ জায়গাটি হারাম, যতদিন না তোমরা তোমাদের রবের সামনে হাধির হয়ে যাও এবং তিনি তোমাদেরকে নিজেদের আমল সম্পর্কে জিজাসাবাদ করেন। শোনো, একথাণ্ডে তোমাদের নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে পৌছিয়ে দেবে। শোনো আমি কি তোমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছি ? এরপর আমরা মদীনায় ফিরে এলাম এবং তারপর কিছুদিন যেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকাল হয়ে গেল।"

এ দু'টি রেওয়ায়াত একত্র করলে দেখা যাবে, সূরা আন নসরের নাযিল হওয়া ও রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইতিকালের মধ্যে ও মাস ও কয়েকদিনের ব্যবধান ছিল। কেননা ইতিহাসের দৃষ্টিতে দেখা যায়, বিদ্যায় হজ্জ ও রসূলের (সা) ওফাতের মাঝখানে এ ক'টি দিনই অতিবাহিত হয়েছিল।

ইবনে আবুসের (রা) বর্ণনা মতে এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলগ্রাহ (সা) বলেন : আমাকে আমার মৃত্যুর খবর দেয়া হয়েছে এবং আমার সময় পূর্ণ হয়ে গেছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনয়ির ও ইবনে মারদুইয়া) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস থেকে বর্ণিত অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলোতে বলা হয়েছে : এ সূরাটি নাযিল হবার পর রসূলগ্রাহ (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দুনিয়া থেকে বিদ্যায় নেবার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর, তাবারানী, নাসায়ী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

উশুল মু'মিনীন হ্যরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হলে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এ বছর আমার ইতিকাল হবে। একথা শুনে হ্যরত ফাতিমা (রা) কেন্দে ফেললেন। এ অবস্থা দেখে তিনি বললেন, আমার বংশধরদের মধ্যে তুমই সবার আগে আমার সাথে মিলিত হবে। একথা শুনে হ্যরত ফাতিমা (রা) হেসে ফেললেন। (ইবনে আবি হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া) প্রায় এই একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বাইহাকীতে ইবনে আবাস (রা) থেকে উদ্ভৃত করেছেন।

ইবনে আবাস (রা) বলেন, হ্যরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বড় বড় জ্ঞানী ও সম্মানিত সাহাবীদের সাথে তাঁর মজলিসে আমাকে ডাকতেন। একথা বয়স্ক সাহাবীদের অনেকের খারাপ লাগলো। তাঁরা বললেন, আমাদের ছেলেরাও তো এ ছেলেটির মতো, তাহলে শুধুমাত্র এ ছেলেটিকেই আমাদের সাথে মজলিসে শরীক করা হচ্ছে কেন ? (ইয়াম বুখারী ও ইবনে জারীর খোলাসা করে বলেছেন যে, একথা বলেছিলেন হ্যরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ) হ্যরত উমর (রা) বললেন, ইলমের ক্ষেত্রে এর যা মর্যাদা তা আপনারা জানেন। তারপর একদিন তিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বয়স্ক সাহাবীদের ডাকলেন। তাদের সাথে আমাকেও ডাকলেন। আমি বুঝে ফেললাম তাদের মজলিসে

আমাকে শরীক করার যৌক্তিকথা প্রমাণ করার জন্য আজ আমাকে ডাকা হয়েছে। আলোচনার এক পর্যায়ে হ্যুরত উমর (রা) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন আ] جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتحُ سুরাটির ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? কেউ কেউ বললেন, এ সুরায় আমাদের হকুম দেয়া হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য আসে এবং আমরা বিজয় লাভ করি তখন আমাদের আল্লাহর হামদ ও ইন্সিগ্নিয়ার করা উচিত। কেউ কেউ বললেন, এর অর্থ হচ্ছে, শহর ও দুর্গসমূহ জয় করা। অনেকে নীরব রইলেন এরপর হ্যুরত উমর (রা) বললেন, ইবনে আরাস তুমি কি একথাই বলো? আমি বললাম : না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি কি বলো। আমি বললাম : এর অর্থ হচ্ছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহৈ ওয়া সাল্লামের ওফাত। এ সুরায় জানানো হয়েছে, যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে এবং বিজয় লাভ হবে তখন আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে, এগুলোই হবে তার আলামত। কাজেই এরপর আপনি আল্লাহর হামদ ও ইন্সিগ্নিয়ার করুন। একথা শুনে হ্যুরত উমর বললেন, তুমি যা বললে আমিও এ ছাড়া আর কিছুই জানি না। অন্য একটি রেওয়ায়াতে এর ওপর আরো একটু বাড়ানো হয়েছে এভাবে যে, হ্যুরত উমর বয়ঙ্ক বদরী সাহাবীদের বললেন : আপনারা এ ছেলেকে এ মজলিসে শরীক করার কারণ দেখার পর আবার কেমন করে আমাকে তিরক্ষার করেন? (বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে জায়ির, ইবনে মারদুইয়া, বাগাবী, বাইহাকী ও ইবনুল মুনফির)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

ওপরে যে হাদীসগুলো আলোচনা করা হয়েছে তাতে একথা বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে বলে দিয়েছিলেন, যখন আরবে ইসলামের বিজয় পূর্ণ হয়ে যাবে এবং লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে তখন এর মানে হবে, আপনাকে যে কাজের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তা পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর তাঁকে হকুম দেয়া হয়েছে, আপনি আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে থাকুন। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে আপনি এতবড় কাজ সম্পর্ক করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তাঁর কাছে এ মর্মে দোয়া করুন যে, এই বিরাট কাজ করতে গিয়ে আপনি যে তুল-ভাস্তি বা দোষ-ত্রুটি করেছেন তা সব তিনি যেন মাফ করে দেন। এ ক্ষেত্রে একটুখানি চিঞ্চা-ভাবনা করলে যে কোন ব্যক্তিই দুনিয়ার মানুষের একজন সাধারণ নেতা ও একজন নবীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখতে পাবেন। মানুষের একজন সাধারণ নেতা যে বিপুর করার জন্য কাজ করে যায় নিজের জীবন্দশাতেই যদি সেই মহান বিপুর সফলকাম হয়ে যায় তাহলে এ জন্য সে বিজয় উৎসব পালন করে এবং নিজের নেতৃত্বের গর্ব করে বেড়ায়। কিন্তু এখানে আল্লাহর নবীকে আমরা দেখি, তিনি তেইশ বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে পুরো একটি জাতির আকীদা-বিশ্বাস, চিঞ্চাধারা, আচার-আচরণ, নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, রাজনীতি ও সামরিক যোগ্যতা সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছেন। মূর্খতা, অভ্যর্থনা ও কুসংস্কারের মধ্যে আপাদমন্ত্রক ডুবে থাকা জাতিকে উদ্ধার করে এমন যোগ্যতাসম্পর্ক করে গড়ে তুলেছেন যার ফলে তারা সারা দুনিয়া জয় করে ফেলেছে এবং সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের নেতৃত্ব পদে আসীন হয়েছে। কিন্তু এতবড় মহৎ কাজ সম্পর্ক করার পরও তাঁকে উৎসব পালন করার নয় বরং আল্লাহর প্রশংসা ও শৃণাবলী বর্ণনা করার

এবং তাঁর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করার হকুম দেয়া হয়। আর তিনি পূর্ণ দীনতার সাথে সেই হকুম পালন করতে থাকেন।

হযরত আয়েশা (রা) বলেন : **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উফাতের পূর্বে سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ** কোন কোন রেওয়ায়াতে এর শব্দগুলো হচ্ছে : **سُبْحَنَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ** খুব বেশী করে পড়তেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই যে কথাগুলো পড়ছেন এগুলো কেমন ধরনের কালেম। জবাব দিলেন, আমার জন্য একটি আলামত নির্ধারণ করা হয়েছে, বলা হয়েছে, যখন আমি সেই আলামত দেখতে পাবো তখনই যেন একথাগুলো পড়ি এবং সেই আলামতটি হচ্ছে **إِذَا جَاءَ نَصْرٌ اللَّهُ وَالْفَتْحُ** (মুসলানাদে আহমাদ, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনবির ও ইবনে মারদুইয়া)। প্রায় এ একই ধরনের কোন কোন রেওয়ায়াতে হযরত আয়েশা বলেন, **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** নামায পড়ার সময় নিজের রুকু' ও সিজদায় খুব বেশী করে এ শব্দগুলো পড়তেন : **سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ** এটি ছিল কুরআনের (অর্থাৎ সূরা আন নসরের ব্যাখ্যা)। তিনি নিজেই ব্যাখ্যাটি করেছিলেন) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে জারীর)।

হযরত উম্মে সালামা বলেন, **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের শেষের দিকে** উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁর পবিত্র মুখে সর্বক্ষণ একথাই শুন্না যেতোঃ **أَسْبَحَانَ اللَّهُ وَبِحَمْدِهِ** আমি একদিন জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি এ যিকিরিটি বেশী করে করেন কেন? জবাব দিলেন, আমাকে হকুম দেয়া হয়েছে, তারপর তিনি এ সূরাটি পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) রেওয়ায়াত করেন, যখন এ সূরাটি নাযিল হয় তখন থেকে **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** নিম্নোক্ত যিকিরিটি বেশী করে করতে থাকেন :

**سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، سُبْحَنَكَ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ** (ابن জরির, مسند অحمد -
ابن আবি হাতম)

ইবনে আবুস (রা) বলেন, এ সূরাটি নাযিল হবার পর **রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম** আবেরাতের জন্য শ্রম ও সাধনা করার ব্যাপারে খুব বেশী জ্ঞারেশেরে আত্মনিয়োগ করেন। এর আগে তিনি কখনো এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেননি। (নাসায়ী, তাবারানী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া)।

আয়াত ৩

সূরা আন নসর-মাদানী

কংকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

إِذَا جَاءَ نَصْرًا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْرُ^۱ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَلْخَلُونَ
 فِي دِينِ اللَّهِ أَفَوَاجَأَ فَسِيرَ بِحَمْلٍ رِّيلَكَ وَاسْتَغْفِرَةً
 إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا^۲

যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয় লাভ হয়,^১ আর (হে নবী!) তুমি (যদি) দেখ যে গোকর্ণ দলে দলে আল্লাহর দীন গ্রহণ করছে^২ তখন তুমি তোমার রবের হাম্দ সহকারে তাঁর তাসবীহ পড়ো^৩ এবং তাঁর কাছে মাগফিলাত চাও^৪ অবশ্যি তিনি বড়ই তাওবা করুনকারী।

১. বিজয় মানে কোন একটি যুদ্ধ বিজয় নয়। বরং এর মানে হচ্ছে এমন একটি চূড়ান্ত বিজয় যার পরে ইসলামের সাথে সংঘর্ষ করার মতো আর কোন শক্তির অভিত্তি দেশের বুকে থাকবে না এবং একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, বর্তমানে আরবে এ দীনটিই প্রাধান্য বিস্তার করবে। কোন কোন মুফাসূসির এখানে বিজয় মানে করেছেন মক্কা বিজয়। কিন্তু মক্কা বিজয় হয়েছে ৮ হিজরাতে-এবং সূরাটি নাযিল হয়েছে ১০ হিজরার শেষের দিকে। ভূমিকায় আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও হযরত সারাও বিনতে নাবহানের (রা) যে হাদীস বর্ণনা করেছি তা থেকে একথাই জানা যায়। এ ছাড়াও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবুস (রা) যে একে কুরআন মজিদের সর্বশেষ সূরা বলেছেন, তাঁর এ বক্তব্যও এ তাফসীরের বিরুদ্ধে চলে যায়। কারণ বিজয়ের মানে যদি মক্কা বিজয় হয় তাহলে সমগ্র সূরা তাওবা মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়। তাহলে আন নসর কেমন করে শেষ সূরা হতে পারে? নিসদেহে মক্কা বিজয় এ দিক দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় ছিল যে, তারপর আরবের মৃশিরিকদের সাহস ও হিম্মত নিষেচ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট শক্তি-সাধাৰণ ছিল। এরপরই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তায়েফ ও হলায়েনের যুদ্ধ। আরবে ইসলামের পূর্ণাংশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হতে আরো প্রায় দু'বছর সময় লেগেছিল।

২. অর্থাৎ গোকর্ণের একজন দু'জন করে ইসলাম গ্রহণ করার যুগ শেষ হয় যাবে। তখন এমন এক যুগের সূচনা হবে যখন একটি গোত্রের সবাই এবং এক একটি বড় বড় এলাকার সমস্ত অধিবাসী কোন প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চাপ প্রয়োগ ছাড়াই ব্রহ্মভূতভাবে

৩। "মুসলমান হয়ে যেতে থাকবে। নবম ইজরীর শুরু থেকে এ অবস্থার সূচনা হয়। এ কারণে এ বছরটিকে বলা হয় প্রতিনিধিদলের বছর। এ বছর আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতে থাকে। তারা ইসলাম করুন করে তাঁর মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করতে থাকে। এমনকি দশম ইজরীতে যখন তিনি বিদায় হওয়া করার জন্য মকাব্ব যান তখন সময় আরব ভূমি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সারাদেশে কোথাও একজন মুশরিক ছিল না।

৩. হামদ মানে মহান আল্লাহর প্রশংসন ও শুণগান করা এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও। আর তাসবীহ মানে আল্লাহকে পাক-পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন এবং দোষ-ক্রিটিমুক্ত গণ্য করা। এ প্রশংসনে বলা হয়েছে, যখন তুমি তোমার রবের কুদরতের এ অভিব্যক্তি দেখবে তখন তাঁর হামদ সহকারে তাঁর তাসবীহ পাঠ করবে। এখানে হামদ বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, এ মহান ও বিরাট সাফল্য সম্পর্কে তোমার মনে যেন কোন সময় বিলুপ্তাও ধারণা না জন্মায় যে, এসব তোমার নিজের কৃতিত্বের ফল। বরং একে পুরোপুরি ও সরাসরি মহান আল্লাহর অনুগ্রহ ও মেহেরবানী মনে করবে। এ জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। মনে ও মুখে একথা শীকার করবে যে, এ সাফল্যের জন্য সমস্ত প্রশংসন আল্লাহর প্রাপ্য। আর তাসবীহ মানে হচ্ছে, আল্লাহর কালেমা বুলন্ড হওয়ার বিষয়টি তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার উপর নির্ভরশীল ছিল—এ ধরনের ধারণা থেকে তাঁকে পাক ও মুক্ত গণ্য করবে। বিপরীত পক্ষে তোমার মন এ দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ থাকবে যে, তোমার প্রচেষ্টা ও সাধনার সাফল্য আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। তিনি তাঁর যে বান্দার থেকে চান কাজ নিতে পারতেন। তবে তিনি তোমার যিদমত নিয়েছেন এবং তোমার সাহায্যে তাঁর দীনের ঝাওা বুলন্ড করেছেন, এটা তাঁর অনুগ্রহ। এ ছাড়া তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ পড়ার মধ্যে বিশ্বয়েরও একটি দিক রয়েছে। কোন বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটলে মানুষ সুবহানাল্লাহ বলে। এর অর্থ হয়, আল্লাহর অসীম কুদরতে এহেন বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটেছে। নয়তো এমন বিশ্বয়কর ঘটনা ঘটাবার ক্ষমতা দুনিয়ার কোন শক্তির ছিল না।

৪. অর্থাৎ তোমার রবের কাছে দোয়া করো। তিনি তোমাকে যে কাজ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তা করতে গিয়ে তোমার যে ভুল-ক্রটি হয়েছে তা যেন তিনি মাফ করে দেন। ইসলাম বান্দাকে এ আদব ও শিষ্ঠাচার শিখিয়েছে। কোন মানুষের দ্বারা আল্লাহর দীনের যতবড় যিদমতই সম্পর্ক হোক না কেন, তাঁর পথে সে যতই ত্যাগ শীকার করুক না কেন এবং তাঁর ইবাদাত ও বদেগী করার ব্যাপারে যতই প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাক না কেন, তাঁর মনে কখনো এ ধরনের চিন্তার উদয় হওয়া উচিত নয় যে, তাঁর উপর তাঁর রবের যে হক ছিল তা সে পুরোপুরি আদায় করে দিয়েছে। বরং সবসময় তাঁর মনে করা উচিত যে, তাঁর হক আদায় করার ব্যাপারে যেসব দোষ-ক্রটি সে করেছে তা মাফ করে দিয়ে যেন তিনি তাঁর এ নগণ্য যেদমত কবৃ করে দেন। এ আদব ও শিষ্ঠাচার শেখানো হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে। অর্থাৎ তাঁর দেয়ে বেশী আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনাকারী আর কোন মানুষের কথা কষ্টনাই করা যেতে পারে না। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্য কোন মানুষের পক্ষে তাঁর নিজের আমলকে বড় মনে করার অবকাশ কোথায়? আল্লাহর যে অধিকার তাঁর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সে আদায় করে দিয়েছে এ

অহংকারে মন্ত্র হওয়ার কোন সুযোগই কি তার থাকে? কোন সৃষ্টি আল্লাহর ইক আদায় করতে সক্ষম হবে, এ ক্ষমতাই তার নেই।

মহান আল্লাহর এ ফরমান মুসলমানদের এ শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, নিজের কোন ইবাদাত, আধ্যাত্মিক সাধনা ও দীনি খেদদতকে বড় জিনিস মনে না করে নিজের সমগ্র প্রাণশক্তি আল্লাহর পথে নিয়োজিত ও ব্যয় করার পরও আল্লাহর ইক আদায় হয়নি বলে মনে করা উচিত। এভাবে যখনই তারা কোন বিজয় লাভে সমর্থ হবে তখনই এ বিজয়কে নিজেদের কোন কৃতিত্বের নয় বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহের ফল মনে করবে। এ জন্য গর্ব ও অহংকারে মন্ত্র না হয়ে নিজেদের রবের সামনে দীনতার সাথে মাথা নত করে হামদ, সানা ও তাসবীহ পড়তে এবং তাওবা ও ইসতিগফার করতে থাকবে।

আল লাহাব

১১১

নামকরণ

প্রথম আয়াতের লাহাব (لَهُبْ) শব্দকে এ সূরার নাম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্ষী হবার ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু মক্ষী যুগের কোন সময় এটি নাযিল হয়েছিল তা যথাযথভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে আবু লাহাবের যে ভূমিকা এখানে দেখা গেছে তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটি এমন যুগে নাযিল হয়ে থাকবে যখন রসূলের (সা) সাথে শক্রতার ক্ষেত্রে সে সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তার দৃষ্টিজ্ঞ ও কর্মনীতি ইসলামের অগ্রগতির পথে একটি বড় বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্ভবত কুরাইশরা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বৎশের লোকদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করে তাদের শে'বে আবু তালেবে (আবু তালেব গিরিগথ) অস্তরীণ করেছিল এবং একমাত্র আবু লাহাবই তার বৎশের লোকদেরকে পরিভ্যাগ করে শক্রদের সাথে অবস্থান করছিল, তখনই এ সূরাটি নাযিল হওয়া বিচিত্র নয়। আমাদের এ অনুমানের ভিত্তি হচ্ছে, আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। আর তাতিজার মুখে চাচার প্রকাশ্য নিন্দাবাদ ততক্ষণ সংগত হতে পারতো না যতক্ষণ চাচার সীমা অতিক্রমকারী অন্যায়, জুলম ও বাড়াবাড়ি উন্মুক্তভাবে সবার সামনে না এসে গিয়ে থাকে। এর আগে যদি ক্ষরণতেই এ সূরাটি নাযিল করা হতো তাহলে লোকেরা নৈতিক দিক দিয়ে একে ক্ষটিগৰ্ণ মনে করতো। কারণ তাতিজার পক্ষে এভাবে চাচার নিন্দা করা শোভা পায় না।

পটভূমি

কুরআনে মাত্র এ একটি জায়গাতেই ইসলামের শক্রদের কারো নাম নিয়ে তার নিন্দা করা হয়েছে। অথচ মকায় এবং হিজ্রাতের পরে মদীনায়ও এমন অনেক লোক ছিল যারা ইসলাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শক্রতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ব্যক্তিটির এমনকি বিশেষত্ব ছিল যে কারণে তার নাম নিয়ে নিন্দা করা হয়েছে? একথা বুবার জন্য সহকারীন আরবের সামাজিক অবস্থা অনুধাবন এবং সেখানে আবু লাহাবের ভূমিকা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাচীন যুগে যেহেতু সারা আববের দেশের সব আয়গায় অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, শূটরাজ ও রাঘবেন্টিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এবং শত শত বছর থেকে এমন অবস্থা চলছিল যার ফলে কোন ব্যক্তির জন্য তার নিজের বংশ ও রক্তসম্পর্কের আত্মীয়-পরিজনের সহায়তা ছাড়া নিজের ধন-প্রাণ ও ইচ্ছিত-আবরন্ত হেফাজত করা কোনক্রমেই সত্ত্বপর ছিল না। এ জন্য আরবীয় সমাজের নেতৃত্ব মূল্যবোধের মধ্যে আত্মীয়-ব্রজনদের সাথে সম্ভবহার ছিল অত্যন্ত শুরুত্বের অধিকারী। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল করাকে মহাপাপ মনে করা হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে এলেন তখন আববের এ প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রভাবে কুরাইশ গোত্রের অন্যান্য পরিবার ও তাদের সরদাররা তাঁর কঠোর বিরোধিতা করলেও বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব (হাশেমের ভাই মুত্তালিবের সন্তানরা) কেবল তাঁর বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেনি বরং প্রকাশ্যে তাঁকে সমর্থন দিয়ে এসেছে। অথচ তাদের অধিকাংশই তাঁর নবুওয়াতের প্রতি ইমান আনেনি। কুরাইশের অন্যান্য পরিবারের শোকেরাও রসূলুল্লাহর (সা) রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-ব্রজনদের এ সমর্থন-সহযোগিতাকে আববের নেতৃত্বিক ঐতিহ্যের যথার্থ অনুসারী মনে করতো। তাই তারা কখনো বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবকে এই বলে ধিতার দেয়ানি যে, তোমরা একটি ভির ধর্মের আহবায়কের প্রতি সমর্থন দিয়ে নিজেদের পৈতৃক ধর্ম থেকে বিচ্ছৃত হয়ে গেছো। তারা একথা ধানতো এবং স্বীকারণও করতো যে, নিজেদের পরিবারের একজন সদস্যকে তারা কোনক্রমেই শক্ত হাতে তুলে দিতে পারে না। কুরাইশ তথা সমগ্র আববের অধিবাসীরাই নিজেদের আত্মীয়ের সাথে সহযোগিতা করাকে একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় বলে মনে করতো।

জাহেলী যুগেও আববের শোকেরা এ নেতৃত্বিক আদর্শকে অত্যন্ত মর্যাদার চোখে দেখতো। অথচ শুধু মাত্র একজন শোক ইসলামের প্রতি বিদ্যে ও শক্রতায় অস্ত হয়ে এ আদর্শ ও মূলনীতি লংঘন করে। সে ছিল আবু দাহাব ইবনে আবদুল মুত্তালিব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। রসূলের (সা) পিতা এবং এ আবু দাহাব ছিল একই পিতার সন্তান। আববে চাচাকে বাপের মতই মনে করা হতো। বিশেষ করে যখন ভাতিজার বাপের ইতিকাল হয়ে গিয়েছিল তখন আরবীয় সমাজের রীতি অনুযায়ী চাচার কাছে আশা করা হয়েছিল, সে ভাতিজাকে নিজের ছেনের মতো ভালোবাসবে। কিন্তু এ ব্যক্তি ইসলাম বৈরিতা ও কুফরী প্রেমে আকর্ষণ ভূবে গিয়ে এ সমস্ত আরবীয় ঐতিহ্যকে পদদলিত করেছিল।

মুহাম্মদসংগ্রহ বিভিন্ন সূত্রে ইবনে আবাস থেকে একটি হাদীস উন্মৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বসাধারণের কাছে দাওয়াত পেশ করার হৃক্ষ দেয়া হলো এবং কুরআন মজীদে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হলো : “সবার আগে আপনার নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহর আয়াবের তয় দেখান।” এ নির্দেশ পাওয়ার পর সকাল বেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠে বুলবুল আওয়াজে চিঙ্কার করে বগলেন **يَا صَبَاحاً** (হায়, সকাল বেলার বিপদ!) আববে এ ধরনের আওয়াজ এমন এক ব্যক্তি দিয়ে থাকে যে তোর বেলার আলো আঁধারীর মধ্যে কোন শক্তদলকে নিজেদের গোত্রের ওপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসতে দেখে থাকে। রসূলুল্লাহর (সা) এ আওয়াজ শুনে শোকেরা জিজেস করলো, কে আওয়াজ দিছে?

বলা হলো মুহাম্মদ (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আওয়াজ দিছেন। একথা শুনে কুরাইশদের সমস্ত পরিবারের লোকেরা দৌড়ে গেলো তাঁর দিকে। যে নিজে আসতে পারতো সে নিজে এসে গেলো এবং যে নিজে আসতে পারতো না সে তার একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দিল। সবাই পৌছে গেলে তিনি কুরাইশের প্রত্যেকটি পরিবারের নাম নিয়ে ডেকে ঢেকে বললেন : হে বনী হাশেম! হে বনী আবদুল মুভালিব! হে বনী ফেহর! হে বনী উমুক! হে বনী উমুক! যদি আমি তোমাদের একথা বলি, এ পাহাড়ের শেষেনে একটি সেনাবাহিনী প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমাদের ওপর আক্রমণ করার জন্য, তাহলে আমার কথা কি তোমরা সত্য বলে মেনে নেবে? লোকেরা জবাব দিল, হ্যা, আমরা কখনো আপনার মুখ্য কথা শুনিনি। একথা শুনে তিনি বললেন : তাহলে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আগামীতে কঠিন আয়াব আসছে। একথায় অন্যকেউ বলার আগে তাঁর নিজের চাচা আবু লাহাব বললো : **تَبَالَكَ الْهَذَا جَمِيعَنَا** “তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি কি এ জন্য আমাদের ডেকেছিলে?” অন্য একটি হাদীসে একথাও বলা হয়েছে, সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুঁড়ে মারার জন্য একটি পাথর উঠিয়েছিল। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, ইবনে জামীর ইত্যাদি)।

ইবনে যায়েদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে : আবু লাহাব একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, যদি আমি তোমার দীন গ্রহণ করি তাহলে এর বদলে আমি কি পাবো? তিনি জবাব দিলেন, অন্যান্য ইমানদাররা যা পাবে আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বললো : আমার জন্য কিছু বাড়তি মর্যাদা নেই? জবাব দিলেন : **أَنْ تَبَالَكَ الْرِّبِّينَ تَبَأْ أَنْ كُفَّنْ وَمُؤْلَءْ سَوْءَ** “আর কি চান? একথায় সে বললো : **أَنْ تَبَأْ** অন্তর্ভুক্ত সর্বনাশ হোক এ দীনের যেখানে আমি ও অন্যান্য লোকেরা একই পর্যায়ত্বস্থ হবে।” (ইবনে জামীর)

মুকায় আবু লাহাব ছিল রসূলুল্লাহর (সা) নিকটতম প্রতিবেশী। উভয়ের ঘরের মাঝখানে ছিল একটি প্রাচীর। এ ছাড়াও হাকাম ইবনে আস (মারওয়ানের বাপ), উকবা ইবনে আবু মুঈত; আদী ইবনে হামরা ও ইবনুল আসদায়েল হ্যাসীও তাঁর প্রতিবেশী ছিল। এরা বাড়িতেও রসূলুল্লাহকে নিশ্চিন্তে থাকতে দিত না। তিনি যখন নামায পড়তেন, এরা তখন ওপর থেকে ছাগলের নাড়িভৃতি তাঁর গায়ে নিষ্কেপ করতো। কখনো তাঁর বাড়ির আভিনাম রাখাবারা হতো এরা হাঁড়ির মধ্যে ময়লা ছুঁড়ে দিতো। রসূলুল্লাহ (সা) বাইরে এসে তাদেরকে বলতেন, “হে বনী আবদে মারাফ। এ কেমন প্রতিবেশীসূলত আচরণ?” আবু লাহাবের স্ত্রী উমে জামীল (আবু সুফিয়ানের বোন) প্রতি রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজার সামনে কাটাগাছের ডাল পালা ছড়িয়ে রেখে দিতো। এটা ছিল তাঁর প্রতিদিনের স্থায়ী আচরণ। যাতে রসূলুল্লাহ (সা) বা তাঁর শিশু সন্তানরা বাইজে বের হলে তাদের পায়ে কাঁটা বিধে যায়। (বায়হাকী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জামীর, ইবনে আসাকির ও ইবনে হিশাম)।

নবুওয়াত শাতের পূর্বে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই মেয়েকে আবু লাহাবের দুই ছেলে উতো ও উতাইবার সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। নবুওয়াতের পরে যখন তিনি ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তখন আবু লাহাব তাঁর দুই

চেলেকে বলে, তোমরা মুহাম্মদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদের তালাক না দিলে আমার পক্ষে তোমাদের সাথে দেখা-সাক্ষাত হারাম হয়ে যাবে। কাজেই দু'জনেই তাদের স্ত্রীদের তালাক দেয়। উতাইবা জাহেলিয়াতের মধ্যে খুব বেশী অগ্রসর হয়ে যায়। সে একদিন রসূলুল্লাহর (সা) সামনে এসে বলে : আমি **النَّجْمُ إِذَا مَوَىٰ** এবং **الْدُّنْيَى دَنَّا فَتَدَلَّسْ** অব্যুক্তির করছি। একথা বলে তাঁর দিকে থুথু নিঙ্কেপ করে। থুথু তাঁর গায়ে লাগেনি। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! তোমার কুরুরদের মধ্য থেকে একটি কুরুর এর উপর চাপিয়ে দাও। এরপর উতাইবা তার বাপের সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হয়। সফরকালে রাতে তাদের কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করে। স্থানীয় লোকেরা জানায়, সেখানে রাতে হিস্তে জানোয়ারদের আনাগোনা হয়। আবু লাহাব তার কুরাইশী সাথীদের বলে, আমার ছেলের হেফাজতের ভালো ব্যবস্থা করো। কারণ আমি মুহাম্মদের (সা) বদ দোয়ার ভয় করছি। একথায় কাফেলার লোকেরা উতাইবার চারদিকে নিজেদের উটগুলোকে বসিয়ে দেয় এবং তারা নিজেরা ঘূর্মিয়ে পড়ে। গভীর রাতে একটি বাধ আসে। উটদের বেঠনী তেদ করে সে উতাইবাকে ধরে এবং সেখানেই তাকে ছির বিছির করে ধেয়ে ফেলে (আল ইসতিআব লি ইবনে আবদিল বার, আল ইসাবা লি ইবনে হাজার, দাঁলায়েলুন নুবুওয়া লি আবী নাসির আল ইসফাহানী ও রাষ্ট্রদুল উনুফ গিস সুহাইলী)। বর্ণনাগুলোর মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন বর্ণনাকারী তালাকের ব্যাপারটি নবুওয়াতের ঘোষণার পরের ঘটনা বলেন। আবার কোন কোন বর্ণনাকারীর মতে “তাবাত ইয়াদা আবী লাহাব” এর নাখিলের পরই তালাকের ঘটনাটি ঘটে। আবার আবু লাহাবের এ তালাক দানকারী ছেলেটি উটবা ছিল না উতাইবা—এ ব্যাপারে মতবিভ্রান্ত রয়েছে। কিন্তু মুক্তি বিজয়ের পর উটবা ইসলাম গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন, একথা প্রমাণিত সত্য। তাই আবু লাহাবের এ তালাকদানকারী ছেলেটি যে উতাইবা ছিল, এতে সল্লেহ নেই।

সে যে কেমন জগন্য মানসিকতার অধিকারী ছিল তার পরিচয় একটি ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে হ্যরত আবুল কাসেমের ইতিকালের পর তার হিতীয় ছেলে হ্যরত আবদুল্লাহরও ইতিকাল হয়। এ অবস্থায় আবু লাহাব তার ভাতিজার শোকে শরীর না হয়ে বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে দৌড়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে পৌছে যায়। সে তাদেরকে জানায় : শোনো, আজ মুহাম্মদের (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম নিশানা মুছে গেছে। তার এ ধরনের আচরণের কথা আমরা ইতিপূর্বে স্বীকৃত করে আসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে যেখানে ইসলামের দাওয়াত দিতে যেতেন আবু লাহাবও তাঁর পেছনে পেছনে সেখানে গিয়ে পৌছতো এবং লোকদের তাঁর কথা শুনার কাজে বাধা দিতো। রাবী'আহ ইবনে আবাদ আদদীলী (রা) বর্ণনা করেন, আমি একদিন আমার আবার সাথে মূল-মাজায়ের বাজারে যাই। তখন আমার বয়স ছিল কম। সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখি। তিনি বলছিলেন : “হে লোকেরা! বলো, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। একথা বললেই তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।” এ সময় তাঁর পেছনে পেছনে এক ব্যক্তি বলে চলছিল, “এ ব্যক্তি মিথুক, নিজের ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।” আমি জিজ্ঞেস করি, এ লোকটি কে? লোকেরা

বলগো, ওঁর চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাকী) এ একই বর্ণনাকারী ইয়রত রাবীআহ (রা) থেকে আর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম। তিনি প্রত্যেকটি গোত্রের শিবিরে যাইছিলেন এবং বলছিলেন : “হে বনী অমৃক। আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রসূল। তোমাদের নির্দেশ দিই, একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তৌর সাথে আর কাউকে শরীক করো না। তোমরা আমাকে সত্য নবী বলে মেনে নাও এবং আমার সাথে সহযোগিতা করো। এভাবে আল্লাহ আমাকে যে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছেন তা আমি পূর্ণ করতে পারবো।” তৌর পিছে পিছে আর একটি লোক আসছিল এবং সে বলছিল : “হে বনী অমৃক! এ ব্যক্তি নিজে যে নতুন ধর্ম ও ভট্টাচ নিয়ে এসেছে তাত ও উফ্যার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তোমাদের সেদিকে নিয়ে যেতে চায়। এর কথা একদম মেনো না এবং এর পেছনেও চলো না।” আমি আমার আবাকে জিজ্ঞেস করলাম : এ লোকটি কে? তিনি বললেন : এ গোকটি ওরই চাচা আবু লাহাব। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবাহানী) তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহারেবীর (রা) রেওয়ায়াতও প্রায় এ একই ধরনের। তিনি বর্ণনা করেছেন : যুন মাজাহের বাজারে দেখলাম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের বলে যাচ্ছেন, “হে লোকেরা! তোমরা গা-ইলাহা ইলাহার বলো, তাহলে সফলকাম হয়ে যাবে।” ওদিকে তৌর পিছে পিছে একজন লোক তাঁকে পাথর মেরে চলছে। এভাবে তৌর পায়ের গোড়ালি রক্ষাকু হয়ে যাচ্ছে। এই সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি বলে চলেছে, “ এ মিথ্যক, এর কথা শুনো না।” আমি লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? লোকেরা বলগো : ওরই চাচা আবু লাহাব। (তিরমিয়ী)

নবুওয়াতের সপ্তম বছরে কুরাইশদের সমস্ত পরিবার মিলে যখন বনি হাশেম ও বনী মুভালিবকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কট করলো এবং এ পরিবার দু’টি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে অবিচল থেকে আবু তালেব গিরিপথে অস্তরীণ হয়ে গেলো তখন একমাত্র আবু লাহাবই নিজের পরিবার ও বৎসরের সহগায়ী না হয়ে কুরাইশ কাফেরদের সহযোগী হলো। এ বয়কট তিনি বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এ সময় বনী হাশেম ও বনী মুভালিবকে অনেক সময় অনাহারে ধাকতে হয়েছে। কিন্তু আবু লাহাবের ভূমিকা ছিল মারমুয়ী। বাইর থেকে মকাব কোন বাণিজ্য কাফেলো এনে আবু তালেব গিরিপথে অস্তরীণদের মধ্য থেকে কেউ তাদের কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য কিনতে যেতো। আবু লাহাব তখন চিন্কার করে বণিকদেরকে বলতো : ওদের কাছে এতো বেশী দাম চাও যাতে ওরা কিনতে না পারে। এ জন্য তোমাদের যত টাকা ক্ষতি হয় তা আমি দেবো। কাজেই তারা বিরাট দাম হাঁকতো। ক্রেতা মহাসংকটে পড়তো। শেষে নিজের অনাহারের কষ বুকে পুরে রেখে খালি হতে পাহাড় ফিরে যেতে হতো কুধা কাতৰ স্তনান্দের কাছে। তারপর আবু লাহাব সেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই পণ্যগুলোই বাজার দরে কিনে নিতো। (ইবনে সাদ ও ইবনে হিশাম)

এই সূরায় যে ব্যক্তিটির নাম নিয়ে নিদা করা হয়েছে এগুলো ছিল তারই কর্মকাণ্ড। বিশেষ করে এর প্রয়োজন এ অন্য ক্ষেত্রে দিয়েছিল যে, মকাব বাইরের আরবের যেসব লোকেরা ইজ্জের অন্য আসতো অথবা বিভিন্ন স্থানে যেসব বাজার বসতো সেখানে যাইয়া আমায়েত হতো, তাদের সামনে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের

চাচা তাঁর পিছনে ঘুরে ঘরে তাঁর বিরোধিতা করতো তখন বাইরের লোকদের ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়তো। কারণ আরবের প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে কোন চাচা বিনা কারণে অন্যদের সামনে তার নিজের ভাতিজাকে গালিগালাজ করবে; তার গায়ে পাথর মারবে এবং তার প্রতি দোষারোপ করবে এটা কঢ়নাতীত ছিল। তাই তারা আবু লাহাবের কথায় প্রভাবিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে যেতো। কিন্তু এ সূরাটি নাফিল হবার পর যখন আবু লাহাব রাগে অন্ধ হয়ে আবোলতাবোল বকতে লাগলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতার ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সে নিজের ভাতিজার শক্তায় অন্ধ হয়ে গেছে।

তাছাড়া নাম নিয়ে নিজের চাচার নিন্দা করার পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে দীনের ব্যাপারে কারো মুখ চেয়ে কোন প্রকার সমর্পোতা বা নরম নীতি অবলম্বন করবেন, এ আশা চিরতরে নির্মূল হয়ে গেলো। যখন প্রকাশ্যে ঘোষণার মাধ্যমে রসূলের চাচার নিন্দা করা হলো তখন লোকেরা বুঝতে পারলো, এখানে কোন কিছু রেখে ঢেকে করার অবকাশ নেই। এখানে ঈমান আনলে পরও আপন হয়ে যায় এবং ইসলামের বিরোধিতা ও কুফরী করলে আপনও হয়ে যায় পর। এ ব্যাপারে অমুকের ছেলে, অমুকের তাই বা অমুকের বাপের কোন গুরুত্ব নেই।

আয়াত ৫

সূরা আল লাহাব-মুক্তি

জুক্তি ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মশাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

تَبَّتْ يَدَيْ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ^①
 سَيَصْلِي نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ^② وَامْرَأَ تَهْ حَمَالَةَ الْحَطَبِ^③ فِي
 جِيلٍ هَا حَبَلٌ مِنْ مُسْلِ^④

ডেঙে গেছে আবু লাহাবের হাত এবং ব্যর্থ হয়েছে সে।^১ তার ধন-সম্পদ এবং
 যা কিছু সে উপার্জন করেছে তা তার কোন কাজে লাগেনি।^২ অবশ্যই সে লেলিহান
 আগুনে নিষিদ্ধ হবে। এবং (তার সাথে) তার স্ত্রীও,^৩ লাগানো ভাঙানো চোগলখুরী
 করে বেড়ানো যার কাজ,^৪ তার গলায় ধাকবে খেজুর ডানের আঁশের পাকানো শক্ত
 রশি।^৫

১. আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল উয়্যায়। তাকে আবু লাহাব বলে ডাকার
 কারণ, তার গায়ের রং ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল সাদা লালে মেশানো। লাহাব বলা হয় আগুনের
 শিখাকে। কাজেই আবু লাহাবের মানে হচ্ছে আগুন বরণ মুখ। এখানে তার আসল নামের
 পরিবর্তে ডাক নামে উল্লেখ করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। এর একটি কারণ হচ্ছে এই
 যে, মূল নামের পরিবর্তে ডাকনামেই সে বেশী পরিচিত ছিল। দ্বিতীয় কারণ, তার আবদুল
 উয়্যায় (অর্থাৎ উয়্যায় দাস) নামটি ছিল একটি মুশরিকী নাম। কুরআনে তাকে এ নামে
 উল্লেখ করা পছন্দ করা হয়নি। তৃতীয় কারণ, এ সূরায় তার যে পরিণতি বর্ণনা করা
 হয়েছে তার সাথে তার এ ডাকনামই বেশী সম্পর্কিত।

— এর অর্থ কোন কোন তাফসীরকার করেছেন, “ডেঙে যাক
 আবু লাহাবের হাত” এবং শব্দের মানে করেছেন, “সে ধূস হয়ে যাক” অথবা
 “সে ধূস হয়ে গেছে।” কিন্তু আসলে এটা তার প্রতি কোন ধিক্কার নয়। বরং এটা একটা
 ভবিষ্যদ্বাণী। এখানে ভবিষ্যতে যে ঘটনাটি ঘটবে তাকে অতীত কালের অর্থ প্রকাশক
 শব্দের সাহায্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এর মানে, তার হওয়াটা যেন এত বেশী নিশ্চিত
 যেমন তা হয়ে গেছে। আর আসলে শেষ পর্যন্ত তাই হলো যা এ সূরায় কয়েক বছর আগে
 বর্ণনা করা হয়েছিল। হাত ডেঙে যাওয়ার মানে শরীরের একটি অংগ যে হাত সেটি ডেঙে
 যাওয়া নয়। বরং কোন ব্যক্তি যে উদ্দেশ্য সম্পন্ন করার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে

তাতে পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে যাওয়াই এখানে বুঝানো হয়েছে। আর আবু লাহাব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য যথাধৰ্থ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। কিন্তু এ সুরাটি নাখিল হবার মাত্র সাত আট বছর পরেই বদরের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ যুদ্ধে কুরাইশদের অধিকাংশ বড় বড় সরদার নিহত হয়। তারা সবাই ইসলাম বিরোধিতা ও ইসলামের প্রতি শক্রতার ক্ষেত্রে আবু লাহাবের সহযোগী ছিল। এ পরাজয়ের ব্যবর মকায় পৌছার পর সে এত বেশী ঘৰ্যাহত হয় যে, এরপর সে সাত দিনের বেশী জীবিত থাকতে পারেনি। তারপর তার মৃত্যুও ছিল বড়ই তয়াবহ ও শিক্ষাপদ। তার শরীরে সাংঘাতিক ধরনের ফুসকুড়ি (Malignant Pustule) দেখা দেয়। রোগ সংক্রমণের ভয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। মরার পরও তিন দিন পর্যন্ত তার ধারেকাছে কেউ দেখেনি। ফলে তার লাশে পচন ধরে। চারদিকে দুর্গন্ধি ছড়াতে থাকে। শেষে লোকেরা তার ছেলেদেরকে ধিকার দিতে থাকে। একটি বর্ণনা অনুসারে তখন তারা মজুরীর বিনিয়য়ে তার লাশ দাফন করার জন্য কয়েকজন হাবশীকে নিয়োগ করে এবং তারা তার লাশ দাফন করে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে, তারা গর্ত খুড়ে লম্বা লাঠি দিয়ে তার লাশ তার মধ্যে ফেলে দেয় এবং উপর থেকে তার উপর মাটি চাপা দেয়। যে দীনের অঞ্চলিতির পথ রোধ করার জন্য সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল তার সন্তানদের সেই দীন গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে তার আরো বেশী ও পূর্ণ পরাজয় সম্পর্ক হয়। সর্বপ্রথম তার মেয়ে দাররা হিজরাত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে যান এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মক্কা বিজয়ের পর তার দুই ছেলে উত্তো ও মু'আস্তাব হ্যরত আবাসের (রা) মধ্যস্থতায় রসূলুল্লাহর (সা) সামনে হায়ির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করেন।

২. আবু লাহাব ছিল হাড়কৃগণ ও অর্থলোলুপ। ইবনে আসীরের বর্ণনা মতে, জাহেলী যুগে একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল যে, সে কাবা শরীফের কোষাগার থেকে দু'টি সোনার হরিণ চুরি করে নিয়েছে। যদিও পরবর্তী পর্যায়ে সেই হরিণ দু'টি অন্য একজনের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় তবুও তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনার ফলে তার সম্পর্কে মক্কার লোকদের মনোভাব উপলব্ধি করা যায়। তার ধনাঢ্যতা সম্পর্কে কাজী রশীদ ইবনে যুবাইর তাঁর "আয়াখায়ের ওয়াত'তুহাফ" (*الذخائر والتحف*) গ্রন্থে লিখেছেন : কুরাইশদের মধ্যে যে চারজন লোক এক কিনতার (এক কিনতার = দু'শো আওকিয়া আর এক আওকিয়া = সোয়া তিন তোলা কাজেই এক কিনতার সমান ৮০ তোলার সেরের ওজনে ৮ সের ১০ তোলা) সোনার মালিক ছিল আবু লাহাব তাদের একজন। তার অর্থ লোলুপতা কি পরিমাণ ছিল বদর যুদ্ধের সময়ের ঘটনা থেকে তা আন্দাজ করা যেতে পারে। এ যুদ্ধে তার ধর্মের ভাগ্যের ফায়সালা হতে যাচ্ছিল। কুরাইশদের সব সরদার এ যুদ্ধে অংশ নেবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু আবু লাহাব নিজে না গিয়ে নিজের পক্ষ থেকে আস ইবনে হিশামকে পাঠায়। তাকে বলে দেয়, তার কাছে সে যে চার হাজার দিরহাম পায় এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে এর বদলে তার সেই ঝণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। এতাবে সে নিজের ঝণ আদায় করার একটা কোশল বের করে নেয়। কারণ আস দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল। ঝণ পরিশোধের কোন ক্ষমতাই তার ছিল না।

কোন কোন তাফসীরকার ক্ষেত্রে শব্দটিকে উপার্জন অর্থে নিয়েছেন। অর্থাৎ নিজের অর্থ থেকে সে যে মুনাফা অর্জন করেছে তা তার উপার্জন। আবার অন্য কয়েকজন তাফসীরকার এর অর্থ নিয়েছেন সন্তান-সন্ততি। কারণ রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তানরা মানুষের উপার্জন (আবু দাউদ ও ইবনে আবী হাতেম)। এ দুটি অর্থই আবু লাহাবের পরিণতির সাথে সম্পর্কিত। কারণ সে মারাজাক ফুসকৃতি গ্রাগে আক্রান্ত হলে তার সম্পদ তার কোন কাজে লাগেনি এবং তার সন্তানরাও তাকে অসহায়ভাবে মৃত্যু বরণ করার জন্য ফেলে রেখে দিয়েছিল। তার ছেলেরা তার লাশটি মর্যাদা সহকারে কাঁধে উঠাতেও চাইল না। এভাবে এ সূরায় আবু লাহাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল লোকেরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তা সত্য হতে দেখলো।

৩. আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল “আরদা”। “উমে জামীল” ছিল তার ডাক নাম। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন। রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শক্রতার ব্যাপারে সে তার স্বামী আবু লাহাবের চাইতে কোন অংশে কম ছিল না। হ্যরত আবু বকরের (রা) মেয়ে হ্যরত আসমা (রা) বর্ণনা করেছেন : এ সূরাটি নাখিল হবার পর উমে জামীল যখন এটি শুনলো, সে ক্রোধে ক্ষিণ হয়ে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৌজে বের হলো। তার হাতের মুঠোয় পাথর তরা ছিল রসূলগ্রাহকে (সা) গালাগালি করতে করতে নিজের রচিত কিছু কবিতা পড়ে চলছিল। এ অবস্থায় সে কা’বা ঘরে পৌছে গেলো। সেখানে রসূলগ্রাহ (সা) হ্যরত আবু বকরের (রা) সাথে বসেছিলেন। হ্যরত আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রসূল! দেখুন সে আসছে। আমার আশংকা হচ্ছে, সে আপনাকে দেখে কিছু অভদ্র আচরণ করবে। তিনি বললেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। বাস্তবে হলোও তাই। তাঁর উপস্থিতি সন্ত্রেণ সে তাঁকে দেখতে পেলো না। সে আবু বকরকে (রা) জিজ্ঞেস করলো, শুনলাম তোমার সাথী আমার নিন্দা করেছে। হ্যরত আবু বকর (রা) জবাব দিলেন : এ ঘরের রবের কসম, তিনি তো তোমার কোন নিন্দা করেননি। একথা শুনে সে ফিরে গেলো—(ইবনে আবী হাতেম, সীরাতে ইবনে হিশাম। বায়ুয়ারও প্রায় একই ধরনের একটি রেয়েয়াত হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা) থেকে উন্নত করেছেন)। হ্যরত আবু বকরের (রা) এ জবাবের অর্থ ছিল, নিন্দা তো আল্লাহ করেছেন রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি।

৪. মূল শব্দ হচ্ছে جَمَّالُ الْحَاطِبْ এর শান্তিক অর্থ হচ্ছে, “কাঠ বহনকারিনী।” মুফাস্সিসরগণ এর বহু অর্থ বর্ণনা করেছেন। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্দাস (রা) ইবনে যায়েদ, যাহহাক ও রাবী ইবনে আনাস বলেন : সে রাতের বেশে কৌটা গাছের ডালপালা এনে রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরজায় ফেলে রাখতো। তাই তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। কাতাদাহ, ইকরামা, হাসান বসরী, মুজাহিদ ও সুফিয়ান সওরী বলেন : সে লোকদের মধ্যে ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য চোগলখুলী করে বেড়াতো। তাই আরবী প্রবাদ অনুযায়ী তাকে কাঠ বহনকারিনী বলা হয়েছে। কারণ যারা এর কথা ওর কাছে বলে এবং লাগানো ভাঙানোর কাজ করে ফিতনা-ফাসাদের আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে আরবরা তাদেরকে কাঠ বহনকারিনী বলে থাকে। এ প্রবাদ অনুযায়ী “হামালাতাল হাতাব” শব্দের সঠিক অনুবাদ হচ্ছে, “যে লাগানো ভাঙানোর কাজ করে।” সাইদ ইবনে জুবাইর বলেন : যে ব্যক্তি নিজের পিঠে গোনাহের বোঝা বহন করে আরবী

প্রবাদ অনুসারে তার সম্পর্কে বলা হয়, ﴿فَلَمْ يُحْتَبِ عَلَىٰ ظَهِيرَةِ أَمْوَالِكَ بِعْدِ نِيَجَرِ الْمَيْطِ﴾ (অর্থাৎ অমুক ব্যক্তি নিজের পিঠে কাঠ বহন করছে)। কাজেই হাথালাতাল হাতাব (حَمَّالَةِ الْحَطَبِ) মানে হচ্ছে, “গোলাহের বোঝা বহনকারিনী।” মুফাস্সিরগণ এর আরো একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। সেটি হচ্ছে, আখেরাতে তার এ অবস্থা হবে। অর্থাৎ সেখানে যে আগনে আবু লাহাব পৃড়তে থাকবে তাতে সে (উম্মে জামিল) কাঠ বহন করে এনে ফেলতে থাকবে।

৫. তার গলার জন্য জীদ (جَذَد) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় যে গলায় অলংকার পরানো হয়েছে তাকে জীদ বলা হয়। সাইদ ইবনুল মুসাইয়েব, হাসান বসরী ও কাতাদা বলেন : সে একটি অতি মূল্যবান হার গলায় পরতো এবং বলতো, লাত ও উষ্যধার কসম, এ হার বিক্রি করে আমি এর মূল্য বাবদ পাওয়া সম্ভব অর্থ মুহাম্মদের (সা) বিরলদ্রু শক্রতামূলক কাজ করার জন্য ব্যয় করবো। এ কারণে জীদ শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাঙার্থে। অর্থাৎ এ অলংকার পরিহিত সুসজ্জিত গলায়, যেখানে পরিহিত হার নিয়ে সে গর্ব করে বেড়ায়, কিয়ামতের দিন সেখানে রশি বৌধা হবে। এটা ঠিক সম্পর্যায়েই ব্যাঙাত্মক বক্তব্য যেমন কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে : **بَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ الْيَمْنِ** “তাদেরকে যত্নণাদায়ক আয়াবের সুসংবাদ দাও।”

তার গলায় বৌধা রশিটির জন্য **حَبْلٌ مَنْ مُسْلِمٌ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ সে রশিটি হবে ‘মাসাদ’ ধরনের। অভিধানবিদ্ব ও মুফাস্সিরগণ এ শব্দটির বহ অর্থ বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি বক্তব্য হচ্ছে, খুব মজবুত করে পাকানো রশিকে মাসাদ বলা হয়। দ্বিতীয় বক্তব্য হচ্ছে, খেজুর গাছের (ডালের) ছাল থেকে তৈরি রশি মাসাদ নামে পরিচিত। এ সম্পর্কে তৃতীয় বক্তব্য হচ্ছে, এর মানে খেজুরের ডালের গোড়ার দিকের মোটা অংশ থেঁতলে যে সরু আঁশ পাওয়া যায় তা দিয়ে পাকানো রশি অথবা উটের চামড়া বা পশম দিয়ে তৈরি রশি। আর একটি বক্তব্য হচ্ছে, এর অর্থ সোহার তারের পাকানো রশি।

আল ইখলাস

১১২

নামকরণ

ইখলাস শব্দ এ সূরাটির নামই নয়, এখানে আলোচ্য বিষয়বস্তুর শিরোনামও। কারণ, এখানে খালেস তথা নির্ভেজাল তাওহীদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন মজীদের অন্যান্য সূরার ক্ষেত্রে সাধারণত সেখানে ব্যবহৃত কোন শব্দের মাধ্যমে তার নামকরণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ সূরাটিতে ইখলাস শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি। কাজেই এর এ নামকরণ করা হয়েছে এর অর্থের ভিত্তিতে। যে ব্যক্তি এ সূরাটির বক্তব্য অনুধাবন করে এর শিক্ষার প্রতি ইমান আনবে, সে শিরক থেকে মুক্তি লাভ করে খালেস তাওহীদের আলোকে নিজেকে উদ্ভাসিত করবে।

নাযিলের সময়-কাল

এর মক্ষী ও মাদানী হবার ব্যাপারে মতভেদ আছে। এ সূরাটি নাযিল হবার কারণ হিসেবে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর ভিত্তিতেই এ মতভেদ দেখা দিয়েছে। নীচে পর্যায়ক্রমে সেগুলো উল্লেখ করছি :

(১) হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন, কুরাইশরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বৎশ পরিচয়* আমাদের জানান। একথায় এ সূরাটি নাযিল হয়। (তাবারানী)।

(২) আবুল আলীয়াহ হ্যরত উবাই ইবনে কাবের (রা) বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বৎশ পরিচয় আমাদের জানান। এর জবাবে আলীয়াহ এ সূরাটি নাযিল করেন। (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে জারীর, তিরমিয়ী, বুখারী ফিত তারীখ, ইবনুল মুনফির, হাকেম ও বায়হাকী) এ বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট একটি হাদীস আবুল আলীয়ার মাধ্যমে ইমাম তিরমিয়ী উদ্ভৃত করেছেন। সেখানে হ্যরত উবাই ইবনে কাবের বরাত নেই। ইমাম তিরমিয়ী একে অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভুল বলেছেন।

* আরববাসীদের নিয়ম ছিল, কোন অপরিচিত ব্যক্তির পরিচয় লাভ করতে হলে তারা বলতো, **إِنْسَبْ لَنَا** (এর বৎশধারা আমাদের জানাও) কারণ তাদের কাছে পরিচিতির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হতো বৎশধারার। সে কোন বৎশের লোক? কোন গোত্রের সাথে সম্পর্কিত? একথা জানার প্রয়োজন হতো। কাজেই তারা যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর রব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হলো তিনি কে এবং কেমন, তখন তারা তাঁকে একই প্রশ্ন করলো। তারা প্রশ্ন করলো, **إِنْسَبْ لَنَا رَبّكَ** অর্থাৎ আপনার রবের নসবনামা (বৎশধারা) আমাদের জানান।

(৩) হ্যরত জবাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, এক গ্রামীণ আরব (কোন কোন হাদীস অনুযায়ী লোকেরা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে, আপনার রবের বৎসরারা আমাদের জানান। এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাখিল করেন (আবু ইয়ালা, ইবনে জারীর, ইবনুল মুন্যির, তাবারানী ফিল আওসাত, বায়হাকী ও আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া)।

(৪) ইকরামা হ্যরত ইবনে আবাস (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেন, ইহুদীদের একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হায়ির হয়। তাদের মধ্যে ছিল কা'ব ইবনে আশরাফ ও হই ইবনে আখতাব প্রমুখ লোকেরা। তারা বলে, “হে মুহাম্মাদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার যে বর আপনাকে পাঠিয়েছেন তিনি কেমন সে সম্পর্কে আমাদের জানান।” এর জবাবে মহান আল্লাহ এ সূরাটি নাখিল করেন। (ইবনে আবী হাতেম, ইবনে আদী, বায়হাকী ফিল আসমায়ে ওয়াস সিফাত)

এ ছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়া কয়েকটি হাদীস তাঁর স্ন্যা ইখলাসের তাফসীরে বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

(৫) হ্যরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, খয়বারের কয়েকজন ইহুদী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলে, “হে আবুল কাসেম! আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে নূরের পরদা থেকে, আদমকে পচাগলা মাটির পিও থেকে, ইবলিসকে আগুনের শিখা থেকে, আসমানকে ধোয়া থেকে এবং পৃথিবীকে পানির ফেলা থেকে তৈরি করেছেন। এখন আপনার রব সঁথকে আমাদের জানান (অর্থাৎ তিনি কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি?)” রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথার কোন জবাব দেননি। তারপর জিব্রিল (আ) আসেন। তিনি বলেন, হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, “হে যুহুল্লাহ! আহাদ” (তিনি আল্লাহ এক ও একক).....

(৬) আমের ইবনুত তোফায়েল রসূলুল্লাহকে (সা) বলে : “হে মুহাম্মাদ! আপনি আমাদের কোন জিনিসের দিকে আহবান জানাচ্ছেন? তিনি জবাব দেন, “আল্লাহর দিকে।” আমের বলে : “তালো, তাহলে তাঁর অবস্থা আমাকে জানান। তিনি সৌনার তৈরি, না ঝুপার অথবা লোহার?” একথার জবাবে এ সূরাটি নাখিল হয়।

(৭) যাহহাক, কাতাদাহ ও মুকাতেল বলেন, ইহুদীদের কিছু আলেম রসূলুল্লাহর (সা) কাছে আসে। তারা বলে : “হে মুহাম্মাদ! আপনার রবের অবস্থা আমাদের জানান। হয়তো আমরা আপনার উপর ইমান আনতে পারবো। আল্লাহ তাঁর গুণাবলী তাওরাতে নাখিল করেছেন। আপনি বলুন, তিনি কোন বস্তু দিয়ে তৈরি? কোন গোত্রভুক্ত? সোনা, তামা, পিতল, লোহা, ঝুপা, কিসের তৈরি? তিনি পানাহার করেন কি না? তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে কার কাছ থেকে পৃথিবীর যালিকানা লাভ করেছেন? এবং তারপর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? এর জবাবে আল্লাহ এ সূরাটি নাখিল করেন।

(৮) ইবনে আবাস (রা) বর্ণনা করেন, নাজরানের খুষ্টানদের সাতজন পাদরী সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করে। তারা তাঁকে বলে : “আমাদের বলুন, আপনার রব কেমন? তিনি কিসের তৈরি?”

তিনি বলেন, “আমার রব কোন জিনিসের তৈরি নন। তিনি সব বস্তু থেকে আলাদা।” এ ব্যাপারে আল্লাহ এ সূরাটি নাযিল করেন।

এ সমষ্টি হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) যে মাসুদের ইবাদাত ও বন্দেগী করার প্রতি শোকদের আহবান জানাচ্ছিলেন তার মৌলিক সম্ভা ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোক প্রশ্ন করেছিল। এ ধরনের প্রশ্ন যখনই এসেছে তখনই তিনি জবাবে আল্লাহর হৃষ্টে শোকদেরকে এ সূরাটিই পড়ে শুনিয়েছেন। সর্বপ্রথম মকায় কুরাইশ বংশীয় মুশারিকরা তাঁকে এ প্রশ্ন করে। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এরপর মদীনা তাইহোবায় কথনো ইহুদী, কথনো খৃষ্টীয় আবাব কথনো আববের অন্যান্য শোকদেরও রসূলুল্লাহকে (সা) এই ধরনের প্রশ্ন করতে থাকে। প্রত্যেকবারই আল্লাহর পক্ষ থেকে ইশারা হয় জবাবে এ সূরাটি তাদের শুনিয়ে দেবার। ওপরে উল্লেখিত হাদীসগুলোর প্রত্যেকটিতে একথা বলা হয় যে, এর জবাবে এ সূরাটি নাযিল হয়। এর থেকে এ হাদীসগুলো পরম্পর বিরোধী একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আসলে হচ্ছে কোন বিষয় সম্পর্কে যদি পূর্ব থেকে অবতীর্ণ কোন আয়াত বা সূরা থাকতো তাহলে পরে রসূলুল্লাহর (সা) সামনে যখনই সেই একই বিষয় আবাব উথাপিত হতো তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে হিদায়াত আসতো, এর জবাব উমুক আয়াত বা সূরায় রয়েছে অথবা এর জবাবে শোকদেরকে উমুক আয়াত বা সূরা পড়ে শুনিয়ে দাও। হাদীসসমূহের রাবীগণ এ জিনিসটিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, যখন উমুক সমস্যা দেখা দেয় বা উমুক প্রশ্ন উথাপিত হয় তখন এ আয়াত বা সূরাটি নাযিল হয়। একে বারংবার অবতীর্ণ হওয়া অর্থাৎ একটি আয়াত বা সূরার বাববাব নাযিল হওয়াও বলা হয়।

কাজেই সঠিক কথা হচ্ছে, এ সূরাটি আসলে মক্কী। বরং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা করলে একে মকায় একেবারে প্রথম যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত করা যায়। আল্লাহর সম্ভা ও গুণাবলী সম্পর্কে কুরআনের কোন বিস্তারিত আয়াত তখনো পর্যন্ত নাযিল হয়নি। তখনো লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর দিকে দাওয়াতের বার্তা শুনে জানতে চাইতো : তাঁর এ রব কেমন, যাঁর ইবাদাত-বন্দেগী করার দিকে তাদেরকে আহবান জানানো হচ্ছে। এর একেবারে প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্তরভুক্ত হবার আর একটি প্রমাণ হচ্ছে, মকায় হয়রত বেলালকে (রা) তার প্রভু উমাইয়া ইবনে খালাফ যখন মরম্ভুমির উত্তপ্ত বালুকার ওপর চিৎ করে শুইয়ে তার বুকের ওপর একটা বড় পাথর ঢাপিয়ে দিতো তখন তিনি “আহাদ” আহাদ” বলে চিৎকার করতেন। এ আহাদ শব্দটি এ সূরা ইখলাস থেকেই গৃহীত হয়েছিল।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সম্পর্কিত যেসব হাদীস ওপরে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর ওপর এক নজর বুলালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন তখন দুনিয়ার মানুষের ধর্মীয় চিন্তা-তাবনা ও ধ্যান-ধারণা কি ছিল তা জানা যায়। মৃতি পৃজনী মুশারিকরা কাঠ, পাথর, সোনা, ঝর্পা ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের তৈরি খোদার কাঞ্চনিক মৃত্তিসমূহের পৃজা করতো। সেই মৃত্তিগুলোর আকার, আকৃতি ও

দেহাবয়ব ছিল। এ দেবদেবীদের রীতিমত বৎধারাও ছিল। কোন দেবী এমন ছিল না যার স্বামী ছিল না আবার কোন দেবতা এমন ছিল না যার স্ত্রী ছিল না। তাদের খাবার দাবারেরও প্রয়োজন দেখা দিতো। তাদের পূজারীরা তাদের জন্য এসবের ব্যবস্থা করতো। মুশরিকদের একটি বিরাট দল খোদার মানুষের রূপ ধারণ করে আত্মপকাশ করায় বিশ্বাস করতো এবং তারা মনে করতো কিছু মানুষ খোদার অবতার হয়ে থাকে। খৃষ্টানরা এক খোদায় বিশাসী হবার দাবীদার হলেও তাদের খোদার কমগুলে একটি পুত্র তো ছিলই এবং পিতা পুত্রের সাথে খোদায়ী সাম্ভাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে রূপল কুন্দসও (জিবীল) অংশীদার ছিলেন। এমন কি খোদার মা-ও ছিল এবং শাশুড়ীও। ইহদিনোও এক খোদাকে মেনে চলার দাবীদার ছিল কিন্তু তাদের খোদাও কস্তুসভা ও মরদেহ এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলীর উর্ধে ছিল না। তাদের এ খোদা টহুল দিতো, মানুষের আকার ধারণ করে আত্মপকাশ করতো। নিজের কোন বাস্তুর সাথে কৃশ্তিও লড়তো। তার একটি পুত্রণ (উয়াইর) ছিল। এ ধর্মীয় দলগুলো ছাড়া আরো ছিল মাজুসী—অগ্নি উপাসক ও সাবী—তারকা পূজারীর দল। এ অবস্থায় যখন লোকদেরকে এক ও লা-শরীক আল্লাহর আনুগত্য করার দাওয়াত দেয়া হয় তখন তাদের মনে এ প্রশ্ন জাগা নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যে, সেই রবটি কেমন, সমস্ত রব ও মাবুদদেরকে বাদ দিয়ে যাকে একমাত্র রব ও মাবুদ হিসেবে মেনে নেবার দাওয়াত দেয়া হচ্ছে? এটা কুরআনের অলৌকিক প্রকাশতঁগীরই কৃতিত্ব। এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মাত্র করেকটি শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করে কুরআন মূলত আল্লাহর অস্তিত্বের এমন সুস্পষ্ট ও ঘৃথহীন ধারণা পেশ করে দিয়েছে, যা সব ধরনের মুশরিকী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার মূলোৎপাটন করে এবং আল্লাহর সন্তান সাথে সৃষ্টির গুণাবলীর মধ্য থেকে কোন একটি গুণকেও সংযুক্ত করার কোন অবকাশই রাখেনি।

শ্রেষ্ঠত্ব ও শুরুত্ব

এ কারণে রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে এ সূরাটি ছিল বিপুল মহত্বের অধিকারী। বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদেরকে এ শুরুত্ব অনুভব করাতেন। তারা যাতে এ সূরাটি বেশী করে পড়ে এবং জনগণের মধ্যে একে বেশী করে ছাড়িয়ে দেয় এ জন্য ছিল তাঁর এ প্রচেষ্টা। কারণ এখানে ইসলামের প্রাথমিক ও মৌলিক আকীদাকে (তাওহীদ) এমন ছোট ছোট চারটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে, যা শুনার সাথে সাথেই মানুষের মনে গেঁথে যায় এবং তারা সহজেই মুখে মুখে সেগুলো আওড়াতে পারে। রসূলুল্লাহ (সা) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদ্ধতিতে লোকদের বলেছেন, এ সূরাটি কুরআনের এক-ত্রৈয়াঞ্চের সমান—এ যর্মে হাদীসের কিতাবগুলোতে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী, তিরমিয়ী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাই, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ, তাবারানী ইত্যাদি কিতাবগুলোতে বহু হাদীস আবু সাঈদ খুদরী, আবু হৱাইরা, আবু আইয়ুব আনসারী, আবুদদারদা, মু'আয ইবনে জাবাল, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, উবাই ইবনে কা'ব, কুলসুম বিনতে উকবাহ ইবনে আবী মু'আইত, ইবনে উমর, ইবনে মাস'উদ, কাতাদাহ ইবনুন নু'মান, আনাস ইবনে মালেক ও আবু মাস'উদ রাদিয়াল্লাহ আলহম থেকে বর্ণিত হয়েছে। মুফাসিসরগণ রসূলুল্লাহ সাল্লামের আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ উক্তির বহু

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। তবে আমাদের মতে সহজ, সরল ও পরিষ্কার কথা হচ্ছে, কুরআন মঙ্গীদ যে দীন ও জীবন ব্যবস্থা পেশ করে তার ভিত্তি রাখা হয়েছে তিনটি বুনিয়াদী আকীদার ওপর। এক, তাওহীদ। দুই, রিসালাত। তিনি, আখেরোত। এ সূরাটি যেহেতু নির্ভেজাল তাওহীদ তত্ত্ব বর্ণনা করেছে তাই রসূলুল্লাহ (সা) একে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান গণ্য করেছেন।

হযরত আয়েশার (রা) একটি রেওয়ায়াত বুখারী ও মুসলিম এবং হাদীসের অন্যান্য কিতাবগুলোতে উন্নত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক অভিযানে এক সাহারীকে সরদারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠান। তিনি সমগ্র সফরকালে অত্যেক নামাযে “কুল হওয়াল্লাহ আহাদ” পড়ে কিরাত শেষ করতেন। এটা যেন তার স্থায়ী রীতি হয়ে দাঙিয়েছিল ফিরে আসার পর তার সাথীরা রসূলুল্লাহ (সা) কাছে একথা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তাকে জিজেস করো, সে কেন এমনটি করেছিল? তাকে জিজেস করলে তিনি জবাব দেন : এতে রহমানের শুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে। তাই এর পাঠ আমার অত্যন্ত প্রিয়। রসূলুল্লাহ (সা) একথা শুনে লোকদের বলেন : أَخْبِرُوهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَحْبِبُ^۱ তাকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাকে তালোবাসেন।”

প্রায় এ একই ধরনের ঘটনা বুখারী শরাফে হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, জনৈক আনসুরী কুবার মুসজিদে নামায পড়তেন। তাঁর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যেক রাকআতে প্রথমে قُلْ مُوَالَلَّا أَحَدٌ^۲ পড়তেন। তারপর অন্য কোন সূরা পড়তেন। লোকেরা, এ ব্যাপারে আপত্তি উঠায়। তারা বলেন, তুমি এ ক্ষেমন কাজ করছো, প্রথমে قُلْ مُوَالَلَّا^۳ পড়ো তারপর তাকে যথেষ্ট মনে না করে আবার তার সাথে আর একটি সূরা পড়ো? এটা ঠিক নয়। শুধুমাত্র “কুল হওয়াল্লাহ” পড়ো অথবা একে বাদ দিয়ে অন্য একটি সূরা পড়ো। তিনি জবাব দেন, আমি এটা ছাড়তে পারবো না। তোমার চাইলে আমি তোমাদের নামায পড়াবো অথবা ইমামতি ছেড়ে দেবো। কিন্তু লোকেরা তাঁর জায়গায় আর কাউকে ইমাম বানানোও পছন্দ করতো না। অবশেষে ব্যাপারটি রসূলুল্লাহ (সা) সামনে আসে। তিনি তাকে জিজেস করেন, তোমার সাথীরা যা চায় তা করতে তোমার বাধা কোথায়? কোন জিনিসটি তোমাকে প্রত্যেক রাকআতে এ সূরাটি পড়তে উন্মত্ত করেছে? তিনি বলেন : এ সূরাটিকে আমি খুব তালোবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) জবাবে বলেন : حَبَكْ أَبِيَّا مَا أَذْخَلَ الْجَنَّةَ^۴ “এ সূরার প্রতি তোমার তালোবাসা তোমাকে জানাতে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে।”

আয়াত ৪

সূরা আল ইখলাস-মঙ্গী

১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَّهُ إِلَيْهِ كُفُواً أَحَدٌ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝

বলো,^১ তিনি আল্লাহ,^২ একক,^৩ আল্লাহ কারোর ওপর নির্ভরশীল নন এবং
সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল।^৪ তাঁর কোন স্তান নেই এবং তিনি কারোর স্তান
নন।^৫ এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।^৬

১. এখানে 'বলো' শব্দের মাধ্যমে প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামকে
সংবোধন করা হয়েছে। কারণ তাঁকেই প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনার রব কে? তিনি কেমন? আবার তাঁকেই হকুম দেয়া হয়েছিল, প্রয়ের জবাবে আপনি একথা বলুন। কিন্তু রসূলের (সা) তিরোধানের পর এ সংবোধনটি প্রত্যেক মু'মিনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায়। রসূলুল্লাহকে (সা) যে কথা বলার হকুম দেয়া হয়েছিল এখন সে কথা তাঁকেই বলতে হবে।

২. অর্থাৎ আমার যে রবের সাথে তোমরা পরিচিত হতে চাও তিনি আর কেউ নন, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের প্রথম জবাব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের সামনে আমি কোন নতুন রব নিয়ে আসিনি। অন্যসব মাবুদদের ইবাদাত ত্যাগ করে কোন নতুন মাবুদের ইবাদাত করতে আমি তোমাদের বলিনি। বরং আল্লাহ নামে যে স্তুতির সাথে তোমরা পরিচিত তিনি সেই স্তুতি। আরবদের জন্য 'আল্লাহ' শব্দটি কোন নতুন ও অপরিচিত শব্দ ছিল না। প্রাচীনতম কাল থেকে বিশ্ব-জাহানের স্তুতির প্রতিশব্দ হিসেবে তাঁরা আল্লাহ শব্দটি ব্যবহার করে আসছিল। নিজেদের অন্য কোন মাবুদ ও উপাস্য দেবতার সাথে এ শব্দটি সংশ্লিষ্ট করতো না। অন্য মাবুদদের জন্য তাঁরা "ইলাহ" শব্দ ব্যবহার করতো। তারপর আল্লাহ সম্পর্কে তাদের যে আকীদা ছিল তাঁর চমৎকার প্রকাশ ঘটেছিল আবরাহার মঙ্গা আকৃষণের সময়। সে সময় কাঁ'বাঘরে ৩৬০টি উপাস্যের মৃতি ছিল। কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য মুশরিকরা তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিল। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা ভালোভাবে জানতো, এ সংকটকালে আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্তুতি তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না। কাঁ'বাঘরকেও তাঁরা এসব ইলাহের সাথে সম্পর্কিত করে বায়তুল আ-লিহাহ (ইলাহ-এর বহুবচন) বলতো না বরং আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে একে বলতো বায়তুল্লাহ। আল্লাহ সম্পর্কে আরবের মুশরিকদের আকীদা কি ছিল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তা বলা হয়েছে। যেমন : সূরা

যুখরুফে বলা হয়েছে : “যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরে পয়দা করেছে, তাহলে তারা নিচয়ই বলবে আল্লাহ।” (৮৭ আয়াত)

সূরা অনকাবুতে বলা হয়েছে : “যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো, আকাশসমূহ ও যমীনকে কে পয়দা করেছে এবং চাঁদ ও সূর্যকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে, তাহলে নিচয়ই তারা বলবে আল্লাহ।.....আর যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলেন এবং কার সাহায্যে মৃত পতিত জমিকে সঙ্গীবতা দান করলেন, তাহলে তারা নিচয়ই বলবে আল্লাহ।” (৬১-৬৩ আয়াত)।

সূরা মু’মিনুনে বলা হয়েছে : “এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জানো, এ যমীন এবং এর সমস্ত জনবসতি কার? এরা অবশ্যি বলবে আল্লাহর।.....এদেরকে জিজ্ঞেস করো, সাত আকাশ ও মহাআরশের মালিক কে? এরা অবশ্যি বলবে, আপ্পাহ।..... এদেরকে জিজ্ঞেস করো, বলো যদি তোমরা জেনে থাকো প্রত্যেকটি জিনিসের উপর কার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত? আর কে আশয় দান করেন এবং কার মোকাবিলায় কেউ আশয় দিতে পারেন না? এরা নিচয়ই বলবে, এ ব্যাপারটি তো একমাত্র আল্লাহরই জন্য।” (৮৪-৮৯ আয়াত)

সূরা ইউনুসে বলা হয়েছে : “এদেরকে জিজ্ঞেস করো কে তোমাদের আকাশ ও যমীন থেকে রিয়িক দেন? তোমরা যে শ্রবণ ও দৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী হয়েছো এগুলো কার ইখতিয়ারালভূত? আর কে জীবিতকে মৃত থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? এবং কে এ বিশ্ববস্থাপনা চালাচ্ছেন? এরা নিচয়ই বলবে, আল্লাহ।” (৩১ আয়াত)।

অনুরূপভাবে সূরা ইউনুসের আর এক জায়গায় বলা হয়েছে : “যখন তোমরা জাহাজে আরোহণ করে অনুকূল বাতাসে আনন্দ চিন্তে সফর করতে থাকো আর তারপর হঠাৎ প্রতিকূল বাতাসের বেগ বেড়ে যায়, চারদিক থেকে তরঙ্গ আঘাত করতে থাকে এবং মুসাফিররা মনে করতে থাকে, তারা চারদিক থেকে ঝনঝা পরিবৃত হয়ে পড়েছে, তখন সবাই নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে নিয়ে তাঁরই কাছে দোয়া করতে থাকো এই বলে : “হে আল্লাহ যদি তুমি আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো তাহলে আমরা কৃতজ্ঞ বাস্তায় পরিণত হবো। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে বাঁচিয়ে দেন তখন এই লোকেরাই সত্যচূর্ণ হয়ে পৃথিবীতে বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে লিঙ্গ হয়ে পড়ে।”

সূরা বনী ইসরাইলে একখাট্টাই পুনরাবৃত্তি এভাবে করা হয়েছে : “যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে তখন সেই একজন ছাড়া আর যাদেরকে তোমরা ডাকতে তারা সবাই হারিয়ে যায়। কিন্তু যখন তিনি তোমাদের বাঁচিয়ে স্লতাগে পৌছিয়ে দেন তখন তোমরা তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।” (৬৭ আয়াত)।

এ আয়াতগুলো সামনে রেখে চিন্তা করুন, লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার সেই রব কে এবং কেমন, যার ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য আপনি আমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন? তিনি এর জবাবে বললেন : **هُوَ اللّٰهُ** তিনি আল্লাহ। এ জবাব থেকে আপনা আপনি এ অর্থ বের হয়, যাকে তোমরা নিজেরাই নিজেদের ও সারা বিশ্ব-জাহানের স্থষ্টা, প্রতু, আহারদাতা, পরিচালক ও ব্যবস্থাপক বলে মানো এবং কঠিন সংকটময় মুহূর্তে অন্য সব মাবুদদের পরিত্যাগ করে একমাত্র তাঁর কাছেই সাহায্য করার

আবেদন জ্ঞানও, তিনিই আমার রব এবং তাঁরই ইবাদাত করার দিকে আমি তোমাদের আহবান জ্ঞানাচ্ছি। এ জবাবের মধ্যে আল্লাহর সমস্ত পূর্ণাংশ শৃণাবলী আপনা আপনি এসে পড়ে। কারণ যিনি এ বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা, যিনি এর বিভিন্ন বিষয়ের পরিচালনা ও ব্যবস্থাগ্রন্থ করেন, যিনি এর মধ্যে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীর আহার যোগান এবং বিপদের সময় নিজের বাসাদের সাহায্য করেন তিনি জীবিত নন, শুনতে ও দেখতে পান না, স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নন, সর্বজ্ঞ ও সর্বজ্ঞানী নন, কর্মাণাময় ও মেহশীল নন এবং সবার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারী নন, একথা আদতে কম্বনাই করা যায় না।

৩. ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে উলামায়ে কেরাম **مُوَالِلْهُ أَحَدُ** বাক্যটির বিভিন্ন বিশ্লেষণ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের মতে যে বিশ্লেষণটি এখানকার সাথে পুরোপুরি খাপ খায় সেটি হচ্ছে : **مُوَالِلْhُ أَحَدُ** উদ্দেশ্য (Subject) **أَلٰ** তার বিধেয় (Predicate) এবং **أَحَدٌ** তার দ্বিতীয় বিধেয়। এ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে, তিনি (যৌর সম্পর্কে তোমরা প্রশ্ন করছো) আল্লাহ, একক। অন্য অর্থ এও হতে পারে এবং ভাষারীতির দিক দিয়ে এটা ভুলও নয় যে, তিনি আল্লাহ এক।

এখানে সর্প্রথম একথাটি বুঝে নিতে হবে যে, এ বাক্যটিতে মহান আল্লাহর জন্য “আহাদ” শব্দটি যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা আরবী ভাষায় এ শব্দটির একটি অর্থাত্তাবিক ব্যবহার। সাধারণত অন্য একটি শব্দের সাথে সংযোগের ভিত্তিতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন : **يَوْمَ أَحَدٍ** “সন্ধাহের প্রথম দিন।” অনুরূপভাবে “তোমাদের কোন একজনকে পাঠাও।” অথবা সাধারণ নেতৃত্বাচক অর্থে এর ব্যবহার হয়। যেমন : **مَاجَاءَنِي أَحَدٌ** “আমার কাছে কেউ আসেনি।” কিংবা ব্যাপকতার ধারণাসহ প্রশ্ন সূচক বাক্যে বলা হয়। যেমন : **مَلِّ عَنْدَكَ أَحَدٌ** “তোমার কাছে কি কেউ আছে?” অথবা **إِنْ** ব্যাপকতার ধারণাসহ শর্ত প্রকাশক বাক্যে এর ব্যবহার হয় যেমন : **إِنْ حَمَّاًكَ أَحَدٌ** “যদি তোমার কাছে কেউ এসে থাকে।” অথবা গণনায় বলা হয়। যেমন : **أَحَدٌ، أَثْنَانٌ، أَحَدُ عَشْرَ** “এক, দুই, এগার।” এ সীমিত ব্যবহারগুলো ছাড়া কুরআন নাযিলের পূর্বে আরবী ভাষায় **أَحَدٌ** (আহাদ) শব্দটির শুণবাচক অর্থে ব্যবহার অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা জিনিসের শুণ প্রকাশ অর্থে “আহাদ” শব্দের ব্যবহারের কোন নজির নেই। আর কুরআন নাযিলের পর এ শব্দটি শুধুমাত্র আল্লাহর স্বার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থাত্তাবিক বর্ণনা পদ্ধতি স্বতন্ত্রভাবে একথা প্রকাশ করে যে, একক ও অদ্বিতীয় হওয়া আল্লাহর বিশেষ শুণ। বিশ্ব-জাহানের কোন কিছুই এ শুণে গুণাবিত নয়। তিনি এক ও একক, তাঁর কোন দ্বিতীয় নেই।

তারপর মুশরিক ও কুরাইশুরা রস্তাত্ত্বাত্ত্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রব সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন করেছিল সেগুলো সামনে রেখে দেখুন, **مُوَالِلْhُ أَحَدُ** বলার পর :

প্রথমত, এর মানে হচ্ছে, তিনি একাই রব। তাঁর ‘রববিয়াতে’ কারো কোন অংশ নেই। আর যেহেতু ইলাহ (মাবুদ) একমাত্র তিনিই হতে পারেন যিনি রব (মালিক ও প্রতিপালক) হন, তাই ‘উলুহীয়াতে’ও (মাবুদ হবার শুণাবলী) কেউ তাঁর সাথে শরীক নেই।

ঢিতীয়ত, এর মানে এও হয় যে, তিনি একাই এ বিশ্ব-জ্ঞানের সুষ্ঠা। এ সৃষ্টিকর্মে কেউ তাঁর সাথে শরীক নয়। তিনি একাই সমগ্র বিশ্ব-রাজ্যের মালিক ও একচ্ছত্র অধিপতি। তিনি একাই বিশ্ব-ব্যবহার পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। নিজের সমগ্র সৃষ্টিজগতের নিয়িক তিনি একাই দান করেন। সংকটকালে তিনি একাই তাদের সাহায্য করেন ও ফরিয়াদ শোনেন। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের এসব কাজকে তোমরা নিজেরাও আল্লাহর কাজ বলে মনে করো, এসব কাজে আর কারো সামান্যতম কোন অংশও নেই।

তৃতীয়ত, তারা একথাও জিজেস করেছিল, তিনি কিসের তৈরি? তাঁর বংশধারা কি? তিনি কোন প্রজাতির অন্তরভুক্ত? দুনিয়ার উত্তরাধিকার তিনি কার কাছ থেকে পেয়েছেন? এবং তাঁর পর কে এর উত্তরাধিকারী হবে? আল্লাহ তাদের এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব একটিমাত্র “আহাদ” শব্দের মাধ্যমে দিয়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে : (১) তিনি এক আল্লাহ চিরকাল আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর আগে কেউ আল্লাহ ছিল না এবং তাঁর পরেও কেউ আল্লাহ হবে না। (২) আল্লাহর এমন কোন প্রজাতি নেই, যার সদস্য তিনি হতে পারেন। বরং তিনি একাই আল্লাহ এবং তাঁর সমগ্রগোত্তীয় ও সমজাতীয় কেউ নেই। (৩) তাঁর সত্তা নিছক এক নয় বরং **واحد** একক, যেখানে কোন দিক দিয়ে একাধিকের সামান্যতম স্পর্শও নেই। তিনি বিভিন্ন উপাসনে গঠিত কোন সত্তা নন। তাঁর সত্তাকে বিখ্যিত করা যেতে পারে না। তার কোন আকার ও রূপ নেই। তা কোন স্থানের গভীতে আবদ্ধ নয় এবং তার মধ্যে কোন জিনিস আবদ্ধ হতে পারে না। তাঁর কোন বর্ণ নেই। কোন অংগ-প্রত্যঙ্গ নেই। কোন দিক নেই। তাঁর মধ্যে কোন প্রকার পদ্ধতি-বিপর্তন-বিপর্তন ঘটে না। সকল প্রকার ধরন ও প্রকরণ মূজ্ঞ ও বিবর্জিত তিনি একমাত্র সত্তা, যা সবদিক দিয়েই আহাদ বা একক। (এ পর্যায়ে একথাটি ভালোভাবে জেনে নিতে হবে যে, আরবী ভাষায় “ওয়াহেদ” শব্দটিকে ঠিক তেমনিভাবে ব্যবহার করা হয় যেমনভাবে আমাদের ভাষায় আমরা “এক” শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকি। বিপুর সংখ্যা সংশ্লিষ্ট কোন সমষ্টিকেও তার সামগ্রিক সত্তাকে সামনে রেখে “ওয়াহেদ” বা “এক” বলা হয়। যেমন এক ব্যক্তি, এক জাতি, এক দেশ, এক পৃথিবী, এমন কি এক বিশ্ব-জ্ঞানও। আবার কোন সমষ্টির প্রত্যেক অংশকেও আলাদা আলাদাভাবেও “এক”-ই বলা হয়। কিন্তু “আহাদ” বা একক শব্দটি আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না। এ জন্য কুরআন মজীদে যেখানেই আল্লাহর জন্য ওয়াহেদ (এক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে : “ইলাহ ওয়াহেদ” এক মাবুদ বা “আল্লাহল ওয়াহেদুল কাহুরাম”—এক আল্লাহই সবাইকে বিজিত ও পদানত করে রাখেন। কোথাও নিছক “ওয়াহেদ” বলা হয়নি। কারণ যেসব জিনিসের মধ্যে বিপুর ও বিশাল সমষ্টি রয়েছে তাদের জন্যও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বিপরীত পক্ষে আহাদ শব্দটি একমাত্র আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ আল্লাহই একমাত্র সত্তা ও অস্তিত্ব যার মধ্যে কোন প্রকার একাধিক্য নেই। তাঁর একক সত্তা সবদিক দিয়েই পূর্ণাংগ।

৪. মূলে “সামাদ” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে **ص** **م** **خ** ধাতু থেকে। আরবী ভাষায় এ ধাতুটি থেকে যতগুলো শব্দের উৎপত্তি হয়েছে সেগুলোর ওপর নজর বুলালে এ শব্দটির অর্থের ব্যাপকতা জানা যায়। যেমন : **الصلمد** মনস্ত করা, ইচ্ছা করা। বিপুরায়তন বিশিষ্ট উন্নত স্থান এবং বিপুর ঘনত্ব বিশিষ্ট উন্নত মর্যাদা। উক-

সমতল ছাদ। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত ও পিপসার্ত হয় না। প্রয়োজনের সময় যে সরদারের শরণাপন হতে হয়।

الصَّمْدُ : প্রত্যেক জিনিসের উচু অংশ। যে ব্যক্তির ওপরে আর কেউ নেই। যে নেতার আনুগত্য করা হয় এবং তার সাহায্য ছাড়া কোন বিষয়ের ফায়সালা করা হয় না। অভাবীরা যে নেতৃত্ব শরণাপন হয়। চিরস্তন। উরত মর্যাদা। এমন নিবিড় ও নিষ্ঠ যার মধ্যে কোন ছিদ্র, শূন্যতা ও ফাঁকা অংশ নেই, যেখান থেকে কোন জিনিস বের হতে পারে না এবং কোন জিনিস যার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। যুদ্ধে যে ব্যক্তি ক্ষুধা-তৃষ্ণার শিকার হয় না।

الْمُصْمَدُ : জমাট জিনিস, যার পেট নেই।

الْمُصْمَدُ : যে লক্ষ্মের দিকে যেতে মনস্ত করা হয়; যে কঠিন জিনিসের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই।

بِيَتْمَصْمَدٌ : এমন গৃহ, প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য যার আশ্রয় নিতে হয়।

بِنَاءً مَصْمَدٌ : উচু ইমারত।

صَمْدَهُ وَصَمْدَ الْيَهْ صَمْدًا : এই লোকটির দিকে যাওয়ার সংকল্প করলো।

أَصْمَدَ الْيَهْ الْأَمْرَ : ব্যাপারটি তার হাতে সোপদ করলো; তার সামনে ব্যাপারটি পেশ করলো; বিষয়টি সম্পর্কে তার ওপর আস্তা স্থাপন করলো। (সিহাহ, কামুস ও লিসানুল আরব)

এসব শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে “আল্লাহস সামাদ” আয়াতিটিতে উল্লেখিত “সামাদ” শব্দের যে ব্যাখ্যা সাহাবা, তাবেঈ ও পরবর্তীকান্দের আলেমগণ থেকে উদ্ভৃত হয়েছে নিচে আমরা তা উল্লেখ করছি :

হযরত আলী (রা), ইকরামা ও কা'ব আহবার বলেছেন : সামাদ হচ্ছেন এমন এক সম্ভা যীর ওপরে আর কেউ নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) ও আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনে সালামাহ বলেছেন : তিনি এমন সরদার, নেতা ও সমাজপতি, যীর নেতৃত্ব পূর্ণতা লাভ করেছে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে।

এ প্রসংগে ইবনে আবাসের দ্বিতীয় উক্তি হচ্ছে : লোকেরা কোন বিপদে-আপদে যার দিকে সাহায্য লাভের জন্য এগিয়ে যায়, তিনি সামাদ। তাঁর আর একটি উক্তি হচ্ছে : যে সরদার তার নেতৃত্ব, মর্যাদা, প্রেষ্ঠত্ব, ধৈর্য, সংযম, জ্ঞান, বৃদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণাতায় পূর্ণতার অধিকারী তিনি সামাদ।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন : যিনি কারো ওপর নির্ভরশীল নন, সবাই তাঁর ওপর নির্ভরশীল, তিনিই সামাদ।

ইকরামার আর একটি বক্তব্য হচ্ছে : যার মধ্য থেকে কোন জিনিস কোনদিন বের হয়নি এবং বের হয়ও না আর যে পানাহার করে না, সে-ই সামাদ। এরই স্মার্থবোধক উক্তি সাবী ও মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল কুরায়ী থেকেও উদ্ভৃত হয়েছে।

সুন্দী বলেছেন : আকাখিত বস্তু লাভ করার জন্য লোকেরা যার কাছে যায় এবং বিপদে সাহায্য লাভের আশায় যার দিকে হাত বাড়ায়, তাকেই সামাদ বলে।

সাইদ ইবনে জুবাইর বলেছেন : যে নিজের সকল শুণ ও কাঞ্জে পূর্ণতার অধিকারী হয়।

রাবী ইবনে আনাস বলেছেন : যার উপর কখনো বিপদ-আপদ আসে না।

মুকাতেল ইবনে হাইয়ান বলেছেন : যিনি সকল প্রকার দোষ-ক্ষম্টি মুক্ত।

ইবনে কাইসান বলেছেন : অন্য কেউ যার গুণাবলীর ধারক হয় না।

হাসান বসরী ও কাতাদাহ বলেছেন : যে বিদ্যমান থাকে এবং যার বিনাশ নেই। প্রায় এই একই ধরনের উক্তি করেছেন মুজাহিদ, মা'মার ও মুররাতুল হামদানী।

মুররাতুল হামদানীর আর একটি উক্ত হচ্ছে : যে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং যা ইচ্ছা তাই করে; যার হকুম ও ফায়সালা পূর্বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো থাকে না।

ইবরাহীম নাখরী বলেছেন : যার দিকে লোকেরা নিজেদের প্রয়োজন প্ররূপের জন্য এগিয়ে যায়।

আবু বকর আমবায়ী বলেছেন : সামাদ এমন এক সরদারকে বলা হয়, যার উপরে আর কোন সরদার নেই এবং লোকেরা নিজেদের বিভিন্ন বিষয়ে ও নিজেদের প্রয়োজন প্ররূপের জন্য যার শরণাপন হয়, অভিধানবিদদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই। আয় যুজাজের বক্তব্য প্রায় এর কাছাকাছি। তিনি বলেছেন : যার উপর এসে নেতৃত্ব ব্যবহার করার জন্য প্রত্যেকে যার শরণাপন হয়, তাকেই বলা হয় সামাদ।

এখন চিন্তা করুন, প্রথম বাক্যে “আল্লাহ আহাদ” কেন বলা হয়েছে এবং এ বাক্যে “আল্লাহস সামাদ” বলা হয়েছে কেন? “আহাদ” শব্দটি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলেছি, তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট—আর কারো জন্য এ শব্দটি আদৌ ব্যবহৃত হয় না। তাই এখানে “আহাদুন” শব্দটি অনিদিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে “সামাদ” শব্দটি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তাই “আল্লাহ সামাদুন” না বলে “আল্লাহস সামাদ” বলা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, আসল ও প্রকৃত সামাদ হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। সৃষ্টি যদি কোন দিক দিয়ে সামাদ হয়ে থাকে তাহলে অন্য দিক দিয়ে তা সামাদ নয়। কারণ তা অবিনশ্বর নয়—একদিন তার বিনাশ হবে। তাকে বিশ্বেষণ ও বিভক্ত করা যায়। তা বিভিন্ন উপাদান সহযোগে গঠিত। যে কোন সময় তার উপাদানগুলো আলাদা হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কোন কোন সৃষ্টি তার মুখাপেক্ষী হলেও সে নিজেও আবার কারো মুখাপেক্ষী। তার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব আপেক্ষিক, নিরকৃশ নয়। কারো তুলনায় সে শ্রেষ্ঠতম হলেও তার তুলনায় আবার অন্য কেউ আছে শ্রেষ্ঠতম। কিছু সৃষ্টির কিছু প্রয়োজন সে পূর্ণ করতে পারে, কিন্তু সবার সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। বিপরীত পক্ষে আল্লাহর সামাদ হবার গুণ অর্থাৎ তাঁর মুখাপেক্ষীহীনতার গুণ সবদিক দিয়েই পরিপূর্ণ। সারা দুনিয়া তাঁর মুখাপেক্ষী তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার প্রত্যেকটি

জিনিস নিজের অস্তিত্ব, স্থায়ীত্ব এবং প্রয়োজন ও অভাব পূরণের জন্য সচেতন ও অবচেতনতারে তারই শরণাপন হয়। তিনিই তাদের সবার প্রয়োজন পূর্ণ করেন। তিনি অমর, অজয়, অক্ষয়। তিনি রিয়িক দেন—নেন না। তিনি একক—যৌগিক ও মিশ্র নন। কাজেই বিভক্তি ও বিশ্লেষণযোগ্য নন। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের উপর তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত। তিনি সর্বশেষ। তাই তিনি নিছক “সামাদ” নন, বরং “আসসামাদ।” অর্থাৎ তিনিই একমাত্র সন্তা যিনি মূলত সামাদ তথা অমুখাপেক্ষিতার উণ্ডাবলীর সাথে পুরোপুরি সংযুক্ত।

আবার যেহেতু তিনি “আসসামাদ” তাই তাঁর একাকী ও স্বজনবিহীন হওয়া অপরিহার্য। কারণ এ ধরনের সন্তা একজনই হতে পারেন, যিনি কারো কাছে নিজের অভাব পূরণের জন্য হাত পাতেন না, বরং সবাই নিজেদের অভাব পূরণের জন্য তাঁর মুখাপেক্ষী হয়। দুই বা তার চেয়ে বেশী সন্তা সবার প্রতি অমুখাপেক্ষী ও অনিভুলশীল এবং সবার প্রয়োজন পূরণকারী হতে পারে না। তাছাড়া তাঁর “আসসামাদ” হবার কারণে তাঁর একক মাঝুদ হবার ব্যাপারটিও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ মানুষ যার মুখাপেক্ষী হয় তারই ইবাদাত করে। আবার তিনি ছাড়া আর কোন মাঝুদ নেই, “আসসামাদ” হবার কারণে এটাও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, যে প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা ও সামর্থ্য রাখে না, কোন সচেতন ব্যক্তি তাঁর ইবাদাত করতে পারে না।

৫. মুশারিকরা প্রতি যুগে খোদায়ীর এ ধারণা পোষণ করে এসেছে যে, মানুষের মতো খোদাদেরও একটি জাতি বা শ্রেণী আছে। তাঁর সদস্য সংখ্যাও অনেক। তাদের মধ্যে বিয়ে-শাদী এবং বৎস বিস্তারের কাজও চলে। তাঁরা আল্লাহ রাবুল আলামীনকেও এ জাহেলী ধারণা মুক্ত রাখেনি। তাঁর জন্য সন্তান সন্তানিতি ও ঠিক করে নিয়েছে। তাই কুরআন মজীদে আরববাসীদের আকীদা বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে, তাঁরা ফেরেশতাদেরকে মহান আল্লাহর কন্যা গণ্য করতো। তাদের জাহেলী চিন্তা নবীগণের উস্মাতদেরকেও সত্ত্বাক্ষিত রাখেনি। তাদের মধ্যেও নিজেদের সৎ ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করার আকীদা জন্য নেয়। এ বিভিন্ন ধরনের কাঞ্চনিক চিন্তা-বিশ্বাসের মধ্যে দুই ধরনের চিন্তা সবসময় মিশ্রিত হতে থেকেছে। কিছু লোক মনে করেছে, যাদেরকে তাঁরা আল্লাহর সন্তান গণ্য করছে তাঁরা সেই মহান পবিত্র সন্তান উরসজাত সন্তান। আবার কেউ কেউ দাবী করেছে, যাকে তাঁরা আল্লাহর সন্তান বলছে, আল্লাহ তাকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছেন। যদিও তাদের কেউ কাউকে (মাআ’যাল্লাহ) আল্লাহর পিতা গণ্য করার সাহস করেনি। কিন্তু যখন কোন সন্তা সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, তিনি সন্তান উৎপাদন ও বৎস বিস্তারের দায়িত্বমুক্ত নন এবং তাঁর সম্পর্কে ধারণা করা হয়, তিনি মানুষ জাতীয় এক ধরনের অস্তিত্ব, তাঁর উরসে সন্তান জন্মান্ত করে এবং অপুত্রক হলে তাঁর কাউকে পালক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন মানুষের মন তাঁকেও কারো সন্তান মনে করার ধারণা মুক্ত থাকতে পারে না। এ কারণে রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁর মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল, আল্লাহর বৎসধারা কি? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল, কার কাছে থেকে তিনি দুনিয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেছেন এবং তাঁর পরে এর উত্তরাধিকারী হবে কে?

এসব জাহেলী মূর্খতা প্রসূত ধারণা-কল্পনা বিশ্বেগ করলে দেখা যায়, এগুলোকে যদি নীতিগতভাবে মেনে নিতে হয়, তাহলে আরো কিছু জিনিসকেও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। যেমন :

এক : আল্লাহর এক নয়, বরং আল্লাহর কোন একটি জাতি ও গোষ্ঠী আছে। তাদের সদস্যরা আল্লাহর শুণাবলী, কার্যকলাপ ও কর্তৃত-ক্ষমতায় তাঁর সাথে শরীক। আল্লাহর কেবলমাত্র উরসজ্ঞাত সন্তান ধারণা করে নিলে এ বিষয়টি অপরিহার্য হয় না, বরং কাউকে পালকপুত্র হিসেবে ধারণা করে নিলেও এটি অপরিহার্য হয়। কেননা কারো পালকপুত্র অবশ্যি তারই সমজাতীয় ও সমগ্রোত্তীয় হতে পারে। আর (মা'আল্লাহ) যখন সে আল্লাহর সমজাতীয় ও সমগ্রোত্তীয় হয়, তখনই সে আল্লাহর শুণাবলী সম্পর্কে হবে, একথা অঙ্গীকার করা যেতে পারে না।

দুই : পুরুষ ও নারীর মিলন ছাড়া কোন সন্তানের ধারণা ও কল্পনা করা যেতে পারে না। বাপ ও মায়ের শরীর থেকে কোন জিনিস বের হয়ে সন্তানের রূপ লাভ করে—সন্তান বলতে একথাই বুঝায়। কাজেই এ ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তান ধারণা করার ফলে (নাউয়ুবিল্লাহ) তাঁর একটি বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব, তাঁর সমজাতীয় কোন স্তৰীর অস্তিত্ব এবং তাঁর শরীর থেকে কোন বস্তু বের হওয়াও অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তিনি : সন্তান উৎপাদন ও বংশধারা চালাবার কথা যেখানে আসে সেখানে এর মূল কারণ হয় এই যে, ব্যক্তিকা হয় মরণশীল এবং তাদের জাতির ও গোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের সন্তান উৎপাদন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ, এ সন্তানদের সাহায্যেই তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কাজেই আল্লাহর সন্তান আছে বলে মনে করলে (নাউয়ুবিল্লাহ) তিনি নিজে যে মরণশীল এবং তাঁর বংশ ও তাঁর নিজের সন্তা কোনটিই চিরতন নয় একথা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া সমস্ত মরণশীল ব্যক্তির মতো (নাউয়ুবিল্লাহ) আল্লাহরও কোন শরুক ও শেষ আছে, একথাও মেনে নেয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের ওপর যেসব জাতি ও গোত্র নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাদের ব্যক্তিবর্গ অনাদি-অনন্তকালীন জীবনের অধিকারী হয় না।

চার : কারো পালকপুত্র বলবার উদ্দেশ্য এ হয় যে, একজন সন্তানহীন ব্যক্তি তাঁর নিজের জীবনে কারো সাহায্যের এবং নিজের মৃত্যুর পর কোন উত্তরাধিকারের প্রয়োজন বোধ করে। কাজেই আল্লাহ কাউকে নিজের পুত্র বানিয়েছেন একথা মনে করা হলে সেই পুরিত্র সন্তার সাথে এমন সব দুর্বলতা সংশ্লিষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেগুলো মরণশীল শান্ত্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

যদিও মহান আল্লাহকে “আহাদ” ও “আসসামাদ” বললে এসব উদ্ভুট ধারণা-কল্পনার মূলে কুঠারঘাত করা হয়, তবুও এরপর “না তাঁর কোন সন্তান আছে, না তিনি কারো সন্তান”—একথা বলায় এ ব্যাপারে আর কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশই থাকে না। তারপর যেহেতু আল্লাহর মহান সন্তা সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা-কল্পনা শিরকের সর্বাধিক শুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত, তাই মহান আল্লাহ শুধুমাত্র সূরা ইখলাসেই এগুলোর ঘৰ্থহীন ও ছড়ান্ত প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বিভিন্ন জায়গায় এ

বিষয়টিকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে লোকেরা সত্যকে পুরোপুরি বুঝতে সক্ষম হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নীচের আয়াতগুলো পর্যালোচনা করা যেতে পারে :

إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - النساء : ١٧١

“আল্লাহ-ই হচ্ছে একমাত্র ইলাহ। কেউ তাঁর পুত্র হবে, এ অবস্থা থেকে তিনি মুক্ত-পাক-পবিত্র। যা কিছু আকাশসমূহের মধ্যে এবং যা কিছু যমীনের মধ্যে আছে, সবই তাঁর মালিকানাধীন।” (আন নিসা, ১৭১)

أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ « وَلَدَ اللَّهُ » وَإِنَّهُمْ لَكُذَّابُونَ

“জেনে রাখো, এরা যে বলছে আল্লাহর সত্তান আছে, এটা এদের নিজেদের মনগড়া কথা। আসলে এটি একটি ডাহা মিথ্যা কথা।” (আস সাফ্ফাত, ১৫১-১৫২)

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسَبًا ، وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةَ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

“তারা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের মধ্যে বংশীয় সম্পর্ক তৈরি করে নিয়েছে অথচ ফেরেশতারা তালো করেই জানে এরা (অপরাধী হিসেবে) উপস্থাপিত হবে।”

(আস সাফ্ফাত, ১৫৮)

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِمْ جُزُءًا ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

“লোকেরা তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কাউকে তাঁর অশ বানিয়ে ফেলেছে। আসলে মানুষ স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।” (আয় যুখরুফ, ১৫)

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَثَتْ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ ، بِدِينِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ - الانعام : ١٠٠ - ١٠١

“আর লোকেরা জিনদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়েছে। অথচ তিনি তাদের মষ্ট। আর তারা না জেনে-বুঝে তাঁর জন্য পুত্র-কন্যা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ তারা যে সমস্ত কথা বলে তা থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র এবং তার উর্ধে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি তো আকাশসমূহ ও পথবীর নির্মাতা। তাঁর পুত্র কেমন করে হতে পারে যখন তাঁর কোন সঙ্গনী নেই? তিনি প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন।” (আল আনআম, ১০০-১০১)

وَقَالُوا أَتَخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ ، بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

“আর তারা বললো, দয়াময় আল্লাহ কাউকে পুত্র বানিয়েছেন। তিনি পাক-পবিত্র। বরং (যাদেরকে এরা তাঁর সত্তান বলছে) তারা এমন সব বান্দা যাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে।” (আল আবিয়া, ২৬)

قَالُوا أَتَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

“লোকেরা বলে দিয়েছে, আল্লাহর কাউকে পুত্র বানিয়েছেন আল্লাহ পাক-পবিত্র। তিনি তো অমৃতাপেক্ষ। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর শান্তিকানাধীন। এ বক্তব্যের সপক্ষে তোমাদের প্রমাণ কি? তোমরা কি আল্লাহর সম্পর্কে এমন সব কথা বলছো, যা তোমরা জানো না?” (ইউনুস, ৬৮)

وَقُلِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخَذِ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلُّ -

“আর হে নবী! বলে দাও, সেই আল্লাহর জন্য সব প্রশংসা যিনি না কাউকে পুত্র বানিয়েছেন, না বাদশাহীতে কেউ তাঁর শরীক আর না তিনি অঙ্গম, যার ফলে কেউ হবে তাঁর পৃষ্ঠপোষক।” (বনী ইসরাইল, ১১১)

مَا أَتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ -

“আল্লাহ কাউকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে দ্বিতীয় কোন ইলাহও নেই।” (আল মু’মিনুন, ১১)

যারা আল্লাহর জন্য উরসজাত সন্তান অথবা পালকপুত্র গ্রহণ করার কথা বলে, এ আয়াতগুলোতে সর্বতোভাবে তাদের এহেন আকীদা-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করা হয়েছে। এ আয়াতগুলো এবং এ বিষয়বস্তু সংশ্লিত অন্য যে সমস্ত আয়াত কুরআনের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়, সেগুলো সূরা ইখলাসের অতি চমৎকার ব্যাখ্যা।

৬. মূলে বলা হয়েছে কৃষ্ণ (ক্ফু) এর মানে হচ্ছে, নজীর, সদৃশ, সমান, সমর্যাদা সম্পর্ক ও সমতুল্য। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের দেশে কৃষ্ণ শব্দের ব্যবহার আছে। এ ক্ষেত্রে এর অর্থ হয়, সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছেলের ও মেয়ের সমান পর্যায়ে অবস্থান করা। কাজেই এখানে এ আয়াতের মানে হচ্ছে : সারা বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর সমকক্ষ অথবা তাঁর সমর্যাদা সম্পর্ক কিংবা নিজের গুণাবলী, কর্ম ও ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁর সমান পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এমন কেউ কোন দিন ছিল না এবং কোন দিন হতেও পারবে না।

মু'আওবিয়াতাইন

(আল ফালাক ও আন নাস)

১১৩, ১১৪

নামকরণ

কুরআন মজীদের এ শেষ সূরা দু'টি আলাদা আলাদা সূরা ঠিকই এবং মূল লিপিতে এ সূরা দু'টি তিনি তিনি নামেই লিখিত হয়েছে, কিন্তু এদের পারস্পরিক সম্পর্ক এত গভীর এবং উভয়ের বিষয়বস্তু পরস্পরের সাথে এত বেশী নিকট সম্পর্ক রাখে যার ফলে এদের একটি যুক্ত নাম “মু'আওবিয়াতাইন” (আল্লাহর কাছে আশয় চাওয়ার দু'টি সূরা) রাখা হয়েছে। ইমাম বায়হাকী তাঁর “দালায়েল নবুওয়াত” বইতে লিখেছেন : এ সূরা দু'টি নাযিলও হয়েছে একই সাথে। তাই উভয়ের যুক্তনাম রাখা হয়েছে “মু'আওবিয়াতাইন”। আমরা এখানে উভয়ের জন্য একটি সাধারণ ভূমিকা লিখছি। কারণ, এদের উভয়ের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী ও বক্তব্য সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভূক্ত। তবে ভূমিকায় একত্র করার পর সামনের দিকে প্রত্যেকের আলাদা ব্যাখ্যা করা হবে।

নাযিলের সময়-কাল

হ্যরত হাসান বসরী, ইকরামা, আতা ও জাবের ইবনে যায়েদ বলেন, এ সূরা দু'টি যক্ষী। হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্রাস (রা) থেকেও এ ধরনের একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য একটি বর্ণনায় একে মাদানী বলা হয়েছে। আর হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা) ও কাতাদাহও একই উক্তি করেছেন। যে সমস্ত হাদীস এ হিতীয় বক্তব্যটিকে শক্তিশালী করে তার মধ্যে মুসলিম, তিরমিয়ী, নাসাই ও মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাবলে হ্যরত উকবা ইবনে আমের (রা) বর্ণিত একটি হাদীস হচ্ছে : একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আযাকে বলেন :

اَلْمَرَأَيَاتِ اِنْزَلْتِ اللَّيْلَةَ ، لَمْ يُرْمِلْهُنَّ ، اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ، اَعُوذُ بِرَبِّ
النَّاسِ -

“তোমরা কি কোন খবর রাখো, আজ রাতে আমার ওপর কেমন ধরনের আয়াত নাযিল হয়েছে? নজীরবিহীন আয়াত! কুল আউয়ু বিরাবিল ফালাক এবং কুল আউয়ু বিরাবিল নাস!”

হ্যরত উকবা ইবনে আমের (রা) হিজরাতের পরে মদীনা তাইয়েবায় ইসলাম গ্রহণ করেন বলেই এ হাদীসের ভিত্তিতে এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলার যৌক্তিকতা দেখা দেয়। আবু দাউদ ও নাসাই তাদের বর্ণনায় একথাই বিবৃত করেছেন। অন্য যে রেওয়ায়েতগুলো এ

বক্তব্যকে শক্তিশালী করেছে সেগুলো ইবনে সাদ, মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী, ইমাম নাসাই, ইমাম বায়হাকী, হাফেয় ইবনে হাজার, হাফেয় বদরুন্দীন আইনী, আবদ ইবনে হমায়েদ এবং আরো অনেকে উন্মুক্ত করেছেন। সেগুলোতে বলা হয়েছে : ইহদিরা যখন মদীনায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করেছিল এবং তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তখন এ সূরা নাখিল হয়েছিল। ইবনে সাদ ওয়াকেবীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন, এটি সপ্তম ইজুরীর ঘটনা। এরই ভিত্তিতে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাও এ সূরা দু'টিকে মাদানী বলেছেন।

কিন্তু ইতিপূর্বে সূরা ইখলাসের ভূমিকায় আমরা বলেছি, কোন সূরা বা আয়াত সম্পর্কে যখন বলা হয়, উমুক সময় সেটি নাখিল হয়েছিল। তখন এর অর্থ নিশ্চিতভাবে এ হয় না যে, সেটি প্রথমবার ঐ সময় নাখিল হয়েছে। বরং অনেক সময় এমনও হয়েছে, একটি সূরা বা আয়াত প্রথমে নাখিল হয়েছিল, তারপর কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনর্বার তারই প্রতি বরং কখনো কখনো বারবার তার প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। আমাদের মতে সূরা নাস ও সূরা ফালাকের ব্যাপারটিও এ রকমে। এদের বিষয়বস্তু পরিকার জানিয়ে দিছে, প্রথমে মকায় এমন এক সময় সূরা দু'টি নাখিল হয়েছিল যখন সেখানে নবী করীমের (সা) বিরোধিতা জোরেশোরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে যখন মদীনা তাইয়েবায় মুনাফিক, ইহুদি ও মুশরিকদের বিপুল বিরোধিতা শুরু হলো, তখন তাঁকে আবার ঐ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। ওপরে উল্লেখিত হ্যরত উকবা ইবনে আমেরের (রা) রেওয়ায়াতে একথাই বলা হয়েছে। তারপর যখন তাঁকে যাদু করা হলো এবং তাঁর মানসিক অসুস্থতা বেশ বেড়ে গেলো তখন আল্লাহর হকুমে জিরুল আলাইহিস সালাম এসে আবার তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার হকুম দিলেন। তাই আমাদের মতে যেসব মুফাসিস এ সূরা দু'টিকে মক্কী গণ্য করেন তাদের বৃগ্নাই বেশী নির্ভরযোগ্য। সূরা ফালাকের শুধুমাত্র একটি আয়াত রাখে, এ ছাড়া আল ফালাকের বার্ক সমস্ত আয়াত এবং সূরা নাসের সবক'টি আয়াত এ ব্যাপারে সরাসরি কোন সম্পর্ক রাখে না। যাদুর ঘটনার সাথে এ সূরা দু'টিকে সম্পর্কিত করার পথে এটিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কা মু'আয়মায় এক বিশেষ প্রেক্ষপটে এ সূরা দু'টি নাখিল হয়েছিল। তখন ইসলামী দাওয়াতের সূচনা পর্বেই মনে হচ্ছিল, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন ভীমরূপের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাওয়াত যতই বিস্তার লাভ করতে থেকেছে কুরাইশ বংশীয় কাফেরদের বিরোধিতাও ততোই বেড়ে যেতে থেকেছে। যতদিন তাদের আশা ছিল, কোনরকম দেয়া-নেয়া করে অথবা ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে তাঁকে ইসলামী দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারা যাবে, ততদিন তো বিদ্যে ও শক্তির ভীতাত কিছুটা কমতি ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) যখন দীনের ব্যাপারে তাদের সাথে কোন প্রকার আপোষ রফা করার পথে তাদেরকে সম্পূর্ণ নিরাশ করে দিলেন এবং সূরা আল কাফেরনে তাদেরকে ঘৃথহীন কঠে বলে দিলেন—যাদের বলেগী তোমরা করছো

আমি তার বন্দেগী করবো না এবং আমি যার বন্দেগী করছি তোমরা তার বন্দেগী করো না, কাজেই আমার পথ আলাদা এবং তোমাদের পথও আলাদা—তখন কাফেরদের শক্রতা চরমে পৌছে গিয়েছিল। বিশেষ করে যেসব পরিবারের ব্যক্তিবর্গ (পুরুষ-নারী, ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে) ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের মনে তো নবী কর্মীমের (সা) বিরুদ্ধে সবসময় ত্যবের আগুন ঝুলছিল। ঘরে ঘরে তাঁকে অভিশাপ দেয়া হচ্ছিল। কোন দিন রাতের আধারে লুকিয়ে তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হচ্ছিল। যাতে বনী হাশেমদের কেউ হত্যাকারীর সন্ধান পেয়ে আবার প্রতিশোধ নিতে না পারে এ জন্য এ ধরনের গুরামৰ্শ চলছিল। তাঁকে যাদু-টোনা করা হচ্ছিল। এভাবে তাঁকে মেরে ফেলার বা কঠিন রোগে আক্রান্ত করার অথবা পাগল করে দেয়ার অভিপ্রায় ছিল। জিন ও মানুষদের মধ্যকার শয়তানরা সব দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা চাষ্টিল জন-মানুষের মনে তাঁর এবং তিনি যে দীন তথা জীবন বিধান ও কুরআন এনেছেন তার বিরুদ্ধে কোন না কোন সংশয় সৃষ্টি করতে। এর ফলে লোকেরা তাঁর প্রতি বিরুপ ধারণা করে দূরে সরে যাবে বলে তারা মনে করছিল। অনেক লোকের মনে হিংসার আগুন ঝুলছিল। কারণ তারা নিজেদের ছাড়া বা নিজেদের গোক্রের লোকদের ছাড়া আর কারো প্রদীপের আলো ঝুলতে দেখতে পারতো না। উদাহরণ ব্রহ্মপুর, আবু জেহেল যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতায় সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল সেটি ছিল তার নিজের ভাষায় : “আমাদের ও বনী আবদে মালাফের (তথা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার) মধ্যে ছিল পারস্পরিক প্রতিযোগিতা। তারা মানুষকে আহার করিয়েছে, আমরাও আহার করিয়েছি। তারা লোকদেরকে সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। তারা দান করেছে, আমরাও দান করেছি। এমন কি তারা ও আমরা মান-মর্যাদার দৌড়ে সমানে সমান হয়ে গেছি। এখন তারা বলছে কি, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছে, তার কাছে আকাশ থেকে অঙ্গী আসে। আচ্ছা, এখন এ ক্ষেত্রে আমরা তাদের সাথে কেমন করে মোকাবেলা করতে পারি? আল্লাহর কসম, আমরা কখনো তাঁকে মেনে নেবো না এবং তার সত্যতার স্বীকৃতি দেবো না।” (ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, ৩৩৭-৩৩৮ পৃষ্ঠা)

এহেন অবশ্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে : এদেরকে বলে দাও আমি আধ্য চাষ্টি সকাল বেলার রবের, সমুদয় সৃষ্টির দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট থেকে, রাতের আধার থেকে, যাদুকর ও যাদুকারিণীদের অনিষ্ট থেকে এবং হিংসুকদের দুষ্কৃতি থেকে। আর এদেরকে বলে দাও, আমি আধ্য চাষ্টি সমস্ত মানুষের রব, সমস্ত মানুষের বাদশা ও সমস্ত মানুষের মাবুদের কাছে। এমন প্রত্যেকটি সন্দেহ ও প্ররোচনা সৃষ্টিকারীর অনিষ্ট থেকে যা বার বার ঘুরে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে ও তাদেরকে প্ররোচিত করে। তারা জিন শয়তানদের মধ্য থেকে হতে পারে, আবার মানুষ শয়তানদের মধ্য থেকেও হতে পারে। এটা হয়রত মুসার (আ) ঠিক সেই সময়ের কথার মতো যখন ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার সংকল্প প্রকাশ করেছিল। হয়রত মুসা তখন বলেছিলেন :

إِنَّ عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔

“আমি নিজের ও তোমাদের রবের আধ্য নিয়েছি এমন ধরনের প্রত্যেক দাষ্টিকের মোকাবেলায় যে হিসেবের দিনের প্রতি ঈমান রাখে না” (আল মু’মিন, ২৭)

وَأَنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَدَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ

“আর তোমরা আমার ওপর আক্রমণ করবে এ জন্য আমি নিজের ও তোমাদের রবের আশয় নিয়েছি” (আদ দুখান, ২০)।

উভয় স্থানেই আল্লাহর এ মহান মর্যাদা সম্পর্ক প্রয়গবরদের নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় বিগুল উপায় উপকরণ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীদের সাথে মোকাবেলা করতে হয়েছিল। উভয় স্থানেই শজিসালী দুশ্মনদের সামনে তাঁরা নিজেদের সত্ত্বের দাওয়াত নিয়ে অবিচল ও দৃঢ়তর সাথে দাঙ্ডিয়ে গিয়েছিলেন। অথচ দুশ্মনদের মোকাবেলা করার মতো কোন বস্তুগত শক্তি তাদের ছিল না। উভয় স্থানেই তাঁরা “তোমাদের মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব-জাহানের রবের আশয় নিয়েছি” এই বলে দুশ্মনদের হমকি-ধমকি, মারাত্মক বিপজ্জনক কৃট কৌশল ও শক্রতামূলক চক্রান্ত উপেক্ষা করে গেছেন। মূলত যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, আল্লাহর শক্তি সব শক্তির সেরা, তাঁর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব শক্তি তুচ্ছ এবং যে ব্যক্তি তাঁর আশয় নিয়েছে তার সামান্যতম ক্ষতি করার ক্ষমতাও কারো নেই, একমাত্র সেই ব্যক্তিই এ ধরনের অবিচলতা, দৃঢ় সংকল্প ও উন্নত মনোবলের পরিচয় দিতে পারে এবং সে-ই একথা বলতে পারে : সত্ত্বের বাণী ঘোষণার পথ থেকে আমি কখনই বিচ্যুত হবো না। তোমাদের যা ইচ্ছা করে যাও। আমি তাঁর কোন পরোয়া করি না। কারণ আমি তোমাদের ও আমার নিজের এবং সারা বিশ্ব-জাহানের রবের আশয় নিয়েছি।

এ সূরা দু'টি কুরআনের অংশ কিনা

এ সূরা দু'টির বিষয়বস্তুও মূল বক্তব্য অনুধাবন করার জন্য ওপরের আলোচনাটুকুই যথেষ্ট। তবুও হাদীস ও তাফসীর গ্রন্থগুলোয় এদের সম্পর্কে এমন তিনটি বিষয়ের আলোচনা এসেছে যা মনে সংশয় ও সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে, তাই আমরা সে ব্যাপারটিও পরিকল্পন করে দিতে চাই। এর মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় সেটি হচ্ছে, এ সূরা দু'টির কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি কি চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত অথবা এর মধ্যে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ আছে? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো উন্নত মর্যাদা সম্পর্ক সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়াতে একথা উন্নত হয়েছে যে, তিনি এ সূরা দু'টিকে কুরআনের সূরা বলে মানতেন না এবং নিজের পাঞ্চলিপিতে তিনি এ দু'টি সূরা সংযোজিত করেননি। ইমাম আহমাদ, বায়বার, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, আবু ইয়ালা, আবদুল্লাহ ইবনে আহমাদ ইবনে হাবল, হমাইদী, আবু নূ'আইয়, ইবনে হিবান প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন স্তোত্রে এবং বেসীর ভাগ ক্ষেত্রে সহীহ সনদের মাধ্যমে একথা হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে উন্নত করেছেন। এ হাদীসগুলোতে কেবল একথাই বলা হয়নি যে, তিনি এই সূরা দু'টিকে কুরআনের পাঞ্চলিপি থেকে বাদ দিতেন বরং এই সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তিনি বলতেন : “কুরআনের সাথে এমন জিনিস যিনিয়ে ফেলো না যা কুরআনের অংশ নয়। এ সূরা দু'টি কুরআনের অন্তরভুক্ত নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর মাধ্যমে একটি হকুম দেয়া হয়েছিল। তাঁকে বলা হয়েছিল, এ শব্দগুলোর মাধ্যমে

“আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।” কোন কোন রেওয়ায়াতে আরো বাড়তি বলা হয়েছে যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি পড়তেন না।

এ রেওয়ায়াতগুলোর কারণে ইসলাম বিরোধীরা কুরআনের বিরুদ্ধে সলেহ সৃষ্টির এবং (নাউয়ুবিল্লাহ) কুরআন যে বিকৃতিমূক্ত নয় একথা বলার সুযোগ পেয়ে গেছে। বরং আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মতে বড় সাহাবী যখন এই মত পোষণ করছেন যে, কুরআনের এ দু'টি সূরা বাইর থেকে তাতে সংযোজিত হয়েছে তখন না জানি তার মধ্যে আরো কত কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা হয়েছে। এ ধরনের সংশয় ও সদেহ সৃষ্টির সুযোগ তারা সহজেই পেয়ে গেছে। কুরআনকে এ ধরনের দোষান্বোগ মুক্ত করার জন্য কাষী আবু বকর বাকেল্লামী ও কাষী ইয়ায় ইবনে মাসউদের বক্তব্যের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, ইবনে মাসউদ সূরা ফালাক ও সূরা নাসের কুরআনের অংশ হবার ব্যাপারটি অঙ্গীকার করতেন না বরং তিনি শুধু এ সূরা দু'টিকে কুরআনের পাতায় লিখে রাখতে অঙ্গীকার করতেন। কারণ তাঁর মতে কুরআনের পাতায় শুধুমাত্র তাই লিখে রাখা উচিত যা লিখার অনুমতি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ জবাব ও ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ ইবনে মাসউদ (রা) এ সূরা দু'টির কুরআনের সূরা হওয়ার কথা অঙ্গীকার করেছেন, একথা নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত। ইমাম নববী, ইমাম ইবনে হায়ম, ইমাম ফখরুল্লাহ রায়ী প্রমুখ অন্য কতিপয় মনীষী ইবনে মাসউদ যে এ ধরনের কোন কথা বলেছেন, একথাটিকেই সরাসরি মিথ্যা ও বাতিল গণ্য করেছেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক সত্যকে সনদ ছাড়াই রদ করে দেয়া কোন সুস্থ জ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয়।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, ইবনে মাসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াত থেকে কুরআনের প্রতি যে দোষান্বোগ হচ্ছে তার জবাব কি ? এ প্রশ্নের কয়েকটি জবাব আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করছি।

এক : হাফেয বায়ার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে ইবনে মসউদ (রা) সংক্রান্ত এ রেওয়ায়াতগুলো বর্ণনা করার পর লিখেছেন : নিজের এ রায়ের ব্যাপারে তিনি একান্তই নিঃসংগ ও একাকী। সাহাবীদের একজনও তাঁর এ বক্তব্য সমর্থন করেননি।

দুই : সকল সাহাবী একমত হওয়ার ভিত্তিতে তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহ আনহ কুরআন মজীদের যে অনুলিপি তৈরি করেছিলেন এবং ইসলামী খেলাফতের পক্ষ থেকে ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে সরকারী পর্যায়ে পাঠিয়েছিলেন তাতে এ দু'টি সূরা লিপিবদ্ধ ছিল।

তিনি : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুবারক যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় কুরআনের যে কপির ওপর সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত তাতেই সূরা দু'টি নিয়িত আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদের (রা) একক রায় তাঁর বিপুল ও উচ্চ মর্যাদা সত্ত্বেও সমগ্র উম্মাতের এ মহান ইজমার মোকাবেলায় কোন মূল্যই রাখে না।

চার : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য হাদীস অনুযায়ী একথা প্রমাণিত হয় যে, তিনি নামাযে এ সূরা দু'টি নিজে পড়তেন,

অন্যদের পড়ার আদেশ দিতেন এবং কুরআনের সুরা হিসেবেই লোকদেরকে এ দু'টির শিক্ষা দিতেন। উদাহরণ ব্রহ্মপ নিম্নোক্ত হাদীসগুলো দেখুন।

ইতিপূর্বে মুসলিম, আহমাদ, তিরমিয়ী ও নাসাইর বরাত দিয়ে আমরা হয়রত উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছি। এতে রসূলুল্লাহ (সা) সুরা ফালাক ও সুরা নাস সম্পর্কে তাঁকে বলেন : আজ রাতে এ আয়াতগুলো আমার ওপর নাযিল হয়েছে। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত নাসায়ীর এক রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দু'টি সুরা ফজরের নামাযে পড়েন। ইবনে হিবানও এই হয়রত উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে রেওয়ায়াত করেছেন, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেন : “যদি সম্ভব হয় তোমার নামাযসমূহ থেকে এ সুরা দু'টির পড়া যেন বাদ না যায়।” সাস্টেড ইবনে মনসুর হয়রত মু'আয ইবনে জাবালের রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) ফজরের নামাযে এ সুরা দু'টি পড়েন। ইমাম আহমাদ তাঁর মুসলাদে সহীহ সনদ সহকারে আরো একজন সাহাবীর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী (সা) তাঁকে বলেন : যখন তুমি নামায পড়বে, তাতে এ দু'টি সুরা পড়তে ধাকবে। মুসলাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাইতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন : “লোকেরা যে সুরাগুলো পড়ে তার মধ্যে সর্বোত্তম দু'টি সুরা কি তোমাকে শেখাবো না? তিনি আরজ করেন, অবশ্যি শিখাবেন। হে আল্লার রসূল! একথায় তিনি তাঁকে এ আল ফালাক ও আন নাস সুরা দু'টি পড়ান। তারপর নামায দাড়িয়ে যায় এবং নবী করীম (সা) এ সুরা দু'টি তাঁতে পড়েন। নামায শেষ করে তিনি তাঁর কাছ দিয়ে যাবার সময় বলেন : “হে উকাব (উকবা)! কেমন দেখলে তুমি?” এরপর তাঁকে হিদায়াত দিলেন, যখন তুমি ঘুমাতে যাও এবং যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠো তখন এ সুরা দু'টি পড়ো। মুসলাদে আহমাদ, আবু দাউদ তিরমিয়ী, নাসাইতে উকবা ইবনে আমেরের (রা) অন্য একটি রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে প্রতোক নামাযের পর “মুআওবিয়াত” (অর্থাৎ সুরা ইখলাস, সুরা আল ফালাক ও সুরা আন নাস) পড়তে বলেন। নাসায়ী ইবনে মারদুইয়ার এবং হাকেম উকবা ইবনে আমেরের আর একটি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : একবার নবী করিম (সা) সওয়ারীর পিঠে চড়ে যাচ্ছিলেন এবং আমি তাঁর পবিত্র পায়ে হাত ঝেঁয়ে সাথে সাথে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, আমাকে কি সুরা হুদ সুরা ইউসুফ শিখিয়ে দেবেন? বললেন : “আল্লাহর কাছে বাদ্দার জন্য ‘কুল আউজু বিরাবিল ফালাক’-এর চাইতে বেশী বেশী উপকারী আর কোন জিনিস নেই।” নাসাই, বায়হকী, বাগাবী ও ইবনে সা'দ আদুল্লাহ ইবনে আবেস আল জুহানীর রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে, নবী করিম (সা) আমাকে বলেছেন : “ইবনে আবেস, আমি কি তোমাকে জানাবো না, আর্থাত প্রাথীরা যতগুলো জিনিসের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আর্থাত চেয়েছে তার মধ্যে সর্বশেষ কোনগুলো?” আমি বললাম, অবশ্যি বলবেন হে আল্লাহর রসূল! বললেন : “কুল আউযু বিরাবিল ফালাক” ও “কুল আউযু বিরাবিল নাস” সুরা দু'টি। ইবনে মারদুইয়া হয়রত ইবনে সালমার রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : “আল্লাহ যে সুরাগুলো সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন তা হচ্ছে”, কুল আউযু বিরাবিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাবিল নাস।”

এখানে প্রশ্ন দেখা যায়, এ দু'টি কুরআন মজীদের সূরা নয়, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ ধরনের ভূল ধারণার শিকার হলেন কেমন করে? দু'টি বর্ণনা একত্র করে দেখলে আয়রা এর জবাব পেতে পারিঃ।

একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে : হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলতেন, এটিতো আল্লাহর একটি হকুম ছিল। রসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়া সালামকে হকুম দেয়া হয়েছিল, আপনি এভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চান। অন্য বর্ণনাটি বিভিন্ন সূত্রে উচ্ছিত হয়েছে। ইমাম বুখারী সহীহ আল বুখারীতে, ইমাম মুহাম্মদ তাঁর মুসনাদে, হাফেজ আবু বকর আল হমাইদী তাঁর মুসনাদে, আবু নু'আইম তাঁর আল মুসতাখরাজে এবং নাসাই তাঁর সুনানে যির ইবনে জুবাইশের বরাত দিয়ে সামান্য শান্তিক পরিবর্তন সহকারে কুরআনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব থেকে এটি উচ্ছিত করেছেন। যির ইবনে হবাইশ বর্ণনা করেছেন, আমি হ্যরত উবাইকে (রা) বললাম, আপনার ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো এমন এমন কথা বলেন। তাঁর এ উক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? তিনি জবাব দিলেন : “আমি এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজেস করেছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমাকে বলা হয়েছে, ‘কুল’ (বলো), কাজেই আমিও বলেছি ‘কুল।’ তাই আমরাও তেমনিভাবে বলি যেতাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলতেন।” ইমাম আহমাদের বর্ণনা অতে হ্যরত উবাইয়ের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ : “আমি সাক্ষ দিছি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন, জিরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বলেছিলেন, কুল আউয়ু বিরবিল ফালাক” তাই তিনিও তেমনি বলেন। আর জিরীল (আ) ‘কুল আউজু বিরবিল নাস’ বলেছিলেন, তাই তিনিও তেমনি বলেন। কাজেই রসূল (সা) যেতাবে বলতেন আমরাও তেমনি বলি।” এ দু'টি বর্ণনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে, হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উভয় সূরায় ‘কুল’ (বলো) শব্দ দেখে এ ভূল ধারণা করেছিলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে “আউয়ু বিরবিল ফালাক” (আমি সকাল বেলার রবের আশ্রয় চাচ্ছি) বলার হকুম দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রসূলে করিমকে (সা)-এর এ সম্পর্কে জিজেস করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। হ্যরত উবাই ইবনে কা'বের (রা) মনে এ সম্পর্কে প্রশ্ন জেগেছিল। তিনি রসূলের (সা) সামনে প্রশ্ন রেখেছিলেন। রসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন : জিরীল আলাইহিস সালাম যেহেতু ‘কুল’ বলেছিলেন তাই আমিও ‘কুল’ বলি। একথাটিকে এভাবেও ধরা যায় যদি কাউকে হকুম দেয়ার উদ্দেশ্য থাকে এবং তাকে বলা হয়, “বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি, তাহলে এ হকুমটি পালন করতে গিয়ে এভাবে বলবে না যে, “বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি।” বরং সে ক্ষেত্রে ‘বলো’ শব্দটি বাদ দিয়ে “আমি আশ্রয় চাচ্ছি” বলবে। বিপরীত পক্ষে যদি উর্ধ্বতন শাসকের সংবাদবাহক কাউকে এভাবে খবর দেয়, “বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি” এবং এ পয়গাম তাঁর নিজের কাছে রেখে দেবার জন্য নয় বরং অন্যদের কাছেও পৌছে দেবার জন্য দেয়া হয়ে থাকে, তাহলে তিনি সোকদের কাছে এ পয়গামের শব্দগুলো, হবহ পৌছে দেবেন। এর মধ্য থেকে কোন একটি শব্দ বাদ দেবার অধিকার তাঁর থাকবে না। কাজেই এ সূরা দু'টির সূচনা ‘কুল’ শব্দ দিয়ে করা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এটি ‘অইর’ কালাম এবং কালামটি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যেতাবে নাযিল হয়েছিল ঠিক

সেভাবেই লোকদের কাছে পোছিয়ে দিতে তিনি বাধ্য ছিলেন। এটি শুধু নবী সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া একটি হকুম ছিল না। কুরআন মজীদে এ দু'টি সূরা ছাড়াও এমন ৩৩০টি আয়াত আছে যেগুলো 'কুল' শব্দ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ আয়াতগুলোতে 'কুল' (বলো) থাকা একথাই সাক্ষ্য বহন করে যে, এগুলো অবৈর কালাম এবং যেসব শব্দ সহকারে এগুলো নবী করিম (সা)-এর ওপর নাযিল হয়েছিল হবহ সেই শব্দগুলো সহকারে লোকদের কাছে পোছিয়ে দেয়া তাঁর জন্য ফরয করা হয়েছিল। নয়তো প্রত্যেক জ্ঞায়গায় 'কুল' (বলো) শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু সেই শব্দগুলোই বলতেন যেগুলো বলার হকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি এগুলো কুরআনে সন্ধোজিত করতেন না। বরং এ হকুমটি পালন করার জন্য শুধু মাত্র সেই কথাগুলোই বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করতেন যেগুলো বলার হকুম তাঁকে দেয়া হয়েছিল।

এখানে সামান্য একটু চিত্তা-ভাবনা করলে একথা ভালোভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে ক্রেমকে ভুল-জ্ঞান মুক্ত মনে করা এবং তাদের কোন কথা সম্পর্কে 'ভুল' শব্দটি শুনার সাথে সাধেই সাহাবীদের অবমাননা করা হয়েছে বলে হৈ চৈ শুরু করে দেয়া কতইনা অথবীন। এখানে দেখা যাচ্ছে, হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর যত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর কুরআনের দু'টি সূরা সম্পর্কে কৃত বড় একটি ভুল হয়ে গেছে। এতবড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবীর যদি এমনি একটি ভুল হয়ে যেতে পারে তাহলে অন্যদেরও কোন ভুল হয়ে যাওয়া সম্ভব। আমরা ইলমী তথা তাদ্বিক গবেষণার জন্য এ ব্যাপারে যাচাই-বাচাই ও পর্যালোচনা করতে পারি। তবে যে ব্যক্তি ভুলকে ভুল বলার পর আবার সামনে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রতি ধিক্কার ও নিদাবাদে মুখ্য হবে সে হবে একজন মন্তব্যবড় জালেম। এ "মু'আওবিযাতাইন" প্রসংগে মুফাস্সির ও মুহাদিসগণ হয়রত ইবনে মাসউদ (রা)-এর রায়কে ভুল বলেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই কথা বলার দৃঃসাহস করেননি যে, (নাউয়ুবিল্লাহ) কুরআনের দু'টি সূরা অবীকার করে তিনি কাফের হয়ে গিয়েছিলেন।

নবী কর্মীমের (সা) ওপর যাদুর প্রভাব

এ সূরাটির ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন দেখা দেয়। হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাহুর্রাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদু করা হয়েছিল। তার প্রভাবে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এ যাদুর প্রভাব দূর করার জন্য জিরীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁকে এ সূরা দু'টি পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রাচীন ও আধুনিক বুদ্ধিবাদীদের অনেকে এ ব্যাপারটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ হাদীসগুলো মেনে নিলে সমস্ত শরীয়াতটাই সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। কারণ, নবীর ওপর যদি যাদুর প্রভাব পড়তে পারে এবং এ হাদীসগুলোর দৃষ্টিতে তাঁর ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল, তাহলে আমরা জানি না বিরোধীরা যাদুর প্রভাব ফেলে তাঁর মুখ থেকে কতো কথা বলিয়ে এবং তাঁকে দিয়ে কত কাজ করিয়ে নিয়েছে। আর তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার মধ্যেইবা কি পরিমাণ জিনিস আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং কৃত যাদুর প্রভাবে ছিল তাও আমরা জানি না। বরং তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে, একথা সত্য বলে মেনে নেয়ার পর যাদুরই মাধ্যমে নবীকে নবুওয়াতের দাবী করতে উদ্বৃত্ত করা হয়েছিল কি না এবং যাদুরই প্রভাবে তিনি বিভাসির শিকার হয়ে তাঁর কাছে

ফেরেশতা এসেছে বলে মনে করেছিলেন কিনা একথাও নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে না। তাদের আরো যুক্তি হচ্ছে, এ হাদীসগুলো কুরআন মজীদের সাথে সংবর্ধনী। কারণ, কুরআন মজীদে কাফেরদের এ অভিযোগ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা নবীকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলেছে :

يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبَعَّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْخُورًا -

“জালেমরা বলেন, তোমরা নিছক একজন যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির আনুগত্য করে চলছো।” (বনি ইসরাইল, ৪৭) আর এ হাদীসগুলো কাফেরদের এ অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণ করছে। অর্থাৎ এ হাদীসগুলো থেকে প্রমাণ হচ্ছে, সত্যই নবীর ওপর যাদু করা হয়েছিল।

এ বিষয়টির ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছুতে হলে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, মূলত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়েছিল বলে কি সহীহ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে? আর যদি প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে তা কি ছিল এবং কতটুকু ছিল? তারপর যেসব আপত্তি করা হয়েছে, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে সেগুলো উত্থাপিত হতে পারে কি না, তা দেখতে হবে।

প্রথম যুগের মুসলিম আলেমগণ নিজেদের চিন্তা ও ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস বিকৃত অথবা সত্য গোপন করার প্রচেষ্টা না চালিয়ে চরম সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। বরং যা কিছু ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাকে হবহ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পোছিয়ে দিয়েছেন। এ সত্যগুলো থেকে যদি কেউ বিপরীত ফলাফল গ্রহণে উদ্যোগী হয় তাহলে তাদের সংগৰ্হীত এ উপাদানগুলোর সাহায্যে সে যে বিপুলভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে পারবে এ সঙ্গাবনার কোন পরোয়াই তারা করেননি। এখন যদি কোন একটি কথা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিপুল সংখ্যক ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীর ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়, তাহলে তা মেনে নিলে অযুক্ত অযুক্ত ত্রুটি ও অনিষ্টকারিতা দেখা দেবে এ অজুহাত দেখিয়ে ইতিহাসকে মেনে নিতে অবীকার করা কোন ন্যায়নিষ্ঠ পণ্ডিত ও ভানী লোকের কাজ হতে পারে না। অনুরূপভাবে ইতিহাস থেকে যতটুকু সত্য বলে প্রমাণিত হয় তার ওপর কর্মনার ঘোড়া দৌড়িয়ে তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজের আসল আকৃতি থেকে অনেকগুণ বাড়িয়ে পেশ করাও ঐতিহাসিক সততার পরিচায়ক নয়। এর পরিবর্তে ইতিহাসকে ইতিহাস হিসেবে মেনে নিয়ে তার মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় ও কি প্রমাণ হয় না তা দেখাই তার কাজ।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত। তাত্ত্বিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাকে যদি ভুল প্রমাণ করা যেতে পারে তাহলে দুনিয়ার কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সঠিক প্রমাণ করা যাবে না। হ্যরত আয়েশা (রা) হ্যরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) ও হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) থেকে বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবনে মাজাহ, ইমাম আবহাদ, আবদুর রাজ্জাক, হমাইদী, বাযহাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া, ইবনে সাদ, ইবনে আবী শাইবা, হাকেম, আবদ ইবনে হমাইদ প্রমুখ মুহাদিসগণ এত বিভিন্ন ও বিপুলসংখ্যক সনদের মাধ্যমে এ ঘটনা উদ্ভূত করেছেন যে,

এর একটি বর্ণনা, 'খবরে ওয়াহিদ'-এর পর্যায়ভূক্ত হলেও মূল বিষয়ক্ষুটি 'মুতাওয়াতির' বর্ণনার পর্যায়ে পৌছে গেছে। বিভিন্ন হাদীসে এর যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে সেগুলো একত্র করে এবং একসাথে গ্রথিত ও সুসংবন্ধ করে সাজিয়ে শুনিয়ে আমরা এখানে একটি ঘটনা আকারে তুলে ধরছি।

হোদায়বিয়ার সক্রিয় পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন। এ সময় সন্তুষ্য হিজরীর মহররম মাসে খ্যাবর থেকে ইহুদীদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় এলো। তারা আনসারদের বনি যুরাইক গোত্রের বিখ্যাত যাদুকর লাবীদ ইবনে আ'সমের সাথে সাক্ষাত করলো।^১ তারা তাকে বললো, মুহাম্মদ (সা) আমাদের সাথে যা কিছু করেছেন তা তো তুমি জানো। আমরা তাঁর ওপর অনেকবার যাদু করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সফল হতে পারিনি। এখন তোমার কাছে এসেছি। কারণ তুমি আমাদের চাইতে বড় যাদুকর। তোমার জন্য এ তিনটি আশরাফী (বৃণ মুদ্রা) এনেছি। এগুলো গ্রহণ করো এবং মুহাম্মদের ওপর একটি শক্ত যাদুর আঘাত হানো। এ সময় একটি ইহুদী ছেলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাজ করতো। তার সাথে যোগসাজশ করে তারা রসূলুল্লাহর (সা) চিরমনীর একটি টুকরা সংগ্রহ করতে সক্ষম হলো। তাতে তাঁর পৰিত্র চুল আটকালো ছিল সেই চুলগুলো ও চিরমনীর দাঁতের ওপর যাদু করা হলো। কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে, লাবীদ ইবনে আ'সম নিজেই যাদু করেছিল। আবার কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে— তার বেনেরা ছিল তার চেয়ে বড় যাদুকর। তাদের সাহায্যে সে যাদু করেছিল যাহোক এ দু'টির মধ্যে যে কোন একটিই সঠিক হবে। এ ক্ষেত্রে এ যাদুকে একটি পূর্ব খেজুরের ছড়ার আবরণের^২ নীচে রেখে লাবীদ তাকে বনী যুরাইকের যারওয়ান বা যী-আয়ওয়ান নামক কৃয়ার তলায় একটি পাথর চাপা দিয়ে রাখলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পূর্ণ এক বছর সময় লাগলো। বছরের শেষ ছয় মাসে মেজাজে কিছু পরিবর্তন অনুভূত হতে থাকলো। শেষ চল্লিশ দিন কঠিন এবং শেষ তিন দিন কঠিনতর হয়ে গেলো। তবে এর সবচেয়ে বেশী যে প্রভাব তাঁর ওপর পড়লো তা কেবল এতটুকুই যে, দিনের পর দিন তিনি রোগা ও নিষ্ঠেজ হয়ে যেতে লাগলেন। কোন কাজের ব্যাপারে মনে করতেন, করে ফেলেছেন অথচ তা করেননি। নিজের দ্বন্দ্বের সম্পর্কে মনে করতেন, তিনি তাদের কাছে গেছেন অথচ আসলে তাদের কাছে যাননি। আবার কোন কোন সময় নিজের দৃষ্টির ব্যাপারেও তাঁর সন্দেহ হতো। মনে করতেন কোন জিনিস দেখেছেন অথচ আসলে তা দেখেননি। এসব প্রভাব তাঁর নিজের ব্যক্তিসম্ভা পর্যন্তই সীমান্ত ছিল। এমনকি তাঁর ওপর দিয়ে কি ঘটে যাচ্ছে তা অন্যেরা জানতেও

১. কোন কোন বর্ণনাকারী তাকে ইহুদী বলেছেন। আবার কেউ বলেছেন, মুনাফিক ও ইহুদীদের যিত্ত। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, সে ছিল বনী যুরাইকের অন্তর্ভুক্ত। আর বনী যুরাইক ইহুদীদের কোন শেষ ছিল না, একথা সবাই জানে। বরং এটি ছিল বায়রাজদের অন্তর্ভুক্ত আনসারদের একটি গোত্র। তাই বলা যেতে পারে, সে মদীনাবাসী ছিল, কিন্তু ইহুদী র্ষ গ্রহণ করেছিল অথবা ইহুদীদের সাথে চুক্তিবন্ধ সহযোগী হবার কারণে কেউ কেউ তাকে ইহুদী মনে করে নিয়েছিল। তবুও তার জন্য মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করার কারণে জানা যায়, বাস্তত সে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিতো।
২. পূর্বতে খেজুরের ছড়া একটি আবরণের মধ্যে থাকে। পূর্ব খেজুরের আবরণের রং হয় মানুষের রংহের মতো। তার গুরু হয় মানুষের শুক্রের গন্ধের মতো।

পারেনি। কিন্তু নবী হিসেবে তাঁর উপর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় তাঁর মধ্যে সামান্যতম ব্যাধাতও সৃষ্টি হতে পারেনি। কোন একটি বর্ণনায়ও একথা বলা হয়নি যে, সে সময় তিনি কুরআনের কোন আয়াত ভুল গিয়েছিলেন। অথবা কোন আয়াত ভুল পড়েছিলেন। কিংবা নিজের মজলিসে, বক্তৃতায় ও ভাষণে তাঁর শিক্ষাবলীতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল। অথবা এমন কোন কালাম তিনি অহী হিসেবে পেশ করেছিলেন যা আসলে তাঁর উপর নাখিল হয়নি। কিংবা তাঁর কোন নামায তরক হয়ে গেছে এবং সে সম্পর্কে তিনি যনে করেছেন যে, তা পড়ে নিয়েছেন অথবা আসলে তা পড়েননি। নাউয়বিল্লাহ, এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটে গেলে চারদিকে হৈচৈ পড়ে যেতো। সারা আরব দেশে খবর ছড়িয়ে পড়তো যে নবীকে কেউ কাঁ করতে পারেনি। একজন যাদুকরের যাদুর কাছে সে কাঁ হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদা এ অবস্থায় পুরোপুরি সমূলত থেকেছে। তাঁর উপর কোন প্রভাব পড়েনি। কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ জিনিসটি অনুভব করে পেরেশান হয়ে পড়েছিলেন। শেষে একদিন তিনি হ্যরত আয়েশার কাছে ছিলেন। এ সময় বার বার আগ্নাহীর কাছে দোয়া চাইতে থাকলেন। এ অবস্থায় তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। জেগে উঠে হ্যরত আয়েশাকে বললেন, আমি যে কথা আমার রবের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম তা তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। হ্যরত আশেয়া (রা) জিজ্ঞেস করলেন, কি কথা? জবাব দিলেন, “দু’জন লোক (অর্থাৎ দু’জন ফেরেশতা দু’জন লোকের আকৃতি ধরে), আমার কাছে এলো। একজন ছিল মাথার দিকে, আরেকজন পায়ের দিকে। একজন জিজ্ঞেস করলো, এর কি হয়েছে? অন্যজন জবাব দিল, এর উপর যাদু করা হয়েছে। প্রথম জন জিজ্ঞেস করলো, কে করেছে? জবাব দিল, লাবীদ ইবনে আ’সম। জিজ্ঞেস করলো, কোন জিনিসের মধ্যে করেছে? জবাব দিল, একটি পুরুষ খেজুরের ছাঁড়ার আবরণে আবৃত চিরন্তনী ও চুলের মধ্যে। জিজ্ঞেস করলো, তা কোথায় আছে? জবাব দিল, বনী যুরাইকের কৃয়া যী-আয়ওয়ানের (অথবা যী-যারওয়ান) তলায় পাথর চাপা দেয়া আছে। জিজ্ঞেস করলো, তাহলে এখন এ জন্য কি করা দরকার? জবাব দিল, কৃয়ার পানি সেচে ফেলতে হবে। তারপর পাথরের নিচ থেকে সেটি বের করে আনতে হবে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যরত আলী (রা), হ্যরত ইবনে ইয়াসির (রা) ও হ্যরত যুবাইরকে (রা) পাঠালেন। তাদের সাথে শামিল হলেন হ্যরত জুবাইর ইবনে ইয়াস আয়যুরাকী ও কায়েস ইবনে মিহসান আয়যুরাকী (অর্থাৎ বনি যুরাইকের দুই ব্যক্তি)। পরে নবী (সা) নিজেও কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে সেখানে পৌছে গেলেন। পানি তোলা হলো। কৃয়ার তলা থেকে কথিত আবরণটি বের করে আনা হলো। তাঁর মধ্যে চিরন্তনী ও চুলের সাথে মিশিয়ে রাখা একটি সূতায় এগারটি গিরা দেয়া ছিল। আর ছিল মোমের একটি পুতুল। তাঁর গায়ে কয়েকটি সুই ফুটানো ছিল। জিরীল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, আপনি সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়ুন। কাজেই তিনি এক একটি আয়াত পড়তে যাচ্ছিলেন, সেই সাথে এক একটি গিরা খুলে যাচ্ছিল এবং পুতুলের গা থেকে এক একটি সুই তুলে নেয়া হচ্ছিল। সূরা পড়া শেষ হতেই সমস্ত গিরা খুলে গেলো, সমস্ত সুই উঠে এলো এবং তিনি যাদুর প্রভাবমুক্ত হয়ে ঠিক এমন অবস্থায় পৌছে গেলেন যেমন কোন ব্যক্তি রশি দিয়ে বাঁধা ছিল তাঁরপর তাঁর বাঁধন খুলে গেলো। তাঁরপর তিনি শাবীদকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে তাঁর দোষ স্থীকার করলো এবং তিনি তাঁকে ছেড়ে দিলেন। কারণ, নিজের ব্যক্তিসন্তানের জন্য তিনি কোনদিন কারো উপর প্রতিশোধ নেননি।

শুধু এই নয়, তিনি এ বিষয়টি নিয়ে কোন কথাবার্তা বলতেও অবীকৃতি জানালেন। কারণ তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন, কাজেই এখন আমি কারো বিরুদ্ধে শোকদের উৎসেজিত করতে চাই না।

এ হলো এ যাদুর কাহিনী। এর মধ্যে এমন কোন বিষয় নেই যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে যদি তাঁকে আহত করা যেতে পারে, যেমন ওহেদের যুক্তে হয়েছিল, যদি তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়ে পড়েন, যেমন বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত, যদি তাঁকে বিছু কামড় দেয়, যেমন অন্যান্য হাদীসে পাওয়া যায় এবং নবী হবার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর সাথে যে সরক্ষণের ওয়াদা করেছিলেন, যদি এগুলোর শধ্য থেকে কোন একটিও তাঁর পরিপন্থী না হয়ে থাকে, তাহলে ব্যক্তিগত পর্যায়ে তিনি যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হতেও পারেন। এতে অব্বাতাবিক কিছুই নেই। নবীর ওপর যাদুর প্রভাব পড়তে পারে, একথা কুরআন মজীদ থেকেও প্রমাণিত। সূরা আরাফেও ফেরাউনের যাদুকরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে : হযরত মুসা (আ)–এর মোকাবিলায় তারা এলো। তারা সেখানে এ মোকাবিলা দেখতে উপস্থিত হাজার হাজার লোকের দৃষ্টিশক্তির ওপর যাদু করলো। (سَخْرُواْ أَعْيُنُ النَّاسِ)। সূরা তা-হায় বলা হয়েছে : তারা যেসব লাঠি ও রশি ছুড়ে দিয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে শুধু সাধারণ লোকেরাই নয়, হযরত মুসাও মনে করলেন সেগুলো সাপের মতো তাঁর দিকে দৌড়ে আসছে এবং তিনি এতে ভীত হয়ে পড়লেন। এমন কি মহান আল্লাহ তাঁর ওপর এই মর্মে অঙ্গী নাযিল করলেন যে, তয় পেয়ে না, তুমই বিজয়ী হবে। তোমার লাঠিটা একটু ছুড়ে ফেলো।

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ يُخْيِلُ الَّتِي مِنْ سِخْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى
فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُؤْسَىٰ - قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ
وَالْقِمَاءِ فِي يَمِينِكَ - ط' : ১৯-২১

এখানে যদি আপনি উথাপন করে বলা হয়, এ ধরনের বিশ্বেষণের মাধ্যমে মক্কার কাফেরদের দোষারোপকেই সত্য প্রমাণ করা হলো। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো। এর জবাবে বলা যায়, তিনি কোন যাদুকরের যাদুর প্রভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এ অর্থে মক্কার কাফেররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত ব্যক্তি বলতো না। বরং তাঁকে যাদুর প্রভাবে পাগল করে দিয়েছিল এবং নবুওয়াতের দাবী ছিল তাঁর এ পাগলামীরই বহিঃপ্রকাশ। আর এ পাগলামীর বশবর্তী হয়েই তিনি জারাত ও জাহানামের গর্ভ শুনিয়ে যেতেন। একথা সুস্পষ্ট, যে বিষয় ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, যে যাদুর প্রভাব শুধুমাত্র মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিসম্ভাব ওপর পড়েছিল, তাঁর নবীসম্ভা ছিল এর আওতার সম্পূর্ণ বাইরে। তেমন ধরনের কোন বিষয়ের সাথে এ আপনি সম্পৃক্ত হতে পারে না।

এ প্রসংগে একথাও উল্লেখযোগ্য, যারা যাদুকে নিছক কান্নিক জিনিস মনে করেন, যাদুর প্রভাবের কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বেষণ সম্ভবপর নয় বলেই তারা এ ধরনের মত পোষণ করেন। কিন্তু দুনিয়ায় এমন বহু জিনিসই রয়েছে যেগুলো অতিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে

ধরা পড়ে, কিন্তু সেগুলো কিভাবে হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তার বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এ ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার অক্ষমতার ফলে একথা অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, আমরা যে জিনিসটি বিশ্লেষণ করতে অক্ষম সেটিকে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে। আসলে যাদু একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। শারীরিক প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিগুলো যেভাবে শরীরের সীমা অতিক্রম করে মনকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি যাদুর প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিও মনের সীমা পেরিয়ে শরীরকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, তয় একটি মনস্তাত্ত্বিক জিনিস। কিন্তু শরীরের উপর এর প্রভাব যখন পড়ে গায়ের লোহগুলো থাঢ়া হয়ে যায় এবং দেহ ধর করে কৌপতে থাকে। আসলে যাদু প্রকৃত সম্ভাব্য কোন পরিবর্তন ঘটায় না। তবে মানুষের মন ও তার ইন্দ্রিয়গুলো এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মনে করতে থাকে, বৃক্ষ প্রকৃত সম্ভাব্য পরিবর্তন হয়েছে। হয়রত মূসার দিকে যাদুকররা যেসব শাঠি ও রশি ছুঁড়ে ফেলেছিল সেগুলো সত্যি সাপে পরিণত হয়নি। কিন্তু হাজার হাজার লোকের চোখে এমন যাদুর প্রভাব পড়লো যে, তারা সবাই এগুলোকে সাপ মনে করলো। এমন কি হয়রত মূসার ইন্স্ট্রানুভূতিও এ যাদুর প্রভাব মুক্ত থাকতে পারেনি। অনুরূপভাবে কুরআনের সূরা আল বাকারার ১০২ আয়াতে বলা হয়েছে : বেবিলনে হারান্ত ও মারান্তের কাছে লোকেরা এমন যাদু শিখতো যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতো। এটাও ছিল একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব। আর তাছাড়া অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লোকেরা যদি এ কাজে সফলতা না পেতো তাহলে তারা এর খরিদ্দার হতো না। একথা ঠিক, বন্দুকের শীলি ও বোমারু বিমান থেকে নিষ্কিঁণ বোমার মতো যাদুর প্রভাবশালী হওয়াও আল্লাহর হকুম ছাড়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু হাজার হাজার বছর থেকে যে জিনিসটি মানুষের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণে ধরা দিছে তার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা নিষ্ক একটি ইঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইসলামে ঝাড়-ফুকের স্থান

এ সূরা দু'টির ব্যাপারে তৃতীয় যে প্রশ্নটি দেখা দেয়, সেটি হচ্ছে এই যে, ইসলামে কি ঝাড়-ফুকের কোন অবকাশ আছে? তাছাড়া ঝাড়-ফুক যথার্থই কোন প্রভাব ফেলে কি না? এ প্রশ্ন দেখা দেবার কারণ হচ্ছে, বিপুর সংযুক্ত সহীহ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম প্রতি রাতে যুবাবার আগে বিশ্বেষ করে অসুস্থ অবস্থায় সূরা আল ফালাক ও আন নাস এবং কোন কোন হাদীস অনুযায়ী এ দু'টির সাথে আবার সূরা ইখলাসও তিন তিন বার করে পড়ে নিজের দুই হাতের তালুতে ফুক দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেখানে যেখানে তাঁর হাত যেতে পারে—সব জায়গায় হাত বুলাতেন। শেষ বারে মোগে আক্রান্ত হবার পর যখন তাঁর নিজের পক্ষে এমনটি করা সম্ভবপর ছিল না তখন হয়রত আয়েশা (রা) এ সূরাগুলো (বেছাকৃতভাবে বা নবী কর্মীর হকুমে) পড়তেন এবং তাঁর মুবারক হাতের বরকতের কথা চিন্তা করে তাঁরই হাত নিয়ে তাঁর শরীরে বুলাতেন। এ বিষয়ক্রমুক্ত সুবলিত রেওয়ায়াত নির্ভুল সূত্রে বুখারী, মুসলিম, নাসাই, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ও মুআভা ইমাম মালিকে হয়রত আয়েশা (রা)-এর চাইতে আর কাঁজো বেশী জানার কথা নয়।

এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গীটি তালোভাবে বুঝে নেয়া উচিত। বিভিন্ন হাদীস গ্রহে হয়রত আবদুগ্রাহ ইবনে আরাস (রা)-এর একটি সূনীর্ঘ রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। তার শেষের দিকে নবী করীম (সা) বলেছেন : আমার উম্মাতের মধ্যে তারা বিনা হিসেবে জানাতে প্রবেশ করবে যারা না দাগ দেয়ার চিকিৎসা করে, না জাড়-ফুক করায় আর না শুভাশুভ লক্ষণ প্রাপ্ত করে। (মুসলিম) হয়রত মুগীরা ইবনে শোবার (রা) বর্ণনা মতে রস্তুগ্রাহ সাঞ্চারাহ আলাইহি ওয়া সাঞ্চাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দাগ দেয়ার চিকিৎসা করালো এবং জাড়-ফুক করালো সে আল্লাহর প্রতি তাওয়াকুল থেকে ১:৮ম্পর্ক হয়ে গেলো। (তিরিমিয়া) হয়রত আবদুগ্রাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেছেন : রস্তুগ্রাহ সাঞ্চারাহ আলাইহি ওয়া সাঞ্চাম দশটি জিনিস অপছন্দ করতেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ঝাড়-ফুক করা, তবে সুরা আল ফালাক ও আন নাস অথবা এ দু'টি ও সুরা ইখ্বাস ছাড়া (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাই, ইবনে হিরান ও হাকেম)। কোন কোন হাদীস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রথম দিকে রসূলে করীম (সা) ঝাড়-ফুক করা থেকে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করিছেন, কিন্তু পরে শর্ত সাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছিলেন। সেই শর্তগুলো হচ্ছে : এতে কোন শিরকের আমেজ থাকতে পারবে না। আল্লাহর পবিত্র নাম বা তাঁর পবিত্র কালামের সাহায্যে ঝাড়-ফুক করতে হবে। কালাম বৌদ্ধগ্রন্থ হতে হবে এবং তার মধ্যে কোন শুনাহর জিনিস নেই একথা জানা সম্ভব হতে হবে। আর এই সঙ্গে ডরসা ঝাড়-ফুকের ওপর করা যাবে না এবং তাকে রোগ নিরাময়কারী মনে করা যাবে না। বরং আল্লাহর ওপর ডরসা করতে হবে এ মর্মে যে, আল্লাহ চাইলে এ ঝাড়-ফুকের মাধ্যমেই সে রোগ নিরাময় করবেন। এ ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গী সুম্পষ্ট হয়ে যাবার পর এখন হাদীসের বক্তব্য দেখুন।

তাবারানী 'সগীর' গ্রন্থে হয়রত আলীর (রা) রেওয়ায়াত উন্মুক্ত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে : একবার নামায পড়ার সময় রসূলে করীমকে (সা) বিছু কামড় দেয়। নামায শেষ করে তিনি বলেন, বিছুর ওপর আল্লাহর লানত, সে না কোন নামাযীকে রেহাই দেয়, না আর কাউকে। তারপর পানি ও লবন আনান। যে জায়গায় বিছু কামড়েছিল সেখানে মোনতা পানি দিয়ে ডলতে থাকেন আর কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন, কুল হওয়াল্লাহ আহাদ, কুল আউয়ু বিরবিল ফালাক ও কুল আউয়ু বিরবিল নাস পড়তে থাকেন।

ইবনে আরাসের (রা) বর্ণনাও হাদীসে এসেছে। নবী সাঞ্চারাহ আলাইহি ওয়া সাঞ্চাম হয়রত হাসান ও হয়রত হসাইনের ওপর এ দোয়া পড়তেন :

أعْيُذُ كُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَّمَاءْمَةٍ وَّمِنْ كُلِّ
عَيْنٍ لَّامَةٍ -

“আমি তোমাদের দু’জনকে প্রত্যেক শয়তান ও কষ্টদায়ক এবং বদনজর থেকে আল্লাহর ক্ষেত্রে কালেমাসমূহের আপ্যয়ে দিয়ে দিচ্ছি।”

(বুখারী, মুসলাদে আহমাদ, তিরিমিয়া ও ইবনে মাজাহ)

উসমান ইবনে আবিল আস সাকাফী সম্পর্কে সামান্য শব্দের হেরফের সহকারে মুসলিম, মুআসা, তাবারানী ও হাকেমে একটি রেওয়ায়াত উন্মুক্ত হয়েছে তাতে বলা

হয়েছে : তিনি রসূলগ্রাহ সাল্লাহুর আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নালিশ করেন, আমি যখন থেকে মুসলমান হয়েছি তখন থেকেই একটা ব্যথা অনুভব করছি। এ ব্যথা আমাকে মেরে ফেলে দিয়েছে। নবী (সা) বলেন, যেখানে ব্যথা হচ্ছে সেখানে তোমার ডান হাতটা রাখো। তারপর তিনবার বিসমিল্লাহ পড়ে, এবং সাতবার এ দোয়াটা পড়ে সেখানে হাত বুলাও আবু جعْدٌ وَهَارِبٌ مِنْ شَرِّمَا أَجْدُ وَأَحَدٌ "আমি আল্লাহ ও তাঁর কুদরতের আশয় চাষ্টি সেই জিন্দেসের অনিষ্টকারিতা থেকে যাকে আমি অনুভব করছি এবং যার লেগে যাওয়ার ভয়ে আমি তীজ।" মুআভায় এর ওপর আরো এতটুকু বৃক্ষি করা হয়েছে যে, উসমান ইবনে আবিল আস বলেন, এরপর আমার সে ব্যথা দূর হয়ে যেতে থাকে এবং আমার ঘরের লোকদেরকেও আমি এটা শিখাই।

মুসনাদে আহমাদ ও তাহবী গ্রহে তালক ইবনে আলীর (রা) রেওয়ায়াত উদ্ভূত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন, রসূলগ্রাহ সাল্লাহুর আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতেই আমাকে বিছু কামড় দেয়। তিনি কিছু পড়ে আমাকে ফুক দেন এবং কামড়ানো জায়গায় হাত বুলান।

মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরীর (রা) বর্ণনায় বলা হয়েছে : একবার নবী সাল্লাহুর আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। জিরুল এসে জিজ্ঞেস করেন, "হে মুহাম্মাদ! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন?" জবাব দেন হী জিরুল বলেন,

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ
اللَّهُ تَشْفِيْكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ -

"আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি এমন প্রত্যেকটি জিনিস থেকে যা আপনাকে কষ্ট দেয় এবং প্রত্যেকটি নফস ও ইংসুকের হিংসা দৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ আপনাকে নিরাময় দান করবন। আমি তাঁর নামে আপনাকে ঝাড়ছি।"

প্রায় এ একই ধরনের আর একটি বর্ণনা মুসনাদে আহমাদে হয়রত উবাদা ইবনে সামেত থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : নবী করীম (সা) অসুস্থ ছিলেন। আমি তাঁকে দেখতে গোলাম। দেখলাম তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিকেলে দেখতে গোলাম, দেখলাম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। কিভাবে এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছেন তা জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন, জিরুল এসেছিলেন এবং কিছু কালেমা পড়ে আমাকে ঝাড়-ফুক করেছিলেন (তাতেই আমি সুস্থ হয়ে উঠেছি)। তারপর তিনি প্রায় ওপরের হানীসে উদ্ভূত কালেমাগুলোর মতো কিছু কালেমা শুনালেন। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হয়রত আয়েশা (র্হ) থেকেও এমনি ধরনের রেওয়ায়াত উদ্ভূত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তাঁর মুসনাদে উচ্চুল মুমেনীন হয়রত হাফসার (রা) বর্ণনা উদ্ভূত করেছেন। তাতে হয়রত হাফসা (রা) বলেন : একদিন নবী সাল্লাহুর আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কাছে এলেন। তখন আমার কাছে শিফা* নামের এক মহিলা বসেছিলেন।

* তৎ মহিলার আসল নাম ছিল লাইলা। কিন্তু তিনি শিফা বিনতে আবদুল্লাহ নামে পরিচিত ছিলেন। হিজরাতের আগে মুসলমান হন। তাঁর সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনি আদী বংশের সাথে। হয়রত উমরও (রা) এ বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এভাবে তিনি ছিলেন হয়রত হাফসার (রা) আত্মীয়া।

তিনি শিখড়া বা মাহি থ্রিভির দৎসনে কাড়-ফুক করেছেন। রসুনে বন্নীম (সা) বন্ধেনি : হাফসাকেও এ আমন শিখিয়ে দাও। শিখ বিনতে আবদুল্লাহর এ সংক্ষেপ একটি রেওয়ায়াত ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ ও নাসাই উচ্চ করেছেন। তিনি বন্ধেন, নবী সাধ্মাহ আগাইহি ওয়া সাধ্মাম আমাকে বন্ধেন, ভূমি হাফসাকে মেন গেয়াপড়া শিখিয়ে তেমনিভাবে এ কাড়-ফুকের আমনও শিখিয়ে দাও।

মুসলিমে আউফ ইবনে মাখের আশ্পার্যীর রেওয়ায়াত উচ্চ হয়েছে, তাতে তিনি বন্ধেন : আহেশিয়াতের যুগে আমরা কাড়-ফুক করতাম। আমরা রসুন্নাহ সাধ্মাহ আগাইহি ওয়া সাধ্মামকে শিখিসে করলাম, এ খাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বন্ধেন, তোমরা যে ধিনিস দিয়ে কাড়-ফুক করো তা আমার সামনে পেশ করো। তার মধ্যে যদি শিরক না থাকে তাহলে তার সাহায্যে আড়ায় কোন ক্ষতি নেই।

মুসলিম, মুসলাদে আহমাদ ও ইবনে মাধায় হয়রত আবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) রেওয়ায়াত উচ্চ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে রসুন্নাহ সাধ্মাহ আগাইহি ওয়া সাধ্মাম কাড়-ফুক নিষেধ করে দিয়েছিনেন। তারপর হয়রত আমর ইবনে হায়মের বৎশের পোকেরা এগো! তারা বললো, আমাদের কাছে এমন কিছু আমল দিন যার সাহায্যে আমরা বিছু (বা সাল) কামড়ানো রোগীকে আড়তাম, কিছু আপনি তা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তারপর তারা যা পড়তো তা তাকে শনাকো। তিনি বন্ধেন, “এর মধ্যে তো আমি কোন ক্ষতি দেখিবি না। তোমাদের কেউ যদি তার ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে তাহলে তাকে অবশ্যি তা করা উচিত।” আবের ইবনে আবদুল্লাহর (রা) দ্বিতীয় হর্দিসাটি মুসলিমে উচ্চ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : হায়ম পরিবারের পোকেরা সাপে কামড়ানো রোগীর নিরাময়ের একটা গ্রেক্রিয়া দানতো। রসুন্নাহ (সা) তাদেরকে তা থেঝোগ করার অনুমতি দেন। মুসলিম, মুসলাদে আহমাদ ও ইবনে মাধায় হয়রত আবেশা (রা) বর্ণিত রেওয়ায়াতিত একথা সমর্দ্দন করে। তাতে বলা হয়েছে : রসুন্নাহ (সা) আনসারদের একটি পরিবারকে প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণীর কামড়ে কাড়-ফুক করার অনুমতি দিয়েছিনেন। মুসলাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাধাহ ও মুসলিমেও হয়রত আবাস (রা) থেকে প্রায় এ একই ধরনের একটি রেওয়ায়াত উচ্চ হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসুন্নাহ (সা) বিয়ক্ত প্রণীদের কামড়, পিপড়ার দৎশন ও নন্দর ধানের অন্য কাড়-ফুক করার অনুমতি দিয়েছিনেন।

মুসলাদে আহমাদ, তিরমিয়ী, ইবনে মাধাহ ও হাকেম হয়রত উমাইয়ের মাশুলা ধার্বিন ধাহম (রা) থেকে একটি রেওয়ায়াত উচ্চ করেছেন। তাতে তিনি বন্ধেন, ধাক্কো যুগে আমি একটি আমল ধানতাম। তার সাহায্যে আমি কাড়-ফুক করতাম। আমি রসুন্নাহ সাধ্মাহ আগাইহি ওয়া সাধ্মামের সামনে তা পেশ করলাম। তিনি বন্ধেন, উমুক উমুক টিনিস এ থেকে বের করে দাও, এরপর যা থাকে তার সাহায্যে তুমি কাড়তে পারো।

মুআভায় বলা হয়েছে হয়রত আবু বকর (রা) তাঁর মেয়ে হয়রত আশেয়া (রা)-এর ধরে গেলেন। দেখলেন তিনি অসুস্থ এবং একটি ইহুদী মেয়ে তাঁকে কাড়-ফুক করছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি বললেন, আগ্রাহ কিভাব পড়ে আড়ো। এ থেকে ধানা গেলো, আহমি কিতাবরা যদি তাওরাত বা ইঞ্জিলের আয়াত পড়ে কাড়-ফুক করে তাহলে তা আয়েয়।

এখন ঝাড়-ফুক উপকারী কি না এ থেকে দেখা দেয়। এর জবাবে বলা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিত্সা ও ঔষধ ব্যবহার করতে কখনো নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক রোগের ঔষধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তোমরা রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধ ব্যবহার করো। রসূল (সা) নিজেও শোকদেরকে কোন কোন রোগের ঔষধ বলে দিয়েছেন। হাদীস গ্রহসমূহে সংকলিত “কিতাবুত তিব” (চিকিত্সা অধ্যায়) পাঠ করলে একথা জানা যেতে পারে। কিন্তু ঔষধও আল্লাহর হকুম ও অনুমতিক্রমেই উপকারী হতে পারে। নয়তো ঔষধ ও চিকিত্সা যদি সব অবস্থায় উপকারী হতো তাহলে হাসপাতালে একটি রূগ্ণীও যরতো না। এখন চিকিত্সা ও ঔষধের সাথে সাথে যদি আল্লাহর কালাম ও তাঁর আসমায়ে হসনা (ভালে ভালো নাম) থেকে ফায়দা হাসিল করা যায় অথবা যেসব জায়গায় চিকিত্সার কোন সুযোগ সুবিধা নেই সেখানে যদি আল্লাহর কালামের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর পরিত্র নাম ও শুণাৰচীর সহায়তা লাভ করা হয় তাহলে এ পদক্ষেপ একমাত্র ক্ষুব্ধাদীরা ছাড়া আর কারো কাছে বিবেক বিরোধী ঘনে হবে না।* তবে যেখানে চিকিত্সা ও ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় সেখানে জেনে বুঝেও তা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র ঝাড়-ফুকের ওপর নির্ভর করা কোনক্রমেই সঠিক পদক্ষেপ বলে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আর এভাবে একদল শোককে মাদুলি তাৰীজের দোকান খুলে সুযোগ মতো দু'পয়সা কামাই করার অনুমতিও কোনক্রমেই দেয়া যেতে পারে না।

এ ব্যাপারে অনেকে হ্যারত আবু সাঈদ খুদুরী (রা) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। হাদীসটি বুখারী, মুসলিম, তিরমিয়ী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় উচ্চৃত হয়েছে। বুখারীতে উচ্চৃত ইবনে আবুসের (রা) একটি বর্ণনাও এর সমর্থন করে। এতে বলা হয়েছে : রসূলে করীম (সা) কয়েকজন সাহাবীকে একটি অভিযানে পাঠান। হ্যারত আবু সাঈদ খুদুরীও (রা) তাঁদের সাথে ছিলেন। তাঁরা পথে একটি আরুব গোত্রের পল্লীতে অবস্থান করেন। তাঁরা গোত্রের লোকদের কাছে তাঁদের মেহমানদারী করার আবেদন জানান। কিন্তু তাঁরা অবৈকার করে। এ সময় গোত্রের সরদারকে বিচ্ছু কামড় দেয়। লোকেরা এ মুসাফির দলের কাছে এসে আবেদন জানায়, তোমাদের কোন ঔষধ বা আমল জানা থাকলে আমাদের সরদারের চিকিত্সা করো। হ্যারত

* ক্ষুব্ধাদী দুনিয়ার অনেক ডাক্তারও একথা বীকার করেছেন যে, দোয়া ও আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ মানসিক সংবেগ রোগীদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর উপাদান। আমার নিজের জীবনেও আমি এ ব্যাপারে দু'বার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ১৯৪৮ সালে কারাগাতে অস্তরীয় থাকা অবস্থায় আমার মূর্যদাসিতে একটি পাথর সৃষ্টি হয়। ঘোল ঘটা পর্যন্ত পেশাব আঁটকে থাকে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! আমি জালেমদের কাছে চিকিত্সার জন্য আবেদন করতে চাই না। তুমই আমার চিকিত্সা করো। কাজেই পেশাবের রাস্তা থেকে পাথরটি সত্ত্বে থায় এবং পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত সত্ত্বে থাকে। তারপর ১৯৬৮ সালে সেটি আবার কষ্ট দিতে থাকে। তখন অপ্রার্থেন করে তাকে বের করে দেলা হয়। আর একবার ১৯৫০ সালে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। সে সময় আমি কয়েক মাস থেকে দু'পায়ের গোছায় দাদে আচ্ছান্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পেতে থাকি। কোন রকম চিকিত্সার আরাম পাইলাম না। গ্রেফতারীর পর আল্লাহর কাছে ১৯৪৮ সালের মতো আবার সেই একই দোয়া করি। এরপর কোন প্রকার চিকিত্সা ও ঔষধ ছাড়াই সম্ভব নাদ একেবাবে নির্মূল হয়ে যায়। তারপর আর কখনো এ রোগে আক্রান্ত হইনি।

আবু সাইদ বলেন, আমরা জানি ঠিকই, তবে যেহেতু তোমরা আমাদের মেহমানদারী করতে অধীকার করেছে, তাই আমাদের কিছু দেবার ওয়াদা না করলে আমরা চিকিৎসা করবো না। তারা একটি ছাগলের পাল (কোন কোন বর্ণনা মতে ৩০টি ছাগল) দেবার ওয়াদা করে। ফলে হয়রত আবু সাইদ সরদারের কাছে যান। তার উপর সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁক দিতে থাকেন এবং যে জায়গায় বিচ্ছু কামড়েছে সেখানে নিজের মুখের লালা মলতে থাকেন।* অবশ্যে বিষের প্রভাব খতম হয়ে যায়। গোত্রের লোকেরা তাদের ওয়াদা মতো ছাগল দিয়ে দেয়। কিন্তু সাহাবীগণ নিজেদের মধ্যে বলতে থাকেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজেস না করে এ ছাগলগুলো থেকে কোন ফায়দা হাসিল করা যাবে না। কারণ, এ কাজে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয় কিনা তাত্ত্ব জানা নেই। কাজেই তারা নবী কর্মীর (সা) কাছে আসেন এবং সব ঘটনা বয়ান করেন। তিনি হেসে বলেন, তোমরা কেমন করে জানলে এ সূরা ঝাড়-ফুঁকের কাজেও লাগতে পারে? ছাগল নিয়ে নাও এবং তাতে আমার ভাগও রাখো।

কিন্তু তিরিমিয়ী বর্ণিত এ হাদীস থেকে মাদুলি, তাবীজ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে রীতিমতো চিকিৎসা করার জন্য চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান কায়েম করার অনুমতি প্রয়াণ করার আগে তদানীন্তন আরবের অবস্থাও সামনে রাখতে হবে। তৎকালীন আরবের এ অবস্থার চাপেই হয়রত আবু সাইদ খুদরী (রা) এ কাজ করেছিলেন। রসূলে কর্মণ্ড (সা) একে শুধু জায়েয়ই ঘোষণা করেননি বরং এতে নিজের অংশ ব্রাখার হকুমও দিয়েছিলেন, যাতে তার জায়েয় ও নাজায়েয় হবার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লোকদের মনে কোন প্রকার সদ্দেহের অবকাশ না থাকে। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আরবের অবস্থা সেকালে যেমনটি ছিল আজকেও তেমনটিই রয়ে গেছে। পঞ্চাশ, একশো, দেড়শো মাইল ঢলার পরও একটি জনবসতি চোখে পড়ে না। জনবসতিগুলোও ছিল ভির ধরনের। সেখানে কোন হোটেল, সরাইখানা বা দোকান ছিল না। মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে রওয়ানা হয়ে কয়েকদিন পরিশ্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অন্য বসতিতে পৌছে যে খাবার-দাবার কিনে কুধা নিবারণ করতে পারবে, এ ধরনের কোন ব্যবস্থাও সেকালে ছিল না। এ অবস্থায় আরবের প্রচলিত রীতি ছিল, মুসাফিররা এক জনবসতি থেকে আর এক জনবসতিতে পৌছলে সেখানকার স্নেকেরাই তাদের মেহমানদারী করতো। অনেক ক্ষেত্রে এ ধরনের মেহমানদারী করতে অধীক্ষিত জানালে মুসাফিরদের মৃত্যু অবধারিত হয়ে উঠতো। কাজেই এ ধরনের কার্যকলাপ আরবে অত্যন্ত নিন্দনীয় মনে করা হতো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সাহাবীগণের এহেন কার্যকলাপকে বৈধ গণ্য করেন। গোত্রের লোকেরা যখন মুসাফিরদের মেহমানদারী করতে অধীক্ষিত জানায় তখন তাদের সরদারের চিকিৎসা করতেও তারা অধীকার করেন এবং পরে বিনিয়য়ে কিছু দেয়ার শর্তে তাঁর চিকিৎসা করতে রাজি হন। তারপর তাদের একজন আল্লাহর উপর তরসা করে সূরা ফাতেহা পড়েন এবং সরদারকে ঝাড়-ফুঁক করেন। এর ফলে সরদার সুস্থ হয়ে ওঠে। ফলে গোত্রের লোকেরা চূক্ষি মোতাবেক পারিশ্রমিক এনে তাদের সামনে হায়ির করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল গণ্য করেন।

* হয়রত আবু সাইদ খুদরী (রা) যে এ অমূলটি করেছিলেন এ ব্যাপারে অধিকালে হাদীসে সুল্লিষ্ট বক্তব্য নেই। এমন কি হয়রত আবু সাইদ নিজে এ অভিযানে শরীক ছিলেন কি না একথাও সেখানে সুল্লিষ্ট নয়। কিন্তু তিরিমিয়ী বর্ণিত হাদীসে এ দু'টি কথাই সুল্লিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

বুখারী শরীফে এ ঘটনা সম্পর্কিত হয়েছে আবদুল্লাহ ইবনে আবাসের (রা) যে রেওয়ায়াত
আছে তাতে রসূলে করীমের (সা) বক্তব্যে বলা হয়েছে অধিকারী জন্য মানব করে আল্লাহর কিতাব পড়ে পারিষ্ঠিক
নিয়েছে, এটা তোমাদের জন্য বেশী ন্যায়সংগত হয়েছে। তাঁর একথা বলার কারণ হচ্ছে,
অন্যান্য সমস্ত আমলের তুলনায় আল্লাহর কালাম শ্রেষ্ঠ। তাহাড়া এভাবে আরবের সংস্কৃত
গোত্রের উপর ইসলাম প্রচারের হকও আদায় হয়ে যায়। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী
সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে কালাম এনেছেন তার বরকত তারা জানতে পারে।
যারা শহরে ও প্রায়ে বসে বাড়ি-ফুঁকের কারবার চালায় এবং একে নিজেদের অর্থ
উপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করে তাদের জন্য এ ঘটনাটিকে নজীর বলে গণ্য করা যেতে
পারে না। নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঙ্গন ও
প্রথম যুগের ইমামগণের মধ্যে এর কোন নজীর পাওয়া যায় না।

সূরা ফাতেহার সাথে এ সূরা দু'টির সম্পর্ক

সূরা আল ফালাক ও সূরা আন নাস সম্পর্কে সর্বশেষ বিবেচ্য বিষয়টি হচ্ছে, এ সূরা
দু'টির সাথে কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতেহার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কুরআন মজীদ
যেতাবে নাযিল হয়েছে, লিপিবদ্ধ করার সময় নুয়ুলের সেই ধারাবাহিকতার অনুসরণ করা
হয়নি। তেইশ বছর সময়-কালে বিভিন্ন পরিবেশ, পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এর
আয়ত ও সূরাগুলো নাযিল হয়েছে। বর্তমানে আমরা কুরআনকে যে আকৃতিতে দেখছি,
রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বেচ্ছাকৃতভাবে তাকে এ আকৃতি দান করেননি
বরং কুরআন নাযিলকারী আল্লাহর হকুম অনুযায়ী এ আকারে তাকে বিন্যস্ত করেছেন। এ
বিন্যাস অনুযায়ী কুরআনের সূচনা হয় সূরা ফাতেহা থেকে এবং সমাপ্ত হয় আল ফালাক
ও আন নাসে এসে। এখন উভয়ের উপর একবার দৃষ্টি বুলালে দেখা যাবে, শুরুতে রাবুল
আলামীন, রহমান রহীম ও শেষ বিচার দিনের মালিক আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ
করে বান্দা নিবেদন করছে, আমি তোমারই বন্দোগী করি, তোমারই কাছে সাহায্য চাই
এবং তোমার কাছে আমি যে সবচেয়ে বড় সাহায্যটা চাই সেটি হচ্ছে এই যে, আমাকে
সহজ-সরল-সত্য পথটি দেখিয়ে দাও। জবাবে সোজা পথ দেখাবার জন্য আল্লাহর পক্ষ
থেকে তার কাছে পুরো কুরআন মজীদটি নাযিল করা হয়। একে এমন একটি বক্তব্যের
ভিত্তিতে শেষ করা হয় যখন বান্দা সকাল বেলার রব, মানব জাতির রব, মানব জাতির
বানশাহ ও মানব জাতির ইলাহ মহান আল্লাহর কাছে এ মর্মে আবেদন জানায় যে, সে
প্রত্যেক সৃষ্টির প্রত্যেকটি ফিতনা ও অনিষ্টকারিতা থেকে সংরক্ষিত থাকার জন্য একমাত্র
তাঁরই কাছে আশ্রয় নেয়। বিশেষ করে জিন ও মানব জাতির অন্তরভুক্ত শয়তানদের
প্ররোচনা থেকে সে একমাত্র তাঁর-ই আশ্রয় চায়। কারণ, সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে সে-ই
হয় সবচেয়ে বড় বাধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সূরা ফাতেহার সূচনার সাথে এই শেষ দুই
সূরার যে সম্পর্ক তা কোন গভীর দৃষ্টি সম্পর্ক ব্যক্তির অগোচরে থাকার কথা নয়।

আয়াত ৫

সূরা আল ফাতার-মতী

কৃত ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম কর্মণাম যেহেনবান আল্লাহর নামে

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ
عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَنِ ۝ وَمِنْ
شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

বলো,^১ আশ্রয় চাহিই^২ আমি প্রভাতের রবের,^৩ এমন প্রত্যেকটি জিনিসের
অনিষ্টকারিতা থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন।^৪ এবং রাতের অঙ্ককারের
অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন তা হেয়ে যায়।^৫ আর গিরায় ফুর্দকারদানকারীদের (বা
কারিনীদের) অনিষ্টকারিতা থেকে।^৬ এবং হিংসুকের অনিষ্টকারিতা থেকে, যখন সে
হিংসা করে।^৭

১. রিসালাতের প্রচারের ঘন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অহীর
মাধ্যমে যে পয়গাম নাযিল হয় কুল (বলো) শব্দটি যেহেতু তার একটি অংশ, তাই
একথাটি প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংৰোধন করে উচ্চারিত
হলেও তার পরে প্রত্যেক মু'মিনও এ সংৰোধনের আওতাভুক্ত হয়।

২. আশ্রয় চাওয়া কাজটির তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে। এক, আশ্রয় চাওয়া। দুই, যে
আশ্রয় চায়। তিন, যার কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। আশ্রয় চাওয়ার অর্থ, কোন জিনিসের
ব্যাপারে তায়ের অনুভূতি জাগার কারণে নিজেকে তার হাত থেকে বাঁচাবার ঘন্য অন্য
কারো হেফাজতে ঢলে যাওয়া, তার অত্তরান গ্রহণ করা, তাকে ঝড়িয়ে ধরা বা তার
ছায়ায় ঢলে যাওয়া। আশ্রয়প্রাপ্তী অবশ্যি এমন এক ব্যক্তি হয়, যে অনূভব করে যে, সে যে
জিনিসের তায়ে ভীত তার মোকাবেলা করার শক্তি তার নেই। বরং তার হাত থেকে
বাঁচার জন্য তার অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করা প্রয়োজন। তারপর যার আশ্রয় চাওয়া হয় সে
অবশ্যি এমন কোন ব্যক্তিত্ব বা সম্ভা হয় যার ব্যাপারে আশ্রয় গ্রহণকারী মনে করে সেই
ভয়ংকর জিনিস থেকে সে-ই তাকে বাঁচাতে পারে। এখন এক প্রকার আশ্রয়ের প্রাকৃতিক
আইন অনুযায়ী কার্যকারণের জগতে কোন অনুভূত জড় পদার্থ, ব্যক্তি বা শক্তির কাছে
গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন শক্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন দুর্গের আশ্রয়
নেয়া, গোলাশুলীর বর্ষণ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য পরিখা, বালি ভর্তি ধলের প্রাচীর বা

ইটের দেয়ালের আড়াল নেয়া, কোন শক্তিশালী জালেমের হাত থেকে বৌচার জন্য কোন ব্যক্তি, জাতি বা রাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করা অথবা ঝোদ থেকে নিজেকে বৌচাবার জন্য কোন গাছ বা দালানের ছায়ায় আশ্রয় নেয়া। এর বিপরীতে দিতীয় প্রকারের আশ্রয় হচ্ছে, প্রত্যেক ধরনের বিপদ, প্রত্যেক ধরনের বস্তুগত, নেতৃত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি এবং ক্ষতিকর বস্তু থেকে কোন অতি প্রাকৃতিক সভার আশ্রয় এ বিশাসের ভিত্তিতে গ্রহণ করা যে ইস্তিয় বহির্ভূত অনন্তরূপ পদ্ধতিতে তিনি আশ্রয় গ্রহণকারীকে অবশ্যি সজ্ঞক্ষণ করতে পারবেন।

শুধু এখানেই নয়, কুরআন ও হাদীসের যেখানেই আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার কথা এসেছে, সেখানেই এ বিশেষ ধরনের আশ্রয় চাওয়ার অর্থেই তা বলা হয়েছে। আল্লাহ ছাড়া আর কাঠো কাছে এ ধরনের আশ্রয় প্রার্থনা না করাটাই তাওহীদী বিশাসের অপরিহার্য অংশ। মুশর্রিকরা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য সভা যেমন জিন, দেবী ও দেবতাদের কাছে এ ধরনের আশ্রয় চাইতো এবং আজো চায়। বস্তুবাদীরা এ জন্য বস্তুগত উপায়-উপকরণের দিকে মুখ ফিরায়। কারণ, তারা কোন অতি প্রাকৃতিক শক্তিতে বিশাসী নয়। কিন্তু মু'মিন যেসব আগদ-বিপদ ও বা঳া-মুসিবতের মোকাবেলা করার ব্যাপারে নিজেকে অক্ষম মনে করে, সেগুলোর ব্যাপারে সে একমাত্র আল্লাহর দিকে মুখ ফিরায় এবং একমাত্র তাঁরই সঙ্গে আশ্রয় প্রার্থনা করে। উদাহরণ ব্রহ্ম মুশর্রিকদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِنِ يَعُونُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ -

“আর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মানব জাতির অস্তরভূক্ত কিছু লোক জিন জাতির অস্তরভূক্ত কিছু লোকের কাছে আশ্রয় চাইতো।” (আল জিন, ৬) এর ব্যাখ্যায় আয়রা সূরা জিনের ৭ টিকায় হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) বর্ণিত একটি হাদীস উন্নত করছি। তাতে বলা হয়েছে : আরব মুশর্রিকদের যখন কোন রাতে কোন জনমানবইন উপত্যকায় রাত কাটাতে হতো তখন তারা চিঢ়কার করে বলতো : “স্মামরা এ উপত্যকার রবের অর্থেও এ উপত্যকার উপর কর্তৃশালী জিন বা এ উপত্যকার মালিক) আশ্রয় চাচ্ছি।” অন্যদিকে, ফেরাউন সম্পর্কে, বলা হয়েছে : হ্যরত মুসার (আ) পেশকৃত মহান নিশানীগুলো দেখে (فَتَوَلَّ بِرِكْنَةِ)। “নিজের শক্তি সামর্থের উপর নির্ভর করে সে সদর্পে নিজের ঘাড় ঘূরিয়ে ধাঁকলো।” (আয় যারিয়াত, ৩৯)। কিন্তু কুরআনে আল্লাহ বিশাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মনীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : তারা বস্তুগত, নেতৃত্বিক বা আধ্যাত্মিক যে কোন জিনিসের ভৌতি অনুভব করলে তার অনিষ্ট থেকে বৌচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই হ্যরত মারয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে : যখন অক্ষয় নিজসে আল্লাহর ফেরেশতা একজন মানুষের বেশ ধরে তাঁর কাছে এলেন (তিনি তাঁকে আল্লাহর ফেরেশতা বলে জানতেন না) তখন তিনি বললেন :

أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْ كَيْنَةِ أَنْ كُنْتَ تَقْبِيَاً -

“যদি তোমার আল্লাহর ভয় থাকে, তাহলে আমি দয়াময় আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।” (মারয়াম, ১৮) হ্যরত নূহ (আ) যখন আল্লাহর কাছে অবাস্তব দোয়া করলেন এবং জবাবে আল্লাহ তাঁকে শাসালেন তখন তিনি সংগে সংগেই আবেদন জানালেন :

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمٌ

“হে আমার রব। যে জিনিস সম্পর্কে আমার জ্ঞান নেই তেমন কোন জিনিস তোমার কাছে চাওয়া থেকে আমি তোমার পানাহ চাই।” (হৃদ, ৪৭) হ্যরত মূসা (সা) যখন বনি ইসরাইলদের গাভী যবেহ করার হকুম দিলেন এবং তারা বললো, আপনি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছেন? তখন তিনি তাদের জবাবে বললেন :

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

“আমি মূর্খ-অজ্ঞদের মতো কথা বলা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাচ্ছি।”

(আল বাকারাহ, ৬৭)

হাদীস গ্রন্থগুলোতে রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম থেকে যেসব “তাঅটেউ” উদ্ভৃত হয়েছে সবগুলো এ একই পর্যায়ের। উদাহরণ ব্রহ্ম তাঁর নিম্নোক্ত দোয়াগুলো দেখা যেতে পারে :

عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتَ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ (مسلم)

“হ্যরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লাম নিজের দোয়াগুলোতে বলতেন : হে আল্লাহ! আমি যেসব কাজ করেছি এবং যেসব কাজ করিনি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। অর্থাৎ কোন ধারাপ কাজ করে থাকলে তার ধারাপ ফল থেকে পানাহ চাই এবং কোন কাজ করা উচিত ছিল কিন্তু তা আমি করিনি, যদি এমন ব্যাপার ঘটে থাকে তাহলে তার অনিষ্ট থেকেও তোমার পানাহ চাই। অথবা যে কাজ করা উচিত নয় কিন্তু তা আমি কথনো করে ফেলবো, এমন সম্ভাবনা থাকলে তা থেকেও তোমার আশ্রয় চাই।” (মুসলিম)

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوُلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَأَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخْطِكَ (مسلم)

“ইবনে উমর থেকে বর্ণিত। রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি উয়া সাল্লামের একটি দোয়া ছিল : হে আল্লাহ! তোমার যে নিয়ামত আমি নাভ করেছি তা যাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে না নেয়া হয়, তোমার কাছ থেকে যে নিরাপত্তা আমি শাভ করেছি তা থেকে যাতে আমাকে বধিত না করা হয়, তোমার গবেষ যাতে অকস্মাৎ আমার উপর আপত্তি না হয় সে জন্য এবং তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টি থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি” (মুসলিম)।

عن زيد بن أرقم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تُتَشْبِئُ
وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ (مسلم)

“যারেদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : যে ইন্দ্র উপকারী নয়, যে হৃদয় তোমার তয়ে তৈত নয়, যে নফস কখনো ভৃত্য শাও করে না এবং যে দোয়া কবুল করা হয় না, আমি সেসব থেকে তোমার আশ্রয় চাছি” (মুসলিম)।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُمُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجَّيْعُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ
فَإِنَّهُ بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ (ابو داود)

“হ্যরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : হে আল্লাহ! আমি ক্ষুধা থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ, মানুষ যেসব জিনিসের সাথে রাত অতিবাহিত করে তাদের মধ্যে ক্ষুধা সবচেয়ে খারাপ জিনিস। আর আত্মসাধ থেকে তোমার আশ্রয় চাই। কারণ এটা বড়ই কল্পিত হৃদয়ের পরিচায়ক।” (আবু দাউদ)।

عَنْ أَنْسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجَذَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ (ابو داود)

“হ্যরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : হে আল্লাহ! আমি শ্বেতকৃষ্ণ, উন্মাদনা, কৃষ্টরোগ ও সমস্ত খারাপ রোগ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।” (আবু দাউদ)

عَنْ عَائِشَةَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَجَاتِ
الَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ -

“আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত কথাগুলো সহ দোয়া চাইতেন : হে আল্লাহ! আমি আগন্তনের ফিত্না এবং ধনী ও দরিদ্র হওয়ার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই” (তিরমিয়ী ও আবু দাউদ)।

عَنْ قَطْبَةِ بْنِ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ (ترمذি)

“কুতুবাহ ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অসৎ চরিত্র, অসৎ কাজ ও অসৎ ইচ্ছা থেকে তোমার আশ্রয় চাই।”

শাকাল ইবনে হমাইদ রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, আমাকে কোন দোয়া বলে দিন। জবাবে তিনি বলেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعٍ، وَمِنْ شَرِّ بَصَرٍ، وَمِنْ شَرِّ
لِسَانٍ، وَمِنْ شَرِّ قَلْبٍ، وَمِنْ شَرِّ مَنْتِي -

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশয় চাই আমার শ্ববণশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার বাকশক্তির অনিষ্ট থেকে, আমার হৃদয়ের অনিষ্ট থেকে এবং আমার যৌন ক্ষমতার অনিষ্ট থেকে।” (তিরমিয়া ও আবু দাউদ)।

عن انس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجَزِ وَالْكَسْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ (وفي رواية لمسلم) وَضَلَّعِ
الدِّينِ وَغَلَبةِ الرِّجَالِ (بخارى ومسلم)

“আলাস ইবনে মালেক থেকে বর্ণিত। রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন : হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, কৃড়েমি, কাপুরুষতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে তোমার আশয় চাই। আর তোমার আশয় চাই কবরের আয়াব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। (মুসলিমের অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে :) আর খণ্ডের বোৰা থেকে এবং লোকেরা আমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, এ থেকে তোমার কাছে আশয় চাই।” (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ خَوْلَةِ بْنَتِ حُكَيمِ السُّلَمِيَّةِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَّلَ مَنْزِلَةً لَّمْ قَالَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ
شَرِّمَا خَلَقَ لَمْ يَضُرُّهُ شَئْ هَنْتِي يَرْتَحِلُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ (مسلم)

“খাওলা বিনতে হকাইম সুলামীয়া থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন নতুন ঘনফিলে নেমে একথাগুলো বলবে—আমি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর নিষ্কলৎক কালেমাসমূহের আশয় চাই, সেই ঘনফিল থেকে রওয়ানা হবার আগে পর্যন্ত তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না।” (মুসলিম)

রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কাছে যেতাবে আশয় প্রার্থনা করেছিলেন হাদীস থেকে তার কয়েকটি নমুনা এখানে আমরা তুলে ধরলাম। এ থেকে জানা যাবে, প্রতিটি বিপদ-আপদ ও অনিষ্টকারিতার মোকাবেলায় আল্লাহর কাছে আশয়

চাওয়াই মুমিনের কাজ। অন্য কাঙ্গা কাছে নয়। তাছাড়া আল্লাহর প্রতি বিমুখ ও অনিভৱ হয়ে নিজের উপর ভরসা করাও তার কাজ নয়।

৩. মূলে **رَبُّ الْفَلَقِ** (রবিল ফালাক) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। “ফালাক” শব্দের আসল মানে হচ্ছে ফটানো, চিরে ফেলা বা তেদ করা। কুরআন ব্যাখ্যাদাতদের বিপুল সংখ্যক অংশ এ শব্দটির অর্থ গ্রহণ করেছেন, রাতের অঙ্ককার চিরে প্রভাতের শুভতার উদয় হওয়া। কারণ, আরবীতে “ফালাকুস সুবহ” (فَلَقُ الصَّبْحِ) শব্দ “প্রভাতের উদয়” অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। কুরআনেও মহান আল্লাহর জন্য **فَالْأَصْبَحْ** (ফালেকুল ইসবাহ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মানে, “যিনি রাতের আধার চিরে প্রভাতের উদয় করেন।” (আল আন’আম, ১৬) “ফালাক” শব্দের হিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে সৃষ্টি করা। কারণ দুনিয়ায় যত জিনিসই সৃষ্টি হয়, সবগুলোই কোন না কোন জিনিস তেদ করে বের হয়। বীজের বুক চিরে সব ধরনের গাছ ও উদ্ভিদের অংকুর বের হয়। সব ধরনের প্রাণী মায়ের গর্ভাশয় চিরে অথবা ডিম ফুটে কিংবা অন্য কোন আবরণ তেদ করে বের হয়। সমস্ত ঘরণা ও নদী পাহাড় বা মাটি চিরে বের হয়। দিবস বের হয় রাতের আবরণ চিরে। বৃষ্টির ধারা মেঘের স্তর তেদ করে পৃথিবীতে নামে। মোটকথা, অস্তিত্ব জগতের প্রতিটি জিনিস কোন না কোনভাবে আবরণ তেদ করার ফলে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ করে। এমনকি পৃথিবী ও সমগ্র আকাশ মণ্ডলও প্রথমে একটি সূপ ছিল। তারপর তাকে বিদীর্ণ করে পৃথক পৃথক অস্তিত্ব দান করা হয়েছে।

كَانَتَا رَنْقًا فَفَتَّفَنَاهُمَا এ আকাশ ও পৃথিবী সবকিছুই সূর্পাকৃত ছিল, পরে আমি এদেরকে আলাদা আলাদা করে দিয়েছি। (আল আবিয়া, ৩০) কাজেই এ অর্থের প্রেক্ষিতে ফালাক শব্দটি সমস্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। এখন এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করলে আয়াতের অর্থ হবে, আমি প্রভাতের মালিকের আশ্রয় চাচ্ছি। আর হিতীয় অর্থটি গ্রহণ করলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টি জগতের রবের আশ্রয় চাচ্ছি। এখানে আল্লাহর মূল সভাবাচক নাম ব্যবহার না করে তাঁর গুণবাচক নাম “রব” ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ, আশ্রয় চাওয়ার সাথে আল্লাহর “রব” অর্থাৎ মালিক, প্রতু ও পরম্পরারদিগার হবার গুণবলীই বেশী সম্পর্ক রাখে। তাছাড়া “রবুল ফালাক” এর অর্থ যদি প্রভাতের রব ধরা হয় তাহলে তাঁর আশ্রয় চাওয়ার মানে হবে, যে রব অঙ্ককারের আবরণ তেদ করে প্রভাতের আলো বের করে আনেন আমি তাঁর আশ্রয় নিছি। এর ফলে তিনি বিপদের অঙ্ককার জাল তেদ করে আমাকে নিরাপত্তা দান করবেন। আর যদি এর অর্থ সৃষ্টিজগতের রব ধরা হয়, তাহলে এর মানে হবে, আমি সমগ্র সৃষ্টির মালিকের আশ্রয় নিছি। তিনি নিজের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমাকে বৌঢ়াবেন।

৪. অন্য কথায় সমগ্র সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আমি তাঁর আশ্রয় চাচ্ছি। এ বাক্যে চিন্তা করার মতো কয়েকটি বিষয় আছে। প্রথমত অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির ব্যাপারটিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়নি। বরং সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর অনিষ্টকারিতাকে সম্পর্কিত করা হয়েছে সৃষ্টির সাথে। অর্থাৎ একথা বলা হয়নি যে, আল্লাহ যে অনিষ্টকারিতাসমূহ সৃষ্টি করেছেন সেগুলো থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। বরং বলা হয়েছে, আল্লাহ যেসব জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তাদের অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। এ থেকে জানা যায়, মহান আল্লাহ কোন সৃষ্টিকে অনিষ্টকারিতার জন্য সৃষ্টি

করেননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কাজ কল্যাণকর এবং কোন না কোন কল্যাণগুলক প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্যই হয়ে থাকে। তবে সৃষ্টির মধ্যে তিনি যেসব শুণ সমাহিত করে রেখেছেন, যেগুলো তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন, সেগুলো থেকে অনেক সময় এবং অনেক ধরনের সৃষ্টি থেকে প্রায়ই অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে।

ত্বরীয়ত, যদি শুধু একটি মাত্র বাক্য বলেই বক্তব্য শেষ করে দেয়া হতো এবং প্রবর্তী বাক্যগুলোতে বিশেষ ধরনের সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে আলাদা আলাদাভাবে আল্লাহর আশয় গ্রহণ করার কথা নাই—বা বলা হতো তাহলেও এ বাক্যটি বক্তব্য বিষয় পুরোপুরি প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ, এখানে সমস্ত সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর আশয় চেয়ে নেয়া হয়েছে। এই ব্যাপকভাবে আশয় চাওয়ার পর আবার কৃতিগ্রহণ বিশেষ অনিষ্টকারিতা থেকে আশয় চাওয়ার কথা বলা ব্রহ্মবৃত্তভাবে এ অর্থই প্রকাশ করে যে, আমি স্বাভাবিকভাবে আল্লাহর প্রত্যেকটি সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে তাঁর আশয় চাছি, তবে বিশেষভাবে সূরা আল ফালাকের অবশিষ্ট আয়াতসমূহে শ সূরা আন নাসে যেসব অনিষ্টকারিতার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো এমন পর্যায়ের যা থেকে আমি আল্লাহর নিরাপত্তা লাভের বড় বেশী মুশাপেক্ষী।

ত্বরীয়ত, সৃষ্টিলোকের অনিষ্টকারিতা থেকে পানাহ লাভ করার জন্য সরচেয়ে সংগত ও প্রত্যবশালী আশয় চাওয়ার ব্যাপার যদি কিছু হতে পারে, তবে তা হচ্ছে তাদের সৃষ্টির কাছে আশয় চাওয়া। কারণ, তিনি সব অবস্থায় নিজের সৃষ্টির উপর প্রাধান্য বিভাগ করে আছেন। তিনি তাদের এমন সব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে জানেন যেগুলো আমরা জানি, আবার আমরা জানিনা এমনসব অনিষ্টকারিতা সম্পর্কেও তিনি জানেন। কাজেই তাঁর আশয় হবে, যেন এমন সর্বশ্রেষ্ঠ শাসকের কাছে আশয় গ্রহণ যার মোকাবেলা করার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কাছে আশয় চেয়ে আমরা দুনিয়ার প্রত্যেকটি সৃষ্টির জানা-অজানা অনিষ্টকারিতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। তাছাড়া কেবল দুনিয়ারই নয়, আবেরাতের সকল অনিষ্টকারিতা থেকেও পানাহ চাওয়াও এর অস্তরভূক্ত হয়েছে।

চতুর্থত, অনিষ্টকারিতা শব্দটি ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণার জন্যও ব্যবহার করা হয়। আবার যে কারণে ক্ষতি, কষ্ট, ব্যথা ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় সে জন্যও ব্যবহার করা হয়। যেমন ঝোগ, অনাহার, কোন যুক্তে বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, সাপ-বিছু ইত্যাদি দ্বারা দণ্ডিত হওয়া, সভানের মৃত্যু শোকে কাতর হওয়া এবং এ ধরনের আরো অন্যান্য অনিষ্টকারিতা প্রথমোক্ত অর্থের অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলো যথার্থই কষ্ট ও যন্ত্রণা। অন্যদিকে দৃষ্টিতে ব্রহ্ম কুফরী, শিরুক এবং যেসব ধরনের গোনাহ ও জুলুম হিতীয় প্রকার অনিষ্টকারিতা। কারণ, এগুলোর পরিগাম কষ্ট ও যন্ত্রণা। যদিও আপাত দৃষ্টিতে এগুলো সাময়িকভাবে কোন কষ্ট ও যন্ত্রণা দেয় না বরং কোন গোনাহ বেশ আরামের। সেসব গোনাহ করে আনন্দ পাওয়া যায় এবং লাভের অংকটাও হাতিয়ে নেয়া যায়। কাজেই এ দু'অর্থেই অনিষ্টকারিতা থেকে আশয় চাওয়া হয়।

পঞ্চমত, অনিষ্টকারিতা থেকে আশয় চাওয়ার মধ্যে আরো দু'টি অর্থও রয়েছে। যে অনিষ্ট ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। বাস্তা আল্লাহর কাছে দোয়া করছে, হে আল্লাহ! তাকে খতম করে দাও। আর যে অনিষ্ট এখনো হয়নি, তার সম্পর্কে বাস্তা দোয়া করছে, হে আল্লাহ! এ অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো।

৫. সৃষ্টিজগতের অনিষ্টকারিতা থেকে সাধারণতাবে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়ার পর এবার কয়েকটি বিশেষ সৃষ্টির অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষভাবে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। মূল আয়াতে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। 'গাসেক' এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অঙ্গুকার। কুরআনে এক জায়গায় বলা হয়েছে : **أَقْرَمَ الْمُصْلِمَةَ** "নামায কায়েম করো সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাতের অঙ্গুকার পর্যন্ত।" (বনি ইসরাইল, ৭৮)

আর 'ওয়া কাবা' (وَقَبْ) মানে হচ্ছে, প্রবেশ করা বা ছেয়ে যাওয়া। রাতের অঙ্গুকারের অনিষ্টকারিতা থেকে বিশেষ করে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেবার কারণ হচ্ছে এই যে, অধিকাল অপরাধ ও জুনুম রাতের অঙ্গুকারেই সংঘটিত হয়। হিস্ত জীবেরাও রাতের আধারেই বের হয়। আর এ আয়াতগুলো নাখিল হবার সময় আরবে রাজনৈতিক অরাজকতা যে অবস্থায় পৌছে গিয়েছিল তাতে রাতের চিত্ত তো ছিল অত্যন্ত তয়াবহ। তার অঙ্গুকার চাদর মুড়ি দিয়ে শুটেরা ও আক্রমণকারীর বের হতো। তারা জনবসতির উপর ঝাপিয়ে পড়তো শুটতরাজ ও খুনাখুনি করার জন্য যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণ নাশের চেষ্টা করছিল, তারাও রাতের আধারেই তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা তৈরি করেছিল। কারণ, এভাবে হত্যাকারীকে চেনা যাবে না। ফলে তার সন্ধান লাভ করা সম্ভব হবে না। তাই রাতের বেলা যেসব অনিষ্টকারিতা ও বিপদ-আপদ নাখিল হয় সেগুলো থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার ক্ষুম দেয়া হয়েছে। এখানে আধার রাতের অনিষ্টকারিতা থেকে প্রভাতের রবের আশ্রয় চাওয়ার মধ্যে যে সূক্ষ্মতম সম্পর্ক রয়েছে তা কোন গভীর পর্যবেক্ষকের দৃষ্টির আড়ালে থাকার কথা নয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন দেখা দেয়। বিভিন্ন সহীহ হাদীসে হয়েছে আয়েশার (রা) একটি বর্ণনা এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, রাতে আকাশে চাঁদ বলমল করছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে তার দিকে ইশারা করে বলেন, আল্লাহর কাছে পানাহ চাও : **إِذَا حَسِقَ أَذًا وَقَبْ** : অর্থাৎ এ হচ্ছে সেই গাসেক ইয়া ওয়াকাব (আহমাদ, তিরমিয়ী, নাসার্দ, ইবনে জাসীর, ইবনুল মুনফির, হাকেম ও ইবনে মারদুইয়া)। এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন, ইয়া ওয়াকাব (ইয়া খাসাকা) অর্থাৎ যখন তার গ্রহণ হয়ে যায় অথবা চন্দ্ৰগ্রহণ তাকে ঢেকে ফেলে। কিন্তু কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি যে, যখন রসূলুল্লাহ (সা) চাঁদের দিকে এভাবে ইশারা করেছিলেন তখন চন্দ্ৰগ্রহণ চলছিল। আরবী আভিধানিক অর্থেও **إِذَا حَسِقَ** অর্থাৎ কখনো হয় না। তাই আমার মতে এ হাদীসটির সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে : চাঁদের উদয় যেহেতু রাতের বেগায়ই হয়ে থাকে এবং দিনের বেলা চাঁদ আকাশের গায়ে থাকলেও উচ্চল থাকে না, তাই রসূলুল্লাহ (সা) উক্তির অর্থ হচ্ছে—এর (অর্থাৎ চাঁদের) আগমনের সময় অর্থাৎ রাত থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। কারণ, চাঁদের আলো আত্মরক্ষাকারীর জন্য ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় আক্রমণকারীর জন্য আর তা অপরাধীকে যতটুকু সহায়তা করে, যে অপরাধের শিকার হয় তাকে ততটুকু সহায়তা করে না। এ জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا غَرَبَتْ انتَشَرَتِ الشَّيَاطِينُ فَاكْفِتُوا صَبِيَانَكُمْ
وَاحْبَسُوا مَوَاشِيكُمْ حَتَّى تَذَهَّبَ فَحْمَدُ الْعَشَاءِ -

“যখন সূর্য ডুবে যায়, তখন শয়তানরা সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই শিশুদেরকে তখন ঘরের মধ্যে রাখো এবং নিজেদের গৃহপালিত পশুগুলোও বেঁধে রাখো, যতক্ষণ রাতের আধার থতম না হয়ে যায়।”

৬. মূলে نَفَتْتُ فِي الْعُقْدِ شব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। ‘উকাদ’ (عُقد) শব্দটি ‘উকদাতুন’ (عقدة) শব্দের বহবচন। এর মানে হচ্ছে গিরা। যেমন সূতা বা বুশিতে যে গিরা দেয়া হয়। নাফস (نفث) মানে ফুক দেয়া। নাফফাসাত (نفثت) হচ্ছে নাফফাসাত (نفاث)-এর বহবচন। এ শব্দটিকে উলম্ভে এর ওজনে ধরা হলে এর অর্থ হবে খুব বেশী ফুকদানকারী। আর ঝীলিংগে এর অর্থ করলে দীড়ায় খুব বেশী ফুকদানকারিনীরা অথবা ফুকদানকারী ব্যক্তিবর্গ বা দলের। কারণ আরবিতে ‘নফস’ (ব্যক্তি) ও ‘জামায়াত’ (দল) ঝীলিংগ অধিকার্ণ তথা সকল মুফাস্সিরের মতে গিরায় ফুক দেয়া শব্দটি যাদুর জন্য রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। কারণ, যাদুকর সাধারণত কোন সূতায় বা ডোরে গিরা দিতে এবং তাতে ফুক দিতে থাকে। কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আমি পূর্ব যাদুকর বা মহিলা যাদুকরদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য প্রভাতের রংবের আশয় চাচ্ছি। রসূলগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন যাদু করা হয়েছিল, তখন জিরীল আলাইহিস সালাম এসে তাকে সূরা আল ফালাক ও আন নাস পড়তে বলেছিলেন। এ হাদীসটি থেকেও উপরের অর্থের সমর্থন পাওয়া যায়। এ সূরা দু'টির এ একটি বাক্যই সরাসরি যাদুর সাথে সম্পর্ক রাখে। আবু মুসলিম ইসফাহানী ও যামাখারী ‘নাফফাসাত ফিল উকাদ’ বাক্যাশের অন্য একটি অর্থও বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, এর মানে হচ্ছে : মেয়েদের প্রতারণা এবং পুরুষদের সংকুল, যতায়ত ও চিন্তা-ভাবনার উপর তাদের প্রভাব বিস্তার। একে তারা তুলনা করেছেন যাদুকরের যাদুকর্মের সাথে। কারণ, মেয়েদের প্রেমে মন্ত হয়ে পুরুষদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যায়, যেন মনে হয় কোন যাদুকর তাদেরকে যাদু করেছে। এ ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত রসাত্তুক হলেও পূর্ববর্তী ব্যাখ্যাদাতাগণ এর যে ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন, এটি সেই স্বীকৃত ব্যাখ্যার পরিপন্থী। আর ইতিপূর্বে আমরা ভূমিকায় এ দু'টি সূরা মাধ্যিলের যে সমকালীন অবস্থার বর্ণনা দিয়ে এসেছি তার সাথে এর মিল নেই।

যাদুর ব্যাপারে অবশ্য একথা জেনে নিতে হবে, এর মধ্যে অন্য লোকের উপর খারাপ প্রভাব ফেলার জন্য শয়তান, প্রেতাত্মা বা নক্ষত্রসমূহের সাহায্য চাওয়া হয়। এ জন্য কুরআনে একে কুফরী বলা হয়েছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
“সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু শেখাতো।” (আল বাকারা, ১০২) কিন্তু তার মধ্যে কোন কুফরী কালেমা বা শিরকী কাজ না থাকলেও তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এমন সাতটি কবীরা গোনাহের অস্তরভূক্ত করেছেন, যা মানুষের আধেরাত বরবাদ করে দেয়। এ

প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে হয়েছে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাই ই উয়া সাল্লাম বলেছেন, সাতটি ধর্মসকর জিনিস থেকে দূরে থাকো। সোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! সেগুলো কি? বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু, আল্লাহ যে প্রাণ নাশ হারাব করেছেন ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া সেই প্রাণ নাশ করা, সুন খাওয়া, এতিমের সম্পত্তি গ্রাস করা, জিহাদে দুশ্মনের যোকাবিলায় পালিয়ে যাওয়া এবং সরল সতীসাধী মু'মিন মেয়েদের বিবরণকে ব্যক্তিত্বের দোষারোপ করা।

৭. হিসার মানে হচ্ছে, কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ যে অনুগ্রহ, শ্রেষ্ঠত্ব বা গুণাবলী দান করেছে তা দেখে কোন ব্যক্তি নিজের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে এবং তার থেকে উগুলো ছিনিয়ে নিয়ে এ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেয়া হোক, অথবা কমপক্ষে তার থেকে সেগুলো অবশ্যিত ছিনিয়ে নেয়া হোক এ আশা করতে থাকে। তবে কোন ব্যক্তি যদি আশা করে, অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করা হয়েছে তার প্রতিও তাই করা হোক, তাহলে এটাকে হিসার সংজ্ঞায় ফেলা যায় না। এখানে হিসুক যখন হিসা করে অর্থাৎ তার মনের আগুন নিভাবার জন্য নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কোন পদক্ষেপ নেয়, সেই অবস্থায় তার অনিষ্টকারিতা থেকে বৌঢ়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। কারণ, যতক্ষণ সে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না ততক্ষণ তার জ্বালা-পোড়া তার নিজের জন্য খারাপ হলেও যার প্রতি হিসা করা হচ্ছে তার জন্য এমন কোন অনিষ্টকারিতায় পরিণত হচ্ছে না, যার জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চাওয়া যেতে পারে। তারপর যখন কোন হিসুক থেকে এমন ধরনের অনিষ্টকারিতার প্রকাশ ঘটে তখন তার হাত থেকে বৌঢ়ার থধানতম কৌশল হিসেবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে। এই সাথে হিসুকের অনিষ্টকারিতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আরো কয়েকটি জিনিসও সহায় কর্তৃত হয়। এক, মানুষ আল্লাহর উপর ভরসা করবে এবং আল্লাহ না চাইলে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, একথায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করবে। দুই, হিসুকের কথা শুনে সবর করবে। বেসবর হয়ে এমন কোন কথা বলবে না বা কাজ করতে থাকবে না, যার ফলে সে নিজেও নৈতিকভাবে হিসুকের সাথে একই সমতলে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। তিনি, হিসুক আল্লাহভীতি বিসর্জন দিয়ে বা চরম নির্ণজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যতই অন্যায়-অশালীন আচরণ করতে থাকুক না কেন, যার প্রতি হিসী করা হচ্ছে সে যেন সবসময় তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। চার, তার চিন্তা যেন কোন প্রকারে মনে ঠাই না দেয় এবং তাকে এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন সে নেই। কারণ, তার চিন্তায় যত হয়ে যাওয়াই হিসুকের হাতে পরাজয় বরশের পূর্ব লক্ষণ। পাঁচ, হিসুকের সাথে অসংবহার করা তো দুর্ভাব কথা, কখনো যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, যার প্রতি হিসা করা হচ্ছে যে হিসাকারীর সাথে সংঘবহার ও তার উপকার করতে পারে, তাহলে তার অবশ্যি তা করা উচিত। হিসুকের মনে যে জ্বালাপোড়া চলছে, প্রতিপক্ষের এ সংঘবহারে তা কতটুকু প্রশংসিত হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে নজর দেবার কোন প্রয়োজন নেই! হয়, যে ব্যক্তির প্রতি হিসী করা হচ্ছে সে তাওহীদের আকীদা সঠিকভাবে উপলক্ষ করে তার উপর অবিচল থাকবে। কারণ, যে হৃদয়ে তাওহীদের আকীদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আল্লাহর উয়ের সাথে অপর কাঠো ভয় স্থান লাভ করতে পারে না।

আয়াত ৬

সূরা আন নাস-মৰী

জৰু' ১

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম করণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝
 مِنْ شَرِّ الْوَسَوَاسِ ۝ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ
 فِي صُلُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

বলো, আমি আশ্রয় চাহি মানুষের রব, মানুষের বাদশাহ, মানুষের প্রকৃত মাবুদের কাছে,^১ এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে,^২ যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।^৩

১. এখানেও সূরা আল ফালাকের মতো ‘আউয়ু বিল্লাহ’ বলে সরাসরি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার পরিবর্তে আল্লাহর তিনটি শুণের মাধ্যমে তাঁকে শ্রবণ করে তাঁর আশ্রয় নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ তিনটি শুণের মধ্যে একটি হচ্ছে, তাঁর রাবুন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রতিপালক, মালিক ও প্রভু হওয়া। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তাঁর মালিকুন নাস অর্থাৎ সমস্ত মানুষের বাদশাহ, শাসক ও পরিচালক হওয়া। তৃতীয়টি হচ্ছে, তাঁর ইলাহন নাস অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির প্রকৃত মাবুদ হওয়া। (এখানে একথা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, ইলাহ শব্দটি কুরআন মজীদে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এক, এমন বস্তু বা ব্যক্তি যার ইবাদাত গ্রহণ করার কোন অধিকারই নেই কিন্তু কার্যত তার ইবাদাত করা হচ্ছে। দুই, যার ইবাদাত গ্রহণ করার অধিকার আছে এবং যিনি প্রকৃত মাবুদ, লোকেরা তার ইবাদাত করুক বা না করুক। (আল্লাহর জন্য যেখানে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এ দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)।

এ তিনটি শুণের কাছে আশ্রয় চাওয়ার মানে হচ্ছে : আমি এমন এক আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাহি, যিনি সমস্ত মানুষের রব, বাদশাহ ও মাবুদ ইবার কারণে তাদের ওপর পূর্ণ কর্তৃত রাখেন, যিনি নিজের বাল্দাদের হেফাজত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন এবং যথার্থই এমন অনিষ্টের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারেন, যার হাত থেকে নিজে বাঁচার এবং অন্যদের বাঁচাবার জন্য আমি তাঁর শরণাপন হচ্ছি। শুধু এতেকুই নয় বরং যেহেতু তিনিই রব, বাদশাহ ও ইলাহ, তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যাই কাছে আমি পানাহ চাইতে পারি এবং প্রকৃতপক্ষে যিনি পানাহ দেবার ক্ষমতা রাখেন।

২. মূলে وَسْوَاسُ الْخَنَّاسِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এর মানে হচ্ছে, বারবার প্ররোচনা দানকারী। আর “ওয়াসওয়াসাহ” মনে হচ্ছে, একের পর এক এমন গন্ধতিতে মানুষের মনে কোন খারাপ কথা বসিয়ে দেয়া যে, যার মনে ঐ কথা বসিয়ে দেয়া হচ্ছে, ওয়াসওয়াসাহ সৃষ্টিকারী যে তার মনে ঐ কথা বসিয়ে দিচ্ছে তা সে অনুভবই করতে পারে না। ওয়াসওয়াসাহ শব্দের মধ্যেই বারবার হবার অর্থ রয়েছে, যেমন ‘যাত্যালাহ’ (ভূমিকম্প) শব্দটির মধ্যে রয়েছে, বারবার ভূকম্পনের ভাব। যেহেতু মানুষকে শুধুমাত্র একবার প্রতারণা করলেই সে প্রতারিত হয় না বরং তাকে প্রতারিত করার জন্য একের পর এক প্রচেষ্টা চালাতে হয়, তাই এ ধরনের প্রচেষ্টাকে ‘ওয়াসওয়াসাহ’(প্ররোচনা) এবং প্রচেষ্টাকারীকে ‘ওয়াসওয়াস’ (প্ররোচক) বলা হয়। এখানে আর একটি শব্দ এসেছে খনাস। এর মূল হচ্ছে খুন্স। এর মানে খনুস এর মানে প্রকাশিত হবার পর আবার গোপন হওয়া অথবা সামনে আসার পর আবার পিছিয়ে যাওয়া। আর “খারাস” যেহেতু বেশী ও অত্যধিক বৃদ্ধির অর্থবোধক শব্দ, তাই এর অর্থ হয়, এ কাজটি বেশী বেশী বা অত্যধিক সম্পর্কারী। একথা সৃষ্টিপ্রক্রিয়া প্ররোচনাদানকারীকে প্ররোচনা দেবার জন্য বারবার মানুষের কাছে আসতে হয়। আবার এই সঙ্গে যখন তাকে খারাসও বলা হয়েছে তখন এ দু’টি শব্দ প্রস্পর মিলিত হয়ে আপনা আপনি এ অর্থ সৃষ্টি করেছে যে, প্ররোচনা দান করতে করতে সে পিছনে সরে যায় এবং তারপর প্ররোচনা দেবার জন্য আবার বারবার ফিরে আসে। অন্য কথায় একবার তার প্ররোচনা দান করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর সে ফিরে যায়। তারপর সেই প্রচেষ্টা চালাবার জন্য বারবার সে ফিরে আসে।

“বারবার ফিরে আসা প্ররোচনাকারীর অনিষ্ট”-এর অর্থ বুঝে নেয়ার পর এখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আর্থ প্রার্থনা করার অর্থ কি, একথা চিন্তা করতে হবে। এর একটি অর্থ হচ্ছে, আশ্রয় প্রার্থনাকারী নিজেই তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর আর্থ প্রার্থনা করছে। অর্থাৎ এ অনিষ্ট তার মনে যেন কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করতে না পারে। এর বিত্তীয় অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে আহবানকারীদের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তিই লোকদের মনে কোন প্ররোচনা সৃষ্টি করে বেড়ায় তার অনিষ্ট থেকে সত্ত্বের আহবায়ক আল্লাহর আশয় চায়। সত্ত্বের আহবায়কের ব্যক্তি সত্ত্ব বিরুদ্ধে যেসব লোকের মনে প্ররোচনা সৃষ্টি করা হচ্ছে তার নিজের পক্ষে তাদের প্রত্যেকের কাছে পৌছে খুটে খুটে তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন দূর করে দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করার যে কাজ সে করে যাচ্ছে তা বাদ দিয়ে প্ররোচনাকারীদের সৃষ্টি বিভিন্ন দূর করার এবং তাদের অভিযোগের জবাব দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করাও তার পক্ষে সম্ভত নয়। তার বিরুদ্ধবাদীরা যে পর্যায়ে নেমে এসেছে তার নিজের পক্ষেও সে পর্যায়ে নেমে আসা তার মর্যাদার পরিপন্থি। তাই মহান আল্লাহ সত্ত্বের আহবায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন, এ ধরনের অনিষ্টকারীদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর শরণাপন হও এবং তারপর নিচিতে নিজেদের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করো। এরপর এদের মোকাবেলা কর্ণ তোমাদের কাজ নয়, মরুন নাস, মালিকুন নাস ও ইলাহিন নাস সর্বশক্তিমান আল্লাহরই কাজ।

এ প্রসঙ্গে একথাটিও অনুধাবন করতে হবে যে, ওয়াসওয়াসাহ বা প্ররোচনা হচ্ছে অনিষ্ট কর্মের সূচনা বিন্দু। যখন একজন অসতর্ক বা চিন্তাহীন মানুষের মনে তার প্রভাব পড়ে, তখন প্রথমে তার মধ্যে অসংকোচ করার আকাংখা সৃষ্টি হয় তারপর আরো প্ররোচনা দান করার পর এ অসৎ আকাংখা অসৎ ইচ্ছায় পরিণত হয়। এরপর প্ররোচনার প্রভাব

বাড়তে থাকলে আরো সামনের দিকে গিয়ে অসৎ ইহা অসৎ সংকলে পরিণত হয়। আর তারপর এর শেষ পদক্ষেপ হয় অসৎকর্ম। তাই প্রোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে আগ্নাহের আশ্বয় চাওয়ার অর্থ হবে, অনিষ্টের সূচনা যে স্থান থেকে হয়, মহান আগ্নাহ যেন সেই স্থানেই তাকে নির্মুল করে দেন।

প্রোচনা দানকারীদের অনিষ্টকারিতাকে অন্য এক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যাবে, প্রথমে তারা খোলাখুলি কুফরী, শিরক, নাষ্টিকতা বা আগ্নাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং আগ্নাহপ্রাপ্তীদের সাথে শক্তির উক্তানী দেয়। এতে ব্যর্থ হলে এবং মানুষ আগ্নাহের দীনের মধ্যে প্রবেশ করে গেলে তারা তাকে কোন না কোন বিদআতের পথ অবগতনের প্রোচনা দেয়। এতেও ব্যর্থ হলে তাকে গোনাহ করতে উদ্বৃক্ত করে। এখানেও সফলতা অর্জনে সক্ষম না হলে মানুষের মনে এ চিন্তার যোগান দেয় যে, হোট ছেট সামান্য দুঃচারিটে গানাহ করে নিলে তো কোন ক্ষতি নেই। অর্থাৎ এভাবে এ হোট গানাহ-ই যদি বিপুল পরিমাণে করতে থাকে তাহলে বিপুল পরিমাণ গোনাহে মানুষ ঢুবে যাবে। এ থেকেও যদি মানুষ পিঠ বাঁচিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে তাহলে শেষমেশ তারা চেষ্টা করে মানুষ যেন আগ্নাহের সত্য দীনকে শুধুমাত্র নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি এ সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করে দেয় তাহলে জিন ও মানুষ শয়তানদের সমস্ত দল তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে শোকদেরকে উক্তানি দিতে ও উভ্যেভিত্তি করতে থাকে। তার প্রতি ব্যাপকভাবে গালিগালাজ ও অভিযোগ-দোষারোপের ধারা বর্ণণ করতে থাকে। চতুর্দিক থেকে তার দূর্নাম রটাবার ও তাকে লাহিত করার চেষ্টা করতে থাকে। তারপর শয়তান সে সেই মন্দে মু'মিনকে ক্রোধাভিত করতে থাকে। সে বলতে থাকে, এসব কিছু নীরবে সহ্য করে নেয়া তো বড়ই কাপুরুষের কাজ। ওঠো, এ অক্রমণকারীদের সাথে সংঘর্ষ বাধাও। সত্যের দাওয়াতের পথ রূপ্ত্ব করার এবং সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অন্ত। সত্যের আহবায়কদেরকে পথের কাঁটার সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করার জন্য এটি হয় শয়তানের শেষ অন্ত। সত্যের আহবায়ক এ শয়দান থেকেও যদি বিদ্যমান বেশে বের হয়ে আসে তাহলে শয়তান তার সামনে নিরূপায় হয়ে যায়। এ জিনিসটি সম্পর্কেই কুরআন মজিদে বলা হয়েছে :

وَإِمَّا يَنْزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَرْعَى فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ

“আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে তোমরা কোন উক্তানী অনুভব করো তাহলে আগ্নাহের পানাহ চাও।” (হা-মীম সাজদাহ, ৩৬)

- وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَرَتِ الشَّيْطَينِ -

“বলো, হে আমার রব। আমি শয়তানের উক্তানী থেকে তোমার পানাহ চাই।”

(আল মু'মিনুন, ১৭)

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَرِفٌ مِّنَ الشَّيْطَنِ تَذَكَّرُوا فَإِنَّا هُمْ مُبَصِّرُونَ

“যারা আগ্নাহকে ভয় করে তাদের অবহা এমন হয় যে, কখনো শয়তানের প্রভাবে কোন অসৎ চিন্তা তাদেরকে স্পৰ্শ করলেও তারা সঙ্গে সঙ্গেই সংঘাপ হয়ে যায় এবং

০ "তারপর (সঠিক পথ) তাদের দৃষ্টি সমক্ষে পরিকার ভেসে উঠতে থাকে।"

(আল আরাফ, ২০১)।

আর এ জন্যই যারা শয়তানের এই শেষ অঙ্গের আধাতও ব্যর্থ করে দিয়ে সফলকাম হয়ে বেরিয়ে আসে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يُلْقَهَا إِلَّا نُوحَظُ عَظِيمٌ

"অতি সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ এ জিনিস লাভ করতে পারে না।"

(হা-মীম আস সাজদাহ, ৩৫)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও সামনে রাখতে হবে। সেটি হচ্ছে, মানুষের মনে কেবল জিন ও মানুষ দলভুক্ত শয়তানরাই বাইর থেকে প্রোচনা দেয় না বরং ডেতর থেকে মানুষের নিজের নফসও প্রোচনা দেয়। তার নিজের ভাস্ত মতবাদ তার বৃদ্ধিশৃঙ্খিকে বিপর্যে পরিচালিত করে। তার নিজের অবৈধ বার্থ-লালসা তার ইচ্ছা, সংকলন, বিশ্বেষণ ও মীমাংসা করার ক্ষমতাকে অসৎপথে চালিত করে। আর বাইরের শয়তানরাই শথু নয়, মানুষের ডেতরের তার নিজের নফসের শয়তানও তাকে ভুল পথে চালায়। একথাটিকেই কুরানের এক জায়গায় বলা হয়েছে এভাবে **وَتَعْلَمُ مَاتُقْسِسُونَ بِهِ نَفْسَهُ** "আর আমি তাদের নফস থেকে উদ্ভূত প্রোচনাসমূহ জানি।" (কোফ, ১৬) এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাহই ওয়া সাল্লাম তাঁর এক বহু প্রচারিত ভাষণে বলেন : **نَعْزَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِفِ أَنْفُسِنَا** "আমরা নফসের অনিষ্টকারিতা থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি।"

৩. কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এ শব্দগুলোর অর্থ হচ্ছে, প্রোচণা দানকারীরা দুই ধরনের লোকদের মনে প্রোচনা দান করে। এক, জিন এবং দুই, মানুষ। এ বক্তব্যটি মেনে নিলে এখানে নাস নাস বলতে জিন ও মানুষ উভয়কে বুঝাবে এবং তাঁরা বলেন, এমনটি হতে পারে। কারণ, কুরআনে যখন **رَجَالٌ** (পুরুষরা) শব্দটি জিনদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন সূরা জিনের ৬ আয়াতে দেখা যায় এবং যখন **نَفْرُ** (দল) শব্দটির ব্যবহার জিনদের দলের ব্যাপারে হতে পারে, যেমন সূরা আহকাফের ২৯ আয়াতে দেখা যায়, তখন প্রোক্ষভাবে 'নাস' শব্দের মধ্যে মানুষ ও জিন উভয়ই শামিল হতে পারে। কিন্তু এ মতটি সঠিক নয়। কারণ এ নাস - **أَنْسَان** ও **শব্দগুলো** অভিধানিক দিকে দিয়েই **جِن** (জিন) শব্দের বিপরীতধর্মী। জিন-এর আসল মানে হচ্ছে গোপন সৃষ্টি। আর জিন মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন থাকে বলেই তাকে জিন বলা হয়। বিপরীত পক্ষে 'নাস' ও 'ইনস' শব্দগুলো মানুষ অর্থে এ জন্য বলা হয় যে, তাঁরা প্রকাশিত, তাদের চেয়ে দেখা যায় এবং তাঁক দিয়ে, অনুভব করা যায়। সূরা কাসাসের ২৯ আয়াতে **أَنْسَ منْ جَانِبِ الطَّورِ نَارًا** (আ-নাসা) মানে **রাত্রি** (রাত্রি) অর্থাৎ হ্যারত মূসা (আ) স্তুর পৃথাড়ের কিনারে আগুন দেখেন।" সূরা আন নিসার ৬ আয়াতে বলা হয়েছে : **فَإِنْ انْسَمْ مِنْهُمْ رِشَادًا** "যদি তোমরা অনুভব করো, এতিম শিশুদের এখন বুঝসূব হয়েছে।

رَأَيْتُمْ (আ-নাসভূম) মানে **أَخْسَنْتُمْ** (আহসাসভূম) বা **رَأَيْتُمْ** (রোআইভূম)। কাজেই আরবী ভাষার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 'নাস' শব্দটির মানে জিন হতে পারে না।

তাই এখানে আয়াতটির সঠিক মানে হচ্ছে, “এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে সে জিনদের মধ্য থেকে হোক বা মানুষদের মধ্য থেকে।” অর্থাৎ অন্য কথায় বলা যায়, প্ররোচনা দান করার কাজ জিন শয়তানরাও করে আবার মানুষ শয়তানরাও করে। কাজেই এ সূরায় উভয়ের অনিষ্ট থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন থেকে এ অর্থের সমর্থন পাওয়া যায় এবং হাদীস থেকেও। কুরআনে বলা হয়েছে :

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُواً شَيْطَانَ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ يُؤْحِي بَعْضُهُمْ
إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقُولِ غُرُورًا -

“আর এভাবে আমি জিন শয়তান ও মানুষ শয়তানদেরকে প্রত্যেক নবীর শক্তি বানিয়ে দিয়েছি, তারা পরস্পরের কাছে মনোমুগ্ধকর কথা ধীকা ও প্রতারণার ছলে বলতে থাকে।” (আল আন আম, ১১২)

আর হাদীসে ইমাম আহমাদ, নাসাই ও ইবনে হিবান হযরত আবু যার গিফারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হায়ির হলাম। তখন তিনি মসজিদে বসেছিলেন। তিনি বললেন, আবু যার! তুমি নামায পড়েছো? আমি জবাব দিলাম, না। বললেন, ওঠো এবং নামায পড়ো! কাজেই আমি নামায পড়লাম এবং তারপর আবার এসে বসলাম। তিনি বললেন :

يَا أَبَاذَرْ نَعَوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيْطَانِ الْإِنْسَانِ وَالْجِنِّ -

“হে আবু যার! মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর পানাহ চাও।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যেও কি আবার শয়তান হয়? বললেন, হৈ।

শেষ কথা

আমি ১৩৬১ হিজরীর মুহররম মাসে (ইসায়ী ১৯৪২ ফেব্রুয়ারি) তাফহীমুল কুরআন লেখার যে সুকঠিন দায়িত্ব মাধ্যম তুলে নিয়েছিলাম, তিনিশ বছর চার মাস পরে আজ তা সম্পর্ক করতে সক্ষম হয়েছি—এ জন্য গভীর অস্তরিক নিষ্ঠা সহকারে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। তিনি নিজের এক নগণ্য বাল্দাকে তাঁর পবিত্র কিতাবের খেদমত করার তাওফীক দান করেছেন। তাঁর প্রত্যেক অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ তাফসীর গ্রন্থে আমি যা কিছু সঠিক ও সত্য আলোচনা করেছি তা মূলত মহান আল্লাহর হিদায়াত ও পথনির্দেশনার বদলতে সম্ভব হয়েছে। আর যেখানেই কুরআনের ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের প্রতিনিধিত্ব করার ব্যাপারে আমি কোন ভুল করেছি, তা অবশ্য আমার নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধি-বিবেচনার কমতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে আলহামদুলিল্লাহ! আমি জেনে-বুঝে কোন ভুল করিনি। তাই আল্লাহর অনুগ্রহের দরবারে এতটুকু আশা রাখি, তিনি এটি মাফ করে দেবেন এবং আমার এ কাজের মাধ্যমে তাঁর বাল্দারা হিদায়াত লাভ করার ক্ষেত্রে কোন সহায়তা লাভ করে থাকলে তাকে আমার মাগফেরাতের মাধ্যমে পরিণত করবেন। আলেম সমাজের কাছেও আমার আবেদন, আমার ভুল-ক্রটির ব্যাপারে তাঁরা যেন আমাকে অবহিত করেন। যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে যে কথাটির প্রতি আমার সামনে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হবে, ইনশালাল্লাহ আমি তা শুধরে নেবো। কিতাবল্লাহর ব্যাপারে জেনে-বুঝে কোন ভুল করার এবং কোন ভুল প্রমাণিত হবার পরও তার উপর অবিচল থাকার ব্যাপারে আমি আল্লাহর পানাহ চাই।

এ কিতাবে আমি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আমি নিজে কুরআনকে যেভাবে বুঝেছি, সাধারণ শিক্ষিত লোকদেরকে সেভাবে কুরআন বুঝাবার জন্য এখানে চেষ্টা করেছি। কুরআনের আসল তাৎপর্য ও মূল বক্তব্য এমন ঘৃণ্যহীনভাবে তুলে ধরতে চেয়েছি যার ফলে পাঠক কুরআনের অস্তুলে পৌছুতে সক্ষম হন। কুরআন ও তার নিষ্কর্ষক অনুবাদগুলো পড়ে মানুষের মনে যেসব সন্দেহ-সংশয় জাগে সেগুলো দূর করা এবং যেসব প্রশ্নের উদয় হয় সেগুলোর জবাব দেবার চেষ্টা আমি করেছি। কুরআন মজীদে যেসব কথা ইশ্রারা-ইস্তিতে, চুক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে এবং সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোকে সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার একটা প্রচেষ্টা আমি চালিয়েছি।

শুরুতে বেশী লম্বা-চতুর্ভা আলোচনা করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। তাই প্রথম জিলদের টিকাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারেই এসেছে। পরবর্তী পর্যায়ে আমি যতই সামনে এগিয়ে যেতে থেকেছি 'ততই টিকায় বিজ্ঞানিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেছি। এমনকি পরবর্তী জিলদগুলো দেখে এখন প্রথমেরগুলোকে সবাই অসম্পূর্ণ মনে করতে শুরু করেছেন। কিন্তু কুরআন মজীদের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে আমরা একটা ফায়দা হাসিল করতে পেরেছি। যে বিষয়ের ব্যাখ্যা এক জায়গায় অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, পরবর্তী সূরাগুলোতে তার পুনরাবৃত্তি হবার কারণে সেখানে তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি আশা করি যারা কুরআন মজীদকে তাফহীমুল কুরআনের মাধ্যমে শুধুমাত্র একবার পড়েই ক্ষতি হন না, তারা সমগ্র কিতাব দিতীয়বার পড়ার সময় নিজেরাই অনুভব করবেন যে পরবর্তী সূরাগুলোর ব্যাখ্যাসমূহ পূর্ববর্তী সূরাগুলো অনুধাবন করার ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ক প্রয়োগিত হয়।

আবুল আলা

লাহোর,

২৪ রবিউস সালী, ১৩৯২ হিজরী

(৭ জুন, ১৯৭২ ইং)

هذا يان العالى مذهب
هذا يان العالى مذهب

تقى القرآن

ابوالاعلى
مودودى
ر